ঊনবিংশ শতাব্দীর
সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে বঙ্গমহিলা

উনবিংশ শতাব্দীর
সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে বঙ্গমহিলা

ডঃ মঞ্জুশ্রী সিংহ

প্রাপ্তিস্থান :

গ্রন্থসম্পুট

৪৪/১সি, বেনিয়াটোলা লেন

কলকাতা-৭০০ ০০৯

UNABINGSHA SATABDIR SAHITYA O SANGSKRITITE BANGA MAHILA

ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে বঙ্গমহিলা

প্রথম প্রকাশ :

১১ই ডিসেম্বর, ২০০০ খ্রীষ্টাব্দ

২৫শে অগ্রহায়ণ, ১৪০৭ বঙ্গাব্দ

প্রকাশক :

ডঃ পতিতপাবন সিংহ

৯৫, সাদার্ন এভিনিউ, ফ্ল্যাট-৩।ই

কলকাতা - ৭০০ ০২৯

ফোন : ৪৬৬-২৬২১

মুদ্রক :

শাল্মলী পাবলিকেশনস্‌

৫৭বি, টাউনসেন্ড রোড

কলকাতা - ৭০০ ০২৫

ফোন : ৪৭৫-০৮৩৮

প্রচ্ছদ :

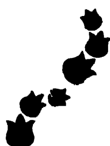
সমীরণ সরকার

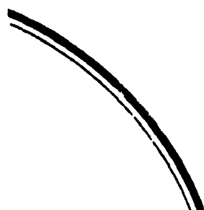
প্রাপ্তিস্থান :

গ্রন্থসম্পুট,

৪৪/১সি, বেনিয়াটোলা লেন

কলকাতা-৭০০ ০০৯





উৎসর্গ

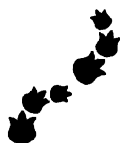
মাতৃদেবী সরসীবালা কর

ও

পিতৃদেব ভূপতিনাথ করের

পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে





বিষয়সূচী

পৃষ্ঠা সংখ্যা

ভূমিকা : ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (ট)

নিবেদন (ড)

মুখবন্ধ ১-২০

প্রথম অধ্যায়

প্রাচীন যুগ থেকে প্রাক্-উনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় জীবনে সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে নারীর স্থান, দান ও মর্যাদা ২১-৮৬

প্রথম পবিচ্ছেদ ২১-২৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ২৭ ৩০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ৩১-৪০

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ৪১-৪৮

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ৪৯-৬৪

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ৬৫-৮৬

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বঙ্গীয় সংস্কৃতিতে নারী ৮৭-১৩৮

প্রথম পরিচ্ছেদ ৮৭-৯৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ১০০-১০৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ১০৪-১১৩

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ১১৪-১৩৮

পৃষ্ঠা সংখ্যা

তৃতীয় অধ্যায়

উনিশ শতকের সামাজিক পরিবেশ ও বঙ্গনারী ১৩৯-২০৫

প্রথম পরিচ্ছেদ ১৩৯-১৫৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ১৫৯-১৬৭

তৃতীয় পবিচ্ছেদ ১৬৮-১৭৭

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ১৭৮-১৮২

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ১৮৩-১৮৮

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ১৮৯-১৯৬

সপ্তম পরিচ্ছেদ ১৯৭-২০৫

চতুর্থ অধ্যায়

বঙ্গে স্ত্রী শিক্ষার প্রবর্তন ও প্রসার ২০৬-২৩৩

প্রথম পরিচ্ছেদ ২০৬-২২৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ২২৬-২২৭

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ২২৮-২৩৩

পঞ্চম অধ্যায়

সাহিত্য সৃজনে বঙ্গনারী ২৩৪-৩১৪

পৃষ্ঠা সংখ্যা

ষষ্ঠ অধ্যায়

সংস্কৃতি বিভিন্নক্ষেত্রে বঙ্গনারী ৩১৫-৩৮০

প্রথম পরিচ্ছেদ ৩১৫-৩২০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ৩২১-৩২৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ৩২৪-৩৩২

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ৩৩৩-৩৩৪

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ৩৩৫ ৩৩৮

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ৩৩৯-৩৪৫

সপ্তম পরিচ্ছেদ ৩৪৬-৩৫৪

অষ্টম পরিচ্ছেদ ৩৫৫-৩৮০

উপসংহার ৩৮১-৩৮৮

নির্ঘন্ট ৩৮৯-৪৩২



চিত্রসূচী

পৃষ্ঠা সংখ্যা

১। অর্ধনারীশ্বর শিল্পী নন্দলাল বসু
২। অলঙ্কারশোভিত দেবামূর্তি (গঙ্গা, ইন্দ্রাণী ও সরস্বতী) ১০৮, ১০৯
৩। আলপনা ১২৩, ১২৪
৪। রাজা রামমোহন রায় ১৪৭
৫। 'সতীর চিতায় আরোহণ' শিল্পী : নন্দলাল বসু ১৫৭
৬। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৬০
৭। বেথুন সাহেব ২১৫
৮। কাদম্বিনী বসু ও চন্দ্রমুখী বসু ২২২
৯। 'অনামা' রচিত গ্রন্থের প্রচ্ছদপট ২৪৬
১০। স্বর্ণকুমারী দেবী ও তরু দত্ত ২৫৫
১১। গিরীন্দ্রমোহিনী দত্ত, মানকুমারী বসু ও কামিনী রায় ২৫৯, ২৬০
১২। সরোজিনী নাইডু ২৭০
১৩। 'হিন্দুমহিলাগণের হীনাবস্থা'র প্রচ্ছদ ২৮৯
১৪। 'নারীচরিত' গ্রন্থের প্রচ্ছদ ২৯২
১৫। শ্রীশ্রী সারদাদেবী ও আনন্দময়ী মা ৩১৯
১৬। ভগিনী নিবেদিতা ও সরলা দেবীচৌধুরাণী ৩২৭
১৭। নটী বিনোদিনী ৩৪৩
১৮। প্রতিভা দেবী ও ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী ৩৫২
১৯। সুনয়নীদেবীর আত্মপ্রতিকৃতি ৩৫৮
২০। অন্নপূর্ণা দত্তের আত্মপ্রকৃতি ৩৬৩
২১। গয়নাবড়ি ৩৬৫
২২। প্রজ্ঞাসুন্দরীদেবী, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ৩৭৩
২৩। কবরীবিন্যাস ৩৭৫



ভূমিকা

অনেকদিন আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. পাঠ সাঙ্গ করে শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী সিংহ আমার কাছে পি-এইচ. ডি. র জন্য গবেষণা করেছিলেন। বিষয় : 'উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে বঙ্গনারী'। এর জন্য তাঁকে বহু তথ্য সংগ্রহ করতে হয়েছিল, বৈদিক, বৌদ্ধ, পৌরাণিক ও মধ্যযুগের বহু গ্রন্থ মন্থন করে প্রাচীন ও আধুনিক নারীসমাজের বিবর্তন ও বিকাশ নির্দেশই ছিল তাঁর সন্ধানের বিষয়। কাজটি দুরূহ, বিতর্কসংকুল এবং নানা বাদপ্রতিবাদে কণ্টকিত। তাঁর বিষয়টির প্রধান বক্তব্য উনিশ শতকের বাঙালি নারীসমাজ হলেও তাঁকে প্রাচীন, মধ্যযুগ ও উনিশ শতকের তথ্যসমুদ্র মন্থন করে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হয়েছে। কারণ নারীসমাজের বিবর্তন শুধু এক যুগের ব্যাপার নয়, বহু পুরাতন কাল থেকে ভারতীয় নারীর পারিবারিক, সামাজিক ও ধর্মীয় জীবন নানা বাধা-নিষেধ, বিচিত্র totem ও taboo-র মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। তার প্রতিফলন হয়েছে সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে।

আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদে দেখানো হয়েছে যে, একদা নারী ছিল পুরুষের ভোগ্য পণ্য, আর পাঁচটা পণ্যের মতোই। কিন্তু ভারতবর্ষের নারীসমাজ সেই পথ ধরে রেখায় রেখায় অগ্রসর হয়নি। বৈদিক যুগ থেকেই দেখা যাচ্ছে ধর্মকর্মে নারীর বিশেষ স্বাতন্ত্র্য ছিল, পরিবারে তিনি ছিলেন কর্ত্রী, অন্তঃপুর নিয়ন্ত্রণের বজ্রমুষ্টি ছিল তাঁরই করধৃত। প্রাচীনকাল থেকেই নারী জাতি শুধু গৃহাঙ্গনে নয়, বহিরঙ্গনেও নিজ প্রতিভা প্রমাণ করেছিলেন। তাঁরা বেদের সূক্ত রচনা করেছেন, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন, শিল্পকলায় নিজ নিজ প্রভাব মুদ্রিত করেছেন। কেউ শাসনদণ্ড ধারণ করে রাজ্য শাসন করেছেন, যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্রপরিচালনা করেছেন। ধর্মসম্প্রদায়ের নেতৃত্ব করেছেন (যেমন নিত্যানন্দ-পত্নী জাহ্নবা দেবী এবং শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যা হেমলতা ঠাকুরাণী)। এইভাবে সমগ্র মধ্যযুগেই বাংলার সমাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্যে নারীপ্রাধান্য লক্ষ্য করা যাবে। এটি সম্ভব হয়েছে বৈষ্ণব ও তান্ত্রিক সমাজে। ইংরেজ ভারত-তাত্ত্বিকগণ যাই বলুন, খ্রীস্টান ধর্মযাজকগণ যে রঙেই বাঙালি নারীকে চিত্রিত করতে চান-না-কেন, মধ্যযুগের বাঙালি নারীসমাজ নিতান্ত মূর্খ ছিলেন না, তা ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকেই প্রমাণ করা যাবে। শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী বহু পরিশ্রম করে সেই সমস্ত তথ্য উদ্ধার করেছেন। উনিশ শতকে যাকে বাঙালির নবজাগরণ বা রেনেসাঁস বলে, শুধু পুরুষেই তা ত্বরান্বিত করেনি, এই শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে সাহিত্য, শিক্ষা, সমাজ, রাজনীতি, চিকিৎসাবিজ্ঞান, সাময়িকপত্র প্রকাশে ও সম্পাদনে নারীসমাজ বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, তার ভূরি-পরিমাণ দৃষ্টান্ত এই গবেষণা গ্রন্থে লক্ষ্য করা গেল। বহু উৎস থেকে

এমন দুষ্প্রাপ্য তথ্য উদ্ধার করেছেন যার জন্য তিনি বিশেষ প্রশংসা দাবি করতে পারেন। পরিশ্রমের সঙ্গে প্রতিভার সংযোগ হলে যথার্থ গবেষণা প্রস্তুত হয়। শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী সিংহ এই আলোচনায় তারই দুর্লভ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

গবেষণা বলতে আমরা সাধারণত যে বিপুলকলেবর শুষ্ক কাষ্ঠবৎ নীরস রচনাকে বুঝি এবং যা পড়তে আতঙ্কিত হয়ে পড়ি, এই গবেষণা কোনো দিক দিয়েই সে রকম ভীতিপ্রদ নয়। এর ছত্রে ছত্রে যে কৌতূহল জমা হয়ে আছে, পাঠক-পাঠিকা তার প্রতি নিশ্চয় আকৃষ্ট হবেন। আমার আশা ও বিশ্বাস, এই গবেষণা-গ্রন্থ সুধীমহলে স্বীকৃতি লাভ করবে।

২৬ অক্টোবর, ১৯৯৯

ফোন : ৬৬৭-৪৩০১
১৪/২ ভট্টাচার্য পাড়া লেন,
হাওড়া-৭১১ ১০৪

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অধ্যাপক ও
বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ,
এশিয়াটিক সোসাইটির
সিনিয়ার রিসার্চ ফেলো
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি



।। নমঃ শ্রীগুরবে নমঃ ।।

নিবেদন

রাষ্ট্রসংঘ ১৯৭৫ সালটিকে 'নারীবর্ষ'রূপে চিহ্নিত করায়; ঐ সময় সমগ্র বিশ্বের নারীসমাজে একটা আলোড়ন জেগেছিল। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে কোথাও সাড়ম্বরে, কোথাও বা সাধারণভাবে পালন করা হয়েছিল 'নারীবর্ষ'। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যস্তর শাখার সাহিত্যিক উপসমিতির অস্থায়িকা ছিলেন বিশিষ্ট লেখিকা বাণী রায়। বেশ কয়েকটি আলোচনাচক্র, সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং বঙ্গমহিলা সাহিত্যিকদের নির্বাচিত রচনাবলী কয়েকখণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল। এই সব কাজের সঙ্গে আমিও যুক্ত ছিলাম। এই 'নারীবর্ষ' উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়েই কিন্তু পরোক্ষভাবে আমি গবেষণার কাজে উদ্‌বুদ্ধ হয়েছিলাম।

ভারতীয় সংস্কৃতির চলমান ধারায় বঙ্গীয় নারীদের বিশেষ কী এমন বৈশিষ্ট্য আছে যেজন্যে তাঁরা মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়েও স্বাতন্ত্র্য লাভে সক্ষম হয়েছেন— তারই অনুসন্ধান করতে আমি উদ্‌গ্রীব ছিলাম। বাণীদিই প্রথম আমাকে এই কাজটি করার জন্য উৎসাহ দেন। পরে একটি সংক্ষিপ্ত পরিকল্পনা নিয়ে আমি সাক্ষাৎ করি আমার পরমশ্রদ্ধাস্পদ আচার্য ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে। উনি তখন ছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রধান। সমগ্র বিষয়টি একটি সময়সীমার মধ্যে আবদ্ধ রেখে, কিভাবে উপস্থাপন করতে হবে, সে সম্পর্কে তিনি আমাকে উপদেশ ও নির্দেশ দেন। তাঁরই তত্ত্বাবধানে সমগ্র কাজটি আমি সম্পন্ন করি এবং যথাসময়ে সেটি নির্দিষ্ট দপ্তরে জমা দিই। কিন্তু কী রহস্যময় কারণে জানি না, অন্যান্য আরও অনেকের গবেষণামূলক নিবন্ধের সঙ্গে আমার লেখাটিও দীর্ঘকাল সেখানে আটক ছিল। অবশেষে আমি তৎকালীন সহ-উপাচার্য ড. ভারতী রায়ের শরণাপন্ন হই। তাঁর হস্তক্ষেপের ফলে খুব দ্রুত পরীক্ষা গ্রহণ ইত্যাদি পর্ব সমাধা হয় এবং আমি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি. এইচ. ডি. উপাধি লাভ করি। আজ আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ চিত্তে ড. ভারতী রায়ের কথা স্মরণ করছি। বাণীদি আজ ইহজগতে নেই। এই গ্রন্থ দেখলে নিশ্চয়ই তিনি খুব খুশি হতেন। তাঁর আত্মার উদ্দেশে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানালাম।

যখন গবেষণার কাজে রত ছিলাম, তখন প্রয়োজনবশে অনেকবার সময়-অসময়ে আমি অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাঁতরাগাছির বাসগৃহে গিয়েছি। তাঁর এবং তাঁর সহধর্মিণী— লেখিকা ও অধ্যাপিকা বিনীতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে যে সুন্দর সস্নেহ ব্যবহার পেয়েছি তার কোনো তুলনা নেই। তাঁদের আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাই।

আমার গবেষণা পত্রের যাঁরা পরীক্ষক ছিলেন তাঁদের একজন ছিলেন রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ড. রমা চৌধুরী। তিনি এখন পরলোকে। তাঁর উদ্দেশে আমার সভক্তি প্রণাম নিবেদন করি। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. চিত্তরঞ্জন লাহা অন্যতম পরীক্ষক ছিলেন

বলে শুনেছি। এ ছাড়া যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. সত্যবতী গিরি আমার মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করেন। এঁদের আমার শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা জানাই।

অনেক আগেই গ্রন্থাকারে এই রচনাটি প্রকাশ করার বাসনা ছিল। কিন্তু অস্বাভাবিক বিলম্বের জন্য নিজের আলস্যই দায়ী। প্রথমদিকে আমার বৈবাহিক ও বৈবাহিকা অধ্যাপক কল্যাণনাথ দত্ত ও তাঁর পত্নী রেখাদি আমাকে গ্রন্থটি প্রকাশের সুযোগ-সুবিধা করে দিয়েছিলেন। কিন্তু তখন আমি তেমনভাবে উদ্যোগ নিই নি। তাঁদের ধন্যবাদ দিলে তাঁরা রুষ্ট হবেন ভেবে, সে চেষ্টা থেকে ক্ষান্ত রইলাম। ড. অশোককুমার কুণ্ডুও একসময় লেখাটি ছাপানোর সহায়তা করতে এগিয়ে এসেছিলেন, সে সুযোগ হেলায় হারিয়েছি। আজ তাঁকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানালাম। আমার মেজদা প্রখ্যাত ভাস্কর চিন্তামণি কর তাঁর প্রকাশকের সঙ্গে যোগাযোগ করে গ্রন্থ প্রকাশের সুযোগ দিয়েছিলেন, তারও সদ্ব্যবহার করা হয় নি সময়মতো। দাদার নির্দেশ অনুযায়ী শিল্পী নন্দলাল বসুর আঁকা ছবিটি ছাপানোর অনুমতি পাওয়া গেছে, কলিকাতা জাদুঘরের কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে।

এতদিন পরে গ্রন্থটি প্রকাশের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করলেন স্বেচ্ছায় 'শাল্মলী পাবলিকেশনের' - কর্ণধার শ্রী গৌরীনারায়ণ ঘোষ ও তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী শেলী ঘোষ। শেলী আমার প্রাক্তন ছাত্রীও বটে। এঁদের আমার আন্তরিক স্নেহ ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। শ্রী সুবিমল লাহিড়ী মহাশয় যেভাবে যত্নসহকারে সমগ্র পাণ্ডুলিপি সংশোধন এবং প্রতিটি অধ্যায় পরিচ্ছেদকে সুবিন্যস্ত করে দায়িত্ব পালন করলেন — যা আমার মতো অনভিজ্ঞের পক্ষে ছিল অসম্ভব। এই সহায়তার জন্য তাঁর কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী হয়ে রইলাম। শ্রীমান উৎপল অধিকারী যেভাবে নিষ্ঠাভরে প্রুফ দেওয়া-নেওয়া করেছে এজন্য তাকেও আমার স্নেহ ও শুভেচ্ছা জানালাম।

এ পর্যন্ত কতজনের কাছ থেকে যে আমি নানারকম সাহায্য ও উৎসাহ পেয়েছি তাদের সকলের নাম উল্লেখ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি যাঁদের কাছে একদা শিক্ষা গ্রহণ করেছিলাম, সেই মুরলীধর গার্লস্ কলেজের অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের কথা বিশেষ করে মনে পড়ছে। যাঁদের নাম উচ্চারণ করতেই হয়, তাঁরা হলেন — অধ্যাপক সুশীলরঞ্জন জানা, অনিলকুমার সরকার, কবি সুধীর গুপ্ত, সুবোধচন্দ্র চৌধুরী (প্রয়াত), ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী (প্রয়াত), নরহরি কবিরাজ, নির্মাল্য বাগচী (প্রয়াত), ড. করুণাকর গুপ্ত (প্রয়াত) প্রভৃতি। এ ছাড়া আমার সহকর্মিণীদের মধ্যে বিশেষভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন অধ্যাপিকা স্বপ্না ঘোষ, সবিতা পাকড়াশী, ড.বাণী চক্রবর্তী (প্রয়াত)। এঁদের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার সম্পর্ক অক্ষুন্ন থাক, এই কামনাই করি। আমার ভ্রাতৃপ্রতিম পরম স্নেহভাজন কল্যাণকুমার গুপ্ত (বিশু) অনেক বই ও পত্রপত্রিকা দিয়ে সাহায্য করেছিল একসময়। তাঁর অকাল প্রয়াণ অত্যন্ত বেদনাদায়ক।

যে-সমস্ত গ্রন্থাগারের সাহায্য ভিন্ন আমার এই গবেষণার কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হত না, তার মধ্যে নাম করতে হয়— মুরলীধর গার্লস কলেজের গ্রন্থাগার, জাতীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদ, উত্তবপাড়া জয়বাম মুখোপাধ্যায গ্রন্থাগার ও নিখিলভারত বঙ্গভাষা প্রসার সমিতির গ্রন্থাগার প্রভৃতি। যে-সকল গ্রন্থাগারিকেব নিকট আমি বিশেষভাবে ঋণী তাঁরা হলেন শ্রী প্রশান্ত রায় (বঙ্গীয সাহিত্য পরিযদ), শ্রীমতী চিত্রা শতপথী ও ব্রততী দাশগুপ্ত (মুরলীধর গার্লস কলেজ), শ্রীনির্মলচন্দ্র চৌধুবী (উত্তরপাড়া গ্রন্থাগাব) এবং আরও অনেকে। পরম স্নেহভাজন শ্রী দিবাকব চট্টোপাধ্যায উত্তরপাড়া গ্রন্থাগারেব সঙ্গে যোগাযোগ করার সকল রকম ব্যবস্থা কবেছেন। তাঁকে আমার আন্তরিক স্নেহ ও শুভেচ্ছা জানাই। আমার সহপাঠী বান্ধবী গীতা চট্টোপাধ্যায় আমাকে নানাভাবে সহায়তা করে চলেছে। তার সঙ্গে আমার ধন্যবাদ আদানপ্রদানের সম্পর্ক নয়। আমাদেব পরিবারেব বন্ধু শ্রীসুজিত কুমার বসুর নিকট আমি বিশেযভাবে কৃতজ্ঞ।

বাড়ির সকলকে আমি নানাভাবে উত্ত্যক্ত কবলেও, সকলেই আমাকে সকল সময়ে নানারকমভাবে সাহায্য করতে কুণ্ঠিত হয় নি আমার ভাইবোনেদেব মধ্যে বিশেষভাবে বলতে হয় দিদি মণিমালা পালিত, পুষ্পশ্রী বিন্দু ও জামাইবাবু অবনীকুমার বিন্দু, দাদা সুধাংশু কর ও ছোটোভাই সিতাংশু করের কথা। আর আছে আমার স্নেহভাজন কন্যা ও পুত্রসম কাকলী সেন, কাজরী মিত্র, অভীক বিন্দু। আমাব কন্যা ও জামাতা পত্রালী ও কুশল দত্ত এবং পুত্র পুত্রবধূ ড. সিতাভ্র সিংহ ও ইন্দ্রাণীর কাছেও আমি ঋণী এবং আর -একজন আছেন, তিনি আমার স্বামী ড. পতিতপাবন সিংহ। দীর্ঘকাল ধরে আমাদেব গৃহকর্মের ক্ষেত্রে যে নিযুক্ত ছিল সেই স্বর্গীয়া বীণাপাণি ঘোষের কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ, সে কথা আজ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি।

পাঠক সমাজে আমাব এই গ্রন্থ যদি কিছুমাত্র মর্যাদা পায়, তা হলেই আমি নিজেকে ধন্য মনে করব। অনিচ্ছাসত্ত্বেও বেশ কিছু ভুল ভ্রান্তি বয়ে গেল, তাব জন্য আমি নিরুপায়।

মঞ্জুশ্রী সিংহ

১৮।৮।২০০০
১ ভাদ্র ১৪০৭ বঙ্গাব্দ
৯৫ সাদার্ন এভিনিউ
ফ্ল্যাট-৩। ই
কলকাতা - ৭০০০২৯



মুখবন্ধ

অনাদি অনন্তকাল ধরে কালস্রোত প্রবাহিত হয়ে চলেছে অতীতের উৎস থেকে, অজানা অনাগত ভবিষ্যতের দিকে। কালক্রমে সেই বেগবান ধারায় এসে মিশেছে, উদ্ভিদ ও জীবজগতের প্রাণবান ধারাটি।

সমগ্র বিশ্বে নর ও নারীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে বিচিত্র সভ্যতা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রগুলি। নীল নদীর ধারে মিশরীয় সভ্যতা, মধ্য প্রাচ্যে টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর তীরে মেসোপটেমিয়ার সভ্যতা, সমুদ্রতীরে গ্রীক ও রোমক সভ্যতা, ইয়াং সিকিয়াং ও হোয়াংহো নদীর পাশে চৈনিক সভ্যতা, দক্ষিণ আমেরিকায় মায়াসভ্যতা ইত্যাদির সঙ্গে আমাদের দেশের সিন্ধু-গাঙ্গেয় উপত্যকায় গড়ে উঠেছিল ভারতীয় সভ্যতা। সুদূর অতীত থেকে আরম্ভ করে আজও সেই সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারাটি প্রবলবেগে প্রবহমান রয়েছে এটি আমাদের কাছে পরম গৌরবের বিষয়।

সকল সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটা নিজস্ব বিশেষ রূপ ও রীতি আছে। ভারত তার চিন্তাধারা ও মননের মধ্যে দিয়ে খুঁজে পেয়েছে সেই স্বাতন্ত্র্য। কত বিভিন্ন ধরণের মানুষ এসেছে ভারতে, মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে তারা; ভারতীয় বলে পরিগণিত হয়েছে অবশেষে। প্রাক্-আর্য, আর্য, প্রাক্-বৈদিক, বৈদিক যুগ থেকে অহরহ চলেছে এই দেওয়া-নেওয়া। ধীরে ধীরে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে ভারতীয় সংস্কৃতির মহান্ আদর্শটি।

ভারতীয় সংস্কৃতির মূল আদর্শ— বহুর মধ্যে সমন্বয় সাধন

বহুর মধ্যে ঐক্য স্থাপন দীর্ঘকাল ধরে ভারতে চলেছে এই সাধনা। কত মানুষ এসেছে ও গেছে। কত শত সহস্র মনীষীর আবির্ভাব ঘটেছে এখানে। বিভিন্ন ধারার মধ্যে সমন্বয় ও যোগ সাধন ঘটানোই ছিল তাঁদের কাজ। পরম উদারতা, আন্তরিকতা ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে তাঁরা নিঃশব্দে এই ঐক্য বন্ধনের সাধনায় মগ্ন হয়েছেন। 'সত্য সেই চিরন্তন এক'— এই সত্যের সন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন বৈদিক ঋষিকুল। "একং সদ্ বিপ্র বহুধা বদন্তি" (ঋগ্বেদ ১।১৬৪।৪৬) এক সত্যের কথাই তাঁরা নানাভাবে বলেছেন। একে একে মহাত্মাদের আবির্ভাব ঘটেছে— পৌরাণিক যুগ থেকে, ঐতিহাসিক যুগ ও আধুনিক যুগে— রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্য থেকে আরম্ভ করে একালে শ্রীরামকৃষ্ণদেব পর্যন্ত প্রচার করেছেন 'যত মত তত পথ'। "Unity among diversity" অর্থাৎ বিবিধের মাঝে মহান মিলন প্রদর্শন করানোই আমাদের জাতীয় আদর্শ এবং ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রথম ও প্রধান আদর্শ।

বহুর মধ্যে একের উপলব্ধি— বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য— বিরোধের মধ্যে মিলন — কিভাবে দেখা গেল, এ সম্পর্কে পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন চমৎকার ভাবে আলোচনা করেছেন— "নদী যেমন সাগরের দিকে অগ্রসর হবার পথে ক্রমে ক্রমে এক একটি করে নদীর ধারা পায় এবং

তাকে আত্মসাৎ করে ক্রমে পুষ্ট হয়ে এগিয়ে চলে, তেমনি ভারতীয় অর্থাৎ হিন্দু-সংস্কৃতি যুগের পর যুগে নব নব সংস্কৃতিকে পেয়ে তাদের অস্বীকার বা নষ্ট না করে, বরং তাদের সংস্কৃতিগত সম্পদ সব সাদরে আত্মসাৎ করে আপনার ঐশ্বর্য ও বৈচিত্র্যকে ক্রমাগতই বাড়িয়ে চলেছিল। দ্রাবিড়, শক, গ্রীক প্রভৃতি বহু সভ্যতাই ক্রমে এই বিরাট ধারাতে গৃহীত হয়েছে।[১]

ভারতীয় জনজীবনে ধর্মের প্রভাব

ভারতীয় জনজীবনে ধর্মের গভীর প্রভাব অনুভব করা যায়। এ ধর্ম কোনো বাইরের বস্তু নয়। ধর্ম সাধনা আমাদের ভারতীয় মনন ও চিন্তাধারাকে এবং সেইসঙ্গে জীবনের সকল ক্ষেত্রকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। অথর্ব বেদে আছে 'পৃথিবী ধর্মণাং ধৃতং' (১২।১।১৭) অর্থাৎ ধর্মই পৃথিবীকে ধরে রেখেছে। আমাদের এই ধর্মভাব ও চিন্তা কিন্তু কোনো ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা উদ্ভাবিত নয়। অতীতকাল থেকেই ভারতীয় জীবনাদর্শের সঙ্গে হিন্দু ধর্মের একটি অন্তরঙ্গ যোগ ছিল। সর্বসাধারণের জীবনে তাই ধর্মের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও প্রভাব আছে। অবশ্য সব মানুষের মনেই যে হিন্দু ধর্মের তত্ত্বগত দিকটি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকত, তা নয়, অথচ একটা স্বাভাবিক আত্মিক যোগ ছিল। এই কারণেই আমাদের জীবনযাত্রায় ছিল সহজসুন্দর অথচ গভীর ও নিবিড় এক নিষ্ঠাবোধ। ধর্মের সঙ্গে, আমাদের দৈনন্দিন বাস্তব জীবনের কোনো বিরোধ দেখা যেত না। এদেশের মানুষ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দৈনন্দিন কাজগুলিকে জগন্মাতার পূজা বলে মনে করেছেন

"প্রাতরুত্থায় সায়ং বা সায়াহ্নাৎ প্রাতরুত্থতঃ।
যৎকরোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনম্।।"

এই সরল জীবনাদর্শ ও গভীর ভগবদ্ বিশ্বাস, একটানা চলে এসেছে এই সেদিন পর্যন্ত। একালের কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাসনা' কবিতায় বলেছেন।

'সারাদিনের শ্রান্তিভরা, শিথিল আঁখির পাতে
স্বপ্নহারা ঘুমের আরাম ভোগ করিব রাতে।
না ফুটিতেই উষার আঁখি,
না ডাকিতেই ভোরের পাখি,
ঝঙ্কারিব 'জয় জগদীশ' প্রাণের একতারাতে।'[২]

ভারতের সাধারণ মানুষের জীবনে, ধর্মের অনুশাসন যত প্রবল ছিল, কোনো রাজা-বাদশাহের প্রভাব ততটা ছিল না।

সভ্যতা ও সংস্কৃতি

কোনো মানুষের দেহের অঙ্গসংস্থান নিখুঁত হলেই যে তাকে সুন্দর বা লাবণ্যযুক্ত হতে হবে, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। তেমনি সভ্য হলেই যে, কোনো ব্যক্তি বা জাতি, সব সময় সুউচ্চ সংস্কৃতিসম্পন্ন হয়ে ওঠে, তা নয়। এ ক্ষেত্রে মনে করা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথের 'শেষের

কবিতা'র লিসি ও অমিতের কথোপকথন। লিসি যখন অমিতকে বলল- -'বিদ্যেকেই তো বলে কালচার।' তার তীব্র প্রতিবাদ করল অমিত --"কমল হীরেব পাথরটাকেই বলে বিদ্যে, তাব ওপর থেকে যে আলো ঠিকরে পড়ে, তাকেই বলে কালচাব। পাথরেব ভার আছে, আলোব আছে দীপ্তি।" ৩

সভ্যতায় আছে বাহিরেব সমৃদ্ধি বা ঐশ্বর্যেব পরিচয়, আব সংস্কৃতিতে আছে, অন্তরেব ঐশ্বর্যের অভিব্যক্তি। ব্যক্তির, সমাজের বা জাতির জীবনেব অন্তরতম পরিচয়টি নিহিত থাকে তার সংস্কৃতির মধ্যে। হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ সভ্যতার পাশাপাশি গড়ে তোলে সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার।

সভ্যতা ও সংস্কৃতি শব্দ দুটি তাই সমার্থক নয়। ইংরেজি 'Civilization'কে আমরা বলি 'সভ্যতা' এবং 'Culture' শব্দটিকে বলি 'সংস্কৃতি'। কেউ কেউ অবশ্য 'Culture' বলতে 'কৃষ্টি' শব্দটিকে বেশি পছন্দ করেন। রবীন্দ্রনাথের কাছে 'কৃষ্টি' শব্দটি ছিল শ্রুতিকটু ও দৃষ্টিশূল। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও ছিলেন 'সংস্কৃতি' শব্দের সমর্থক। আবাব যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি ও নীহাবরঞ্জন রায়, যুক্তি দেখিয়ে সমর্থন করেছেন 'কৃষ্টি'কে।

'সংস্কৃতি' কথাটি একটি ব্যঞ্জনাধর্মী শব্দ। এক কথায় এর স্বরূপ প্রকাশ করা সম্ভব নয়। মানুষ আর পশুর প্রধান পার্থক্য এইখানেই। কারণ মানুষের সংস্কৃতি আছে, কিন্তু পশুব তা নেই। এ বিষয়ে অতুলচন্দ্র গুপ্ত বলেছেন, "শরীব ক্রিয়ায় ও মনোবৃত্তিতে পশুব সঙ্গে মানুষেব অনেক মিল তা লক্ষ্য করে আমাদের প্রাচীনেরা বলেছেন যে, পশুতে ও মানুষে বড় প্রভেদ হচ্ছে 'মননে' ; মানুষের বিপুল মানসিক শক্তি, ও গভীর ও ব্যাপক অনুশীলন ও প্রয়োগ ক্ষমতায়।" ৪

চলমান ব্যক্তি-মানুষের জীবন যেমন বিবর্তনশীল, কোনো দেশ ও জাতি তেমনি সময়েব স্রোত বেয়ে অগ্রসর হতে থাকে। পার্থিব জীবনের চলাব ছন্দেই জেগে ওঠে সভ্যতা ও সংস্কৃতিব মৌলিক রূপ। অন্তর জীবনের পরিচয় পাওয়া যায় সংস্কৃতিতে। এই সংস্কৃতিও পবিবর্তনশীল। ভারতীয় জীবনের রীতি ও প্রগতি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে সুনীতিকুমাব চট্টোপাধ্যায় বলেছেন--

"জীবনের সঙ্গে সভ্যতা আব সংস্কৃতিও গতিশীল ব্যাপার। ভারতের সভ্যতা এবং সংস্কৃতি যুগে যুগে নতুন নতুন ভাব-পরম্পরা আত্মসাৎ করবার চেষ্টা করেছে, সমর্থও হয়েছে।"৫

প্রাচীন দিনে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির যে রূপ ছিল, মধ্য যুগে ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে, তার বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ রূপের পরিবর্তন ঘটল যথেষ্ট পরিমাণে। অবশ্য চলিষ্ণুতাই তো জীবনের লক্ষণ। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "সচল মনের প্রভাব সজীব মন না নিয়ে থাকতেই পারে না—এই দেওয়া-নেওয়ার প্রবাহ সেইখানেই নিয়ত চলেছে যেখানে চিত্ত বেঁচে আছে, চিত্ত জেগে আছে।" ৬

উনিশ শতকের নবজাগরণ

আধুনিক যুগের সূচনায় সেই পরিবর্তন ঘটেছে খুব দ্রুতগতিতে। একদা যেমন ইতালি থেকে 'রেনেসাঁস' বা নবজাগরণের ঢেউ, সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল, অভিভূত করেছিল ও দেশের মানুষকে, তেমনিভাবে ইংরেজ ও অন্যান্য ইউরোপীয় শক্তির এদেশে আগমনের ফলে, পাশ্চাত্যের নতুন ভাবধারা আলোড়ন জাগালো আমাদের মনোলোকে। রবীন্দ্রনাথের অননুকরণীয় ভাষায় বলা যায় "য়ুরোপীয় চিত্তের জঙ্গমশক্তি আমাদের স্থাবর মনের উপর আঘাত করল, যেমন দূর আকাশ থেকে আঘাত করে বৃষ্টিধারা মাটির 'পরে, ভূমিতলের নিশ্চেষ্ট অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করে প্রাণের চেষ্টা সঞ্চার করে দেয়, সেই চেষ্টা বিচিত্ররূপে অঙ্কুরিত বিকশিত হতে থাকে।"[৭]

ভারতের অন্যত্র যেমন, তেমনি পূর্ব ভারতে বঙ্গদেশেও এল সেই নবজাগরণের দুরন্ত প্রভাব উনবিংশ শতাব্দীতে। "য়ুরোপীয় রেনেসাঁসের সঙ্গে বাঙলার উনিশ শতকের শিল্পাদর্শ, জীবন চেতনা ও নীতিবোধের সাদৃশ্য আছে বলেই একে সাহিত্য সংস্কৃতির ইতিহাসে উনিশ শতকী রেনেশাঁস বলা হয়।"[৮]

কয়েকটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে খুব দ্রুত পরিবর্তন ঘটেছে বাঙালীর জীবনে। দুটি বিশ্বমহাযুদ্ধের পর, এদেশে এসেছে পঞ্চাশের মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা এবং দেশ স্বাধীন হয়েছে। এই সব ঘটনা ও তার প্রতিক্রিয়া ভিন্ন, হয়েছে বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতি এবং তার প্রভাব পড়েছে জনজীবনে।

নানা ঘাত-প্রতিঘাত ও আকর্ষণ-বিকর্ষণের ঘূর্ণাবর্তে পড়ে সাম্প্রতিককালের বাঙালী কিছু পরিমাণে বিভ্রান্ত ও দিকভ্রষ্ট হয়ে পড়েছে বলে মনে হয়। কোন্ দিকে চলেছি তা আমরা নিজেরাই বোধহয় জানি না। অগ্রগতি— না অধোগতি ? সংস্কৃতিকে অবলম্বন করে এগিয়ে চলেছি - না কি 'অপসংস্কৃতি'র অতলে তলিয়ে যেতে বসেছি ? যে চেতনাবোধ থাকলে আমরা নিজেদের মহতী বিনষ্টির হাত থেকে রক্ষা করতে পারি— তা আছে কি নেই -- তার জবাব দেবে শুধু মহাকাল।

২

জীবনাদর্শ ও ধর্মাদর্শ

প্রাচীন দিনে ভারতীয় জীবনাদর্শের মূলটি যেন বাঁধা ছিল ধর্মাদর্শের নিগড়ে। তবে আদিমযুগে এদেশের ধর্মচিন্তার রূপটি কেমন ছিল, তা কিন্তু সম্পূর্ণ অনুমানের বিষয়। সমাজতাত্ত্বিকরা মনে করেন যে, আদি মানব সমাজ ছিল মাতৃতান্ত্রিক।[৯] মাতাই ছিলেন সে পরিবার বা সমাজের প্রধান। এর থেকেই হয়তো এ দেশের মানুষ, ঈশ্বরকে মাতৃরূপে পূজা করবার প্রেরণা লাভ করেছে। কালী, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি মূর্তি— শক্তি, সমৃদ্ধি ও বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে পূজা

পান। এই শক্তিপূজা সম্পর্কে শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় তাঁর 'ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য' গ্রন্থে বলেছেন—"আমাদের শাক্ত সাহিত্যের মধ্যে উমাকে পাই, তিনিই পার্বতী গিরিজা, আমরা দক্ষকন্যা সতীকে পাই—তিনিই আবার দশমহাবিদ্যা রূপে রূপান্তরিতা, একান্ন মহাপীঠে আবার তাঁহার একান্ন দেহাংশ অবলম্বনে একান্ন দেবী, অসুর অসুরনাশিনী চণ্ডীকে পাই, তিনিই দুর্গতিনাশিনী দুর্গা, অভয়দায়িনী অভয়া, মঙ্গলকারিণী সর্বমঙ্গলা; আর পাই আমরা কালিকা বা কালীদেবীকে—শাক্ত সাধকগণের তিনিই প্রধানভাবে আরাধ্যা। ইহা ব্যতীত পুরাণ-তন্ত্রাদির মধ্যে একই মূলদেবীর সহিত অভিন্নরূপে দেবীর আরও অনেক রূপভেদ আছে, শাক্ত ধর্ম ও সাহিত্যের মধ্যে তাঁহাদের উল্লেখ রহিয়াছে। ইহাদের সঙ্গে মনসা, শীতলা, ষষ্ঠী প্রভৃতি আঞ্চলিক দেবীগণের কথাও স্মরণ রাখিতে হইবে, কারণ সুবিধা মতন ইঁহারাও মূল দেবীর সঙ্গে অভিন্না। বিদ্যারূপিণী সরস্বতী ও শ্রী ও সম্পদরূপিণী লক্ষ্মীর কথাও ভুলিলে চলিবে না। জগদ্ধাত্রী, অন্নপূর্ণা, বাসন্তী প্রভৃতি দেবী সহজেই মূল দেবীর রূপভেদ বলিয়া গৃহীতা। সাহিত্যে অনুলিখিত বহুদেবীর পূজাও ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত আছে।"[১০]

শ্রীশ্রীচণ্ডীর সাতশত শ্লোকে মহামায়ার মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, তিনিই এই জগতের মূলীভূত শক্তি। তাই তাঁকে প্রণাম জানানো হয়েছে এই বলে -

"যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ ।। নমস্তস্যৈ ।। নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ।।"

(দেবীদূত সংবাদ। ৩১-৩৪)

তাঁর কাছে কামনা জানানো হয়—

'রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিশো জহি।'

আর্যদের আগমনের পর, আর্যপ্রভাবে এদেশে গড়ে উঠল পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ও পরিবার। পুরুষরাই হলেন তখন পারিবারিক জীবনের প্রধান ব্যক্তি।

দ্বৈত সাধনার ধারা

আমাদের দেশে ধর্মের ক্ষেত্রে দ্বৈতসাধনার ধারাটি খুব প্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছে।[১১] সিন্ধুনদীর তীরে মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পায় খৃষ্টপূর্ব তিন হাজার বছর আগের যে উন্নতধরণের সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে, তা সত্যই বেশ চমকপ্রদ। অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে এখানে পাওয়া গেছে একটি ধ্যানী যোগী মূর্তি ও মাতৃকামূর্তি। এ দুটিকে শিব ও শক্তির আদিরূপ বলে মনে করা হয়।[১২] [১৩]এই সব দেখে আমাদের ধারণা হয় যে, আজকের মতো, সেকালের মানুষও হয়তো শিব ও শক্তির দ্বৈতরূপের আরাধনা করত। কারণ গৌরী পীঠের উপর স্থাপিত শিবলিঙ্গের পূজা বহুপ্রাচীন।

বেদে আছে ব্রহ্ম ও মায়ার কথা। পরবর্তীকালে আমরা কপিলের সাংখ্য দর্শনের মধ্যে পাই প্রকৃতিপুরুষ তত্ত্ব। সাংখ্যের মতে, সৃষ্টির মূলে রয়েছেন প্রকৃতি ও পুরুষ। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই

পুরুষ প্রকৃতি তত্ত্বের চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। "যিনি ব্রহ্ম, তিনিই আদ্যাশক্তি, যখন নিষ্ক্রিয়, তখন তাকে ব্রহ্ম বলি। পুরুষ বলি। যখন সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় এই সব করেন তাঁকে শক্তি বলি। প্রকৃতি বলি। পুরুষ আর প্রকৃতি। যিনি পুরুষ তিনিই প্রকৃতি। আনন্দময় ও আনন্দময়ী।"[১৪]

বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে যে, সৃষ্টির শুরুতে বিরাজমান ছিলেন শুধুমাত্র বিরাট এক পুরুষাকার আত্মা। তখন তাঁর মনে না ছিল শান্তি, না ছিল তৃপ্তি। তিনি মনে মনে সুখী হতে চাইলেন কামনা করলেন এক মনোমতো সঙ্গিনী—

'স বৈ নৈব রেমে তস্মাদেবাকীন রমতে স দ্বিতীয় মৈচ্ছৎ'

(বৃ. ১।৪।৩)[১৫]

এই মনোভাবটিকে একালের কবির ভাষায় ব্যক্ত করলে বলা যায় 'ভরা মনে বসে আছি, দিতে চাই। নিতে কেহ নাই।'[১৬] এই অভাববোধ থেকে 'এক' হলেন 'দুই' -পুরুষ ও নারী। একে অপরের পরিপূরক হয়ে দেখা দিলেন। পতির প্রয়োজনেই পত্নী হন প্রিয়া, অথবা পিতামাতার নিজের প্রয়োজনেই, পুত্ররা হন প্রিয়, বৃহদারণ্যক উপনিষদে এই কথাই বলা হয়েছে-

'ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায়
জায়া প্রিয়া ভবত্যাত্মনস্তু কামায়
জায়া প্রিয়া ভবতি।'

(বৃ ২।৪।৫)

স্মৃতিশাস্ত্রকার মনু প্রায় একই কথা বলেছেন, জীবের সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর, নিজেকে দ্বিধা বিভক্ত করে নারী ও পুরুষরূপে আত্মপ্রকাশ করলেন—

'দ্বিধা কৃত্বাত্মানোদেহমর্ধেন পুরুষোহভবেৎ।
অর্ধেন নারী তস্যাং স বিরাজ মসৃজৎ প্রভুঃ।।'

(মনু. ১।৩২)[১৭]

হিন্দু বিবাহের মন্ত্রের মধ্যেও রয়েছে এই দু'য়ে মিলে এক হবার কথা-

'যদেতৎ হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম।
যদিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব।।

(মন্ত্রব্রাহ্মণ ১।৩।৯)

নববধূর উদ্দেশে বর বলেন— তোমার হৃদয় আমার হোক, আর আমার হৃদয় তোমার হোক। দেওয়া-নেওয়া বা হৃদয় বিনিময়ের মধ্যে দিয়েই তো আসে পূর্ণতা। তাই হিন্দু বিবাহ নবনারীর মধ্যে চুক্তিমাত্র নয়, জন্মজন্মান্তরব্যাপী অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, এক পবিত্র বন্ধন।

পুরাণেও আছে মনু ও শতরূপার কাহিনী। আদিতে তাঁরাই ছিলেন, আদিম মানব-মানবী, পরস্পর সহচর-সহচরী। বাইবেলে বর্ণিত আদম ও ইভের মতো। এঁরাই হলেন জগৎব্যাপী প্রাণ প্রবাহের উৎস।

বাস্তব জীবনের আদর্শেই গড়ে উঠেছে আমাদের ভারতীয় ধর্মীয় উপাসনার ধারা। তাই 'দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।' জাগতিক সম্পর্ক অনেক কাল দেবতাদের মধ্যেও কারণ 'দেবতারে মোরা আত্মীয় জানি।'

ঘরে ঘরে যে-সব প্রতিমা পূজার প্রচলন আছে, সেখানে শুধুমাত্র তন্ত্রোক্ত শিব ও শক্তি আছেন, তা নয়, আছেন বৈষ্ণব মতের রাধা ও কৃষ্ণ, বিষ্ণু ও শ্রী অথবা লক্ষ্মী নারায়ণ। আবার রামভক্তের জন্য রয়েছেন রাম ও সীতা। এই সব যুগল মূর্তি, অগ্নি ও তার দাহিকা শক্তির মতোই পরস্পর সম্পৃক্ত। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই যুগল মূর্তির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বলেছেন, "যোগ মায়া অর্থাৎ পুরুষ প্রকৃতিযোগ। যা-কিছু দেখছ সবই পুরুষ- প্রকৃতির যোগ। শিব কালীর মূর্তি, শিবের উপর কালী দাঁড়িয়ে আছেন। শিব শব হয়ে পড়ে আছেন। কালী শিবের দিকে চেয়ে আছেন। এই সমস্তই পুরুষ-প্রকৃতিযোগ। পুরুষ নিষ্ক্রিয়, তাই শিব শব হয়ে আছেন। পুরুষের যোগে প্রকৃতি সমস্ত কাজ করছেন। সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করছেন। রাধাকৃষ্ণ যুগল মূর্তিরও মানে ঐ। এ যোগের জন্য বঙ্কিমভাব। সেই যোগ দেখার জন্যই শ্রীকৃষ্ণের নাকে মুক্তা, শ্রীমতীর নাকে নীল পাথর। শ্রীমতীর গৌরবরণ মুক্তোর ন্যায় উজ্জ্বল। শ্রীকৃষ্ণের শ্যামবর্ণ, তাই শ্রীমতীর নীল পাথর। আবার শ্রীকৃষ্ণ পীতবসন ও শ্রীমতী নীলবসন পরেছেন।"[১৮]

অর্ধ-নারীশ্বর পরিকল্পনা

শিব ও শক্তির মিলনের ফলেই বিশ্ব প্রপঞ্চের সৃষ্টি। পুরাণের এই কল্পনাকে অনুসরণ করেই এদেশের ভক্ত শিল্পী ও সাহিত্যিকরা অর্ধনারীশ্বর মূর্তিকে রূপদান করেছেন ভাস্কর্যে, চিত্রে ও সাহিত্যে। এ যেন যুগল মূর্তিরই আরও সংহত রূপ।

প্রাচীন গুপ্তযুগ থেকেই শিব ও পার্বতীর সংযুক্ত মূর্তি- অর্ধনারীশ্বর রূপে দেখা গেছে ভাস্কর্য নিদর্শনের মধ্যে। কবি কালিদাস তাঁর মালবিকাগ্নিমিত্রম নাটকের নান্দীতে শিবকে 'কান্তাংমিশ্রদেহ' বলেছেন। কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে কুষাণযুগ থেকেই এই মূর্তি প্রচলিত ছিল। গুপ্তোত্তর যুগ থেকে বহু অর্ধনারীশ্বর মূর্তি পাওয়া যায়। এই মূর্তির দক্ষিণভাগে আছেন সায়ুধ অর্ধ শিব এবং বাম অংশে আছেন অর্ধপার্বতী।[১৯]

একালের বিশিষ্ট পণ্ডিত ড. সুকুমার সেন মহাশয় তাঁর 'চৈতন্যাবদান' গ্রন্থে যুগনদ্ধ মূর্তি সম্পর্কে কিছু মূল্যবান তথ্য পরিবেশন করেছেন। তিনি বলেছেন "মহাযান তান্ত্রিক মতে প্রথমে যা ছিল অবলোকিতেশ্বর ও প্রজ্ঞাপারমিতা বা করুণা, বজ্রযানে তা হল হেরুক ও নৈরাত্মা (নৈরামণি) তান্ত্রিক মহাযানে অবলোকিতেশ্বর (বোধিসত্ত্ব) ও প্রজ্ঞাপারমিতা (করুণা) আলাদা আলাদা পূজিত হতেন প্রতিমায় অথবা পটে। বজ্রযানে এঁরা পূজিত হতেন যুগনদ্ধ রূপে প্রতিমায়। অনুমান হয় বজ্রযানের যুগনদ্ধ মূর্তিপূজার প্রভাব সমসাময়িক শৈবতান্ত্রিক পুজায়ও পড়েছিল। তার ফলে আমরা পেয়েছি সেনরাজাদের আমলে অর্ধনারীশ্বরের অর্থাৎ শিব পার্বতীর যুগল মূর্তির পূজা। বজ্রযানের যুগল মূর্তির ও শৈবতান্ত্রিক যুগল মূর্তির পুজার প্রভাব বৈষ্ণবধর্মভাবনায়ও



অর্ধনারীশ্বর—শিল্পী নন্দলাল বসু

এসে গিয়েছিল সেনরাজাদের আমলে। এই বংশের প্রথম রাজা বিজয় সেন অর্ধনারীশ্বরের মতন অর্ধ বিষ্ণুলক্ষ্মীর মূর্তিরও পূজা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই দুই মূর্তির জন্য দেবালয়ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।"*

কী ভাবে এই ধারণাটি ভারতীয় মনে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ধর্ম' নামক গ্রন্থে বলেছেন— "প্রাচীন সংহিতাকারগণ হিন্দু সমাজে হরগৌরীকে অভেদাঙ্গ করিতে চাহিয়াছিলেন - বিশ্বচরাচর যে গ্রহণ ও বর্জন, যে আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ, যে কেন্দ্রানুগ ও কেন্দ্রাতিগ, যে স্ত্রী ও পুরুষভাবের নিয়ত সামঞ্জস্যের উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া সত্য ও সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে, সমাজকে তাঁহারা প্রথম হইতেই শেষ পর্যন্ত সকল দিকে সেই বৃহৎ সামঞ্জস্যের উপরে স্থাপিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। শিব ও শক্তির, নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তির সম্মিলনই সমাজের একমাত্র মঙ্গল এবং শিব ও শক্তির বিরোধই সমাজের সমস্ত অমঙ্গলের কারণ, ইহাই তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন।"[২০]

এই অর্ধনারীশ্বর মূর্তির মধ্য দিয়ে যেন বোঝানো হয়েছে— জগৎ সংসারে পুরুষ ও নারীর দায়িত্ব ও কর্তব্যের মর্যাদা সমান। ভারতীয় সংগীতশাস্ত্রে ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণীর আধিপত্য

('দেশ' পত্রিকা, ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮৫, পৃঃ-১৩)

দেখা যায়। সংগীতজ্ঞরা রাগ সৃষ্টির সঙ্গে, রাগিণীকেও সৃষ্টি করেছেন। ধর্ম সাধনাব সঙ্গে শিল্পসাধনা, সংগীত সাধনা ও সাহিত্য সাধনা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। এক কথায় আমাদের সমগ্র জীবনই যেন এক অখণ্ড সাধনার ধারায় যুক্ত।

সংস্কৃতির অভিজাত ধারাটির পাশাপাশি যে লৌকিক ধারাটি সমান্তরালভাবে প্রবহমান, সেখানেও ভারতীয় জীবনের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায় মাঝে মধ্যে। অর্ধনারীশ্বর পরিকল্পনার পরিচয় সেখানেও মেলে। নিরক্ষর অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত পল্লীকবিব বচিত পল্লীগীতির মধ্যে অর্ধনারীশ্বর মূর্তিকল্পনা করে চমৎকার গান বাঁধা হয়েছে তাব একাধিক উদাহরণ দেওয়া যায়। অখণ্ড বাংলা দেশের ময়মনসিং জেলা লোক-সাহিত্যেব খনিবিশেষ। সেই জাতীয় গানের খণ্ডাংশ, উদাহরণ হিসাবে দেওয়া হল—

শিব গৌরীকে বলেছেন—

"আজ হতে তোমাকে রাখিব অর্ধ-অঙ্গে,
যথা যাই তথা তোমায় নিয়ে যাব সঙ্গে।
এত বলি চণ্ডিকাবে রাখি বামপাশে
আলিঙ্গন করিলেন মনের হরিষে।
অঙ্গে অঙ্গ মিশাইল বাহু চাপি ধরি,
অর্ধ অঙ্গে শিব হইল, অর্ধ অঙ্গে গৌরী।
রজত কাঞ্চনে যেন মিশে এক ঠাঁই,
দুই মাথা এক গ্রীবা অঙ্গ ভেদ নাই।
অর্ধ অঙ্গে ভস্ম মাখা অর্ধরক্তাকার,
শিবের হৃদয়ে দোলে পার্বতীর হার।"

ইত্যাদি

আর-একটি গীতির অংশ বিশেষ—

"এক পদে কাষ্ঠের পাদুকা শোভা পায়,
সুবর্ণ নূপুর দেখ শোভে আর পায়।
এক করে ডুম্বু শঙ্কর ধরিয়াছে,
আর করে পদ্ম পুষ্প মোহিনী ধরিছে।
এইরূপে লীলা প্রকাশিলা গঙ্গাধর,
হর গৌরীর রূপে হল অর্ধ-নারীশ্বর।"[২১]

ইত্যাদি।

আকৃতিগত ও প্রকৃতিগত দিক থেকে নর ও নারীর মধ্যে প্রভেদ বর্তমান। বুদ্ধিমত্তার দিক থেকে পুরুষ যদি শ্রেষ্ঠ হন, তা হলে হৃদয়বত্তার দিক থেকে শ্রেষ্ঠ হলেন নারী। স্ব স্ব প্রধান

হয়েও কিন্তু এরা একে অপরের পরিপূরক। কবি নজরুলের কথায় বলা যায়

"বিশ্বে যা কিছু মহান্‌সৃষ্টি চির-কল্যাণকর, অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।"

('সাম্যবাদী' নারী')

ভারতীয় জীবনাদর্শ

ভারতের প্রাচীন ঋষিরা বলেছিলেন - "আত্মানং বিদ্ধি" নিজেকে জানো। আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারলেই ব্রহ্মোপলব্ধি ঘটবে এবং এইভাবেই চরম ও পরম সত্যের সন্ধান পাওয়া যাবে। আত্মোন্নতির দ্বারা 'মোক্ষ' বা 'অমৃতত্ব' লাভই ছিল ভারতীয় জীবনাদর্শের মূল লক্ষ্য।

আধ্যাত্মিক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে হলে সেকালে সকলকেই যে গৃহত্যাগ করে নির্জন বনে গিয়ে একক সাধনায় মগ্ন হতে হত- তা নয়। অনেকে যথাযথ ভাবে গার্হস্থ্য ধর্ম পালন করে এবং সাংসারিক পরিবেশে থেকে একনিষ্ঠ সাধনার দ্বারা চরমলক্ষ্যে উত্তীর্ণ হতেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, জীবনের পথে চলতে হলে অজস্র বাধাবিঘ্নকে এড়িয়ে নয়, পেরিয়ে যেতে হবে। নিজের সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন—

'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।'

('নৈবেদ্য', ৩০)

এই দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে মিশে আছে, ভারতীয় জীবনাদর্শের মূল কথাটি।

সেকালের বড়ো বড়ো জ্ঞানীগুণী তপস্বীরা বসবাস করতেন নগর থেকে দূরে, তপোবনের শান্ত, নিভৃত পবিত্র পরিবেশে। তারা অধিকাংশই ছিলেন গৃহী। অথচ আধ্যাত্মিক সাধনায় সিদ্ধি লাভ করা তাঁদের পক্ষে কঠিন বলে মনে হয় নি। গৃহধর্ম পালনই ছিল তাঁদের অধিকাংশের কাছে অবশ্য কর্তব্য কর্ম। একেই তারা তপস্যা বলে মনে করতেন।

চাতুর্বর্ণ প্রথা

প্রাচীন ভারতে কর্মের ভিত্তিতে বর্ণ বিভাগ বা চাতুর্বর্ণ প্রথা প্রচলিত ছিল - জন্মের ভিত্তিতে নয়। গীতায় আছে-

'চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম বিভাগশঃ।'[২২]

(গীতা ৪/১৩)

পরবর্তীকালে এই প্রথা চলিত হল জন্মের ভিত্তিতে। এ বিষয়ে একজন গবেষকের মত হল এই - "বৈদিক যুগের গোড়ার দিকে ভারতীয় আর্য সমাজে কোনো বৃত্তি বা জীবিকাই বংশানুক্রমিক ছিল না, পরিবারের বিভিন্ন লোক বিভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করতে পারতেন। (ঋগ্বেদ ৯/১১২)। কিন্তু ঐ সময়কার আর্যেরা অত্যন্ত গাত্রবর্ণ সচেতন ছিলেন এবং শ্বেতকায় আর্য ও

কৃষ্ণকায়, খর্বনাসা অনার্যদের পার্থক্য সম্বন্ধে তাঁরা যথেষ্ট অবহিত ছিলেন। এই পার্থক্য শুধু গাত্রবর্ণের জন্য নয়, বিজেতা ও বিজিতদের মধ্যে প্রভেদ বজায় রাখার জন্যও তাঁরা মেনে চলতেন। পরাজিত অনার্যদের তাঁরা 'শূদ্র', 'দাস', 'দস্যুবর্ণ' প্রভৃতি আখ্যা দিয়েছিলেন। গাত্রবর্ণের পার্থক্য থেকে এই সামাজিক প্রভেদের উৎপত্তি হওয়ার জন্যই বোধ হয় সংস্কৃত ভাষায় আদিতে 'জাতি' শব্দের পরিবর্তে 'বর্ণ' শব্দের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। বর্ণাশ্রম কথাটির মধ্যে 'বর্ণ' কথাটির অবস্থিতি লক্ষণীয়।''[২৩]

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র নিজ নিজ জীবনে নির্দিষ্ট রীতিনীতি পালন করে চলতেন। ব্রাহ্মণরা যজন-যাজন, অধ্যয়ন-অধ্যাপনা করতেন। ক্ষত্রিয় বাহুবলের দ্বারায় দেশ ও জাতির নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করতেন। ব্যবসা, বাণিজ্য, কৃষিকাজ ইত্যাদির দ্বারা দেশ ও জাতিকে আর্থিক দিক থেকে সমৃদ্ধ ও স্বাবলম্বী করে তোলাই ছিল বৈশ্যদের কর্তব্য। আর সকলকে সব রকম কাজে, প্রয়োজনমতো সাহায্য দান করতে প্রস্তুত ছিলেন শূদ্রেরা। সবার উপরে ছিল ধর্মের অনুশাসন ও ঈশ্বরে নির্ভরতা।

চতুরাশ্রম

এক সময়ে প্রাচীন ভারতে যে চতুরাশ্রম প্রথা প্রচলিত ছিল তার বিশেষ তাৎপর্য আছে। রবীন্দ্রনাথ তার চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন – ''দিন যেমন চার স্বাভাবিক অংশে বিভক্ত – পূর্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ণ এবং সায়াহ্ন, ভারতবর্ষ জীবনকে সেইরূপ চারি আশ্রমে ভাগ করিয়াছিল। এই বিভাগ স্বভাবকে অনুসরণ করিয়াই হইয়াছিল। আলোক ও উত্তাপের ক্রমশ হ্রাস যেমন দিনের আছে, তেমনি মানুষেরও ইন্দ্রিয় শক্তির ক্রমশ উন্নতি এবং ক্রমশ অবনতি আছে। সেই স্বাভাবিক ক্রমকে অবলম্বন করিয়া ভারতবর্ষ জীবনের আরম্ভ হইতে জীবনান্ত পর্যন্ত একটি অখণ্ড তাৎপর্যকে বহন করিয়া লইয়া গেছে। প্রথমে শিক্ষা, তাহার পরে সংসার, তাহার পরে বন্ধনগুলিকে শিথিল করা, তাহার পরে মুক্তি ও মৃত্যুর মধ্যে প্রবেশ— ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও প্রব্রজ্যা।''[২৪]

মহাকবি কালিদাস তাঁর 'রঘুবংশম্' মহাকাব্যে দেখিয়েছেন, রঘুবংশীয় রাজাদের জীবনে ভারতীয় চিরন্তন আদর্শকে অনুসরণ করতেন—

'শৈশবহস্ত বিদ্যানাং যৌবনে বিষয়ৈষিণাম্।
বার্ধক্যে মুনিবৃত্তীণাং যোগনান্তে তনুত্যজাম্।

(রঘু. ১/৮)

আর্যঋষিরা বিধান দিয়েছিলেন জন্ম, বিবাহ ও মৃত্যুর মধ্যে সীমাবদ্ধ জীবনকে যদি প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির মধ্য দিয়ে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চালানো যায়, তা হলে শান্তি ও পরিপূর্ণতা লাভ হয়। প্রথম আশ্রম 'ব্রহ্মচর্য'— শুধু স্ত্রীলোকের জন্য নয়। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকেই জিতেন্দ্রিয় হয়ে ব্রহ্মচর্য পালন করতে হত। পুরুষরা গুরুগৃহে গমন করতেন কৈশোরে। কিন্তু নারীরা স্বগৃহে নিষ্ঠা সহকারে বিদ্যাচর্চা করতেন ও সংযম ব্রত পালন করতেন।

গুরুগৃহে অবস্থানকালে পুরুষদের কর্তব্য ছিল, পিতৃতুল্য গুরু ও মাতৃতুল্য গুরুপত্নীর পরিচর্যা, অগ্নি সংরক্ষণ কার্যে সহায়তা, যজ্ঞের সমিধ আহরণ, গোচারণ, অতিথি সৎকার ইত্যাদির মধ্য দিয়ে জ্ঞান আহরণ করা। 'উপনয়ন' নামে এক বিশেষ অনুষ্ঠান সমাপ্ত করে আট বছরে গুরুগৃহে যেতেন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সন্তান।

সংযম ও সদাচার শিক্ষাই ছিল ব্রহ্মচর্য পালনের প্রধান উদ্দেশ্য। শিক্ষা সমাপনান্তে গুরু উপদেশ দিতেন বিবাহ করে সংসারাশ্রমে প্রবেশ করতে। জীবনের দ্বিতীয় পর্ব ছিল -গার্হস্থ্যাশ্রম।

গৃহস্থাশ্রমের মহত্ত্ব

সেকালে গার্হস্থ্য ধর্ম পালনের আদর্শ ছিল নিয়ম, সংযম, ত্যাগ, তিতিক্ষা অবলম্বন করা। সংযমের সঙ্গে প্রবৃত্তিকে চালনা করতে পারলে সকল রকম মঙ্গলকর্মের অনুষ্ঠান সহজসাধ্য হয়। মনু বলেছেন -- দ্বিজ ও গুরুর আজ্ঞা নিয়ে যথাবিধি স্নান ও সমাবর্তনের পর সবর্ণা, সুলক্ষণা ভার্যা গ্রহণ করবে।

গুরুণানুমতঃ স্নাত্বা সমাবৃত্তো যথাবিধি।
উদ্বহেত দ্বিজো ভার্য্যাং সবর্ণাংলক্ষণান্বিতাম্।

(মনু. ৩/৪)

গুরুগৃহ ত্যাগের প্রাক্ মুহূর্তে গুরু ছাত্রদের সংসার জীবন যাপনের আদর্শ সম্পর্কে উপদেশ দিতেন। তৈত্তিরীয় উপনিষদের মধ্যে তার পরিচয় আমরা পাই। গুরু শিষ্যকে বলতেন -

সত্যংবদ। ধর্মংচর। স্বাধ্যায়ান্মাপ্রমদঃ।
আচার্য্যায় প্রিয়ং ধনমাহৃত্য প্রজাতন্তুংমা
ব্যবচ্ছেৎসীঃ। সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্।ধর্মান্ন
প্রমদিতব্যম্। কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্।
ভূত্যৈ ন প্রমদিতব্যম্। স্বাধ্যায় প্রবচনাভ্যাংন প্রমদিতব্যম্।

(তৈ. উ. ১/১১/১)

সত্য অবলম্বন করে ধর্মপথে থেকে, অনলস হয়ে বেদ পাঠ করার উপদেশ দিতেন। গৃহস্থ হয়ে শিষ্য, আচার্যকে প্রয়োজনমতো ধন দিতেন ও বংশধারাকে অনবচ্ছিন্ন রাখতেন। আত্মরক্ষা বিষয়ে সাবধান হতেন এবং স্বধর্ম পালন ও অধ্যাপনা বিষয়ে যত্ন নিতেন।

গুরু গৃহস্থ শিষ্যকে আরও যে-সব নির্দেশ দিতেন তা হল-- 'দেব পিতৃকার্যাভ্যাংন প্রমদিতব্যম্। মাতৃদেবোভব। পিতৃদেবোভব। আচার্যদেবোভব। অতিথিদেবোভব। যান্যনবদ্যানি কর্মাণি। তানি সেবিতব্যানি। নো ইতরাণি। যান্যস্মাকং সুচরিতানি তানি ত্বয়োপাস্যানি।

(তৈ. উ. ১।১১।২)

অর্থাৎ দেবকার্য ও পিতৃকার্য যেন ভুল না হয়। মাতা, পিতা. আচার্য ও অতিথিকে দেবতাব সমান ভক্তি ও সেবাযত্ন করতে বলতেন। সংসার জীবন যাপন কবতে গিয়ে কোনো নিন্দনীয় কর্মের অনুষ্ঠান যেন না করা হয়, সে বিষয়ে লক্ষ বাখতে বলতেন। অর্থাৎ যা-কিছু ভালো তার অনুষ্ঠান কবতে হবে জীবনে, মন্দকে এড়িয়ে চলতে হবে- এগুলিই ছিল প্রধান কর্তব্য।

দাম্পত্য জীবনের আদর্শ ছিল সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে ঘরকন্না করা। মনু বলেছেন — যে সংসাবে স্বামী-স্ত্রী পরস্পর মিলেমিশে সন্তুষ্ট চিত্তে সংসারযাত্রা নির্বাহ করেন, সে সংসারে সুখ ও শান্তি দীর্ঘস্থাযী হয়।

'সন্তুষ্টো ভার্য্যয়া ভর্ত্তা ভর্ত্রা ভার্য্যা তথৈবচ।
যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈ ধ্রুবম্।।'

(মনু. ৩/৬০)

সমাজের সঙ্গে প্রতিটি গৃহস্থেব অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ ছিল। সেই কাবণে—"ধর্মশাস্ত্রকাব গৃহস্থাশ্রমকে বনস্পতিব সঙ্গে তুলনা করেছেন; এই গাছেব যেমন স্কন্ধ শাখা পল্লব, তেমনি সমাজেব সকল অঙ্গই গৃহেব প্রাণে প্রাণবান্। শাস্ত্রকাব বলেছেন, বাজা গৃহস্থাশ্রমীকে যেন সম্মান কবেন।"[২৫]

শাস্ত্রকার বশিষ্ঠেব মতে, যিনি গৃহস্থ, তিনি দেবতার পূজা ও কর্তব্য পালনেব মধ্য দিযে অনেক ক্লেশ স্বীকাব কবেন, সেজন্য একে তপস্যা বলা যেতে পাবে এবং ব্রহ্মচর্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস বা যতির চেয়ে, গৃহস্থাশ্রমকে শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য করা হয়।

'গৃহস্থ এব যজতে গৃহস্থ স্তপ্যতে তপঃ ।
চুতর্ণামা শ্রমাণাস্তু গৃহস্থস্তু বিশিষ্যতে।"[২৬]

ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থই শ্রেষ্ঠ

ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ হওয়াই ছিল গৃহজীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ।

'ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাদ্ ব্রহ্মজ্ঞান পরায়ণঃ।
যদ্ যৎকর্ম প্রকুর্বীত তদ্ ব্রহ্মাণি সমর্পয়েৎ।

(মহানির্বাণতন্ত্র ৮/২৩)

অর্থাৎ গৃহস্থ হবেন ব্রহ্মনিষ্ঠ ও ব্রহ্মজ্ঞানপরায়ণ। তাঁর যা-কিছু কর্ম তা সমুদয় তিনি ব্রহ্মে সমর্পণ করবেন। ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ ঈশ্বরে পরিপূর্ণ নিষ্ঠা বজায় রেখে, নিরাসক্ত, নির্লিপ্ত এবং স্থিতধী হযে সংসারে নিখুঁত ভাবে সকল রকম কর্তব্যকর্ম পালন কবতেন। স্মবণ করা যেতে পারে জনকরাজা, যাজ্ঞবল্ক্য কিংবা বশিষ্ঠ মুনির কথা।

রাজা জনক অগাধ জ্ঞান ও অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েও, নিজেব হাতে হল বা লাঙল চালনা করে কৃষিকাজের সহায়তা করতেন। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের আধ্যাত্মিক শক্তি, বিদ্যাবুদ্ধি যেমন

ছিল, সেইসঙ্গে আবার পার্থিব সম্পদের প্রাচুর্যও ছিল। তিনি দুই স্ত্রী নিয়ে সংসার ধর্ম পালন করতেন। মৈত্রেয়ী ছিলেন তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের সঙ্গিনী ও কাত্যায়নী ছিলেন তাঁর ঐহিক সুখ সম্পদের সহায়িকা। কিন্তু তাঁর জীবনে চরমসত্য লাভের অন্তরায় হয়ে দেখা দেয় নি সংসার। সত্য দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করতে পারে নি অতুল ঐশ্বর্য। যোগীশ্রেষ্ঠের সম্মান লাভ করেছিলেন বশিষ্ঠ মুনি। অথচ সংসারের প্রতি ছিল তাঁর অগাধ নিষ্ঠা। সাধ্বী অরুন্ধতী ছিলেন তাঁর সহধর্মিণী। নন্দিনী নামে কামধেনু ছিল তাঁর অধিকারে। অথচ সেইসঙ্গে তাঁর ব্রহ্মতেজও অক্ষুণ্ণ ছিল।

সংসারযাত্রা নির্বাহে— স্ত্রীর সাহচর্য ছিল অপরিহার্য

সংসারযাত্রা নির্বাহে স্ত্রী ছিলেন প্রধান সহায়। মনু বলেছেন

'এতাবানেব পুরুষোযজ্জায়াত্মা প্রজেতি হ।
বিপ্রাঃ প্রাহুস্তথা চৈতদ্ যো ভর্তা সা স্মৃতাঙ্গনা।

(মনু. ৯/৪৫)

অর্থাৎ পুরুষ বলতে তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদেরও বোঝায়, তিনে মিলে এক। পুরুষ একা অর্ধেক এবং অঙ্গনাসহ তিনি পূর্ণ। এই অর্থে স্ত্রী অর্ধাঙ্গিনী।

আবার গৃহ বলতে গৃহিণীকেই বোঝায়

'ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।'

গৃহীকে সস্ত্রীক ধর্মাচারণ করতে হত— 'স স্ত্রী কোধর্মমাচরেৎ।' স্ত্রী ব্যতীত পুরুষের যজ্ঞের অনুষ্ঠান করার অধিকারই ছিল না। সেই কারণে ত্রেতা যুগে শ্রীরামচন্দ্র সীতাকে বনবাসে পাঠিয়ে অশ্বমেধযজ্ঞ করতে চাইলে, 'স্বর্ণসীতা' নির্মাণ করাতে হল। যজ্ঞকালে পত্নীর স্থান হত স্বামীর দক্ষিণ ভাগে 'শ্রাদ্ধে যজ্ঞে বিবাহে চ পত্নী দক্ষিণতঃ সদা।"

(অত্রিসংহিতা ১৩৮)

ভারতীয় দৃষ্টিতে স্ত্রী, ভোগের সামগ্রী নন; ধর্মাচরণের সঙ্গিনী বলে তাঁকে 'সহধর্মিণী' নামে অভিহিত করা হয়। পতি ও পত্নী উভয় উভয়ের সঙ্গী ও সঙ্গিনী-- সেই কারণে 'জায়া' ও 'পতি' মিলে হন 'দম্পতি'। আবার বংশ রক্ষার প্রয়োজনে ভার্যাকে প্রয়োজন- 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা'। প্রাচীন দিনের ভারতীয়দের বিশ্বাস ছিল যে, মৃত্যুর পর পরলোকগত পিতৃলোক ও মাতৃলোকের আত্মাদের কল্যাণ কামনায়, ছেলে পিণ্ডদান করলে, তাঁরা 'পুৎ' নামক নরক থেকে উদ্ধার পান। তাই পত্নীর সহায়তায় সুসন্তান সৃষ্টির দ্বারা বংশধারাকে অব্যাহত রাখতে হত। তবে সন্তান উৎপাদন ছাড়াও স্ত্রীর অন্যান্য গুণও কাম্য ছিল। চাণক্য সে কথা খুব স্পষ্ট করেই বলেছেন-

'সা ভার্য্যা যা শুচির্দক্ষা সা ভার্য্যা যা পতিব্রতা ।
সা ভার্য্যা যা পতিপ্রাণা সা ভার্য্যা যা প্রিয়ংবদা।।'

--তিনিই যথার্থ ভার্যা, যিনি একাধারে পবিত্রমনা, পতিব্রতা ও পতিপ্রাণা এবং মধুরভাষিণী।

গৃহস্থই সমাজের মূল

গৃহস্থরাই ছিলেন সমাজের মূল উপাদান। আবার সমাজ ও গৃহবন্ধনের মূলে ছিল বিবাহ। নরনারীর যৌন সম্পর্ককে নানাভাবে বিধিনিষেধের সূত্রে নিয়ন্ত্রণ করার নামই 'বিবাহ'। মহাভারতে (আদিপর্ব-১২২/৯) আছে যে, এদেশে বিবাহ প্রথার প্রবর্তক হলেন উদ্দালক ঋষির পুত্র শ্বেতকেতু।

প্রধানত আট প্রকারের বিবাহরীতি প্রচলিত ছিল— ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য, প্রাজাপত্য, গান্ধর্ব, রাক্ষস, অসুর ও পৈশাচ।

ব্রাহ্মো দৈবস্তথৈবার্যঃ প্রাজাপত্যস্তথাসুরঃ।
গান্ধর্বো রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচশ্চাষ্টমোঽধমঃ।

(মনু. ৩/২১)

অবশ্য ব্রাহ্ম বিবাহকেই শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য করা হত। এই বিবাহরীতিতে বর স্বয়ং কন্যাকে প্রার্থনা করেন না; বরকে কন্যা দান করা হয়। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী অভিভাবকবৃন্দ, সমাজ ও সংসারের উপযোগিতার নিরিখে নিরপেক্ষ বিচারের দ্বারায়, উপযুক্ত কন্যাকে তুলে দিতেন বরের হাতে। অমঙ্গল আশঙ্কায় তাঁরা কামনা- প্রবর্তিত পথকে নিষ্ঠুরভাবে বাধা দিতেন। ইচ্ছার বেগকে সহজে দমন করার ইচ্ছাতেই পরবর্তীকালে এদেশে বাল্য বিবাহ প্রথার প্রবর্তন ঘটে। কারণ গার্হস্থ্য ধর্ম পালনের ক্ষেত্রে বর ও বধূর আত্মভোগ সুখের আকাঙ্ক্ষাকে প্রবল অন্তরায় বলে মনে করা হত। ধর্মশাস্ত্রকারদের প্রবর্তিত বিবাহ প্রথায় যেভাবে কঠোর সংযম ও ব্যক্তিগত রুচি, আবেগ ও প্রবৃত্তিকে বাধা দেওয়া হয়েছে— বৈদিক যুগে কিন্তু তা ছিল না। পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী মহাশয় তাঁর 'প্রাচীন ভারতে নারী' গ্রন্থে বলেছেন—"প্রাচীন কালে নারী আপন পতি আপনিই বরণ করিতেন।... ক্রমে জাতি ভেদ প্রতিষ্ঠিত হইল। তখন ছেলেমেয়েদের স্বাধীন মতামত দেওয়া আর চলিল না। কারণ বিবাহের দুইটি দেবতা। প্রাচীন দেবতা হইলেন প্রজাপতি— তিনি দেখিয়া শুনিয়া ধীরে সুস্থে শাস্ত্রবিধি সমাজবিধি সব বাচাইয়া অগ্রসর হন। আর বিবাহের নবীন দেবতা হইলেন, 'মন্মথো দুর্নিবারঃ'। তিনি সব ভাঙিয়া চুরিয়া একাকার করিয়া অগ্রসর হন। কালিদাসকৃত শকুন্তলার চরিত্রেও এই নবীন দেবতার কিছু প্রভাব দেখা যায়।...

পরবর্তী যুগে কন্যাদের স্বামী নির্বাচনের অধিকার গুরুজনদের হাতেই গিয়া পড়িল।"[২১]

স্বাভাবিকভাবে মানুষের মন যদি নিয়ন্ত্রিত না করা যায়, তার জন্যই পরবর্তীকালে অন্য ব্যবস্থা প্রবর্তিত হল। এও এক জাতীয় সাধনা।

কোনো কোনো শাস্ত্রকার আবার বিবাহ ব্যাপারটিকে নিয়ে উৎকট ধরণের আতিশয্য প্রকাশ করেছেন। বিবাহকে তাঁরা মানব-জীবনে অপরিহার্য বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁদের মতে গার্হস্থ্

ধর্ম পালন না করা পাপকর্ম। যেমন 'দক্ষসংহিতা'র প্রথম অধ্যায়ে বলা হয়েছে—

অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেতু দিনমেকপি দ্বিজঃ।
আশ্রমেণ বিনা তিষ্ঠন্ প্রায়শ্চিত্তীয়তে হি সঃ।।"

অর্থাৎ এঁর মতে—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের মানুষের, আশ্রমবিহীন হয়ে একদিনও থাকা উচিত নয়। সেটা তার পক্ষে পাপকর্ম।

সংসারযাত্রা নির্বাহের দ্বারা সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধন করা যায় বলেই ভারতীয় মনীষীরা সংসার বা গৃহস্থাশ্রমের এত গুণগান করেছেন। রবীন্দ্রনাথ এবিষয়ে বলেছেন- "আমাদের গৃহস্থের কর্তব্যের মধ্যে সমস্ত জগতের প্রতি কর্তব্য জড়িত রহিয়াছে। আমরা গৃহের মধ্যেই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডপতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছি।"[১৮]

গৃহস্থের গুরুদায়িত্ব

গৃহস্থকে পারিবারিক ও সামাজিক নানা ধরণের গুরু দায়িত্ব পালন করতে হত। সাধারণ মানুষকে এ বিষয়ে অবহিত ও সচেতন করে তোলার জন্য এদেশে লেখা হয়েছিল স্মৃতি সংহিতা। কমপক্ষে কুড়িজন ধর্মশাস্ত্রকারের রচিত গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। শাস্ত্রকারকগণ বার বার গৃহস্থকে নির্দেশ দিয়েছেন— সংযত ও জিতেন্দ্রিয় হয়ে ত্যাগের শিক্ষা গ্রহণ ক'রে বিশ্বের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করার জন্য। গার্হস্থ্য ধর্ম পালনের লক্ষ্য হবে, অনাসক্তির মধ্যে দিয়ে সর্বকর্ম ঈশ্বরে সমর্পণ। এক্ষেত্রে রাজা, প্রজা নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষের জন্যই ছিল এই নিয়ম। এই আদর্শ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

'হে ভারত, নৃপতিরে শিখায়েছ তুমি
ত্যজিতে মুকুট দণ্ড সিংহাসন ভূমি,
ধরিতে দরিদ্রবেশ, শিখায়েছ বীরে
ধর্মযুদ্ধে পদে পদে ক্ষমিতে অরিরে,
ভুলি জয় পরাজয় শর সংহরিতে।
কর্মীরে শিখালে তুমি যোগযুক্ত চিতে
সর্বফলস্পৃহা ব্রহ্মে দিতে উপহার।
* * * * *
শিখায়েছ স্বার্থ ত্যজি সর্ব দুঃখে সুখে
সংসার রাখিতে নিত্য ব্রহ্মের সম্মুখে।'

('নৈবেদ্য' ৯৪)

নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্যকর্ম

শাস্ত্রকারদের নির্দেশ অনুযায়ী ভারতীয় জীবনযাত্রা প্রণালীর একটা নিজস্ব রূপ গড়ে উঠেছিল। অলক্ষিতে আজও তার কিছু প্রভাব রয়ে গেছে আমাদের দৈনন্দিন পারিবারিক ও সমাজজীবনে। এদেশে স্মার্ত শিরোমণি ছিলেন মনু।

সেকালের গৃহস্থকে তিন ধরণের কর্তব্য পালন করতে হত—নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্যকর্ম। যা অবশ্য কর্তব্য তা নিত্যকর্ম। বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে যে কাজ করা হত—তা নৈমিত্তিক কর্ম এবং বিশেষ কোনো কামনা চরিতার্থ করতে হলে যে ব্রতের অনুষ্ঠান করা হত, তা ছিল কাম্য কর্ম।

দশ ধর্মলক্ষণ

ধর্মপত্নীকে নিয়ে সংসারযাত্রা নির্বাহ করতে হলে, ধর্মপথ থেকে বিচ্যুত হওয়া চলত না কোনোক্রমে। সেই ধর্ম লক্ষণগুলি সম্পর্কে মনু নির্দেশ দিয়েছেন—

'ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং
শৌচমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ।
ধীবিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং
ধর্ম লক্ষণম্।

(মনু. ৬/৯২)

এই দশটি ধর্মলক্ষণ হল— ধৈর্য, ক্ষমা, সংযম, অচৌর্য, দেহ ও মনের শুদ্ধি, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, জ্ঞান, ব্রহ্মবিদ্যা, সত্য-কথন ও অক্রোধ। সেকাল বা একাল বলে নয়--- ভালোভাবে অনুধাবন করলে দেখা যাবে যে— সর্ব যুগে, সর্বকালে ও সর্বদেশে সুস্থ ও সুন্দর জীবন যাপন করতে হলে মনুষ্য জীবনে এই গুণগুলি অপরিহার্য।

পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান

প্রতিদিন শ্রেষ্ঠাশ্রমী গৃহস্থকে পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে হত। জীবনের মালিন্য ও দৈন্যকে দূরীভূত করা হত নিত্য মঙ্গলকর্মের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। সাধ্যমতো পঞ্চমহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করা, গৃহস্থমাত্রেরই কর্তব্য ছিল। সেগুলি হল— ব্রহ্মযজ্ঞ, ঋষিযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ ও পিতৃযজ্ঞ। কারণ যে ব্যক্তি কেবলমাত্র নিজে খেয়ে-পরে সুখে থাকতে চায়— সে পাপী। কিন্তু যে ব্যক্তি যজ্ঞাবশেষ খায়, সে অমৃত ভক্ষণ করে, এ কথা গীতায় বলা হয়েছে।

'যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তোমুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে যে ত্বয়ং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ।

(গীতা - ৩/১৩)

'যজ্ঞ' কথাটির অন্তর্নিহিত অর্থ হল 'ত্যাগ'। একক ব্যক্তি জীবনের সঙ্গে, বৃহত্ত্বের যোগ সাধন করাই হল যজ্ঞের উদ্দেশ্য। গৃহস্থ কিভাবে পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান করবেন, সে সম্পর্কে মনু বলেছেন—

'অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্।
হোমো দৈবো বলির্ভৌতোনৃযজ্ঞোঽতিথি পূজনম্।।'

(মনু. ৩/৭০)

অর্থাৎ শাস্ত্রবেদাদি অধ্যয়ন-অধ্যাপনা করা হল ব্রহ্মযজ্ঞ, অন্ন ইত্যাদি দ্বারা পিতৃতর্পণাদি হল পিতৃযজ্ঞ, অগ্নিকুণ্ডে আহুতি প্রদান হল দেবযজ্ঞ, অতিথিসেবা নৃযজ্ঞ এবং মনুষ্যেতর প্রাণীদের খাদ্যাদি দান ও পরিচর্যা হল ভূতযজ্ঞ। শঙ্করাচার্য বলেছিলেন—"সংসারী মানুষ যে কর্ম করবে তা হবে 'বহুজন হিতায় চ বহুজন সুখায় চ।' তাই প্রাচীন ঋষিদের মতে আমাদের গার্হস্থ্য আশ্রমের উদ্দেশ্য হচ্ছে বহুজনের কল্যাণ সাধন।"[২৯]

চতুরাশ্রমের শেষ দুইপর্ব

যৌবন উত্তীর্ণ হয়ে প্রৌঢ়ত্বের দ্বারে পৌঁছলে, বৈরাগ্য অবলম্বন করে সংসার ত্যাগ করতে হত সংসারী মানুষদের। 'পঞ্চশোধর্বং বনং ব্রজেৎ'—পঞ্চাশের কোঠা পার হয়ে, বনে বা নির্জন কোনো স্থানে গিয়ে বাস করার কথা বলেছেন শাস্ত্রকাররা। এই বিধানের তাৎপর্য হল এই মৃত্যুকে সহজ ও প্রসন্ন মনে, জীবনের অনিবার্য পরিণতি বলে মেনে নেবার অনুকূল মনোভাব গড়ে তোলার অবকাশ দেওয়া। এ ছাড়া ঈশ্বর চিন্তার জন্য উপযুক্ত স্থান ও সময় করে নেওয়া। তারপরেও যাঁরা জীবিত থাকতেন, তাঁরা আরও কঠোর জীবন যাপন করতেন 'যতি' বা 'সন্ন্যাস' অবলম্বন করে।

চতুরাশ্রম পালনের দ্বারা ভারতীয় গৃহীরা, ত্যাগের মধ্য দিয়ে জীবনকে উপভোগ করার আদর্শই মেনে চলতেন। কারণ উপনিষদের শিক্ষা হল—

'তেন ত্যেক্তেন ভুঞ্জীথা
মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্'।

(ঈশোপনিষৎ ১/১)

এইভাবে গৃহীরা ক্ষুদ্র গণ্ডীতে আবদ্ধ থেকেও বিশ্বপ্রেমের আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ হতেন

'গৃহীরে শিখালে গৃহ করিতে বিস্তার
প্রতিবেশী আত্মবন্ধু অতিথি অনাথে।'[৩০]

এই নির্মল বৈরাগ্যেই ভারতবাসীর মনে এনে দিত ভোগের সংযম ও প্রশান্তি। ভারতীয় ঋষিদের দৃষ্টি ছিল উদার উন্মুক্ত ও বহুদূর প্রসারিত। তাঁরা দেখিয়েছিলেন বিশ্বের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করতে পারলেই যথার্থ সুখ ও শান্তি লাভ করা যায়। সংসারের চৌহদ্দির মধ্যে বসবাস করেও যদি নর ও নারী উভয়েই, স্থিতধী ও নিরাসক্ত হয়ে ঈশ্বরে মনপ্রাণ ও সর্বকর্ম সমর্পণ করেন সেই জীবনই হবে তাঁদের মহত্ত্বের পরিচায়ক। ইহজগতে থেকে কেমন ভাবে জীবনকে সুখ ও শান্তির আকরে পরিণত করা যায়, ভারতের সত্যদ্রষ্টা ঋষিরা ছিলেন সেই পথের দিশারী।

নির্দেশিকা

১। ক্ষিতিমোহন সেন, 'ভারতের সংস্কৃতি' (বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ) পৃ. ৩৪

২। করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, শতনরী- (কাব্য সংকলন) "বাসনা" কবিতা। পৃ. ৮৯

৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'শেষের কবিতা', রবীন্দ্র-রচনাবলী, নবম খণ্ড (জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ), পৃ. ৭১৮

৪। অতুলচন্দ্র গুপ্ত, "সংস্কৃতি" (প্রবন্ধ), 'জয়শ্রী' সুবর্ণজয়ন্তী গ্রন্থ, ১৯৮৩, পৃ. ২৭৪

৫। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'সংস্কৃতি-শিল্প ইতিহাস' (বিচিত্রবিদ্যাগ্রন্থমালা), পৃ. ২১০

৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালান্তর (প্রবন্ধ) রবীন্দ্র-রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড (জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ), পৃ. ২১০

৭। তদেব

৮। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য, (দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৫৫), পৃ. ৪৯১

৯। Maciver and Page, *Society*, (Published by Macmillan & Co Ltd First Edition-1950)

"The maternal family prevails in many parts of the earth, since under this system the husband has a less important role, some authors have connected it with an original ignorance of the physiological fact of paternity", p. 248

১০। শশিভূষণ দাশগুপ্ত, 'ভারতের শক্তি সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য, (১ম প্রকাশ ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ), পৃ.-১

১১। R.C. Mazumdar, H.C. Roychoudhuri and Kalikinkar Dutta, *An Advanced History of India* (3rd Edition), p. 20

১২। "Indus Valley Civilization" by Madho Sarup Vats (From *The Cultural Heritage of India*, Volume I, pp. 22 24.)

১৩। "Evolution of Religio-Philosophic Culture", by R.C. Mazumder, (From *The Cultural Heritage of India*, Volume IV, p. 32

"Of their religious culture some traces are left in their icons which include the Mother Goddess, The Phallus, and a male God, seated in yogic posture, who has been regarded as Siva."

১৪। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত। ২য় ভাগ, (ত্রয়োদশ সংস্করণ), পৃ. ৭৪

১৫। উপনিষৎ গ্রন্থাবলী। ৩য় ভাগ। স্বামী গম্ভীরানন্দ -সম্পাদিত পৃ. ১৫৮

১৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুব, 'বিসর্জন' (নাটক) (জয়সিংহের উক্তি)

১৭। মনুসংহিতা। শ্যামাকান্ত বিদ্যাভূষণ -সম্পাদিত (তারা লাইব্রেবি)

১৮। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত। ১ম ভাগ, (চতুর্দশ সংস্করণ), পৃ. ১০৯

১৯। ভারতকোষ ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৮

২০। 'ধর্ম' গ্রন্থেব "ততঃ কিম্" প্রবন্ধ। ববীন্দ্র- রচনাবলী দ্বাদশ খণ্ড (জন্মশতবার্ষিকী সংস্কবণ), পৃ. ৭৮

২১। 'সুবচ্ছন্দা' (সঙ্গীত বিষয়ক পত্রিকা) শ্রীনীলবতন বন্দ্যোপাধ্যায় -সম্পাদিত। 'শাবদীয়া পল্লীগীতি সংখ্যা' থেকে গৃহীত। ১৯৮২, পৃ. ৩১৯

২২। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। জগদীশচন্দ্র ঘোষ। ৯ম সংস্করণ, পৃ. ১৬১

২৩। অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, 'জাতিভেদ প্রথা ও উনিশ শতকেব বাঙ্গালী সমাজ' (১ম সংস্কবণ ১৯৮১), পৃ. ২

২৪। 'ধর্ম' গ্রন্থের "ততঃ কিম্" প্রবন্ধ। রবীন্দ্র-রচনাবলী। দ্বাদশ খণ্ড, (জন্মশতবার্ষিকী সংস্কবণ), পৃ. ৮৪

২৫। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা' (প্রবন্ধ), ভারতবর্ষ ও স্বদেশ, ববীন্দ্র-রচনাবলী দ্বাদশ খণ্ড (জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ), পৃ. ১০৬১

২৬। স্বামী অভেদানন্দ, 'হিন্দুনারী'— (৪র্থ সংস্কবণ ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ)। পবিশিষ্ট, পৃ. ৯০

২৭। ক্ষিতিমোহন সেন, 'প্রাচীন ভারতে নারী' (১৩৫৭ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৬৮

২৮। "সমাজ" (প্রবন্ধ) ববীন্দ্র-বচনাবলী ত্রয়োশ খণ্ড, (জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ)। পৃ. ৭

২৯। ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী, 'গীতায় সমাজদর্শন' (১ম সংস্করণ), পৃ. ৬৯

৩০। ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'নৈবেদ্য' ৯৪ নং কবিতা।



প্রথম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রাচীন যুগ থেকে প্রাগ-উনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় জীবনে—সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে—নারীর স্থান, দান ও মর্যাদা

ভারতীয় নারীত্বের আদর্শ

নারী রহস্যময়ী। এদেশে একটি প্রচলিত প্রবাদ শুনতে পাওয়া যায় তাই — "স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ। আবার এযুগে কবি রবীন্দ্রনাথ নারীর মুখেই নারী-মহিমা ব্যক্ত করেছেন —

আমি নারী, আমি মহীয়সী,
আমার সুরে সুর বেঁধেছে
জ্যোৎস্না-বীণায় নিদ্রাবিহীন শশী।
আমি নইলে মিথ্যা হত সন্ধ্যাতারা ওঠা,
মিথ্যা হত কাননে ফুলফোটা।"

"মুক্তি", পলাতকা

যে-কোনো দেশের, সমাজের বা পরিবারের প্রকৃত মান নির্ণয় করতে হলে, সেখানকার গৃহজীবনে, সমাজ জীবনে বা পারিবারিক পরিবেশে নারীদের প্রতিপত্তি ঠিক কতটুকু ও কী প্রকার— তার প্রতি লক্ষ্য রাখলেই তার সঠিক পরিচয় পাওয়া যায়। সমগ্র বিশ্বের নারী-সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়েও, ভারতীয় মহিলারা নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য ও মৌলিকতার গুণে, অনন্যা ও মহিমময়ী হয়ে বিরাজ করছেন দীর্ঘকাল ধরে।

ভারতীয় নারীর স্বাতন্ত্র্য— সতীত্বে ও মাতৃত্বে

ভারতীয় নারীর জীবনাদর্শে সতীত্বের আদর্শকে শ্রেষ্ঠ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। নরনারী নির্বিশেষে সকল মানুষের ক্ষেত্রেই ধর্মবোধ ও সততা রক্ষা করে জীবন যাপন করা অবশ্য কর্তব্য। এদেশে নারীদের ক্ষেত্রে সবার উপরে সতীত্বের মর্যাদাকে অক্ষুণ্ণ রেখে জীবন-যাপন করাই শ্রেয়ধর্ম বলে গণ্য করা হয়। এইজন্যই যুগ যুগ ধরে সতী, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী ও অরুন্ধতী এখানে ভক্তি শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্রী হয়ে আছেন। এই আদর্শবোধ আজও পূর্ণ মর্যাদায় অনুসৃত হচ্ছে অধিকাংশ ভারতীয় রমণীর জীবনে। এই চিরন্তনী নারীরাই আমাদের মধ্যে মহান্ সতীত্বের

আদর্শটিকে চিব জাগরূক রেখেছেন। এই সেদিন পর্যন্ত কোনো সীমন্তিনী নারীকে আশীর্বাদ করতে গিয়ে বলা হত- 'সাবিত্রী সমানা হও।' বিবাহিতা নারীর রূপ বলতে এদেশেব মানুষ বুঝত তার একনিষ্ঠ পতিপ্রেমকে-- "নারী রূপং পতিব্রতম্" (চাণক্য শ্লোক)। সতীত্বের গৌরবে, সেবাপরায়ণতায় ও আত্মোৎসর্গের ক্ষেত্রে সকল যুগের সকল কালের ভারতীয় নারীরাই অতুলনীয়া। লজ্জাশীলতা ও বিনয়নম্রতা যে নারীর ভূষণ, সেকথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন এদেশের মেয়েরা, তা সে তিনি জননীই হোন, পত্নীই হোন, ভগিনীই হোন, কিংবা কন্যাই হোন। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন- -"একমাত্র ভারতবর্ষেই মেয়েদের লজ্জা বিনয় প্রভৃতি দেখে চক্ষু জুড়ায়।"[১] সংযম ও সহিষ্ণুতার গুণেও যে তাঁরা অদ্বিতীয়া— সাহিত্যে, পুরাণে, ইতিহাসে এবং বাস্তবে তার উদাহরণ অপ্রতুল নয়।

ঈশ্বরে মাতৃভাব আরোপ

এদেশে ঈশ্বরে মাতৃভাব আরোপ করে পূজা করার যে রীতি প্রচলিত আছে, তার সম্পর্কে মূল্যবান উক্তি করেছেন ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয়-- "মাতৃপূজার প্রচলন পৃথিবীব বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নকালে নানারূপে দেখা যায়, এখনও হয়তো স্থানে স্থানে কিছু কিছু অবশেষ রহিয়া গিয়াছে, কিন্তু ইহার কোথাওই ভারতবর্ষেব অনুরূপ শক্তিবাদ বা শক্তিসাধনা গড়িয়া উঠিতে দেখি না। শক্তিবাদ এমন কবিয়া আমাদের ভারতীয় চিন্তাধারার একটি বৈশিষ্ট্যের দ্যোতক বলিয়া এবং আমাদের জীবনের উপর এমন করিয়াই ইহার একটি সামগ্রিক প্রভাব বলিয়া ইহা বিশেষ করিয়া আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।"[২]

সাধক রামপ্রসাদ বলেছেন--

'মায়ের মূর্তি গড়াতে চাই, মনের ভ্রমে মাটি দিয়ে, মাবেটি কি মাটির মেয়ে, মিছে খাটি মাটি নিয়ে।' কারণ জগজ্জননীর চিন্ময়ী মূর্তিই তো বিরাজ করছে ভক্তের মনে। ঘরের যে সন্তান, তারও তো মা-অন্ত প্রাণ—

'মা বলিতে প্রাণ করে আন্‌চান্
চোখে আসে জল ভরে।'

বাসভূমিতেও আমরা মাতৃরূপ আরোপ করি, তাই বলি 'দেশ-মাতা'। বন্দেমাতরম্ বলে তার বন্দনা করি। মা এবং মাতৃভূমিব কোনো বিকল্প নেই আমাদের কাছে। কাবণ 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।'

সাহিত্য ও স্মৃতিশাস্ত্রে নারীর মর্যাদা

এদেশের কবি সাহিত্যিক ও স্মৃতিশাস্ত্রকাররা কেউ কেউ স্থানে স্থানে নারী জাতি সম্পর্কে নিন্দা-মন্দ ও কটূক্তি করেছেন ঠিকই, তেমনি আবার অন্যান্য অনেকে আছেন যাঁরা নারীদের শ্রদ্ধা, ভক্তি ও গভীর সহানুভূতি জানাতে কার্পণ্য করেন নি। ব্যবহারিক জীবনের রীতিনীতি ও আদর্শকে বিধি বিধানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করতেন স্মৃতিশাস্ত্রকাররা। তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন

মনু। সুতরাং মনুসংহিতা থেকে কিছু কিছু উদাহরণ তুলে দেখাতে পারলেই, বিষয়টি পরিস্ফুট হবে। যেমন আমরা সকলেই জানি মনু নারীব স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকাব করেন নি। তিনি স্পষ্ট করেই বলে দিয়েছেন--

'পিতা বক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।
রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রা নস্ত্রী স্বাতন্ত্র্য মর্হতি।'

(মনু . ৩।৯)

তিনিই আবার বলেছেন— নারীরা সম্মানের পাত্রী ও পরম পূজনীযা। তাই সাবধান বাণী উচ্চারণ করে বলেছেন- --

'যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ ।'

(মনু. ৩।৫৬)

তাঁর কাছে নারী মুখ— চির পবিত্র— "নিত্য মাস্যাং শুচি স্ত্রীণাম্..." (৫।১৩০)

নারীজাতির নিরাপত্তার কথা মনু খুব গভীরভাবে ও দবদী মন নিয়ে চিন্তা কবেছেন। তাব বহু প্রমাণ আছে তাঁর রচিত সংহিতা গ্রন্থে। মাতৃস্থানীয়া সকল নারীকে তিনি গুরুমায়ের মতো সেবা যত্ন করতে বলেছেন—

'মাতৃষ্বসা মাতুলানী শ্বশ্রূরথ পিতৃষ্বসা।
সম্পূজ্যা গুরুপত্নীবৎ সমাস্তা গুরু-ভার্য্যয়া।'

(মনু. ২।১৩১)

আরও যাঁরা সযত্নে বক্ষণীয়া তাঁরা হলেন— পতিব্রতা, বিধবা, রোগাক্রান্তা, নিঃসন্তান ইত্যাদি (৮।২৮)। পুরুষের বহু বিবাহকে সমর্থন করলেও কিন্তু যে-কোনো ধরণের বিবাহকে তিনি সমর্থন করেন নি । এক স্ত্রী বর্তমান থাকতে কোনো পুরুষ যদি পুনরায় বিবাহ করতেন তাঁকে কয়েকটি শর্ত মেনে চলতে হত। প্রথমা স্ত্রী যদি রোগগ্রস্তা অথচ পতিব্রতা ও চরিত্রবতী হতেন, তাঁর অনুমোদন ভিন্ন পতি পুনর্বিবাহ করতে পারতেন না। অর্থাৎ তাঁকে কোনোক্রমে অবমাননা বা উপেক্ষা করার সুযোগ থাকত না (৯।৮০)। মনু আচার্য ও পিতার সঙ্গে মাতাকে একাসনে স্থান দিয়েছেন, শ্রদ্ধার পাত্রী রূপে। কারণ মা হলেন পৃথিবীস্বরূপা—'মাতা পৃথিব্যামূর্তিস্তু'। (২।২২৬)

এদেশের স্মার্ত পণ্ডিতরা পুরুষজাতিকে কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন, অবলা নারী জাতিকে সুরক্ষিত রাখবার জন্য। এই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে যথেষ্ট বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যায়, যেমন সেকালে সাধারণভাবে নারীর অর্থোপার্জন করে স্বাবলম্বী হবার রীতি প্রচলিত ছিল না। তার কারণ পরিবারভুক্ত সকল শ্রেণীর নারীর ভরণ-পোষণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব ছিল পুরুষদের ওপর। এই কারণেই হয়তো এদেশের আনুষ্ঠানিক বিবাহে একটি আচার দেখা যায়—

'জন্মের ভাত কাপড়' দেওয়া-নেওয়া। এর প্রকৃত অর্থ হল আজীবন স্বামী তাঁর স্ত্রীর ভরণ-পোষণের দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। স্ত্রীর ভরণ-পোষণ করেন বলেই, স্বামীকে 'ভর্তা' নামে অভিহিত করা হয়। মনুর বিধানে দেখা যায় যে, কোনো নারীর স্বামী যদি কার্যোপলক্ষে বিদেশে অবস্থান করতেন, তা হলে তাঁর স্ত্রীর ভরণ-পোষণ বাবদ উপযুক্ত বৃত্তির ব্যবস্থা রেখে যেতে হত। কারণ পেটের দায়ে অনেক সময় সাধু-প্রকৃতির মানুষেরও অধঃপতন ঘটতে পারে। কোনো কারণে যদি এই জাতীয় ব্যবস্থা না থাকত, তা হলে সেই স্ত্রীলোককে সুতাকাটা প্রভৃতি কোনো অনিন্দিত শিল্পকর্মের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতে হত।

'বিধায় প্রোষিতে বৃত্তিং জীবেন্নিয়মমাস্থিতা
প্রোষিতে ত্ববিধায়ৈব জীবেচ্ছিল্পৈরগর্হিতৈঃ।

(মনু. ৯।৭৫)

অসহায় নারীর সম্পত্তি বা স্ত্রীধন যাতে কেউ আত্মসাৎ করতে না পারে, সেজন্যে তিনি নিরাপত্তামূলক বিধিবিধান দিয়েছিলেন। কোনো অবলা নারীর সম্পত্তি, যদি কোনো আত্মীয় জোর করে ভোগ করত, তাকে চোর বলে গণ্য করা হত এবং তাব উপযুক্ত শাস্তিবিধান হত (৮।২৯)। রাজার দায়িত্ব ছিল অনাথা স্ত্রীলোকের সম্পদ রক্ষা করা (৮।২৮)। সকলের চেয়ে বড়ো কথা দণ্ডদানের ক্ষেত্রে— নারী জাতির প্রতি যে মায়া মমতা ও সৌজন্য দেখানো হয়েছে, সেটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ যে জাতীয় অপরাধ করলে পুরুষের প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া হত; সেই একই ধরণের অপরাধে, নারীর জন্য কিছুটা লঘু শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা ছিল। যে-কোনো অবস্থাতেই এদেশে নারীহত্যাকে অত্যন্ত জঘন্য ও গর্হিত অপরাধ বলে গণ্য করা হয়।

প্রাচীন ভাবতে নারীদের সম্পর্কে যে জাতীয় সম্ভ্রমপূর্ণ মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, তাকে আমরা আমাদের উন্নত শ্রেণীর সংস্কৃতির পরিচায়ক বলে উল্লেখ করতে পারি।

তন্ত্রশাস্ত্রে নারী

তন্ত্রশাস্ত্র নারীকে আরও বেশি মর্যাদা দিয়েছে। শক্তিই তন্ত্রের আরাধ্যা দেবী। 'কুমারী পূজা' আজও এদেশে প্রচলিত আছে। তন্ত্রে বলা হয়েছে 'মদংশা যোষিতা মাতাঃ' অর্থাৎ নারী মাত্রেই জগজ্জননীর প্রতিমূর্তি। তন্ত্রশাস্ত্রে জাতিবিচার নেই। তাই স্ত্রী-শূদ্র নির্বিশেষে সকলেরই হোম করার অধিকার আছে। 'স্ত্রী শূদ্রাণাং হোমাধিকারঃ'। স্ত্রীলোকদের সম্পর্কে অত্যন্ত উদার মনোভাব ব্যক্ত করা হয়েছে। তাদের দেবতাস্বরূপ, জীবনস্বরূপ ও অলংকারস্বরূপ বলা হয়েছে। "স্ত্রীয়ো দেবাঃ স্ত্রিয়ঃ প্রাণাঃ স্ত্রিয়শ্চৈব বিভূষণম্।"[৩] এইভাবে ধর্মশাস্ত্রগুলিতে নারীদের সম্পর্কে সম্ভ্রমপূর্ণ মনোভাব ও সেইসঙ্গে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থার নির্দেশও দেখতে পাওয়া যায়।

ভারতের অন্ধকারময় মধ্যযুগেও দেখা যায়, নারীর সতীত্ব ও মাতৃত্বের মূল্য স্বীকৃত হয়েছে। মাতাকে সাক্ষাৎ দেবী বা ঈশ্বরী বলে মনে করা হত। সহস্র পিতা অপেক্ষা মাতার গৌরবই অধিক— 'সহস্রন্তু পিতৃ ন্মাতা গৌরবেনাতিরিচ্যতে'[৪] একথা বলা হয়েছে।

পিতামাতা সম্পর্কিত স্তোত্রে মাতাকে, পিতারও উপরে স্থান দেওয়া হয়েছে—

'পিতুরোপ্যধিকামাতা গর্ভধারণ পোষণাৎ।
অতো হি ত্রিষু লোকেষু নাস্তি মাতৃসমোগুরুঃ ।।'

পিতা ও মাতা যদি একত্রে অবস্থান করেন তাহলে ধর্মবিদ্ পুত্রের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, প্রথম মাতাকেই প্রণাম নিবেদন করতে হবে—

'মাতরং পিতরঞ্চোভৌ দৃষ্ট্বা পুত্রস্তু ধর্মবিৎ।
প্রণম্য মাতরং পশ্চাৎ প্রণমেৎ পিতরং গুরুম্।।'

এই সমস্ত শিক্ষাই হয়তো আমাদের দেশের লোকাচার ও দেশাচারকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। কালক্রমে যতই পরিবর্তন ঘটুক-না-কেন, নারীর মৌলিক অধিকারবোধ সম্বন্ধে ধারণা অথবা মাতৃত্ব কিংবা পত্নীত্বের মর্যাদা মোটামুটিভাবে ক্ষুণ্ন হতে দেখা যায় নি। এই কারণেই পাশ্চাত্য মনীষী স্যার মনিয়ার উইলিয়ামস্ (Sir M.M. Williams) বলেছিলেন—"Indian wives often possess greater influence than the wives of Europeans."[৫]

নারীর আকৃতি–প্রকৃতি ও ভাষা

নারীর আকৃতি ও প্রকৃতির বিশেষ বৈশিষ্ট্যটি প্রকাশ পায় তার চলনে, বলনে ও কথনে। পোশাক পরিচ্ছদ, আহার বিহার, চালচলনের সঙ্গে যেমন নারীর গুণাবলীর পরিচয় ফুটে ওঠে তার মুখের ভাষাও কিন্তু পুরুষের ভাষার চেয়ে কিছু ভিন্নতর। নারীর স্বভাব চরিত্রে একজাতীয় রক্ষণশীলতার ভাব ফুটে ওঠে, তার মুখের ভাষাতেও পাওয়া যায় তার আভাস। ড. সুকুমার সেন এ বিষয়ে বলেছেন—"সব দেশে সব কালে আর সব সমাজে মেয়েদের ভাষার এমন কিছু না কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে, বাচন ভঙ্গিতে, শব্দ ব্যবহারে অথবা পদবিধিতে, যা পুরুষদের বাক্যালাপে সাধারণত শোনা যায় না (যে পুরুষ মেয়েলি ঠাটে কথা কয় তারা ছাড়া)।"[৬]

নারীর দুটি রূপ প্রধান, একটি তার মাতৃরূপ, অন্যটি প্রিয়ারূপ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ দুয়ের চমৎকার তুলনা দিয়েছেন। মায়ের রূপের সঙ্গে তুলনা করেছেন বর্ষা ঋতুর— "মা হলেন বর্ষা ঋতু। জলদান করেন, ফলদান করেন, নিবারণ করেন তাপ, ঊর্ধ্বলোক থেকে আপনাকে দেন বিগলিত করে, দূর করেন শুষ্কতা, ভরিয়ে দেন অভাব।" আর প্রিয়ার রূপের উপমা দিয়েছেন বসন্ত ঋতুর সঙ্গে—"গভীর তার রহস্য, মধুর তার মায়ামন্ত্র, তার চাঞ্চল্য রক্তে তোলে তরঙ্গ, পৌঁছায় চিত্তের সেই মণিকোঠায়, যেখানে সোনার বীণায় একটি নিভৃত তার রয়েছে নীরবে, ঝংকারের অপেক্ষায়, যে ঝংকারে বেজে ওঠে সর্বদেহে মনে অনির্বচনীয়ের বাণী।"[৭]

মাতৃরূপ সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন—"ভারতে নারীত্বের পরাকাষ্ঠা হইল মাতৃত্বে এবং সেই অপূর্ব স্বার্থলেশহীনা সর্বংসহা ক্ষমাস্বরূপিণী মা-ই আমাদের আদর্শ।"[৮] একটি স্থানে এসে অবশ্য দুইরূপ—মাতা ও পত্নী একাকার হয়ে যায়। উপনিষদে আছে—"যা মাতা সা পুনর্ভার্য্যা যা ভার্য্যা জননী হিসা।" (নারীর এই কল্যাণী ও মঙ্গলময়ী মূর্তি স্মরণ করেই হয়তো

কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছেন---

'সর্বশেষের গানটি আমার
আছে তোমার তরে।

কারণ এই কল্যাণী মূর্তির কাছেই নতি স্বীকার করে সকল শ্রেণীর নারী —

'রূপসীরা তোমার পায়ে
রাখে পূজার থালা
বিদুষীরা তোমার গলায়
পরায় বরমালা।'

''কল্যাণী'', 'ক্ষণিকা'

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কন্যা সন্তান সম্পর্কে ভারতীয় মনোভাব

সাধারণ সংসারী মানুষেব কাছে সন্তান পরম কামনার বস্তু— তা সে পুত্রই হোক, বা কন্যা সন্তানই হোক। ভারতীয়দের জীবনে বাস্তব ক্ষেত্রে এ বিষয়ে কিছুটা বিচিত্র মনোভাব পোষণ করতে দেখা যায়। বহু প্রাচীনকাল থেকেই এদেশের মানুষের কাছে পুত্র সন্তান ঠিক যতখানি কাম্য ছিল, কন্যা সন্তান তা ছিল না। বৈদিক সমাজে ও সংসারে নারীর মর্যাদা ও সম্মান যথেষ্টই ছিল, তবুও কিন্তু সন্তান কামনাব ক্ষেত্রে ছিল ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি। তাঁরা বলেছেন—'কৃপণং দুহিতা পুত্রেহ জ্যোতিঃ পরমে ব্যোমন্' অর্থাৎ কন্যা হল কৃপার পাত্রী কিন্তু পুত্র হল স্বর্গেব আলো। ঋগ্বেদে (৫।২৫।৫ ; ১০।১৮।৩।১) ও অথর্ব বেদের (৩।১।৩ ; ৬।২।৩)[৯] মধ্যে এমন অনেক সূক্ত আছে, যেখানে আমরা এই জাতীয় মনোভাবের প্রতিফলন দেখতে পাই। তাঁবা এমন অনেক যাগ-যজ্ঞবিধির বিধান দিয়েছেন, যার অনুষ্ঠান করলে শুধুমাত্র পুত্রসন্তানই লাভ করা যাবে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও (৭।১৩) এই জাতীয় মনোভাব খুব স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে— স্ত্রী সখী, পুত্র জ্যোতি কিন্তু কন্যা কষ্টের কারণ। মহাভারতেও (১।১৭৩।১০) যেন ঠিক এর প্রতিধ্বনি শোনা যায় : "আত্মা পুত্রঃ সখী ভার্য্যা কৃচ্ছ্রংত্ব দুহিতা নৃণাম্।"

এ ছাড়া তৈত্তিরীয় সংহিতা (৬।৫।১০) ও মৈত্রায়ণী সংহিতায় (৪।৬।৪) দেখা যায় যে, পুত্র হলে তাকে সাদরে কোলে নেবার কথা বলা হয়েছে কিন্তু কন্যাকে মাটিতে শুইয়ে রাখাব নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।[১০]

মেয়ের জন্য শেষ পর্যন্ত তার মায়ের উপরেও বিদ্বেষ ভাব জাগিয়ে দিয়েছে এদেশের মানুষেব মনে, এমন উদাহরণ আমরা শাস্ত্র গ্রন্থে দেখতে পাই। মনু বলেছেন, যে-স্ত্রী শুধুমাত্র কন্যা সন্তানই প্রসব করেন, তাঁকে ত্যাগ করে স্বামী পুনরায় বিবাহ করতে পাবেন (মনুসংহিতা, ৯।৮১)।

এদেশের মেয়েলী ছড়া ও প্রবাদ বাক্যে কন্যা সন্তানের প্রতি বিতৃষ্ণাভরা মনোভাবের ছড়াছড়ি দেখতে পাওয়া যায়। উদাহরণ দেওয়া যায়—

'খুকুন বালা টাকার ছালা মট্‌কি ভরা ঘি,
খুকুর ভাতে ভোজ হল না ছি ছি ছি।'[১১]

মেয়ে হলেই যে লোকের মনে একটা আতঙ্ককর মনোভাব জেগে উঠত, এই ছড়াটিতে তার পরিচয় আছে। মেয়ের বিয়েতে প্রচুর খরচপত্র হয়ে যাবে, সেই চিন্তাটাই হযতো বড়ো

হয়ে উঠত। সেই কারণেই হয়তো মেয়েকে আড়ম্বর সহকারে অন্নপ্রাশন দেবার প্রয়োজন ছিল না— কোনোক্রমে ভাত খাইয়ে দেওয়াই ছিল যথেষ্ট। অথচ পুত্রের অন্নপ্রাশনে পূর্বপুরুষের উদ্দেশে পিণ্ডদানের ব্যবস্থাও আছে, কারণ সে বংশধর। কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি কবিতায় ঠাট্টার ছলে এই মনোভাবটির কথা বলেছেন—

'ভাইটি অমূল্য নাই তার তুল্য।
সংসারে বোনটি নেহাৎ অতিরিক্ত।'

("ভাই দ্বিতীয়া", 'প্রহাসিনী')

উনিশ শতকের আর-এক কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার তাঁর নারী- মহিমামূলক 'মহিলা' কাব্যে (১৮৮০ খ্রী.) আরও নগ্ন বাস্তবচিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। কারণ তাঁর প্রতিজ্ঞা ছিল—
'গাবো গীত খুলি হৃদি দ্বার,
মহীয়সী মহিমা মোহিনী মহিলার।'

তাই তিনি অন্ধকার দিকটিকে তুলে ধরতে কসুর করেন নি। 'মাতা' অংশটিতে তিনি বলেছেন—

"... যদি কন্যা জন্মে ঘরে
বাদ্যভাণ্ড নিবারিত,
বন্ধুবর্গ বিষাদিত,
লক্ষ ক্ষতি লক্ষ্য, গৃহি-শুষ্ক-মুখ-পরে,
প্রসূতি চোরের হেন,
কুণ্ঠিতা-লজ্জিতা যেন,
পরশু-প্রহার, দাস-দলের আশায়।
প্রবীণ প্রাচীন যারা
আসিয়া প্রবোধে তারা
জন্মেছে কি মরেছে তা বুঝা নাহি যায়।
দুরাশা স্ত্রীশিক্ষা, হেন স্ত্রীদ্বেষ যথায়।'

('মহিলা', পৃ. ৭৩)

আজও সম্পূর্ণভাবে এই মনোভাব এদেশ থেকে দূরীভূত হয়েছে, এমন মনে হয় না। তবে মনোভাব প্রকাশের রীতিটি হয়তো কিছুটা পাল্‌টেছে।

শুধু আমাদের দেশে নয়, এশিয়ার যে অঞ্চলে সম্প্রতি শাসননীতি, সমাজ-ব্যবস্থা, জনমানসের মনোভাব সবেরই আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে বলে আমাদের ধারণা, সেই চীন দেশেও যে এখনও কী পরিমাণে নারীবিদ্বেষ বর্তমান আছে তার সাক্ষ্য দেয় আজকের সংবাদপত্র। মাত্র কিছুদিন আগে (জুন ২২, ১৯৮২) একটি লোমহর্ষক ঘটনা পড়ে সকলেই

স্তম্ভিত হয়েছেন। সেই ঘটনাটির নির্বাচিত অংশ নীচে দেওয়া হল—

Doing Away with Baby Girls in China

Beijing, June 21 : On June 1 a peasant living near the large north-east city of Shenyang saw two men throw a large sack into a river. Intrigued he fished it out and was amazed to find it contained a few months old baby. A large stone was tied to her feet.

This story of infanticide, says AFP, and others like it, was recounted in a Chinese newspaper and bears testimony to a problem that has grown along with stepped up Chinese efforts to impose strict birth control.

... Drowning baby girls once a common method in the Chinese countryside of getting rid of extra mouths to feed is still the most widely practised method today, according to the official Chinese Press.

... But if a "feudal mentality" is the misfortune of baby girls, their mother sometimes fare little better. They are maltreated, humiliated, hurt and sometimes even beaten to death for failing to produce a male descendent.

—*The Statesman,* Tuesday, June 22, 1982

মধ্যযুগের কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভারতীয়েরা গঙ্গায় কন্যা সন্তান বিসর্জন দিতেন বলে শোনা যায়। কিন্তু 'নতুন চীনে' বিপ্লব ঘটে যাবার পরেও এই মজ্জাগত কুসংস্কারকে তারা বিসর্জন দিতে পারে নি, এটাই আমাদের কাছে বিস্ময়কর ঘটনা বলে বোধ হয়। লোকপরম্পরাগত কুসংস্কারের প্রভাবে মানবতাবিরোধী আরও অনেক কাজ, অনেক দেশেই ঘটতে দেখা যায়। তার কারণ "লোক-সংস্কারের হঠাৎ পরিবর্তন হয় না ; নতুন সংস্কার পুরোনো সংস্কারের পাশাপাশি চলে হাত ধরাধরি করে, শেষ পর্যন্ত নতুন সংস্কার প্রবল হয়ে উঠলেও, পুরোনো ক্ষত শুকিয়ে গিয়ে রেখে যায় তার অস্পষ্ট ছাপ।"[১২]

এদেশের নারীজাতির জন্য সতীদাহ প্রথা, পণ প্রথা ইত্যাদি যে- সব রীতি প্রচলিত ছিল তার সঙ্গে এই জাতীয় মনোভাবও জড়িত ছিল। তবু 'ভিন্ন রুচির্হিলোকাঃ'—তাই কবি কালিদাস তাঁর 'কুমারসম্ভব' কাব্যে কন্যা সন্তান সম্পর্কে চমৎকার একটি প্রশস্তিমূলক উক্তি করেছেন—

'—কন্যেয়ং কুলজীবিতম্।'

(কুমারসম্ভবম্ ৬।৬৩)

কন্যা যে সমগ্রকুলের প্রাণস্বরূপ, একথা উমা সম্পর্কে হিমালয়রাজ নিজমুখে বলেছেন। বাৎস্যায়ণ নারী সম্পর্কে বলেছেন—

'কুসুমধর্মাণো হি যোষিতঃ সুকুমারোপক্রমাঃ

(কামসূত্র, সপ্তদশ অধ্যায়)

স্মৃতিশাস্ত্রকার মনু পিতাকে— কন্যার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করবেন সে সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়েছেন—

'...দুহিতা কৃপণং পরম্।

তস্মাদেতৈরধিক্ষিপ্তঃ সহেতাসংজ্বরঃ সদা।।'

(মনু. ৪।১৮৫)

পিতার পরম স্নেহের পাত্রী কন্যা, সেজন্যে কন্যা যদি অত্যন্ত অন্যায় কাজও করে, তবুও পিতা রাগান্বিত হয়ে কন্যাকে কিছু বলবেন না। মহানির্বাণ তন্ত্রে আমরা পাই সেই বিখ্যাত উক্তি—

'কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ।

দেয়া ববায় বিদুষে ধনরত্ন সমন্বিতা।'' [১৩]

(মহানির্বাণতন্ত্রম্ ৮/৪৭)

কন্যাকে সযত্নে পালন করতে হবে, শিক্ষিত করে তুলতে হবে, আবার ধনরত্ন সহকাবে উপযুক্ত পাত্রেব হাতে সমর্পণও করতে হবে।

ভারতীয়দের মনে কন্যা সম্পর্কে অনুকূল ও প্রতিকূল দুই জাতীয় মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। সব মিলিয়ে এইটুকু বোঝা যায় যে, পুত্রের ন্যায়, কন্যা সন্তান বাঞ্ছনীয় না হলেও অন্তত পক্ষে সে অমর্যাদা বা ঘৃণার পাত্রী নয়। ববং বলা যায় যে অবস্থা বিপাকে পড়েও সে যথোচিত মর্যাদা পেয়ে এসেছে এ পর্যন্ত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রাগৈতিহাসিক যুগে ভারতীয় নারীসমাজের রূপটি হুবহু কেমন ছিল, শুধুমাত্র অনুমানের সাহায্যে সে কথা বলা বড়ো কঠিন। প্রাক্-বৈদিক যুগের সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে, সিন্ধুনদীর তীরে মহেঞ্জদাড়ো ও হরপ্পায়। আনুমানিক খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দের এই ধ্বংসাবশেষ থেকে শুধুমাত্র এই পরিচয়টুকু পাওয়া যায় যে, সেখানে একদা একটি উন্নত ধরণের নাগরিক সভ্যতা বর্তমান ছিল। সেখানকার মানবগোষ্ঠীর পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনযাপন প্রণালী সম্পর্কে—তেমন কোনো বিস্তৃত সংবাদ পাওয়া যায় না। সুতরাং পরিবারে বা সমাজে সেদিনকার নারীর স্থান কোথায় ছিল, সে সম্পর্কে কোনো মন্তব্য প্রকাশ করা সমীচীন নয়।

বৈদিক যুগে নারী সমাজ

বৈদিক যুগের নরনারীর জীবনের কিছু পরিচয় আভাসে ইঙ্গিতে প্রকাশ পেয়েছে ঋক, সাম, যজু ও অথর্ব বেদে ও তার পরবর্তীকালে রচিত উপনিষদাদির মধ্যে। মোটামুটিভাবে বোঝা যায় যে, সেকালে সংসার ও সমাজ জীবনে, শিক্ষায় ও আধ্যাত্মিকতায় নারীরা ছিলেন স্বমহিমা ও মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিতা। নারী ও পুরুষের পারস্পরিক সহযোগিতায় গড়ে উঠেছিল সেকালের সমৃদ্ধ ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি। এই সময় পিতৃতান্ত্রিক পরিবার প্রথার প্রচলন ছিল।

পারিবারিক জীবনে পুরুষ যেমন ছিলেন গৃহের কর্তা তার পাশাপাশি সমমর্যাদা নিয়ে নারী ছিলেন গৃহের কর্ত্রী। যাঁরা এ বিষয়ে বিচার ও বিশ্লেষণ করেছেন তাঁদের একজনের অভিমত এখানে তুলে ধরা যায়— "In the Rigvedic times we find the home well-established, with the father as patriarch, possesing complete control over the household where the centre was primarily the woman the very embodiment of that great moral and spiritual force that ultimately worked itself out in the creation and development of modern civilized society."[১৪]

সকল কালের ন্যায় সেকালেও নারী জীবনের প্রধান অবলম্বন ছিল গৃহ। সাংসারিক পরিবেশে তাঁরা বেশ গৌরবময় জীবন যাপন করতেন। মঙ্গলময়ী নারী তার স্নেহ, প্রেম ও ভালোবাসা দিয়ে সার্থক করে তুলতেন নিজেদের ও পরিবারের অন্যান্য সকলের জীবন। ঋগ্বেদে দেখা যায়, কল্যাণী বধূ গৃহে সম্রাজ্ঞীর মতো আধিপত্য বিস্তার করতেন।

কিভাবে সংসাররূপ সাম্রাজ্যে নিজের প্রতিপত্তি বজায় রাখা যায়, সে কৌশলটুকু নিজেদের চেষ্টায় অর্জন করতে হত তাঁদের। আদর্শ গৃহবধূর জীবন হল—কর্তব্যময় জীবন। গৃহকে যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিবারের সকলের সেবাযত্ন ও স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করাই ছিল তাঁদের প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য। বধূরা ঊষাকালে সকলের আগে উঠতেন এবং সকলের শেষে

রাত্রে শুতে যেতেন। তাই বলতে শোনা যায়— বধূ যেন ইন্দ্রাণীর ন্যায় শোভাবর্ধন করেন এবং জ্যোতির্ময়ী ঊষার সঙ্গে নিত্য জাগরিত থাকেন—

'ইন্দ্রাণীব সুবুধা বুধ্যমানা।
জেবিরগ্রা ঊষসঃ প্রতি জাগরাসি।। (অথর্ব ১৪।২।৩১)

আরও বলা হয়েছে যে, দয়া ও দাক্ষিণ্যের গুণে বধূ যেন সিন্ধুনদীর মতো উদারতা ও মহত্ত্ব দেখিয়ে সম্রাজ্ঞীর পদে আসীন থাকেন—

'যথা সিন্ধুর্নদীনাং সাম্রাজ্যং সুষুবে বৃষা।
এবা ত্বং সম্রাজ্ঞ্যেধিপত্যুরস্তং পরেত্য।।' (অথর্ব ১৪।১।৪৩)

প্রতিদিন তিনবার— প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে 'অগ্নিগৃহে'র যজ্ঞকুণ্ডে রক্ষিত পবিত্র অগ্নিতে স্বামীসহ বধূকে আহুতি দিতে হত। বাড়ির প্রত্যেকের জন্য খাদ্য প্রস্তুত করতে হত। পরিবারের সকলকে, অতিথি অভ্যাগত, ভৃত্য পরিজনদের পরিতোষ সহকারে খাইয়ে, সবার শেষে গৃহস্বামিনী খাদ্য গ্রহণ করতেন। স্ত্রী পতির অনুগত হয়ে চলতেন এবং গুরুজনদের যথাযোগ্য সমাদর করতেন। বাইরে থেকে স্বামী গৃহে প্রত্যাগমন করলে, তাঁর পা ধুইয়ে, বসতে আসন দিতেন। শ্রমলাঘবের জন্য পাখা দিয়ে বাতাস করতেন, পান সেজে দিতেন ইত্যাদি। পতিব্রতা নারী সকল রকমে ও সকল ব্যাপারে স্বামীর সঙ্গে সহযোগিতা করতেন। স্বামী যখন গৃহে অবস্থান করতেন তখন স্ত্রী সালংকারা হয়ে কেশ ও বেশ বিন্যাসের পারিপাট্য বজায় রেখে চলতেন। কিন্তু স্বামী প্রবাসে গেলে, বেশবাস, অলংকার ও প্রসাধনের বাহুল্য বর্জন করতেন। পরবর্তী কালেও সামাজিক বিধিবিধান-রচয়িতা বৃহস্পতি বলেছেন—

প্রসাধনং নৃত্যগীত সমাজোৎসব দর্শনম্।
মাংসমদ্যাভিযোগং চ ন কুর্য্যাৎপ্রোষিতে প্রভৌ।।

(স্মৃতিচন্দ্রিকাধৃত ব্যবহার কাণ্ড)[১৫]

সংসারে নারী ছিলেন পবিত্রতার প্রতীক। সুতরাং সকল রকম আচার আচরণে শুচিতা রক্ষা করে চলাই ছিল স্ত্রীর লক্ষ্য।

বেদের যুগে সতীদাহ প্রথার সুস্পষ্ট উল্লেখ কোথাও দেখা যায় না। বৈধব্য ঘটলে, নারীকে কঠোর ব্রতানুষ্ঠান অবলম্বন করে জীবনযাপন করতে হত। একাহারী হয়ে, জীবনে সকল রকম বিলাসিতা বর্জন করে চলতে হত তাঁকে।

বাড়ির কন্যাদের উপর ছিল গো-দোহনের ভার। তাই কন্যা অর্থে 'দুহিতা' শব্দের প্রয়োগ আজও দেখা যায়।

বেদের যুগে মেয়েদের যৌবন বিবাহই প্রচলিত ছিল, তার নানা প্রমাণ পাওয়া যায়। অথর্ববেদে আছে, কন্যারা ব্রহ্মচর্য পালন করে যৌবনে মনের মতো পতি লাভ করতেন—

'ব্রহ্মচর্যেণ কন্যা যুবানং বিন্দতে পতিম্।' (অথর্ব, ১১।৭।১৮)

ঋক্‌বেদে স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে যে, অপরিণত বয়সে কন্যার বিবাহ দেওয়া উচিত নয়।

'নব্যানব্য যুবতয়ো ভবন্তী মহদ্ দেবা নামসু।'

(ঋক্ ৩।৫৫।১৬)

স্বয়ংবর প্রথা

পুরাকালে রাজকন্যাদের জন্য স্বয়ংবর প্রথা প্রচলিত ছিল। ক্ষত্রিয়-রাজারা কন্যা বা ভগিনীর জন্য বিশেষ এক ধরণের সভার আয়োজন করতেন, যেখানে রাজকন্যাকে বিবাহ করতে সমর্থ এমন সব সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা নিমন্ত্রিত হতেন। সমবেত পাত্রদের মধ্যে থেকে রাজকন্যা স্বয়ং বিবাহযোগ্য বর নির্বাচন করে নিয়ে তাঁকে বরমাল্য প্রদান করতেন। সংস্কৃত সাহিত্যে কবিরা স্বয়ংবর সভার চমৎকার সব বর্ণনা দিয়েছেন। যেমন কালিদাসের 'রঘুবংশ' কাব্যের (ষষ্ঠ সর্গ) বর্ণনায় দেখি 'ইন্দুমতী' কেমনভাবে অজরাজাকে বরণমালা দিলেন। শ্রীহর্ষের রচিত 'নৈষধচরিত' কাব্যে (একবিংশ সর্গ) দেখা যায় 'দময়ন্তী' কী কৌশলে 'নল রাজা'কে স্বামী রূপে গ্রহণ করলেন। অনেক সময় কোনো কোনো রাজা স্বয়ংবর সভায় বিশেষ একটি পণ রাখতেন। যেমন রামায়ণে দেখি রামচন্দ্র হরধনুভঙ্গ করে সীতাকে লাভ করেছিলেন। 'মহাভারতে' আছে অর্জুন লক্ষ্যভেদ করে তবে দ্রৌপদীকে পেলেন। শুধু কাব্য বা নাট্যসাহিত্যে নয়, বহু পুরাণ কাহিনীতে আমরা রাজকন্যাদের ইচ্ছানুযায়ী স্বামী নির্বাচনের কথা পাই। এই সূত্রে মনে পড়ে সাবিত্রী, সুভদ্রা, রুক্মিণী, দেবযানী প্রভৃতি আরও অনেকের কথা। কোনো কোনো বিদুষী সুন্দরী রাজকন্যা প্রতিজ্ঞা করতেন যে, যদি কোনো পুরুষ তাঁকে পাণ্ডিত্যপূর্ণ তর্কযুদ্ধে পরাজিত করতে পারেন, তবেই তিনি তাঁকে বরমাল্য দেবেন।

বিবাহ বিচ্ছেদ ও পুনর্বিবাহ

বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে সেকালে নারীর বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়ে, পুনর্বিবাহের বিধান দিয়েছিলেন শাস্ত্রকারেরা। যদি কোনো নারীর স্বামী রাজদ্বারে অভিযুক্ত হতেন অথবা উন্মাদ, ক্লীব, সমাজচ্যুত কিংবা কুষ্ঠরোগী হতেন, তাহলে সেই নারী ইচ্ছা করলে আইনসম্মতভাবে প্রথম স্বামীকে ত্যাগ করে পুনরায় হিন্দুমতে বিবাহ করে অন্য স্বামী গ্রহণ করতে পারতেন। পরাশর বচন অনুযায়ী এই পাঁচটি কারণে নারীরা দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে পারতেন :

'নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চ স্বাপদৎসু নারীণাং পতিরণ্যো বিধীয়তে ।।'

(পরাশর সংহিতা ৪।৩০)

ব্রহ্মবাদিনী ও সদ্যোবধূ

প্রাচীন দিনে এদেশে সমস্ত নারীরাই যে শুধুমাত্র সংসারধর্ম পালন করতেন, তা নয়। অনেকে আজীবন ব্রহ্মচর্য পালন করতেন : 'অকৃত বিবাহা-স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যং চরতি'। কঠোর তপস্যা ও সাধনার দ্বারা চরম আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের পথে তাঁদের সামনে কোনো বাধা ছিল না। তপঃসিদ্ধা

বেশ কয়েকজন নারীর নাম আমরা শুনতে পাই। মহাভারতের শান্তিপর্বে (৩২০।৭) সুলভা নামে এক তপস্বিনীর কথা সেখানে বলা হয়েছে। যাঁর সঙ্গে রাজা জনকের যোগশাস্ত্র সম্পর্কে গভীর আলোচনা হয়েছিল। টীকাকার নীলকণ্ঠ নারীর সন্ন্যাস গ্রহণের বৈধতা সম্পর্কে বলেছেন যে, বিবাহের পূর্বে বা বৈধব্যের পরে স্ত্রীলোকের সন্ন্যাস গ্রহণের অধিকার আছে। 'রামায়ণে' (আরণ্য ৭৪।৩১) এক বৃদ্ধা সিদ্ধা সাধিকার কথা জানা যায়, তিনি শবরী। নিম্নবর্ণের নারী হয়েও ইনি আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে চরম উন্নতি লাভে সমর্থ হয়েছিলেন। সর্বাবস্থায় নারীরা সন্ন্যাস গ্রহণ করতে পারতেন না। তার কারণ সাধারণ নারীদের জীবনধারা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রীতিতে সন্ন্যাসিনীদের জীবন যাপন করতে হত। এ সময়ে তাঁদের ভিক্ষাচর্য, মোক্ষশাস্ত্র শ্রবণ, আত্মধ্যান ও ত্রিদণ্ডাদি ধারণ করতে হত।

'স্ত্রীণামপি প্রাগ্ বিবাহাদ্ বৈধব্যাদূর্ধ্বং বা সন্ন্যাসে অধিকারোঽস্তি ইতি দর্শিতম্। তেন ভিক্ষাচর্য্যং মোক্ষ শাস্ত্র শ্রবণম্ একান্তে আত্মধ্যানঞ্চ তাভিরপি কর্ত্তব্যম্। ত্রিদণ্ডাদিকঞ্চ ধার্য্যম।'[১৬]

বৈদিক, ঔপনিষদিক, বৌদ্ধ, জৈন সকলযুগেই আমরা এমন কয়েকজন নারীর সন্ধান পাই, যাঁরা আজীবন ব্রহ্মচর্য পালন করতেন। পরবর্তীকালের শাস্ত্রকাররা নির্দেশ দিলেন, বিবাহ নারীর অবশ্য কর্তব্যকর্ম।

বৈদিকযুগের ঋষিরা জানতেন যে, নারীরা শিক্ষা গ্রহণ না করলে, মানব সমাজের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধন সম্ভব নয়। তাই তাঁরা শক্তিরূপা নারীর অমর্যাদা করেন নি কখনও। গার্গী, মৈত্রেয়ী বা সুলভার মতো ব্রহ্মবাদিনীরা অনায়াসে তর্কযুদ্ধে আহ্বান জানাতেন তত্ত্বদ্রষ্টা ঋষিদের প্রকাশ্য সভায়। তাঁদের অনেকে বিবাহ করলেও, বিবাহ তাঁদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না। আত্মশক্তি বিকাশের জন্য তাঁরা 'প্রেয়' অপেক্ষা 'শ্রেয়'কেই চাইতেন। সেকালে নারীদের বেদপাঠের অধিকার তো ছিলই, তা ভিন্ন তাঁরা বেদমন্ত্র রচনা ও যাগ-যজ্ঞ সম্পাদন করতেন। বেদের বহু সূক্ত, 'মন্ত্রদ্রষ্ট্রী' বা 'নারীঋষি' কর্তৃক রচিত হয়েছে। এঁদের 'ব্রহ্মবাদিনী' নামে অভিহিত করার কারণটি নির্দেশ করা হয়েছে এইভাবে—"সাংসারিক সকল ব্যাপার হইতে নির্মুক্ত থাকিয়া তাঁহারা সকলে আধ্যাত্মিকতার সুমহান আদর্শ নিজ নিজ জীবনে সুপরিস্ফুট ও উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহারা ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ দিতেন। তাই সংস্কৃত ভাষায় তাঁহাদের নাম 'ব্রহ্মবাদিনী'।" [১৭]

বেদের যুগে নারীরা রীতিমতো শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষা দানের ব্রত গ্রহণ করতেন। সেকালে উচ্চবর্ণের মানুষকে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত দশটি সংস্কার পালন করতে হত, দেহ ও মনের বিশুদ্ধতা সম্পাদন করার জন্য শাস্ত্রকারদের নির্দেশ অনুযায়ী। যেমন শিক্ষা গ্রহণের অব্যবহিত পূর্বে 'উপনয়ন' নামক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে ছাত্রকে গুরুগৃহে নিয়ে যাওয়া হত। উপ অর্থাৎ সমীপে এবং নয়ন অর্থাৎ নিয়ে যাওয়া। উপনয়ন বলতে বোঝাত—"অধ্যাপনার্থমাচার্য্য সমীপং নীয়তে যেন কর্মণা তদুপনয়মিতি কর্মণা তদুপনয়নমিতি কর্মণো নামধেয়ং তেন কর্মণা যোজয়েৎ।"[১৮]

পুত্রদের ক্ষেত্রে যেমন আট বছর বয়সে 'উপনয়ন' সম্পন্ন করে গুরুগৃহে পাঠানোর রীতি ছিল, মেয়েদের উপনয়ন হলেও গুরুগৃহে তাঁরা যেতেন না। গোভিল গৃহ্যসূত্রে (২।১।১৯) একটি মন্ত্র আছে 'প্রাবৃতাং যজ্ঞোপবীতিম্' এতে প্রমাণ পাওয়া যায় নারীরা যজ্ঞোপবীতও ধারণ করতেন।[১৯] তাই হয়তো উপবীত পরিহিতা অনেক দেবী মূর্তি আমরা দেখতে পাই।

যম নামক একজন স্মৃতিশাস্ত্রকার বলেছেন--- পুরাকালে নারীদেরও মৌঞ্জীবন্ধন অর্থাৎ উপনয়ন সংস্কার ছিল। তাঁরা বেদের অধ্যাপনা করতেন ও সাবিত্রী বচন উচ্চারণ করতেন। নিজগৃহেই ভিক্ষাচর্যা করতেন। অবশ্য নারীদের জন্য অজিন, চীর, জটাধারণ এ সব ছিল না।

'পুরা কল্পে তু নারীণাং মৌঞ্জী বন্ধন মিষ্যতে।
অধ্যাপনং চ বেদানাং সাবিত্রী বচনং তথা।।
পিতা পিতৃব্যো ভ্রাতা বা নৈনামধ্যাপয়েৎ পরঃ।
স্বগৃহে চৈব কন্যায়া ভৈক্ষচর্যা বিধীয়তে।।
বর্জয়েদ্ জিনং চীরং জটা ধারণমেবচ।''

(স্মৃতিচন্দ্রিকা, সংস্কারকাণ্ড)[২০]

হারীত নামক শাস্ত্রকার বলেছেন নারীরা ছিলেন দুইশ্রেণীর - ব্রহ্মবাদিনী ও সদ্যোবধূ। ব্রহ্মবাদিনীরা উপনয়ন, অগ্নীন্ধন, বেদাধ্যয়ন ও স্বগৃহে ভিক্ষাচর্যা পালন করতেন; সদ্যোবধূদের বিবাহের সময় নামে মাত্র উপনয়ন হত।

'দ্বিবিধাস্ত্রিয়ো ব্রহ্মবাদিন্যাস্সদ্যোবধ্বশ্চ।
তত্র ব্রহ্মবাদিনীনাম্ উপনয়নম্ অগ্নীন্ধনং বেদাধ্যয়নং
স্বগৃহে চ ভিক্ষাচর্যেতি। সদ্যোবধূনাং চোপস্থিতে
বিবাহে কথংচিদ্ উপনয়ন মাত্রং কৃত্বা বিবাহ কার্যঃ।

(স্মৃতিচন্দ্রিকা, সংস্কারকাণ্ড, স্ত্রী সংস্কার)[২১]

কন্যাকে বিদ্যাবতী করে তুলতে হলে, কী করতে হবে তার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৬।৪।১৭)—'যা ইচ্ছেদ্ দুহিতা মে পণ্ডিতা জায়েত' ইত্যাদি। নারীরা যথারীতি বিদ্যাগ্রহণ করে, বিদ্যাদানেও পারদর্শিনী হতেন অনেকে। প্রমাণস্বরূপ বলা যায় আমরা পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী' ব্যাকরণে 'আচার্য্যা' 'উপাধ্যায়া' ও 'উপাধ্যায়ী' (৩।৩।২১) এই সব শব্দগুলি পাই। আরও পাই 'কাশকৃৎস্না' শব্দ। যার অর্থ হল 'কাশকৃৎস্নী' নামক মীমাংসাচার্যের গ্রন্থ 'কাশকৃৎস্নী'তে যে নারী ব্যুৎপত্তি লাভ করেছে, সেই অর্থে। অথবা 'আপিশলা' বলা হত সেই নারীকে, যিনি প্রাচীন ব্যাকরণ 'অপিশল' আয়ত্ত করেছেন।

প্রাচীন দিনে কোথাও কোথাও যে সহশিক্ষা প্রচলিত ছিল তার বেশ-কিছু পরিচয় আমরা পাই সেকালের কাব্য-সাহিত্যে। যেমন ভবভূতি (অষ্টম শতাব্দী) তাঁর 'উত্তররামচরিতে' দেখিয়েছেন যে, বাল্মীকির কাছে লবকুশ যখন শিক্ষা গ্রহণ করতেন তখন সেই একই গুরুর

কাছে একত্রে শিক্ষালাভ করতেন আত্রেয়ী। 'মালতীমাধব' নাটকে (দ্বিতীয় অঙ্ক) বৌদ্ধ প্রব্রাজিকা কামন্দকীর সহশিক্ষা গ্রহণের উল্লেখ আছে। বাণভট্টের (সপ্তম শতাব্দী) 'কাদম্বরী'তে দেখতে পাওয়া যায় মহাশ্বেতা 'ব্রহ্মসূত্র' পাঠ করেছিলেন। এ ছাড়া অভিজাত ঘরের কন্যা পত্রলেখার সঙ্গে রাজপুত্র চন্দ্রাপীড়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধুর ন্যায় সাহচর্য গড়ে উঠেছিল। এ সবই সংকীর্ণতামুক্ত উদার দৃষ্টির পরিচয় দেয়। সেকালে নারী ও পুরুষে সমঅধিকার স্বীকৃত ছিল বলেই তা সম্ভব হয়েছে। এ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ড. রমা চৌধুরী বলেছেন "... It is clear that right from the Rig-Vedic Age, the women of India took their due share as equal partners with men, in all spheres, especially, the intellectual and the cultural".[২২]

সেকালের রাজারা অনেক সময় রাজ্য পরিচালনার ব্যাপারে ও বিচারকার্যে বুদ্ধিমতী রানীদের সঙ্গে পরামর্শ করতেন। যেমন মহাভারতের গান্ধারী রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে রাজকার্যে নানা বিষয়ে সুপরামর্শ দিতেন। কালিদাসের রঘুবংশে দেখা যায় রাজা অজের জীবনে রানী ইন্দুমতী ছিলেন সর্বাংশে। তাই তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে রাজা শোকাভিভূত হয়ে দীর্ঘ বিলাপ করেছেন। সেই আক্ষেপ বাণীর কয়েকটি কথা খুবই পরিচিত সকলের কাছে---

'গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ প্রিয় শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ'

(রঘু ৮/৬৭)

রামায়ণে ও মহাভারতে অনেক মনস্বিনী নারীর উল্লেখ আছে--- যেমন অনসূয়া, শবরী, স্বয়ংপ্রভা, সরমা, কৌশল্যা (রামায়ণ) ও গান্ধারী, বিদুলা, সুভদ্রা, উত্তরা, জনা (মহাভারত) প্রভৃতি।

প্রাতঃস্মরণীয়া পঞ্চকন্যা

প্রাতঃস্মরণীয়া পঞ্চকন্যার কথা আমরা শুনতে পাই -

'অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা।
পঞ্চ কন্যা স্মরেন্নিত্যং মহাপাতক নাশনং।।'

অথচ প্রচলিত অর্থে এঁরা কেউই কিন্তু 'সতী' ছিলেন না, তবে কী কারণে এঁরা প্রাতঃস্মরণীয়া সেই কারণটি কিন্তু খুবই রহস্যজনক তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আজও আমাদের দেশে সতী নারীর জীবনের যে আদর্শ প্রচলিত আছে তা অত্যন্ত কঠিন ও কঠোর। সেই নিরিখে বিচার করলে এইসব নারীকে যে প্রকৃত সতীর পর্যায়ে গণ্য করা যায় না তার প্রথম কারণ একনিষ্ঠ প্রেমের দৈহিক শুচিতা পালনে এঁরা ছিলেন অক্ষম। অবশ্য কোনো কোনো সমালোচক বলেন যে, যে যুগে রামায়ণ মহাভারত পুরাণ প্রভৃতি লেখা হয়েছিল, সেকালে কোনো কোনো নারীর একাধিক পুরুষের সংসর্গ সম্ভবত দোষাবহ ছিল না। কারণ এমনও দেখা গেছে যে, "এক পতি থাকিতে নারীর পক্ষে বহুপতি নির্বাচনের রীতি ছিল। এ সম্বন্ধে পঞ্চপাণ্ডবপত্নী দ্রৌপদী, সপ্তপতী সহচারিণী জটিলা গৌতমীর উদাহরণও পাওয়া যায়। বার্কষীর নিদর্শনও অস্বীকার করা যায় না।"[২৩]

পরবর্তীকালে কিন্তু, এই রীতি অত্যন্ত নিন্দনীয় বলে সাব্যস্ত হল। তবে অনুমানের বিষয় হল এই যে, গুণাধিক্যের জন্য অনেক সময়ে, অনেক ব্যক্তির চরিত্রগত ত্রুটিকে তুচ্ছ জ্ঞান করা হয় -- এমন উদাহরণ সকল দেশকালে ও সমাজ সংসারে বিরল নয়। তাই একালে এক সমালোচক 'পঞ্চকন্যা' সম্পর্কে বলেছেন -- "শ্লোক আবৃত্তিকালে অহল্যার চিত্তের একাগ্রতা ও কঠোর তপস্যা, দ্রৌপদীর তেজস্বিতা, অনুপম আত্মসম্মানজ্ঞান, অতুলনীয় আত্মনির্ভরশীলতা, গৃহকর্মে সুনিপুণতা, প্রগাঢ় পতিপ্রেম, 'গভীর' তত্ত্বজ্ঞান ও শ্রীভগবানের চরণে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ, কুন্তীর ধৈর্য, গুরু শুশ্রূষা, উপকারীর প্রত্যুপকার, সন্তানদিগের মঙ্গলের জন্য কূটনীতি, কোমলতা ও তেজস্বিতার অপূর্ব সমন্বয় এবং সুনির্মল ভগবৎ প্রেম, তারার (বৃহস্পতি-পত্নী) প্রগাঢ় সত্যানুরাগ ও জনকনন্দিনীসম পতিগতপ্রাণ এবং মন্দোদরীর পাতিব্রত্য ও ভর্তাকে অহিতকর ও অপমানজনক কর্মসমূহ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার সকরুণ চেষ্টা, এই গুণগুলি স্মরণপথে স্বতঃই উদিত হইবে এবং তদ্দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া আপনাপন জীবন গঠনে যত্নবতী হইবেন। বলাবাহুল্য যদি এই সকল গুণ কোনো একটি নারীতে বিকশিত হয়, তাহা হইলে তিনি যে জগতে অতুলনীয়া বলিয়া কীর্তিত হইবেন, ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই।" [২৪]

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণেও আমরা একজন যোগসিদ্ধা নারীর কথা শুনতে পাই চূড়ালাদেবী। মার্কণ্ডেয় পুরাণে মদালসার চরিত্রটি স্মরণীয়। এ ভিন্ন প্রতিভাশালিনী বহু নারীর নাম শোনা যায় প্রাচীন ভারতের কাহিনীতে। যেমন গণিত বিদ্যায় পারদর্শিনী লীলাবতী, জ্যোতির্বিদ্যায় পারঙ্গমা খনা, দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিতা উভয় ভারতী প্রভৃতি।

সংগীত ও শিল্পসাধনা

সংগীত ও শিল্প সাধনার ক্ষেত্রেও সেকালের অভিজাত ঘরের মেয়েরা পিছিয়ে ছিলেন না। 'কাদম্বরী'তে দেখা যায় মহাশ্বেতা আধ্যাত্মিক সাধনার সঙ্গে সংগীতেও ছিলেন পারঙ্গমা। কালিদাসের 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকে (তৃতীয় অঙ্ক) নারীদের নৃত্যের কথা আছে। পুরুষের নৃত্য ছিল 'তাণ্ডব' কিন্তু নারীদের নৃত্য হল 'লাস্য'। 'বিক্রমোর্বশী' নাটকে (চতুর্থ অঙ্ক) চিত্রলেখা বিভিন্ন রাগ-রাগিণীতে সংগীত পরিবেশন এবং নৃত্য প্রদর্শন করেছেন।

প্রাক্‌বৈদিক যুগ থেকে ভারতে অধ্যাত্মসাধনার অঙ্গ হিসাবে সংগীতের সাধনা চলেছে। সকল বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে নারীরূপে কল্পনা করা হয়েছে। দেবী সরস্বতীর হাতে শোভা পায় বীণা যন্ত্রটি। একদা ভারতের মন্দিরে মন্দিরে নৃত্যগীতপটিয়সী দেবদাসীরা নৃত্য ও গীত পরিবেশন করতেন। বিশেষ অনুশীলনের ফলে তা পরিবেশিত হত বিশুদ্ধ সুরে তানে লয়ে।

চিত্রাঙ্কনে নারীর দক্ষতার উল্লেখ আছে শ্রীহর্ষের 'রত্নাবলী' নাটকে। সাগরিকা রাজা উদয়নের চেহারার অনুরূপ করে মদনদেবের চিত্র অঙ্কন করেছিলেন ভিত্তিচিত্র হিসাবে। আর তার ঠিক পাশেই হুবহু সাগরিকার মতো মুখচ্ছবি-সংবলিত রতির চিত্র আঁকলেন সাগরিকার সখি সুসঙ্গতা। এর থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে প্রতিকৃতি অঙ্কনে এঁরা ছিলেন সিদ্ধহস্তা। সাধারণ ঘরের নারীরাও অনেকেই গৃহকর্মের অবসরে সাহিত্য ও শিল্পের চর্চা করতেন তা বোঝা যায়।

শুধু সুকুমার শিল্পের চর্চায় নয়, অনেক রাজরানী ও রাজকন্যা সেকালে যুদ্ধবিদ্যাতেও পারদর্শিনী ছিলেন। বৈদিক যুগ থেকে আরম্ভ করে আধুনিক যুগ পর্যন্ত বহু বীরাঙ্গনা ও যোদ্ধা নারীর কথা জানা যায়, যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধ পরিচালনা, রথচালনা ও অশ্বারোহণে ছিলেন পটু। সাহিত্য, নাটক ও ইতিহাসে— এই জাতীয় কিছু দুর্ধর্ষ প্রকৃতির নারীর পরিচয় মেলে।

বৈদিক যুগের নারীর বসন ও ভূষণ

উন্নত ধরণের জীবনযাপনের অঙ্গ হিসাবে সেকালের নারীদের বিচিত্র বসনভূষণের কথা বলতে হয়। ঋগ্বেদে 'পেশস্' অর্থাৎ জরির কারুকার্যখচিত বস্ত্রের উল্লেখ আছে। পরবর্তীকালের 'পেশোয়াজে'র সঙ্গে এর কোনো যোগ ছিল কি না বলা কঠিন। অথর্ববেদে মেয়েদের অন্তর্বাস 'নীবি'র কথাও পাওয়া যায়। বিবাহের সময় নববধূ 'বাধূয়' (ঋগ্বেদ ১০।৮৫।৩৪) পরে উপস্থিত হতেন বিবাহসভায়। সেই সুন্দর কাপড়ের 'সিচ্' (ঋগ্বেদ ১০।১৮।১১) বা পাড়ের খুব বাহার থাকত। বিবাহের পর ঐ কাপড়খানি ব্রাহ্মণের প্রাপ্য ছিল। এ ছাড়া মেয়েদের খুব জমকালো পরিচ্ছদ ছিল 'সুবসন' (ঋগ্বেদ ৫।৫১।৪)।

নানা ধরণের অলংকার সেকালের মেয়েরাও পরতেন। ঋগ্বেদে সূর্যার বিবাহের বর্ণনা প্রসঙ্গে নারীর বেশবাস ও গয়নার কথা বলা হয়েছে। 'ওপশ' (ঋগ্বেদে ১০।৮৫।৮) ঠিক কী ধরণের অলংকার ছিল তা অনুমানের বিষয়। অনেকে বলেন শিরোভূষণ অথবা বেণী বা চূড়া। 'কর্ণশোভন' (ঋগ্বেদ ৮।৭৮।৩) ছিল কর্ণভূষণ। 'কুম্ব' ও 'কুরী' (অথর্ব ৬।১৩৮।৩) হয়তো বিশেষ ধরণের কোনো কেশবিন্যাসের নাম অথবা শৃঙ্গনির্মিত চিরুনি বিশেষ। 'খাদি' (ঋগ্বেদ ৫।৫৪।১১) হাতের বা পায়ের খাড়ু। 'তিরীটিনঃ' (অথর্ব ৮।৬।৭) হয়তো এক ধরণের শিরোভূষণ। 'নিষ্ক' (ঋগ্বেদ ২।৩৩।১০, ৮।৪৭।১৫) খুব সম্ভব মোহর বা মুদ্রা গাঁথা গলার হার। 'ন্যোচনী' (ঋগ্বেদ ১০।৮৫।৬) বিশেষ কোনো এক ধরণের গহনা। 'প্রবর্ত' (অথর্ববেদের বাত্য সূক্তে আছে) হল কুণ্ডল ধরণের অলংকার। 'প্রাকাশ' (তৈত্তরীয় ব্রাহ্মণ ১।৮।২।৩) হয়তো দর্পণ। গোলাকার বক্ষের অলংকার 'রুক্ম' (ঋগ্বেদ ১।১৬৬।১০), 'বিমুক্তা' (ষড়বিংশ ব্রাহ্মণ ৫।৬), 'শঙ্খ' (অথর্ব ৪।১০।১) 'মণি' (ঋগ্বেদ ১।৩৩।৮), 'স্রজ' (ঋগ্বেদ ৪।৩৮।৬) মালবা হার-- এমনি আরও অনেক নাম পাওয়া যায়। কতকগুলি এমন নামের উল্লেখ আছে যেগুলি ঠিক কোন্ ধরণের বস্তু ছিল বলা যায় না। যেমন--'স্থাগর', 'প্রাবেশ' প্রভৃতি। তবে এর থেকে একটি কথাই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, নারীরা চিরকালই বসনভূষণপ্রিয়।[২৫]

রাজ্য শাসনে ও প্রজাপালনে নারী

প্রাচীন দিন থেকে বহু নারী রাজ্য শাসন ও পালনে আশ্চর্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। ইতিহাসে অনেক প্রভাবশালিনী রানীর কথা শোনা যায়। যেমন লিচ্ছবি বংশের কন্যা ও গুপ্তবংশের সম্রাট প্রথম চন্দ্রগুপ্তের (৩২০-৩৩০ খ্রীস্টাব্দ) মহিষী কুমারদেবীর কথা জানা যায়। মুদ্রায় শুধু চন্দ্রগুপ্তের মূর্তি নয়, সেইসঙ্গে কুমারদেবীর মূর্তিও উৎকীর্ণ আছে। তাদের পুত্র সমুদ্রগুপ্তের

সময় (৩৩০-৩৭৫ খ্রীস্টাব্দে) ছিল 'স্বর্ণযুগ'। দাক্ষিণাত্যে বাকাটক বংশীয় রাজমহিষী প্রভাবতীর কথা জানা যায়। ইনি ছিলেন গুপ্ত সাম্রাজ্যের রাজা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের (আনুমানিক ৩৭৬-৪১৪ খ্রীস্টাব্দ) কন্যা। দাক্ষিণাত্যের এক পরাক্রমশালী রাজা দ্বিতীয় রুদ্রসেনের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। রাজার মৃত্যুর পর প্রভাবতী তাঁর নাবালক পুত্র দিবাকর সেনেব পক্ষে অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে রাজ্য পরিচালনা করতেন।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের, বিশেষ করে কাশ্মীর, উড়িষ্যা ও অন্ধ্রপ্রদেশে বেশ কয়েকজন বানী, শাসনকার্য পরিচালনায় অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। কহ্লন রচিত 'রাজতরঙ্গিণী'তে আমবা কাশ্মীরের রাজা-রানীদের অনেক কথা জানতে পাই। রানী দিদ্দা (দশম শতাব্দী) ছিলেন একজন বিখ্যাত রানী। তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে—"In the history of Kashmir, the period between 958 and 1003 A.D. was dominated by the personality of Queen Didda."[২৬]

দিদ্দা ছিলেন কাশ্মীর রাজ ক্ষেমগুপ্তের (৯৫০-৫৮ খ্রী.) পত্নী ও লোহার রাজের কন্যা। ক্ষেমগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁর নাবালক পুত্রেরা— নন্দিগুপ্ত, ত্রিভুবন ও ভীমগুপ্ত একে একে সিংহাসনে বসলেও প্রকৃতশাসনক্ষমতা ছিল রানী দিদ্দার হাতে। দিদ্দা নিজেই সিংহাসন অধিকার করেন (৯৮০ খ্রীস্টাব্দে) এবং তাঁর মৃত্যু ঘটে ১০০ খ্রীস্টাব্দে। নিজের নামে মুদ্রার প্রচলন করেন এবং দিদ্দাপুর ও কঙ্কণপুর নামে দুটি নগরীর প্রতিষ্ঠা এবং বিষ্ণুদিদ্দা স্বামীর মন্দির নির্মাণ তাঁরই কীর্তি।[২৭ক]

উড়িষ্যার ভৌমকর রাজাবা নবম থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত রাজত্ব করেছেন। যদিও সাধারণ নিয়মে রানী বা রাজকন্যারা সিংহাসনের অধিকারিণী বা উত্তরাধিকারিণী নির্বাচিত হতেন না, তথাপি কোনো- না-কোনো ভাবে প্রায় ছয়জন রানী সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁরা হলেন প্রথম ত্রিভুবন মহাদেবী— ইনি ছিলেন রাজা ললিতহারের রানী ও রাজমল্লের কন্যা, রানী দ্বিতীয় ত্রিভুবন মহাদেবী ছিলেন রাজা চতুর্থ শুভংকরের রানী। এছাড়াও ছিলেন রানী মহাদেবী, রানী দণ্ডী মহাদেবী, রানী বকুল মহাদেবী ও রানী ধর্ম মহাদেবী।[২৭খ]

শুধু রাজ্য শাসনে নয়, প্রাদেশিক শাসন ও গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্ত্রীরূপেও অনেক নারীর কথা ঐতিহাসিকরা বলেছেন—

"In some of the provinces, notably in the Kanarese country, women acted as provincial governors and heads of villages."[২৮]

স্মৃতির যুগ ও নারীজাতির ভাগ্যবিপর্যয়

আমরা দেখতে পাই যে স্মৃতির যুগ থেকে নারী জাতি পূর্বের অনেক অধিকার থেকে বিচ্যুত হয়েছে। পরবর্তীকালে বহিরাগত বিদেশী শত্রুর আক্রমণে নারীর নিরাপত্তা ব্যাহত হয়েছে নানাভাবে। স্মৃতির যুগে নারীরা শূদ্রের পর্যায়ে গণ্য হলেন কেন, তার কারণ সম্পর্কে বলা হয় যে, বিবাহযোগ্য কন্যার অভাবে, আর্যরা শূদ্র বা অনার্য কন্যাদেরও বিবাহ করতে লাগলেন।

অথচ আর্য নারীরা যে-সব সুযোগ সুবিধা ও অধিকার ভোগ করতেন তা এদের দেওয়া সম্ভব হল না। ফলে সমস্ত নারীজাতির অধিকার পরবর্তীকালে ক্ষুণ্ণ হল।

একমাত্র বিবাহ সংস্কার ভিন্ন, মনু, নারীজাতির অন্য কোনো সংস্কারকে স্বীকার করেন নি। 'বৈবাহিকো বিধিঃ স্ত্রীণাং সংস্কারো বৈদিকঃ স্মৃতঃ।' (মনু. ২।৬৭) মনুর আমলে শিক্ষার অধিকার থেকেও নারী বঞ্চিত হয়েছে। বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ, সতীদাহ, কঠোর বৈধব্য যন্ত্রণা ইত্যাদি নানা কুসংস্কার এসে ক্রমে ক্রমে পঙ্গু করে তুলেছিল এদেশের মেয়েদের জীবন।

পরস্পর বিরোধী বেশ-কিছু মতবাদ ও উক্তি আমরা দেখতে পাই মনুর স্মৃতিতে। যেমন বিবাহ ভিন্ন মেয়েদের অন্য কোনো গতির কথা তিনি বলেন নি। আবার এই মনুই বলেছেন চিরকাল গৃহে কন্যাকে অনূঢ়া অবস্থায় রেখে দেবে, সেও ভালো তবু অপাত্রে তাকে দান করবে না (৯।৮৯)। আবার রামায়ণেও আছে যে, স্বামী গুণবানই হোন অথবা নির্গুণই হোন, তিনিই স্ত্রীলোকের পরম দেবতা।

'ভর্তা তু খলু নারীণাং গুণবান্ নির্গুণোঽপি বা,
ধর্মং বিমৃশমানানাং প্রত্যক্ষং দেবি দৈবতম্।।'

(অযোধ্যা. ৬২।৮)

বেদের যুগে (আনুমানিক খ্রীস্টপূর্ব ২০০০) ও ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের যুগ (আনুমানিক খ্রীস্টপূর্ব ১০০০ থেকে ৫০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ) পর্যন্ত নারী জাতির যে উন্নত অবস্থা দেখা যায় এবং যতখানি মর্যাদা তাঁরা লাভ করেছিলেন -- স্মৃতি ও পুরাণের যুগে (আনুমানিক খ্রীস্টপূর্ব ৫০০ থেকে ৬০০ খ্রীস্টাব্দ) তার অনেক অবনতি ঘটেছিল। তা সত্ত্বেও সে-সব দিনের অনেক মহীয়সী নারীর নাম আমরা আজও শুনতে পাই।

এদেশে যাঁরা সতী শিরোমণিরূপে গণ্য হন সেই সতী, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী ইত্যাদি— এঁরা অত্যন্ত সহনশীলা হলেও, আত্মঅবমাননা সহ্য করেন নি কেউ। সেই হিসেবে তাঁরা বীরাঙ্গনাও বটে। রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদার মতোই ছিল তাঁদের মনোভাব—

"দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী।
পূজা করি রাখিবে মাথায়, সেও আমি
নই, অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে
পিছে, সেও আমি নহি। যদি পার্শ্বে রাখ
মোরে সংকটের পথে, দুরূহ চিন্তার
যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি কর
কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে,
যদি সুখে দুঃখে মোরে কর সহচরী,
আমার পাইবে তবে পরিচয়।" [২৯]

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জৈন ও বৌদ্ধ যুগের নারী

জৈন নারী সম্প্রদায়

জৈন ও বৌদ্ধ এই দুই ধর্মসম্প্রদায়ে আধ্যাত্মিকক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গে নারীর সম অধিকার সহজেই স্বীকৃতি লাভ করেছিল। অবিবাহিতা, বিবাহিতা, বিধবা অথবা ধনী, দরিদ্র, অভিজাত বা হীন বংশীয়া যে-কোনো বয়সের এবং যে-কোনো অবস্থার নারীই সন্ন্যাস গ্রহণের অধিকারিণী ছিলেন। এঁদের সঙ্গে আমরা বেদ-উপনিষদের যুগের নারীদের সঙ্গে একটি বিষয়ে পার্থক্য দেখতে পাই, সেটি হল বেদ-ব্রাহ্মণের যুগে হিন্দু নারীরা সাংসারিক বা পারিবারিক গণ্ডির মধ্য থেকেই সাধারণত আধ্যাত্মিক সত্যের সন্ধানে ব্যাপৃত থাকতেন। কিন্তু জৈন বা বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনীরা সাংসারিক জীবনের বাইরে এসে গড়ে তুলতেন 'মঠ' বা সন্ন্যাসিনী সংঘ। এর থেকে যে সত্যটি প্রতীয়মান হয় তা হল, সেকালের সমাজে নারীদের ধর্মাচরণ সম্পর্কিত ধারণা কিছুটা ভিন্ন ধরণের ছিল এবং সামাজিক মর্যাদাও নিশ্চয়ই ছিল। তা না হলে স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে জীবন যাপন করা তাঁদের পক্ষে সম্ভবপর হত না। সেই সঙ্গে মনে হয় সকল রকম নিরাপত্তা বোধেরও অভাব ছিল না তাঁদের।

অনুমান করা হয়, জৈন সাধ্বীরাই প্রথম এদেশে নারী সংঘ বা মঠ গড়ে তুলেছিলেন। জৈন সন্ন্যাসিনীদের অজ্জা, অর্থাৎ 'আর্যা' বা 'আর্যিকা' নামে অভিহিত করা হত। আবার 'সাধ্বী' বা 'ভিক্ষুণী' নামেও অভিহিতা হতেন তাঁরা। (আচারাঙ্গ সূত্র ২।১।১-১)। [৩০]

অবশ্য জৈন সম্প্রদায়ের মধ্যে দুটি প্রধান ভাগ আছে — দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর। প্রথম সম্প্রদায়টি অত্যন্ত রক্ষণশীল ও কিছুটা অনুদার মনোভাব পোষণ করেন। কিন্তু শ্বেতাম্বর সম্প্রদায় বেশ উদারপন্থী। এঁদের সম্পর্কে জানা যায় যে, নারীদের তাঁরা পুরুষের সমকক্ষ বলে সর্বদাই গ্রহণ করে থাকেন। যেমন বলা হয়েছে যে, "Jainism, however, come to be divided into two main sects, Digambaras and Shwetambaras. The former do not believe that women are capable of attaining salvation (moksha), and so they do not admit women into the order. But the Shwetambara sect, being much more liberal makes no distinction between the sexes and freely admits aspirants of both into the order." [৩১]

জৈন ধর্মাবলম্বীরা সমাজে স্ত্রীলোকের গুরুত্ব স্বীকার করেন। তাই কোনো দৈব-দুর্যোগের মধ্যে তাঁরা নারীকেই প্রথমে রক্ষা করার কথা চিন্তা করেন। বন্যায়, অগ্নিকাণ্ডে, দস্যুর আক্রমণে অথবা যে-কোনো দৈব-দুর্বিপাকের সময়, নারীকে রক্ষা করাই তাঁদের প্রথম ও প্রধান ধর্ম।

জৈন তীর্থস্থানে চব্বিশজন তীর্থঙ্করের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে মথুরা, আবু, গির্ণার প্রভৃতি স্থানে।

সেখানে তীর্থঙ্করবাই শুধু পূজা পান তা নয়. তাঁদের জননীরাও নিয়মিতভাবে সেখানে পূজিত হন। জৈন সম্প্রদায়ে যে নারীর মর্যাদা আছে, এর মধ্যেও সে পরিচয় রয়েছে।[৩২]

জৈন সাহিত্যে বহু জৈন সাধিকার উল্লেখ দেখা যায়। জিনসেন-রচিত মহাপুরাণে আছে যে, প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভদেবের দুই বোন ব্রাহ্মী ও সুন্দরী প্রব্রজ্যা বা সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় তীর্থঙ্কর অজিতনাথের ছিল তিন লক্ষ বিশ হাজার (৩,২০,০০০) ভিক্ষুণী শিষ্যা। গুণভদ্র তাঁর উত্তরপুরাণে বলেছেন, অন্যান্য তীর্থঙ্করদের অসংখ্য ভিক্ষুণী ছিল। সর্বশেষ তীর্থঙ্কর মহাবীরের (খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী) মাতা ত্রিশলা বা প্রিয়ঙ্কারিণী ছিলেন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের শিষ্যা। মহাবীরপত্নী যশোদাও জৈন ধর্মে দীক্ষিত হন।

মহাবীরের প্রথমা শিষ্যা ছিলেন আর্যা চন্দনবালা বা চন্দনা। ইনি ছত্রিশ হাজার (৩৬০০০) আর্যা বা ভিক্ষুণীর অধ্যক্ষা ('গণিনী') বা 'ভিক্ষুণীগণ মুখ্যা' ছিলেন। তাঁর জীবনকথা আলোচনা করলে দেখা যায় যে, নানা বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে তাঁর জীবন অতিবাহিত হয় এবং অবিচলিত চিত্তে তিনি সেই সমস্ত দুঃখ কষ্ট বরণ করে নিয়েছিলেন। অবশেষে মহাবীরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করে তিনি নির্বাণ লাভ করেন।

চন্দনবালা ছিলেন চম্পা রাজ্যের রাজা দধিবাহনের কন্যা। কৌশাম্বীর রাজা শতানীক চম্পারাজ্য আক্রমণ করলে, সেই যুদ্ধে দধিবাহন প্রাণ হারান। কৌশাম্বী-রাজ্যের সৈন্যরা লুটতরাজ করে চন্দনবালা ও তার মাকে হরণ করে নিয়ে যায়। রানী নিজের সম্মান রক্ষার জন্য আত্মহত্যা করেন। চন্দনবালাকে বিক্রি করে দেওয়া হয় এক দাস ব্যবসায়ীর কাছে। ধনাবহ নামে এক সন্তানহীন শ্রেষ্ঠী চন্দনবালাকে কিনে নিয়ে কন্যার মতো লালন পালন করেন। কিন্তু তাঁর পত্নী মূলা, চন্দনার রূপ ও যৌবন দেখে ঈর্ষান্বিতা হয়ে কঠোর নির্যাতন করতেন। তিন দিন উপবাসে কাটানোর পর, এক দাসী তাকে গোরুর খাদ্য হিসাবে রক্ষিত সিদ্ধ কলাই খেতে দেয়। ঘটনাচক্রে ঠিক সেই সময় সে মহাবীরের দর্শন লাভ করে এবং মহাবীর তাঁর দীর্ঘ ছয়মাসের উপবাস ভঙ্গ করেন চন্দনার দেওয়া কলাই সিদ্ধ গ্রহণ করে। ঘটনাটি চন্দনার মনে তীব্র বৈরাগ্যের সঞ্চার করে এবং সে মহাবীরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ ক'রে। জৈন ভিক্ষুণী সম্প্রদায়ের মধ্যে চন্দনা তাঁর ত্যাগ ও তপস্যার জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন।[৩৩] এই সব নারীদের পবিত্র জীবনের অনুসরণে আজকের দিনেও বহু জৈন নারী সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং কঠোর তপশ্চর্যার মধ্যে দিয়ে জীবন অতিবাহিত করেন।

বৌদ্ধ নারী সমাজ

বৌদ্ধ যুগে সমগ্র ভারতে নারীজাতির অবস্থা কীরকম ছিল তা সম্পূর্ণভাবে জানা না গেলেও, মগধ, কলিঙ্গ, কাশী, কৌশল, অবন্তী প্রভৃতি যে- সব অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার ও প্রসার হয়েছিল সেখানকার নারীরা যে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিতা ছিলেন তার পরিচয় পাওয়া যায় বৌদ্ধ সাহিত্য সমূহে। সেখানে সচ্চরিত্রা নারীর গুণগান করা হয়েছে। আবার ভ্রষ্টা ব্যভিচারিণী ও দুশ্চরিত্রা নারীর নিন্দাবাদ করা হয়েছে। নারী সম্পর্কে বৌদ্ধদের মনোভাব কী ছিল, তার বিচার

ও বিশ্লেষণ করেছেন অনেকেই। যেমন দেখা যায়—"রমণীরা অরক্ষণীয়', সাধারণ ভোগ্যা, অকৃতজ্ঞ, মোক্ষলাভের অন্তরায়- স্বরূপা, পুনঃ পুনঃ এইরূপ কটূক্তির প্রয়োগ দেখিয়া আপাততঃ মনে হয়, বুদ্ধদেব ও তাঁহার শিষ্যগণ স্ত্রীজাতির প্রতি অতি অবিচার করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন দেখা যায়, ইঁহারাই মুক্তকণ্ঠে যশোধরা, ক্ষেমা, উৎপলবর্ণা, বিশাখা প্রভৃতি রমণীরত্নের গুণকীর্তন করিয়া গিয়াছেন এবং অনুতপ্তা আম্রপালী প্রভৃতি গণিকাকেও অর্হত্ব প্রদান করিয়াছেন তখন মনে হয় ইঁহারা স্ত্রীজাতির অনাদর করিতেন না।"[৩৪]

নানা কাহিনীর মধ্য দিয়ে নারীর সতীত্বের গৌরব ঘোষণা করা হয়েছে বৌদ্ধ সাহিত্যেও। 'সম্বুলজাতকে' আমরা এমনই এক পতি-অনুরাগিণী সতী সম্বুলার কাহিনী পাই। স্বামীর সুখের জন্য সে সকল রকম দুঃখকে হাসিমুখে বরণ করে নিয়েছে। এই ধরণের কাহিনী 'বাক্কটা জাতকে'ও আছে। সতীত্ব থেকে ভ্রষ্ট হওয়া নারীর পক্ষে গুরুতর অপরাধ। বিশ্বাসহন্ত্রী নারীকে সেজন্য তার স্বামী হত্যা পর্যন্ত করেছে। শুধু কাহিনীতে নয়, বাস্তবেও অনুরূপ অপরাধের জন্য সেকালে মৃত্যুদণ্ড, কারাদণ্ড, অঙ্গচ্ছেদ প্রভৃতি গুরুতর দণ্ডদানের ব্যবস্থা ছিল। সতীত্বের প্রমাণ দিতে গিয়ে নারী অগ্নি-পরীক্ষা দিয়েছে, এমন কথা 'অণ্ডভূত জাতকে' আছে।

'ইত্থিরত্ন' বা 'স্ত্রীরত্ন'

দীর্ঘ-নিকায়গ্রন্থে ভগবান বুদ্ধের মুখ দিয়ে বলানো হয়েছে আদর্শ রমণীর বৈশিষ্ট্য কী। তিনি সেখানে বলেছেন—যে নারী সুদর্শনা, শ্রীসম্পন্না, যার ব্যবহার মনোরম, যিনি সুন্দর দেহবর্ণবিশিষ্টা এবং খুব দীর্ঘও নন হ্রস্বও নন, খুব কৃশও নন, আবার স্থূলও নন, ম্লানও নন, অথচ উজ্জ্বলও নন, নারীসুলভ সৌন্দর্যের উপরে যার দেহে দিব্যকান্তি শোভা পায় —তাকেই 'ইত্থিরত্ন' বা 'স্ত্রীরত্ন' বলা যায়।[৩৫]

সুনাগবিকদের মেনে চলার জন্য বুদ্ধদেব যে সাতটি নিয়ম প্রবর্তন করেন তার মধ্যে 'পঞ্চম' নিয়মটি হল এই যে, "স্ত্রী লোকের সম্মান রাখতে হবে; বিবাহিত হোক অবিবাহিত হোক, স্ত্রীলোকদের ওপর কোনো রকম অত্যাচার করা চলবে না।"[৩৬] তিনি নারীর নিরাপত্তার কথা চিন্তা করতেন বলেই হয়তো কিছু পরিমাণ স্ত্রী-স্বাধীনতা বজায় ছিল। তা সত্ত্বেও কিছু সামাজিক কুপ্রথা প্রচলিত থাকায় অনেক নারীর জীবন সময় সময় দুর্বহ হয়ে পড়ত। কয়েকটি সেই জাতীয় কুপ্রথার এবং অন্যান্য প্রচলিত রীতির উল্লেখ করা যেতে পারে।

বাল্যবিবাহ

তখনকার দিনের রাজা-রাজড়ারা অনেক সময় অবিবাহিত সুন্দরী মেয়েদের জোর করে ধরে নিয়ে যেতেন তাঁদের রাজঅন্তঃপুরে। এই জাতীয় অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যই হয়তো অনেকে বালিকা বয়সে মেয়ের বিবাহ দিতেন। সেকালে অভিভাবক-নির্দিষ্ট বিবাহ ভিন্ন, গান্ধর্ব বিবাহ এবং রাজকন্যাদের জন্য স্বয়ংবর প্রথায় বিবাহ প্রচলিত ছিল। তা ছাড়া আবার বিবাহিতা না হয়েও অনেক নারী প্রলোভনে পড়ে অথবা বলপূর্বক অপহৃতা হয়ে, কেউ কেউ পুরুষের সঙ্গে পত্নীর মতো বাস করতে বাধ্য হতেন।

পণ বা যৌতুক গ্রহণ প্রথা

সেকালেও কন্যার বিবাহে পণ বা যৌতুক দিতে হত তার একাধিক দৃষ্টান্ত দেখা যায় বৌদ্ধ জাতক কাহিনীগুলিতে। ('ধম্মপদত্থ কথা' প্রথম খণ্ড। বিসাখা বত্থুতে)। আর একটি কু-প্রথা ছিল, অভিজাত ঘরের কন্যার বিবাহে বিভিন্ন গ্রাম থেকে উপঢৌকন আদায় করা হত। যেমন ধম্মপদত্থ কথায় (প্রথম খণ্ড) আছে যে, মিগার শ্রেষ্ঠীর পুত্রের সঙ্গে ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর কন্যা বিসাখার বিবাহ উপলক্ষে এক শত গ্রাম থেকে উপহার সংগ্রহ করা হল।

বহু বিবাহ প্রথা ও সপত্নী সমস্যা

সেকালের পুরুষেরা একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করতেন, জাতকের গল্পে তার পরিচয় আছে। কোনো রাজার ষোলো হাজার পত্নী ছিল, এমন ঘটনার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। এর ফলে সপত্নী সমস্যা নারীর জীবন বিষময় করে তুলত। বিবাদ-বিসম্বাদের দরুন গৃহে অশান্তি দেখা দিত। (উদাহরণ : জাতক কথা, ধমপদত্থ কথা প্রথম খণ্ড)। নারীরা সাধারণত একবারই বিবাহ করতেন। একমাত্র 'কুণাল জাতকে' একজন নারীর বহু স্বামী গ্রহণের উল্লেখ দেখা যায়।

বিবাহ বিচ্ছেদ ও নারীর পুনর্বিবাহ এবং বিধবাবিবাহ

সেকালে নারীরা ইচ্ছা করলে বিবাহ বিচ্ছেদ ক'রে পুনরায় বিবাহ করতে পারতেন, তার দু একটি নিদর্শন দেখা যায়। যেমন 'থেরীগাথা'য় ইসি দাসীর জীবনকথা যেভাবে বর্ণিত হয়েছে। অথবা 'উচ্ছঙ্গজাতকে'ও এক নারীর বিবাহ বিচ্ছেদের কথা আছে।

তখন বিধবা বিবাহ প্রচলিত ছিল 'মহাবংশে' তার দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যাবে তবে সর্বত্র মেয়েরা নিজেদের স্বতন্ত্র সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করে চলতে পারত না- - পুরুষরা অনেক সময় স্ত্রীকে নিজের সম্পত্তির মতো ব্যবহার করত তার নিদর্শনও পাওয়া যায় ক্ষেমেন্দ্রের 'অবদান কল্পলতা'য়। এখানে দেখা যায় এক ব্যক্তি স্বইচ্ছায় নিজের পত্নীকে অন্য পুরুষের হাতে সমর্পণ করল। সেযুগে বাড়িতে দাসী বা ক্রীতদাসী রাখার প্রথা ছিল। তাদের উপর বাড়ির মনিব বা প্রভুর ছিল অখণ্ড অধিকার।

অবরোধপ্রথা

এদেশে সম্ভবত নারীহরণরূপ উপদ্রব থেকে রক্ষা পাওয়া ও সতীত্ব বজায় রেখে জীবন যাপনের জন্য একদা পর্দা বা অবরোধ প্রথার প্রচলন ঘটে। বৌদ্ধযুগে কিছু পরিমাণে এই প্রথা প্রচলিত থাকলেও, সর্বত্র ছিল না। কারণ বিসাখার মতো অভিজাত ঘরের মেয়ে বা বধূও অনাবৃত রথে চড়ে বিবাহের পর শ্রাবস্তী নগরীতে প্রবেশ করেছেন— বৌদ্ধ সাহিত্যে তার বর্ণনা আছে। তবে সাধারণত অভিজাত ঘরের মেয়েরা একা বা অনবগুণ্ঠিতা হয়ে কোথাও যেতেন না। মাথার উপর ছত্র বা তালপত্র ব্যবহার করতেন; অন্ততপক্ষে পরিধেয় বস্ত্রের অঞ্চল। (ধম্মপদত্থ কথা ১ম খণ্ড দ্রষ্টব্য)। যানবাহনের ব্যবহার ছিল। রথ বা শকট অথবা পাল্কী জাতীয় যানে চড়ে তাঁরা

একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাতায়াত করতেন। উৎসব-অনুষ্ঠান উপলক্ষে অনুচর বা অনুচরী পরিবৃত হয়ে তাঁরা নদীতে যেতেন স্নানের জন্য। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'কথা ও কাহিনী'তে প্রাচীন দিনের পটভূমিকায় কবিতা রচনা করতে গিয়ে যেমন সব বর্ণনা দিয়েছেন

"স্নানে চলেছেন শত সখী সনে
কাশীর মহিষী করুণা।" — "সামান্য ক্ষতি"

কিন্তু পর্দাপ্রথার বাড়াবাড়ি কিছু ছিল না। প্রয়োজনবোধে তাঁরা পর্দা মানতেন অথবা মানতেন না।

নর্তকী বা বারবণিতা

বৌদ্ধ সাহিত্যে নৃত্য-গীত-বাদ্যকুশলা অনেক বিখ্যাত সুন্দরী বারবণিতার কথা পাওয়া যায়। রাজা বা অভিজাত ধনীঘরের পুরুষদের বিলাস-ব্যসন ও ভোগলালসা চরিতার্থ করাই ছিল এই সব বারাঙ্গনাদের কাজ। সাধারণ সাংসারিক পরিবেশে এঁদের কোনো স্থান ছিল না। ভগবান বুদ্ধের প্রভাব ও বৌদ্ধধর্ম তাঁদের ভাবপ্রবণ মনে পবিত্রভাব জাগিয়ে তুলেছিল। এঁদের মধ্যে অনেকেই শেষ পর্যন্ত পবিত্রজীবন যাপনে সমর্থ হয়েছিলেন। এই শ্রেণীর কয়েকজন নারীর নাম বিখ্যাত হয়ে আছে। যেমন অম্বপালী বা আম্রপালী ছিলেন বৈশালীর রাজসভার নর্তকী। শালবতী ছিলেন রাজগৃহের বিখ্যাত বারবণিতা। সিরিমা ছিলেন শালবতীর কন্যা ও বৈদ্য জীবকের ভগিনী। সামা—বারাণসীর সুপ্রসিদ্ধ বারাঙ্গনা, যাঁর একরাত্রির দর্শনী ছিল সহস্রমুদ্রা। সুলসাও ছিলেন বারাণসীতে। অর্ধকাশী ছিলেন কাশীর বারবণিতা। গণিকাবৃত্তির দ্বারা ইনি কাশী নগরীর অর্ধেক সম্পদের অধিকারিণী ছিলেন বলেই তাঁর নাম অড্ঢকাশী বা অর্ধকাশী। এমনি আরও অনেক নারীর নাম পাওয়া যাবে বৌদ্ধ সাহিত্যে।

বৌদ্ধযুগে স্ত্রীলোকদের স্বাতন্ত্র্য ক্ষুন্ন হওয়ার আরও একটি প্রধান কারণ হল, স্বামীর নামেই স্ত্রীলোকদের পরিচয় দিতে হত; নিজেদের নামের কোনো গুরুত্ব ছিল না—'ভত্তা পঞ্ঞাণং ইত্থিয়াতি' (সংযুক্ত নিকায়, প্রথম খণ্ড)। রাজরাজেশ্বরের পত্নী থেকে আরম্ভ করে দরিদ্রতম নারীর ক্ষেত্রেও এই একই নিয়ম বলবৎ ছিল। কেউ কেউ পুত্রের পরিচয়ে নিজের পরিচয় দিতেন। অবশ্য কয়েকজন নারী এ ক্ষেত্রে ছিলেন ব্যতিক্রম। প্রমাণস্বরূপ বিসাখার নাম করা যায়। নারীকেই আবার বৌদ্ধরা শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলেছেন—'ইত্থি ভণ্ডানম উত্তমম্' (সংযুক্ত নিকায়, প্রথম খণ্ড)। কারণ তাঁরা দেখেছেন যে, পৃথিবীতে বোধিসত্ত্ব বা সাধকের জন্মের জন্যও নারী অপরিহার্য। পরস্পরবিরোধী এই সব তথ্য আমাদের বিভ্রান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বুদ্ধদেব নিজে স্বীকার করতেন যে, কন্যা যদি তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্না, ধর্মপ্রাণা, স্বামী ও শ্বশুরের অনুগতা হয়—তা হলে সে পুত্র অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। তার দ্বারায় এমন-কি রাজ্য শাসনও সম্ভব। 'মহাবংশে' (অধ্যায়-৩৪, শ্লোক ২৭) আছে রানী অনুলা, চারমাস রাজ্য শাসন করেন। সিবল্লীও ('মহাবংশ',৩৫ অধ্যায়, শ্লোক১৪) চারমাস রাজ্য পরিচালনা করেছিলেন।

ড. বিমলাচরণ লাহা বৌদ্ধযুগের নারীদের সম্পর্কে বলেছেন, "বৌদ্ধ সাহিত্যে নারী চরিত্রের উজ্জ্বল দিকটাও যেমন প্রদর্শিত হইয়াছে, খারাপ দিকটাও তেমনি প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিতর নারী জাতির চরিত্রের জন্মগত বৈশিষ্ট্যের একটা সুস্পষ্ট ছবি পাওয়া যায়। রমণীসুলভ ধর্মগুলি বিশেষভাবে ভিক্ষুণী এবং থেরীদের জীবনের ভিতর দিয়াই উজ্জ্বলভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। এই সব কোমলদেহা নারী ধর্মজীবনের কঠোরতাগুলি যেরূপভাবে সহ্য করিয়াছে তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। আবার বৌদ্ধ সাহিত্যে নারীদের দুর্বলতার ছবিও যেরূপভাবে অঙ্কিত হইয়াছে তাহা দেখিলে ভয় এবং ঘৃণারই উদ্রেক করে। এই সব চরিত্রকে কাল্পনিক বলিয়াও মনে করিবার কারণ নাই। সেগুলিতে সত্যকে অক্ষুণ্ন ভাবেই প্রতিফলিত করা হইয়াছে।"[৩৭]

নারীদের উপর বৌদ্ধধর্মের প্রভাব

দলে দলে নারী গৌতমবুদ্ধের প্রচারিত সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করলেন কেন, তার কারণস্বরূপ কিছু তথ্য পাওয়া যায় বৌদ্ধ সাহিত্য সমূহে। বঙ্গদেশের ইতিহাসে যেমন দেখা যায়, ষোড়শ শতাব্দীতে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের ফলে এক মহাভাবের প্লাবন এসেছিল —আড়াই-তিন হাজার বছর আগে তেমনি ভারতে ভগবান বুদ্ধের আবির্ভাবে আধ্যাত্মিক ভাবের প্লাবন জেগেছিল। এর একটা স্বাভাবিক আকর্ষণী শক্তির বলে, দলে দলে নরনারী সেদিন সংসার পরিত্যাগ করে, বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নিয়ে সন্ন্যাস জীবন যাপন করেছিল। এই সব বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের আবাসস্থল হিসাবে গড়ে উঠেছিল বড়ো বড়ো বৌদ্ধ মহাবিহার ও সংঘ। নারীদের ক্ষেত্রে অনেক সময় দৈহিক, মানসিক, নৈতিক বা পারিবারিক অথবা সামাজিক এমন কোনো কারণ থাকত, যার হাত থেকে মুক্তি লাভ কববাব জন্য তারা উন্মুখ হয়ে উঠত। আবেগের বশবর্তী হয়ে তাবা অনায়াসে সন্তান, স্বামী, পিতা-মাতা বা প্রভুকে ছেড়ে দিয়ে বৌদ্ধধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করত। অনেক সময় শোকগ্রস্ত হয়ে সন্তানহারা জননী, বন্ধ্যা নাবী বা বিধবা অথবা অনুতপ্তা বারবণিতা বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করতেন। এমনও দেখা যায় অত্যধিক পণের বিনিময়ে যখন যুবতী কন্যাদের বিকোবার চেষ্টা চলেছে, তখন তারা জীবন সম্বন্ধে বীতশ্রদ্ধ হয়ে ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করে জীবনে শান্তিলাভ করেছে। এর অনেক উদাহরণ আমরা পাই থেরীগাথার মধ্যে।

বৌদ্ধযুগে স্ত্রী শিক্ষা

বৌদ্ধযুগে নারীদের মধ্যে শিক্ষাদীক্ষার প্রচলন যথেষ্ট ছিল, তার বেশ-কিছু প্রমাণ বৌদ্ধ সাহিত্যে আছে। যদিও "অবিবাহিতা বালিকাকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া শিক্ষা দেওয়া হইত কিংবা গৃহেই তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল, সেকথার কোনো ইঙ্গিত অবশ্য বৌদ্ধ সাহিত্যে পাওয়া যায় না, কিন্তু শিক্ষিতা নারীর উল্লেখ প্রচুর পরিমাণেই পাওয়া যায়।"[৩৮]

থেরীগাথায় যে-সব নারীর রচনা স্থান পেয়েছে, তাঁরা শুধু যে সাহিত্যপ্রতিভার অধিকারিণীই ছিলেন তা নয়, অনেকেই যথেষ্ট পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। 'সংযুক্ত নিকায়' (প্রথম খণ্ড) গ্রন্থে সুক্কা নামে এক রমণীর কথা আছে, যিনি বৃহৎ জনতার সামনে ধর্ম সম্পর্কিত চমৎকার বক্তৃতা

দিতেন। বিম্বিসার পত্নী ক্ষেমা একদিকে যেমন ছিলেন অসাধারণ সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী অন্যদিকে ছিলেন শিক্ষিতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বসম্পন্না নারী। তিনি বক্তৃতাও দিতেন ভালো। 'বিনয়গ্রন্থ' তিনি খুব ভালোভাবে আয়ত্ত করেছিলেন। 'থেরীগাথা'য় এঁর রচিত বড়ো শ্লোকাত্মক গীতি আছে। ধম্মদিন্না ছিলেন আর একজন বিশিষ্টা নারী। 'মজ্‌ঝিম নিকায়' গ্রন্থে এঁর উল্লেখ আছে। বিনয় গ্রন্থ ইনিও আয়ত্ত করেছিলেন। বৌদ্ধ দর্শনে ছিলেন সুপণ্ডিতা। সংঘমিত্রা ছিলেন বিবিধ জ্ঞানের আকর। উত্তরা নাম্নী এক সন্ন্যাসিনী সিংহলের অনুরাধাপুরে গিয়ে বিনয়পিটক, সুত্তপিটকের পাঁচটি গ্রন্থ এবং অভিধম্মপিটকের সাতটি গ্রন্থের অধ্যাপনার ভার গ্রহণ করেন। ভদ্দাকুণ্ডলাকেসার জীবনকথা পাওয়া যায় 'থেরীগাথায়' যা অত্যন্ত চমকপ্রদ। ইনি বিদ্যায়, বাক্‌পটুতায়, দৈহিক বলে এবং উপস্থিত বুদ্ধিতে ছিলেন বলীয়ান। রাজগৃহে এক শ্রেষ্ঠীর ঘরে ইনি জন্মেছিলেন। যখন তিনি যুবতী তখন সত্থুক নামে এক অপরাধী ও দুরাচারী যুবককে এক ঝলক দেখেই প্রেমে অভিভূত হন। সে ছিল এক পুরোহিতের পুত্র কিন্তু কোনো গর্হিত কর্মের জন্য নগররক্ষক তাকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাচ্ছিল। ঐ সময় বিপুল অর্থ উৎকোচ স্বরূপ দিয়ে ভদ্দা নগর রক্ষককে বশীভূত করে সত্থুককে মুক্ত করেন এবং তার সঙ্গে পলায়ন করেন। ভদ্দার রত্নালংকারগুলির লোভে সত্থুক তাকে ভুলিয়ে নিয়ে গেল একটি নির্জন পাহাড়ের চূড়ায়। সমস্ত অলংকার কেড়ে নিয়ে সে ভদ্দাকে ফেলে দিতে চেষ্টা করল পাহাড়ের উপর থেকে। ভদ্দাও তাকে শেষবারের মতো আলিঙ্গন করার ছলনায় সুকৌশলে সত্থুককে ফেলে দিল গভীর পাহাড়ী খাদে। এরপর সে আর সংসারে ফিরে যায় নি। জৈনদের নির্গ্রন্থ সম্প্রদায়ভুক্ত হয়ে সন্ন্যাস নিয়ে কঠোর সব নিয়ম পালন করতে লাগল সে নিষ্ঠা সহকারে। তালবৃন্তের 'কঙ্কাতিকা' দিয়ে কেশগুলিকে উৎপাটিত করার পর, পুনরায় কুণ্ডলাকারে তার মাথায় কেশের আবির্ভাব ঘটল। সেই থেকে তার নাম হল 'কুণ্ডলকেশা'।

নির্গ্রন্থদের শিক্ষায় ইনি কিন্তু সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত হতে পারেন নি। পূর্ণজ্ঞান লাভের মানসে তিনি অনেক পণ্ডিতকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান জানাতেন। ভগবান বুদ্ধ যখন জেত বনে অবস্থান করছিলেন, তখন একদিন তাঁর প্রিয় শিষ্য সারিপুত্ত এলেন তর্কের সাহায্যে ভদ্দার অহংকার দমন করতে। পরাজিত হয়ে নতিস্বীকার করে ভদ্দা বুদ্ধের নিকট গিয়ে তাঁর ধর্মোপদেশ গ্রহণ করে হলেন বৌদ্ধ।[৩৯]

আরও অনেক শিক্ষিতা, সাহিত্য-প্রতিভাসম্পন্না ও শাস্ত্রপারদর্শিনী রমণীদের পরিচয় জানা যায় বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহে। কয়েকটি নাম যেমন কালি, সপত্তা, ছন্না, উপালি, রেবতী, সীবলা, হেমা, অগ্‌গিমিত্তা, চূলনাগা, ধন্না, সোনা, মহাতিস্‌সা, চূলসুমনা, মহাসুমনা, নন্দুত্তরা, পটচারা, উপ্‌পলবন্না, বিসাখা, ইসিদাসিকা ইত্যাদি। শাক্যবংশীয়া বহু মহিলা কেউ বধূ, কেউ কন্যা, কেউ গৃহিণী অনেকেই সংসার ত্যাগ করে কঠোর সংযম ও সাধনার মধ্য দিয়ে অর্হত্ত্ব লাভ করেছিলেন।

ভিক্ষুণী সংঘ প্রতিষ্ঠা

বুদ্ধের বাণী ও বৌদ্ধ ধর্মের তত্ত্ববহনকারী 'ত্রিপিটক' নামক পালি গ্রন্থটি সুবিখ্যাত। সেখানে

সুত্তপিটক, বিনয়পিটক ও অভিধম্মপিটক এই তিনটি গ্রন্থের সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। বিনয়পিটকের পাঁচটি বিভাগের মধ্যে 'চুল্লকবগ্‌গ' অন্যতম। এখানে বৌদ্ধ ভিক্ষুণী সংঘ প্রতিষ্ঠার কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রথম দিকে বুদ্ধদেব নারীদের সংঘে প্রবেশের অনুমতি দেন নি। পরে তিনি যখন কপিলাবস্তু নগরীর নিগ্রোধারামে অবস্থান করছিলেন, তখন একদিন মহাপ্রজাপতি গৌতমী এসে তাঁকে অনুরোধ জানালেন নারীদের সন্ন্যাস গ্রহণের অনুমতি দিতে। মায়াদেবীর মৃত্যু ঘটায় গৌতমীই বুদ্ধদেবকে মায়ের স্নেহে ও যত্নে লালন পালন করেছিলেন। বার বার তিনবার বুদ্ধদেব তাঁর মায়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। গভীর বেদনায় অভিভূত হলেন তিনি। তাঁকে এইভাবে মনঃক্ষুন্ন হতে দেখে, বুদ্ধের একনিষ্ঠ সেবক ও পিতৃব্যপুত্র আনন্দ এসে মাতা গৌতমীর পক্ষে সেই অনুমতি আদায় করে নিলেন। নারীরা সন্ন্যাস গ্রহণের অনুমতি পেলেন আটটি দায়িত্বপূর্ণ নিয়ম পালনের বিনিময়ে। এগুলিকে বলা হয় অষ্টানুশাসন বা 'অট্‌ঠগরুধম্মা'।

মাতা গৌতমীই হলেন বুদ্ধের প্রথম শিষ্যা। তাঁর সঙ্গে কপিলাবস্তুর আরও পাঁচশত অভিজাত বংশীয়া নারী ভগবান বুদ্ধের নিকট সংসার ত্যাগের বাসনা জানিয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন।

বুদ্ধদেব নারীদের সন্ন্যাস গ্রহণের পরিপন্থী মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন নানা কারণেই। অত্যন্ত আক্ষেপের সঙ্গে তিনি আনন্দকে জানিয়েছিলেন যে, তাঁর প্রবর্তিত বৌদ্ধধর্ম সহস্র বৎসর পর্যন্ত জীবিত থাকত, যদি না তিনি নারীদের সংঘে প্রবেশের অনুমতি দিতেন। কিন্তু রমণীরা সংঘে প্রবেশের দরুন ঐ ধর্ম মাত্র পঁচশত বৎসর জীবিত থাকবে। (বিনয়পিটক, ৩য় খণ্ড)। এই ভবিষ্যদ্‌বাণী সম্পর্কে অনেকে বলেন—"বুদ্ধদেব মানবের দুর্বলতা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ছিলেন বলিয়াই সংঘগণ্ডির ভিতরে রমণীর প্রবেশের বিরোধী ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, যদি নারীজাতিকে ভিক্ষু সম্প্রদায়ের সহিত মিলিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহার পরিণাম শুভ হইবে না।" [৪০] অনেকে আবার ভিন্ন মত পোষণ করেন। এই সব গবেষকদের মত হল, নারীরা বৌদ্ধধর্ম ও সন্ন্যাস গ্রহণের ফলে অল্প সময়ের মধ্যে এই ধর্ম বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পেরেছিল এবং ধর্ম ও সংঘের প্রচার ও প্রসারের সুবিধা হয়েছিল। নারীদের সংঘে প্রবেশের ফলে যে কল্যাণ সাধিত হয়েছিল, সে সম্পর্কে ড. নলিনাক্ষ দত্ত বলেছেন, "The part played by woman in the spread of Buddhism cannot be ignored or brushed aside as of little importance." [৪১]

মাতা গৌতমীকে বুদ্ধদেব আদর্শ সন্ন্যাসিনীদের জীবনযাপন প্রণালী সম্পর্কে যে-সব উপদেশ দিয়েছিলেন তা হল—তৃষ্ণা পরিহার করতে হবে। অল্পতে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। বৃথা আমোদপ্রমোদ থেকে দূরে নির্জনে ধ্যান ধারণা করতে হবে। ধর্মপালন করতে হবে নিষ্ঠা সহকারে। আলস্য ত্যাগ করে শ্রমশীলা হতে হবে। অভিমান পরিত্যাগ করে সুশীলা বিনয়ী ও নম্র হতে হবে। সকলের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে সন্তোষের সঙ্গে জীবনযাপন করতে হবে। এগুলিকে বৌদ্ধ তপস্বিনীদের অবশ্য কর্তব্য বলে নির্দেশ দিয়েছিলেন বুদ্ধদেব।[৪২]

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

প্রাচীন বৈদিক, সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃত সাহিত্যে নারী

ভারতীয় সাহিত্যের ধারাটি প্রচীন কাল থেকে বৈদিক, সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, অপভ্রংশ, অবহট্‌ঠ প্রভৃতি নানা ভাষার খাতের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এসে, অবশেষে বিলীন হয়েছে আধুনিক কালের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার প্রবাহে। স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে প্রতিভা নিহিত থাকে মানুষের অন্তরে— একথা 'কাব্যমীমাংসা-কার' রাজশেখর নিঃসংশয়ে ঘোষণা করে গিয়েছেন—

"পুরুষ বদ্যোষিতেঽপি কবী ভবেয়ুঃ।
সংস্কারো হ্যাত্মনি সমবৈতি নস্ত্রৈণং
পুরুষং বা বিভাগমপেক্ষতে।"

ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির উষাকাল থেকে কত কত প্রতিভাশালী কবির আবির্ভাব ঘটেছে, তার ইয়ত্তা নেই। অনেকের নাম হয়তো হারিয়ে গেছে। তবু যে-সব নাম আজও বেঁচে আছে— বাল্মীকি, ব্যাসদেব, অশ্বঘোষ, কালিদাস, ভাস, ভবভূতি, ভারবি, মাঘ, বাণভট্ট— এমনি করে নানা নামের মালা গাঁথা যায় ইচ্ছা করলে। অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, পুরুষ কবি ও সাহিত্যিকদের পাশাপাশি, সংখ্যায় নগণ্য হলেও, নারী কবিরাও রেখে গেছেন তাঁদের কবিত্ব শক্তি ও বুদ্ধিবৈদগ্ধ্যের কিছু পরিচয়। বৈদিক যুগের উদার উন্মুক্ত পরিবেশে নারী সমাজের রূপটি যেমন ছিল উজ্জ্বল, তেমনি সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তাঁরা স্বাতন্ত্র্যের মহিমায় মহিমান্বিত হয়ে আছেন।

বৈদিক সাহিত্যে নারী

সেকালে ভারতীয় জীবনাদর্শের মধ্যে শিক্ষার সর্বোচ্চ আদর্শটি ছিল আত্মোপলব্ধির সাধনা। সে যুগের শিক্ষাধারা ছিল সর্বাঙ্গীণ মানসিক বিকাশের সহায়ক। বাস্তব প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে ছিল সেকালের অধ্যাত্মজীবন। এক্ষেত্রে নারীরা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। পরাবিদ্যা ও অপরাবিদ্যা দুই-ই তাঁরা আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন, তার প্রমাণ রয়েছে বেদ ও উপনিষদের মধ্যে। বেদ ও উপনিষদের অন্তর্ভুক্ত নারী-ঋষিদের রচিত সূক্তগুলি তার প্রমাণ দেবে। দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে মিশে আছে সাহিত্যগুণসম্পন্ন আন্তরিক অনুভূতির গভীরতা ও রচনাচাতুর্য।

বেদজ্ঞঋষি শৌনক-রচিত "বৃহদ্দেবতা" নামক ঋগ্বেদ বিষয়ক গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৮২, ৮৩ ও ৮৪ -সংখ্যক শ্লোকে সাতাশজন নারীঋষির কথা বলা হয়েছে—

"ঘোষা গোধা বিশ্ববারা অপালোপনিষন্নিষৎ।
ব্রহ্মা জায়া জুহূর্ণাম অগস্ত্যস্যস্বসাদিতিঃ।। ২।৮২

ইন্দ্রাণী চেন্দ্রমাতা চ সরমা রোমশোর্ব্বশী।
লোপমুদ্রাশ্চ নদ্যশ্চযমী নারী চ শশ্বতী।। ২।৮৩
শ্রীর্লাক্ষা সার্পরাজ্ঞীবাক্ শ্রদ্ধামেধা চ দক্ষিণা।
রাত্রীসূর্যা চ সাবিত্রী ব্রহ্মবাদিন্য ঈরিতাঃ।। ২।৮৪

এই ঘোষা, গোধা, বিশ্ববারা, অপালা উপনিষৎ, নিষৎ, ব্রহ্মজায়া, জুহূ, অগস্ত্যসহোদরা, অদিতি, ইন্দ্রাণী, ইন্দ্রমাতা, সরমা, বোমশা, উর্বশী, লোপামুদ্রা, নদী, যমী, শশ্বতী, শ্রী, লাক্ষা, সার্পরাজ্ঞী, বাক্, শ্রদ্ধা, মেধা, দক্ষিণা, রাত্রি ও সূর্যা এঁরা সকলেই ছিলেন ব্রহ্মবাদিনী নারী। সেকালে বিবাহিতা, অবিবাহিতা সকলেরই ব্রহ্মবাদিনী হবার অধিকার ছিল।

বেদমন্ত্র রচয়িত্রী

ঋগ্বেদের যে মন্ত্রগুলি 'দেবীসূক্ত' নামে পরিচিত, সেগুলি হল দশম মণ্ডলের ১২৫ সূক্তেব আটটি ঋক্ (১০।১২৫।১-৮)। এগুলির রচয়িত্রী হলেন অম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাক্। আমাদের দেশে দুর্গা পূজা উপলক্ষে যে চণ্ডীপাঠের রীতি আছে, তার পূর্বে এই দেবীসূক্ত পাঠের রীতিও প্রচলিত আছে। শঙ্করাচার্যকে অদ্বৈতবাদের প্রবক্তা বলা হয়। কিন্তু এই দেবীসূক্তের মধ্যেই প্রথম অদ্বৈতবাদের মূল সূত্রটি ধ্বনিত হয়েছে। বাগ্‌দেবী বলেছেন—

অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।
অহং মিত্রা বরুণোভা বিভার্ম্যহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা।।
(ঋক্. ১০।১২৫।১)[৪৩]

আমি রুদ্রগণের সহিত, বসুগণের সহিত বিচরণ করি, আমি আদিত্যের সহিত এবং বিশ্বদেবগণের সহিত বিচরণ করি। আমি মিত্র ও বরুণ উভয়কে ধারণ করি; আমি ইন্দ্র এবং অগ্নিকে, আমি অশ্বিনীদ্বয়কে (ধারণ করি)।[৪৪]

নারীঋষিদের রচনায় সুন্দর কবিত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক বর্ণনামূলক সূক্ত আছে। যেমন রাত্রি নামক ঋষির রচিত দশম মণ্ডলের ১২৭ সূত্রের আটটি ঋক (১০।১২৭।১-৮) এই জাতীয় বর্ণনামূলক। প্রথমটি হল——

রাত্রী ব্যখ্যদায়তী পুরুত্রা দেব্যক্ষভিঃ।
বিশ্বা অধি শ্রিয়োঽধিত ।।
(ঋক্.১০।১২৭।১)

[আগমনশীলা দেবী রাত্রি বহুদেশ চক্ষুদ্বারা অবলোকন করিলেন। (তিনি) সকল শ্রী ধারণ করিয়াছেন।]

নদী নামক ঋষি তৃতীয় মণ্ডলের ৩৩ সূক্তের ৪,৬,৮ ও ১৫ -সংখ্যক ঋক্-এর রচয়িত্রী। নদী কেমনভাবে ভূমিকে উর্বরা করে দিয়ে সমুদ্রের দিকে ধাবিত হয়, তাঁর বর্ণনায় সেকথা প্রকাশ পেয়েছে।

যমী নামক ঋষির রচিত দশম মণ্ডলের ১৫৪ সূক্তের ১-৫ ঋক্-এর মধ্যে আমরা মৃতের অবস্থার বর্ণনা পাই। পুণ্য কর্ম করলে স্বর্গলাভ হয়, এই তথ্যটি পরিস্ফুট করাই হয়তো এই রচনাটির উদ্দেশ্য।

বৈদিক যুগের মহিলাদের রচনাগুলি লক্ষ করলে দেখা যাবে সর্বত্রই যে তাঁরা উচ্চ দার্শনিকসুলভ মনোভাব ব্যক্ত করেছেন, তা নয়। অনেক রচনাতেই সাধারণ নারী মনের পরিচয় ফুটে উঠেছে। এগুলির মধ্য থেকে আমরা সেকালের সামাজিক জীবনের রীতিনীতি সম্পর্কে অনেক কথা জানতে পারি। ব্রহ্মবাদিনী হয়েও এঁরা কিন্তু সাধারণ নারীজীবনের অনেক কামনা বাসনার কথা জানিয়েছেন সহজ সরল ভঙ্গিতে। মাটির পৃথিবীর সঙ্গে তাঁদের যে ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল, এখানে তার পরিচয় আছে। এঁরা ছিলেন প্রখর বাস্তব-সচেতন কবি। কয়েকটি এই জাতীয় সূক্তের আলোচনা করলেই ধারণাটি স্পষ্ট হবে।

ব্রহ্মবাদিনী ঘোষা ছিলেন কক্ষীবান ঋষির কন্যা। তিনি কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হওয়ায়, তাঁর সময়মতো পতিলাভ ঘটে নি। তাই তিনি স্বর্গবৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের শরণাপন্ন হন। তাঁদের কৃপায় রোগমুক্ত হওয়ায়, তাঁর উদ্দেশ্য সফল হল। সেকালে যৌবন বিবাহই প্রচলিত ছিল, বাল্য বিবাহের রীতি ছিল না। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৩৯ সূক্তের ১-১৪ ঋক্ থেকে আমরা তাই ঘোষা নাম্নী এক অনূঢ়া কন্যার তীব্র বিবাহের আকাঙ্ক্ষার কথা জানতে পারি।

ইয়ং বামহেব শৃণুতং মে অশ্বিনা পুত্রায়েব পিতরা মহ্যং শিক্ষতম্।
অন্যপিরজ্ঞা অসজাত্যা মতিঃপুরা তস্যা অভিশস্তেরব স্পৃতম্॥

[আমি তোমাদের আহ্বান করি। হে অশ্বিনীদ্বয়। আমার প্রার্থনা শ্রবণ করো, মাতা পিতা যেরূপ পুত্রকে ধন দান করেন, সেরূপ তোমরাও আমাকে ধন দান করো। আমি আত্মীয়া বান্ধবহীনা অনাথা রমণী। অনতিবিলম্বে আমাকে এই অভিশাপ হইতে পরিত্রাণ করো।]

সূর্যা ঋষি -সংকলিত ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৮৫ সূক্তে ১-৪৭ টি ঋক-এর মধ্যে বর ও বধূর কল্যাণ কামনা এবং আশীর্বাদ প্রার্থনা করা হয়েছে। এগুলির মধ্যে কোনো কোনোটি খুবই বিখ্যাত ও পরিচিত। বিবাহের মন্ত্রের সঙ্গে এই ঋকগুলির সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। বধূ বরণের মন্ত্রের একটিতে বলা হয়েছে—

সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব সম্রাজ্ঞী শ্বশ্রাং ভব।
ননান্দরি সম্রাজ্ঞীভব সম্রাজ্ঞী অধি দেবৃষু। (ঋক্. ১০।৮৫।৪৬)

(শ্বশুরের সম্রাজ্ঞী হও, শ্বশ্রূর সম্রাজ্ঞী হও, ননন্দার সম্রাজ্ঞী হও, দেবরগণের সম্রাজ্ঞী হও)।

শশ্বতী ছিলেন মহর্ষি অঙ্গিরার কন্যা। প্লয়োগ রাজার পুত্র অসঙ্গ ছিলেন শশ্বতীর স্বামী। অসঙ্গ অভিশাপগ্রস্ত হয়ে, বিকলাঙ্গ হয়েছিলেন। পতিপরায়ণা স্ত্রী, কঠোর তপস্যার দ্বারা স্বামীকে রোগমুক্ত করেন। সেই পতিগতপ্রাণা সাধ্বীর সংকলিত অষ্টম মণ্ডলের প্রথম সূক্তের ৩৪-সংখ্যক ঋক্‌টি হল তাঁর স্বামী স্তুতি।

বৈদিক যুগে বহুবিবাহ প্রথার প্রচলন ছিল। কিন্তু নারীরা সপত্নীর জ্বালা সহ্য করতে প্রস্তুত ছিলেন না। সপত্নী বিদ্বেষ ও সপত্নী পীড়নের মনোভাব এবং সেইসঙ্গে সংসারের উপর প্রভুত্বলাভের কামনা প্রকাশ পেয়েছে ইন্দ্রাণী ও শচীর রচনায়। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৮৬ সুক্তের ১-১৮ -সংখ্যাক ঋক্ এবং দশম মণ্ডলের ১৪৫ সূক্তের ১-৬ -সংখ্যক ঋক্ ইন্দ্রাণীর রচিত। পরবর্তী সূক্তে দেখা যায় যে, এক তীব্র শক্তিশালী ওষধির দ্বারা তিনি সপত্নী পীড়নের জন্য প্রস্তুত হয়েছেন।

ইমাং খনাম্যোষধিং বীরুধং বলবত্তমাম্।
যয়া সপত্নীং বাধতে যয়া সংবিন্দতে পতিম্ ।।

(ঋক্. ১০।১৪৫।১)

(এই অতি বশবর্তী ওষধিলতা আমি উত্তোলন করি, যাহার দ্বারা সপত্নীকে হনন করিতে পাবে, যাহার দ্বারা সে পতিলাভ করে।)

শচী-রচিত দশম মণ্ডলের ১৫৯ সূক্তের ১-৬ -সংখ্যক ঋক্ -এর মধ্যে সপত্নী-জর্জরিত নারীর বিজয় লাভের আনন্দ ব্যক্ত হয়েছে।

সমজৈষমিমা অহং সপত্নীরভিভূবরী।
যথাহমস্য বীরস্য বিরাজানি জনস্য চ।।

(ঋক্. ১০।১৫৯।৬)

(বিজয়িনী আমি ইহাদের (অর্থাৎ সপত্নীগণকে) সম্যগ্‌ভাবে পরাভূত করিয়াছি, যাহাতে আমি এই বীর (ইন্দ্র) ও (তাঁহার) পরিজনবর্গের সম্রাজ্ঞী হইতে পারি।)

অনেকের মতে অবশ্য এই সব মন্ত্রগুলি কিছু পরবর্তী কালের রচনা।

বৈদিক যুগের স্মরণীয়া নারীদের মধ্যে লোপামুদ্রা অন্যতমা। অসাধারণ পতিভক্তি ও ত্যাগের মহিমাই এর কারণ। বিখ্যাত অগস্ত্যমুনি যিনি সমুদ্রপান দ্বারা অসুর বিনাশ করে দেবতাদের সাহায্য করেছিলেন, আবার ইম্বল ও বাতাপি নামে দানবদের বিনষ্ট করেছিলেন, এ ছাড়া বিন্ধ্যপর্বতের গর্ব খর্ব করেছিলেন, তিনিই ছিলেন লোপামুদ্রার স্বামী। অসামান্যা সুন্দরী লোপামুদ্রা বিদর্ভরাজের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। অথচ দরিদ্র স্বামীর গৃহের দারিদ্র্যকে তিনি অনায়াসেই বরণ করে নিতে পেরেছিলেন। কারণ স্বামীসেবাই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র ধর্ম। সর্বক্ষেত্রে তিনি ছিলেন স্বামীর সহগামিনী। সুতরাং স্বামীও তাঁর প্রতি ছিলেন সদাপ্রসন্ন। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১৭৯-সংখ্যাক সুক্তের ১-২ ঋক দুটি লোপামুদ্রার সংকলিত। এখানে পতিভক্তির কথা যেমন আছে, তেমনি আছে সম্ভোগসুখের কথা।

বৃহস্পতিপুত্রী রোমশা বা লোমশা ঋষি, তাঁর স্বামী ভাবয়ব্যের উদ্দেশে যে ঋক্‌টি রচনা করেছেন (১।১২৬।৭), সেখানেও রয়েছে ভোগাসক্তির কথা।

অত্রিমুনির ব্রহ্মবাদিনী দুঃখিনী কন্যা অপালার কথা জানতে পারা যায়, ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডলের ৯১ সূক্তের ১-৭টি ঋক্ থেকে। চর্মরোগে আক্রান্ত হয়ে অপালা স্বামী-কর্তৃক পরিত্যক্ত হন। মনের দুঃখে পিতার আশ্রমেই অবস্থান করেন তিনি। একদিন দেবরাজ ইন্দ্র অপালার মুখ থেকে সোমরস পান করে তৃপ্ত হয়ে তাকে বর দিতে চাইলেন। সে তিনটি প্রার্থনা জানাল, পিতার মস্তক কেশে পূর্ণ হোক, পিতার অনুর্বর শস্যক্ষেত্র শস্যশালিনী হোক এবং চর্মরোগের হাত থেকে সে নিজে মুক্তি লাভ করুক।

আর-একজন স্বামী পরিত্যক্তা নারীর কথা জানা যায় দশম মণ্ডলের ১০৯ সূক্তের ১-৭টি ঋক্-এ। বৃহস্পতি তাঁর সহনশীলা সতী স্ত্রী জুহূকে ত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু সে অপালার মতো অন্যগামিনী হতে পারে নি। ধর্মপত্নীকে ত্যাগ করলে, সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা যায় না, এই সত্য উপলব্ধি করে তাকে পুনর্গ্রহণ করেছিলেন বৃহস্পতি।

বিশ্ববারা ঋগ্বেদের পঞ্চম মণ্ডলের ২৮-সংখ্যক সূক্তে চমৎকার কবিত্বপূর্ণ ভাষায় অগ্নিদেবতার কাছে দাম্পত্য জীবনের সুখ ও সৌভাগ্য কামনা করেছেন-

অগ্নে শর্ধ মহতে সৌভগায় তব দ্যুম্নান্যুত্তমানি সন্তু।
সংজাস্পত্যং সুযমমা কৃণুষ্ব শত্রূয়তামভি তিষ্ঠা মহাংসি॥

(ঋক্. ৫।২৮।৩)

(হে অগ্নি। (আমরা) যাহাতে শোভন ধনলাভে সমর্থ হই; তজ্জন্য তুমি (আমাদের) শত্রুগণকে বিনাশ করো। তোমার ধনসমূহ উৎকর্ষ লাভ করুক। দাম্পত্য সম্বন্ধ সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রিত করো। শত্রুর তেজ পরাভূত করো।)

বসুক্রপত্নীর ইন্দ্রস্তুতির মধ্যে (দশম মণ্ডলের ২৮- সংখ্যক সূক্তের প্রথম ঋক্) দেখতেপাওয়া যায়, শ্রদ্ধাশীলা পুত্রবধূকে। অদিতি-রচিত চতুর্থ মণ্ডলের ১৮ সূক্তের ৪-৭ ঋক্-এ পুত্রগর্বে গরবিনী মায়ের মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে।

এই রচনাগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, যদিও তাঁরা ঋষি ছিলেন, তবুও পার্থিব প্রেমকে তাঁরা উপেক্ষা করতেন না। বিবাহিত জীবনের সুখ ও শান্তি তাঁরা কামনা করতেন। অসংকোচে তাঁরা সেই জাতীয় মনোভাবকে ব্যক্ত করেছেন। নারী মনের বিচিত্র কামনা-বাসনাকে তাঁরা ফুটিয়ে তুলেছেন। ইন্দ্রের দূতীরূপে সরমাকে (দশম মণ্ডলের ১০৮ সূক্তের ২।৪।৬।৮।১০।১১ ঋক্) অত্যন্ত দৃঢ় মনের অধিকারিণীরূপে দেখা যায়। কোনো প্রলোভনেই তিনি প্রলোভিত হন না। উর্বশীর উক্তিতে (দশম মণ্ডলের ৯৫ সূক্তের ২।৪।৫।৭।১১।১৩।।১৫।১৬।১৮ ঋক্) পুরূরবার সঙ্গে তাঁর মিলন বিচ্ছিন্ন বিদায় বেদনার সুর করুণভাবে ধ্বনিত হয়েছে। যম ও যমী যমজ ভাই বোন। যমীর উক্তিতে (দশম মণ্ডলের ১৫৪ সূক্তে ১।৩।৫।৭।৯।১৩ ঋক্) রয়েছে অসংগত প্রস্তাব। যমের কাছে তিনি আলিঙ্গন দানের প্রস্তাব করেছেন, যম তা প্রত্যাখ্যান করেছেন।

বাস্তবভিত্তিক বিষয়বস্তু নিয়ে রচিত রচনাগুলি ছাড়াও কিছু স্তবস্তুতিমূলক রচনা পাওয়া যায়। যেমন গোধা-রচিত ইন্দ্রস্তব (১০।১৩৪।৬,৭); সার্পরাজ্ঞী-রচিত সূর্যের স্তব (১০।১৮৯।১,২,৩); শ্রদ্ধা-রচিত শ্রদ্ধাদেবীর স্তুতি (১০।১৫১।১-৫), দক্ষিণা-রচিত দক্ষিণাস্তব (১০।১০৭।১-১১)।

ঔপনিষদিকযুগের নারী কবি

বেদের পর এল উপনিষদের যুগ। এই সময়ে যে- সব বিদুষী ও কবিত্বশক্তিসম্পন্না নারীর আবির্ভাব ঘটেছিল, তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে নাম করা যেতে পারে মৈত্রেয়ী ও গার্গী বাচক্লবীর। এঁরা ভিন্ন আরও অনেকে ছিলেন— বধ্রিমতী, দেবাহুতি, রাজ্ঞী, শশীয়সী, ইন্দ্রসেনা প্রভৃতি।

মৈত্রেয়ী ছিলেন মিত্র নামক পণ্ডিতের কন্যা। অত্যন্ত যত্নসহকারে শিক্ষা দান করে পিতা তাঁকে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের সঙ্গে বিবাহ দেন। 'বৃহদারণ্যক' উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণের প্রথম মন্ত্রে আছে যাজ্ঞবল্ক্য ও মৈত্রেয়ীর কথোপকথন। এখানে তাঁর অনন্যসাধারণ মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। বিখ্যাত তাঁর সেই উক্তি— যাজ্ঞবল্ক্য যখন সংসার ত্যাগের বাসনা জানিয়ে তাঁর পত্নীদ্বয়কে পার্থিব সম্পদ দিতে চাইলেন, তখন অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় ও দৃঢ় কণ্ঠে মৈত্রেয়ী তাঁর অভিমত প্রকাশ করলেন—

> 'সা হোবাচ মৈত্রেয়ী যে নাহং নামৃতাস্যাম্
> কিমহং তেন কুর্যাং য দেব ভগবান
> বেদ তদেব মে ব্রুহীতি।' (২।৪।৩)

—যার দ্বারা আমি অমর হব না, তা নিয়ে আমি কী করব ? যা থেকে অমরতা লাভ হয়, কেবল তাই বলুন। তিনি ছিলেন যাজ্ঞবল্ক্যের যোগ্য জীবনসঙ্গিনী।

বচক্লু ঋষির কন্যা বলেই গার্গী বাচক্লবী বলেও পরিচিত ছিলেন। ইনি অসাধারণ জ্ঞানের অধিকারিণী ছিলেন তাই যাজ্ঞবল্ক্যের মতো পণ্ডিতের সঙ্গে নির্ভীক ভাবে আলোচনায় প্রবৃত্ত হতেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের ষষ্ঠ ব্রাহ্মণ অধ্যায়ে গার্গী ও যাজ্ঞবল্ক্যের কথোপকথন আছে। রাজা জনক তাঁর শাস্ত্র আলোচনা সভায় পুরুষ ও নারী উভয়কেই আমন্ত্রণ জানাতেন। এক সহস্র ধেনু ও সুবর্ণ দান করার জন্য যখন তিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের অনুসন্ধান করছিলেন, তখন যাজ্ঞবল্ক্য এগিয়ে এলেন। সেই দান গ্রহণের জন্য তিনিই যোগ্যব্যক্তি কি না, কয়েকটি প্রশ্নের মাধ্যমে তার পরীক্ষা নিলেন গার্গী। এই প্রশ্ন-গুলির মধ্যেই রয়েছে তাঁর জ্ঞান ও প্রখর বুদ্ধিমত্তার পরিচয়।

উপনিষদের পরবর্তীকালেও অনেক বিদুষী ও গুণবতী নারীর আবির্ভাব ঘটেছিল যেমন— মদালসা, সুলভা, আত্রেয়ী প্রভৃতি। নানাবিধ বিদ্যা ও শিল্প -চর্চাতে তাঁরা পটু ছিলেন। স্মৃতির যুগ থেকেই নারীরা অনেক অধিকার থেকে বিচ্যুত হলেন। তাঁদের মধ্যেও অনেক নারী ছিলেন ব্যতিক্রম।

সংস্কৃত কাব্যভাণ্ডারে নারী কবির রচনা

বিপুল সংস্কৃত সাহিত্য ভাণ্ডারে মহিলা কবিদের রচিত কয়েকখানি কাব্যগ্রন্থ এবং কোষ-কাব্যগুলিতে কিছু প্রকীর্ণ কবিতার সন্ধান পাওয়া যায়। কালিদাসোত্তর যুগে সংস্কৃতে প্রকীর্ণ বা খণ্ড কবিতা লেখার প্রবল প্রবণতা দেখা যায়। মহিলা কবিদের মধ্যে এই সময় শীলা ভট্টারিকা, বিজ্জলা বা বিজ্জা, মারুলা বা মৌরিল্যা, মৌরিকা প্রভৃতি কবি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় পরবর্তীকালে রচিত 'শার্ঙ্গধর পদ্ধতি'র (আনুমানিক ১৩৬৩ খ্রীস্টাব্দে) একটি শ্লোকের মধ্যে :

'শীলাবিজ্জা মারুলামৌরিকাদ্যাঃ
কাব্যং কর্তুং সন্তি বিজ্ঞাঃ স্ত্রিয়ৌঽপি।
বিদ্যাং বেত্তুং বাদিনো নির্বিজেতুং
বিশ্বংবক্তুং যঃ প্রবীণঃ স বন্দ্যঃ।'

(শ্লোক নং ১৬৩)

সেকালের একজন বিখ্যাত কবি-নাট্যকার ও আলংকারিক রাজশেখর মহিলা কবিদের প্রচুর প্রশংসা ও স্তুতিবাদ করেছেন। শীলা ভট্টারিকা 'পাঞ্চালীরীতি'তে কাব্য বচনায় সিদ্ধ- হস্তা ছিলেন। ভাব ও ভাষার প্রতি সমান গুরুত্ব আরোপ করাই ছিল পাঞ্চালী রীতির বৈশিষ্ট্য। শীলা ভট্টারিকা -রচিত একটি কবিতা শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। শ্রীকৃষ্ণদাস-রচিত 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে তার পরিচয় পাওয়া যাবে। কবিতাটি হল—-

'যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা
এব চৈত্রক্ষপাস্তেচোমীলিত
মালতী সুর ভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বনিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরত ব্যাপার
লীলা বিধৌ রেবারোধসি
বেতসী তরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে।

(কাব্য প্রকাশ ৪।১)

যিনি (আমার) কুমারী জীবনের প্রথম প্রেমিক, তিনিই (আমার) স্বামী (রূপে উপস্থিত আছেন)। সেই একই চৈত্র রজনী (সমুপগতা)। প্রস্ফুটিত মালতী পুষ্পের সুগন্ধযুক্ত সেই একই প্রবল বায়ু কদম্ববৃক্ষের মধ্য দিয়া (প্রবাহিত হইতেছে)। আমিও সেই একই রহিয়াছি। তথাপি রেবাতীরে বেতসীতরুতলে গোপন প্রেমলীলার জন্য চিত্ত উৎকণ্ঠিত হইতেছে।

(ড. রমা চৌধুরী কর্তৃক অনূদিত)

'সূক্তি মুক্তাবলী'তে (আনুমানিক ১২৫৭ খ্রীস্টাব্দ) অন্যতম বিখ্যাত মহিলা কবি বিকট

নিতম্বা সম্পর্কে বলা হয়েছে—

'কে বৈকট নিতম্বেন গিরাং গুম্ফেন রঞ্জিতাঃ।
নিন্দন্তি নিজকান্তানাং ন মৌগ্ধ্য-মধুরং বচঃ॥

(সূক্তিমুক্তাবলী)

গুর্জরদেশীয়া প্রভুদেবী প্রেমের কবিতা রচনায় নিপুণ ছিলেন। বিজয়াঙ্কা নামে এক মহিলা কবি সম্পর্কে রাজশেখর বলেছেন—

'সরস্বতীব কার্ণাটী বিজয়াঙ্কা জয়ত্যসৌ।
যা বৈদর্ভ গিরাং বাসঃ কালিদাসাদনন্তরম্॥' (সূক্তিমুক্তাবলী)

নারী কবিদের সম্বন্ধে এত প্রশস্তি রচিত হয়েছিল দেখে অনুমান করা যায় যে, সারস্বত সমাজে সেকালে পুরুষ কবিদের পাশে তাঁদেরও একটা বেশ সম্মানজনক স্থান ছিল। উল্লেখযোগ্য মহিলা কবিদের প্রত্যেকের রচিত স্বতন্ত্র গ্রন্থ পাওয়া যায় নি। কিন্তু কোষকাব্যে এবং স্তোত্র সংগ্রহে এঁদের রচিত কবিতা পাওয়া যায়। কাব্যের বিষয়বস্তুরূপে তাঁরা ধর্ম-দর্শন থেকে শুরু করে, অত্যন্ত সাধারণ তুচ্ছ বিষয়কে গ্রহণ করেছেন অনায়াসে। তার মধ্যে মানুষ, পশুপাখি, গাছপালা, ফুল, ঋতুরঙ্গ ইত্যাদি বিষয় তো আছেই, তার উপর পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক বিষয়ের উপর রচিত আখ্যায়িকামূলক কাব্যের সন্ধানও পাওয়া যায়। প্রেমের কবিতা রচনায় এঁদের যথেষ্ট আগ্রহ দেখতে পাওয়া যায়। এঁরা নানা ধরণের নায়িকা ও নায়কের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। বৈধপ্রেম, অবৈধপ্রেম, এমন-কি স্থূল বা দৈহিক প্রেমের নগ্নচিত্র ফুটিয়ে তুলতেও অনেকে কুণ্ঠিত হন নি। কোনো কোনো মহিলা কবি নারীদেহের পুংখানুপুংখ বর্ণনায় অত্যন্ত মনোযোগ দিয়েছেন। কয়েকজন মহিলা কবি রাজ-পৃষ্ঠপোষকতায় কাব্যচর্চা করতেন, তার স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়।

তুলনামূলকভাবে আলোচনা করলে বৈদিকযুগের নারী ঋষিদের কবিতার সঙ্গে, পরবর্তীকালের সংস্কৃত মহিলা কবিদের রচনার কিছু কিছু পার্থক্য চোখে পড়ে। নারী ঋষিরা অধিকাংশ সময়ে বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য বা বিষয় নিয়ে কবিতা বা সূক্ত রচনা করেছেন। কিন্তু পরবর্তীকালের নারী কবিরা, নিজেদের মনের খেয়াল-খুশি অনুযায়ী সহজ ও স্বাধীন ভঙ্গিতে, স্বাভাবিক ভাষায় কবিতা রচনা করেছেন। সংস্কৃত প্রকীর্ণ কবিতার ধারা অনুসরণ করলে, বিভিন্ন কোষকাব্য গ্রন্থে প্রায় চল্লিশজন মহিলা কবির রচিত খণ্ড কবিতার সন্ধান পাওয়া যায়। মোটামুটি উল্লেখযোগ্য নামগুলির একটি তালিকা এখানে দেওয়া যেতে পারে— ইন্দুলেখা, কুটলা, কেরলী, গন্ধদীপিকা, গৌরী, চন্দ্রকান্তাভিক্ষুণী, চণ্ডালবিদ্যা, চিন্নম্মা, জঘন চপলা, ত্রিভুবন সরস্বতী, মাগম্মা, পদ্মাবতী, মদিরেক্ষণা, রাজকন্যা, রসবতীপ্রিয়ম্বদা, ফল্গুহস্তিনী, ভাবদেবী, মদালসা, মধুরবর্ণী, লক্ষ্মী, বিদ্যাবতী, সরস্বতী, সীতা প্রভৃতি।[৪৫] এ ছাড়া অনেক 'অনামী' রচয়িত্রীর রচনাও সংকলন গ্রন্থে স্থান লাভ করেছে। অনেকে আবার ছদ্মনামে কবিতা রচনা করেছেন। উপরোক্ত তালিকাটিতে স্বনাম ছাড়াও, একাধিক ছদ্মনাম রয়েছে বলে মনে হয়।

পালি সাহিত্যে মহিলা কবি—'থেরী গাথা'

'থেরী গাথা' নামক গ্রন্থটি আমাদের প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের একটি মূল্যবান সম্পদ। পালিভাষা ছিল প্রাচীন মগধ অঞ্চলের কথ্য ভাষা। 'ত্রিপিটক' রচিত হয়েছে এই পালি ভাষায় যে গ্রন্থকে বলা হয় 'বৌদ্ধবেদ'। তার কারণ বৌদ্ধ ধর্মের মূলনীতি, দর্শন ও ইতিহাস এই গ্রন্থে নিহিত আছে। 'থেরীগাথা' হল 'ত্রিপিটকে'র দ্বিতীয় গ্রন্থ 'সূত্তপিটক'-এর মধ্যে 'খুদ্দক-নিকায়'-এর অন্তর্ভুক্ত। খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যে কাঞ্চনপুরের অধিবাসী থের ধম্মপাল এই 'থেরীগাথা'র একটি টীকাগ্রন্থ রচনা করেন– 'পরমত্থদীপনী' নামে।

ব্রহ্মবাদিনী নারীরা যেমন তাদের সাহিত্যচর্চার নিদর্শন রেখে গেছেন বেদ-উপনিষদের মধ্যে; তেমনি পালিভাষায় রচিত 'থেরী গাথা' কাব্যগ্রন্থটি, তিয়াত্তর জন পবিত্রমনা বৌদ্ধ সিদ্ধা নারীর কাব্যপ্রতিভা, পাণ্ডিত্য ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের পরিচয় দেয়। আজ থেকে সার্ধদিসহস্র বৎসরেরও আগে এগুলি রচিত হয়েছিল। আপাতদৃষ্টিতে এর সাহিত্যিক মূল্য খুব বেশি আছে বলে মনে না হলেও, এর তাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক মূল্য কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। 'থেরী' শব্দটির অর্থ হল স্থবিরা বা জ্ঞানবৃদ্ধা। নবধর্ম গ্রহণ করে এই সব নারীরা কীভাবে নিজেদের ধন্য মনে করেছিলেন, তার পরিচয় ফুটে উঠেছে তাঁদের রচিত কবিতার ছত্রে ছত্রে। এই সব রচনায় নিহিত আছে তাঁদের জীবনচরিত ও জীবনদর্শন। তাঁদের সম্পর্কে ড. নলিনাক্ষ দত্ত মহাশয় বলেছেন—"কাব্যজগতে 'থেরী গাথা'র স্থান অতি উচ্চে, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। অন্তরের গভীর আবেগই হইতেছে কাব্যসৃষ্টির মূল। সংসার- তাপদগ্ধ দুঃখজর্জরিত থেরীগণ তথাগত বুদ্ধের নির্দেশিত পথ অনুসরণকরত যে অপূর্ব শান্তি ও পরমানন্দের আস্বাদ পাইয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিলেন, গাথাগুলির দ্বারা কবি তাহাই অভিব্যক্ত করিয়াছেন। সংসার জীবনে বৈরাগ্য প্রচার করাই 'থের-থেরীগাথা'র প্রধান উদ্দেশ্য, আর তাহার সহিত আছে মূল বৌদ্ধধর্মের গভীর সম্পর্ক।"[৪৬]

কয়েকজন থেরীর রচনা থেকে কিছু উজ্জ্বল নিদর্শন এখানে উদাহরণ হিসাবে দেওয়া হল। মহাপ্রজাপতী গোতমী রচিত 'ষড়শ্লোকাত্মক' গীতি। (মায়াদেবীর মৃত্যুর পর ইনি রাজা শুদ্ধোধনের 'অগ্‌গমহিষী' বা 'মহাপ্রজাপতী' অর্থাৎ পাটরানী হন। এঁরই অনুরোধে অবশেষে বুদ্ধদেব স্ত্রী জাতিকে সন্ন্যাস গ্রহণের অনুমতি দিলেন। এইভাবে বৌদ্ধ যুগে সন্ন্যাস ধর্মে নারী জাতির অধিকার প্রতিষ্ঠিত হল।)

বুদ্ধবীর নমোত্যত্থু সব্বসত্তানমুত্তম্।
যে মং দুক্‌খ পমোচেসিঅঞ্‌ঞঞ্চবহুকংজনম ১৫৭
সব্বদুক্‌খং পরিঞ্ঞাতং হেতুতণ্‌হা বিসোসিতা।
অরিয়ট্‌ঠঙ্গিয়ো মগ্‌গো নিরোধা ফুসিতো ময়া।। ১৫৮
মাতাপুত্তোপিতাভাতা আয়্যিকা চপুরে অহুং।

যথাভুচ্চম জানন্তী সংসরিহং অনিব্বিসং॥ ১৫৯
দিট্‌ঠো হি মে সো ভগবা অন্তিমোয়ং সমুস্‌সয়ো।
ভিখ্‌খীণো জাতি সংসারো নত্থি দানিপুনব্‌ভবো॥ ১৬০
আরদ্ধ বিরিয়ে পহিতত্তে নিচ্চংদল্‌হপরক্কমে।
সমগ্‌গে সাবকে পস্‌স এসাবুদ্ধান বন্দনা ॥ ১৬১
বাহূনং বত অত্থায় মায়া জনয়ি গোতমং।
ব্যাধি মরণতুন্নানং দুক্‌খক্‌খন্ধং ব্যপানুদি॥ ১৬২

উপরোক্ত শ্লোকগুলির কাব্যানুবাদ (ষষ্ঠ সর্গ-ষড়শ্লোকাত্মকগীতি)—

'বুদ্ধবীর! নমি আমি; তুমি সর্ব সত্তা শ্রেষ্ঠতম;
এড়াইল দুঃখজ্বালা কত শত দুঃখী মোর সম।
দুঃখের নিদান জানি তৃষ্ণা মোর শুকায়েছে প্রাণে,
অষ্টাঙ্গিকে শ্রেষ্ঠ মার্গ লভিয়াছি তব দত্ত জ্ঞানে।
মাতাপুত্র পিতা ভ্রাতা অজ্জিকা রূপেতে ঘরে ঘরে,
না জানিয়া সত্যধর্ম বিচরিনু জন্মজন্মান্তরে।
হেরিলাম ভগবানে; এই মোর অন্তিম জনম,
ছিঁড়েছে সংসার গ্রন্থি, পুনর্জন্মজীবের করম।
দৃঢ় পরাক্রমে সবে সাধু পথে করে বিচরণ,
জীবনে সাধুতা লাভ, শ্রেষ্ঠতম বুদ্ধের বন্দন।
লোকহিত তরে মায়া জন্ম দিল তোমারে গোতম,
হরিয়াছ দুঃখ, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, শোকের রোদন।

(কবি বিজয়রত্ন মজুমদার কর্তৃক অনূদিত-'থেরীগাথা')

আনোপমা (অনুপমা)-রচিত ষড়শ্লোকাত্মক গীতি

(অনুপমা ছিলেন সাকেত নগরের এক শ্রেষ্ঠী কন্যা। ইনি অসাধারণ রূপসী ছিলেন। অনেক ধনী ব্যক্তি তাঁর প্রণয়প্রার্থী ছিলেন। কিন্তু তাঁর মনে হল, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ পাত্রকেই জীবনে বরণ করবেন। তাই ভগবান বুদ্ধের চরণে স্মরণ নিলেন তিনি।)

উচ্চে কূলে অহংজাতা বহুবিত্তে মহদ্ধনে।
বন্নরূপেন সম্পন্না ধীতা মজ্‌ঝপ্‌স অত্তজা ॥ ১৫১
পত্থিতা রাজপুত্তেহি সেট্‌ঠিপুত্তেহি গিজ্‌ঝিতা।
পিতু মে পেসয়ি দূতং দেথমহ্যং আনোপমাং ॥ ১৫২
যত্তকং তুলিতা এসা তুহ্যং ধীতা আনোপমা।
ততো অট্‌ঠগুণং দস্‌সং হিরঞ্‌ঞংরতনানি চ ॥ ১৫৩

সাহং দিস্বান সম্বুদ্ধং লোক জেট্‌ঠং অনুত্তরং।
তস্‌স পাদানি বন্দিত্বা একমন্তং উপাবিসিং ॥ ১৫৪
সো মে ধম্ম ম দেসেসি অনুকমপায় গোতামা।
নিসিন্না আসনে তস্মিং ফুসয়িং ততিয়ং ফলং॥ ১৫৫
ততো কে সানি ছেত্বান পব্বজিং অনগারিয়ং।
সাজ্জ মে সত্তমী রত্তি যতো তণহা বিসোসিতা ॥ ১৫৬

(ষষ্ঠ অধ্যায়)

অনুবাদ :

উচ্চকুলে জন্ম মম; বহুবিত্ত রূপবর্ণযুক্তা।
মঞ্জা নামে মহাধনী সুবিখ্যাত শ্রেষ্ঠীবর সুতা ॥
লভিতে আমারে কত রাজপুত্র শ্রেষ্ঠীপুত্রগণ
পাঠাত পিতার কাছে দূতবর্গ করিয়া যতন।
"যতেক হিরণ্যে রত্নে অনুপমা হইবে তুলিত,
দিব আটগুণ তার" দূত আসি এমনি বলিত।
কিন্তু হেরি লোক জ্যেষ্ঠে উদ্বুদ্ধ হইল মম প্রাণ,
বন্দিয়া চরণ তাঁর বিজনে ধেয়ানে বসিলাম।
অনুকম্পা করি মোরে ধর্মশিক্ষা দিলেন গোতম।
আসনে বসিয়া আমি লভিলাম ফল মনোরম।
ছেদিয়া কেশের ভার অনাগার লভিনু অমনি;
তৃষাক্ষয় দিন হতে আজি হল সপ্তম রজনী।

(কবি বিজয়রত্ন মজুমদার কৃত অনুবাদ)

সুমনা-রচিত এক শ্লোকত্মক গীতি। (প্রথমসর্গ)

(ইনি প্রায় শেষ জীবনে স্বামীর উৎপীড়নে উত্যক্ত হয়ে এবং সন্তানদের দুঃখে অভিভূত হয়ে, সংসার ত্যাগ ও সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।)

ধাতুয়ো দুক্‌খতো দিস্বামা জাতি পুনরাগমি।
ভবে ছন্দম্ বিবাজেত্ব উপসন্তা চরিস্‌সসি ॥

(১৬ প্রথম অধ্যায়)

অনুবাদ :

দুঃখময় এ জীবন জানিয়া কে জন্ম চাহে ফিরে ?
ত্যাজি জন্মান্তর-তৃষ্ণা শান্ত চিতে বিচর গো ধীরে।

(কবি বিজয়রত্ন মজুমদার-অনূদিত)

পটচারা-রচিত পঞ্চশ্লোকাত্মক গীতি

(এই নারী শ্রাবস্তী নগরীর এক শ্রেষ্ঠীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। বিবাহের উপযুক্ত বয়স হলে, পিতামাতা তাঁকে একটি উপযুক্ত পাত্রের হাতে সমর্পণ করতে চাইলেন। কিন্তু ইনি গৃহে নিযুক্ত এক পরিচারকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করেন ও প্রণয়ীর সঙ্গে গৃহত্যাগ করেন। জীবনে একে একে বহু দুঃখ ও শোক তাপ উপস্থিত হল। শেষ পর্যন্ত তিনি উন্মাদিনী হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। বাহ্যজ্ঞানশূন্যা এই নারীর পরিধেয় বস্ত্রটি পর্যন্ত কটিচ্যুত হয়েছিল। সৌভাগ্যক্রমে ইনি একদিন ভগবান বুদ্ধের দর্শন লাভ করলেন। তাঁর উপদেশে সম্বিত ফিরে পেয়ে, এই নারী উপযুক্ত সাধনার দ্বারা মুক্তির পথও খুঁজে পেলেন।

বৌদ্ধ ভিক্ষুণী হবার পূর্বে, এর নাম কী ছিল, জানা যায় না। তবে প্রথমে পতিতা ও পরে আচারসম্পন্না হলেন বলেই এঁকে 'পটচারা' (পট = পট্ট+আচরা) নামে অভিহিত করা হয়। এই নামেই তিনি আজ পরিচিতা।)

নঙ্গলেহি কসং খেত্তং বীজানি পবণং ছমা।
পুত্তদারানি পোসেন্তা ধনং বিন্দন্তি মানবা ॥ ১১২
কিমহং সীলসম্পন্না সত্থু সাসনকারিকা।
নিব্বানং নাধিগচ্ছামি অকুসীতা অনুদ্ধটা॥ ১১৩
পাদে পক্খালয়িত্বান উদকে সু করোমহং।
পাদোদকঞ্চ চ দিস্বান থলতো নিন্নমাগতং।
ততো চিত্তং সামাধেমি অস্সং ভদ্রংব জানিয়ং॥ ১১৪
ততো দীপং গহেত্বান বিহারং পাবিসি অহং।
সে য্যং ওলোকয়িত্বান মঞ্চকম্হি উপাবিসিং ॥ ১১৫
ততো সূচিং গহেত্বান বট্টিং ওকস্সয়ামহং।
পদীপস্সেব নিব্বানং বিমোক্খো অহুচেত সো॥ ১১৬

(পঞ্চম অধ্যায়)

অনুবাদ :

স্ত্রীপুত্র পালন হেতু সযতনে শস্য লাভ তরে,
লাঙ্গলে চষিয়া ক্ষেত্র, কত শ্রমে বীজ বোনে নরে।
শীলধর্ম সুদীক্ষিতা, বুদ্ধের শাসন মানি চিতে,
আমার আলস্য তবে কেন এত, নির্বাণ লভিতে ?
একদা পা-ধোয়া জল নীচু দিকে বহি গেল দ্রুত;
সেদিন শাসিনু চিত্ত, অশ্ব যথা করে বশীভূত।
প্রদীপটি নিয়ে শেষে প্রবেশিনু শুইবার ঘরে,

খাটে বসি দীপশিখা লক্ষ্য আমি করিলাম পরে।
সূচ দিয়া সলিতাটি টেনে আমি দিলাম ডুবায়ে—
নিভিল দীপের শিখা ! লভিলাম মুক্তি সে উপায়ে।

(অনুবাদক : কবি বিজয়রত্ন মজুমদার)

সোমা -রচিত ত্রিশ্লোকাত্মকগীতি

(ইনি ছিলেন রাজা বিম্বিসারের পুরোহিত কন্যা। তাঁরা বাস করতেন শ্রাবস্তী নগরীতে। তার কারণ শ্রাবস্তী ছিল তখন উত্তরকোশলের রাজধানী। অল্প বয়সেই সোমার সাহিত্য- প্রতিভার বিকাশ ঘটে। শৈশব থেকে ধর্মশাস্ত্র আলোচনা করতে করতে, তাঁর মনে সংসারের প্রতি বৈরাগ্য জন্মায়। তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন।

যে গাথাটি এখানে দেওয়া হল, তার মধ্যে আছে উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক নাটকীয় রীতি। কবির আত্মোপলব্ধোগত সত্য এই গীতিকবিতায় সুন্দর ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। নিশীথরাত্রে নির্জন উপবনে সোমা ধ্যানরত। এমন সময় 'মার' তাঁকে ভয় দেখাল। নির্ভীক সোমা তার যথাযথ উত্তর দিলেন এবং তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করলেন।

কবিত্বপূর্ণ এই কথোপকথনের মধ্যে যে বিশেষ তত্ত্বটি প্রকাশ পেয়েছে তা হল বৌদ্ধ যুগে নারীরা ছিলেন পুরুষের সমকক্ষ। মার এখানে নারীবুদ্ধিকে ব্যঙ্গ করে বলেছে, যারা ভাত রান্নায় নিযুক্ত থাকে, সেই গৃহকর্মের উপযোগী বুদ্ধি নিয়ে নির্বাণ লাভ করা অসম্ভব ইত্যাদি। পরে সে সোমার কাছে পরাজিত হয়ে পলায়ন করেছে।)

যং তং ইসী হি পত্তব্বং ঠানং দুরভি সম্ভবম্।
ন তং দ্বঙ্গুলিপঞ্ঞায় সক্কা পপ্পোতুথিখিয়া। ৬০
ইথি ভাবোনো কিং কয়িরা চিত্তম্ হি সুসমাহিতে।
ঞার্ণম্হি বত্তমানম্হি সম্মা ধম্মং বিপস্সতো।। ৬১
যস্স নূন সিয়া এবং ইত্থাহং পুরিসো তি বা।
কিঞ্চি বা পন অস্মীতি তং মারো বত্তুমরহতি।। ৬২

(তৃতীয় অধ্যায়)

অনুবাদ :

'মার' সোমাকে বলেছে—

'করিয়ে কঠোর তপ যে পদ করেন লাভ যোগী সিদ্ধগণ,
তুমি নারী কেমনে পাইবে সেই দুর্লভ রতন ?
রাঁধ বাড় চিরকাল তবু হায়! পাকিল না হাত,
টিপিয়া দেখিতে হয় বার বার ফুটিল কি ভাত।'

দৃঢ় স্বরে সোমা উত্তর দিল 'মার'কে—

'নারীজন্ম লভিয়াছি, তাহে কিছু হয় নাই দোষ,

অচল যাহার চিত্ত লভে সে যে অনন্ত সন্তোষ।
সত্যের শিখর লক্ষ্য; কোন বাধা, কোন ভয় নাই,
আপনার শক্তি পরে করিয়া নির্ভর লক্ষ্যপথে চলে যাই।
অর্হৎ যে পথে চলে সেই পথে হব আগুয়ান,
বিষয় বসনা তুচ্ছ, লক্ষ্য তার অনন্ত নির্বাণ।
অবিদ্যার অন্ধকার ঘুচাইব সত্যের আলোকে,
চলে যাব সত্য পথে নিজ মনে অপূর্ব পুলকে।
ওরে রে পাপিষ্ঠ মার, বৃথা ভয় দেখাস্ আমারে,
চিনেছি চিনেছি তোরে দূর হয়ে যা রে একেবারে।
(অনুবাদক : যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত)[৪৭]

প্রাকৃত সাহিত্যে মহিলা কবি— 'গাথাসপ্তশতী'

প্রাকৃতভাষা জনসাধারণের ভাষা— 'প্রাকৃত জনানং ভাষা প্রাকৃতম্'। এককালে এই ভাষা জনসাধারণের স্বাভাবিক মুখের ভাষা ছিল। প্রাকৃত ভাষার মাধুর্য যে দেবভাষা সংস্কৃতকেও অতিক্রম করে যায় সে কথা বলেছিলেন বিখ্যাত আলংকারিক রাজশেখর তাঁর 'কর্পূরমঞ্জরী' গ্রন্থে—

পরুসা সক্কঅবন্ধা পাউঅবন্ধো বি হোই সুউমারো।
পুরুসমহিলাণং জেত্তিয়মিহন্তরং তেত্তিয়মিমাণং ॥ (১।৮)

অর্থাৎ কোমলাঙ্গী রমণীর মতোই প্রাকৃত ভাষা সুকোমল, তার তুলনায় সংস্কৃত ভাষা পুরুষের মতো পরুষ।

প্রাকৃত ভাষাগুলির মধ্যে মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতের মর্যাদাই সবচেয়ে বেশি। 'গাথাসপ্তশতী' একটি অবিস্মরণীয় প্রাচীন প্রাকৃত কাব্যসংকলনগ্রন্থ। গাথাগুলি মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে রচিত। আনুমানিক খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে খণ্ড খণ্ড বা প্রকীর্ণ কবিতা নিয়ে এই কোষকাব্যটি রচিত হয়। কোষকাব্যের বৈশিষ্ট্য হল প্রত্যেকটি গাথা বা শ্লোক পরস্পর নিরপেক্ষ। স্বতন্ত্রভাবে প্রতিটি কবিতার ভাব এবং অর্থ আস্বাদন করা যায়। প্রাকৃত ভাষায় এই কাব্যগ্রন্থের নাম 'গাহাসত্তসই'। সংকলয়িতা হলেন সাতবাহন নরপতি হাল। রাজা হালের সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে বিশেষ কিছু জানা যায় না। অনুমান করা হয় খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দীর কোনো সময়ে তিনি ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে, বর্তমান অন্ধ্রপ্রদেশের গোদাবরী নদীতীরে প্রতিষ্ঠানপুরে রাজত্ব করতেন। তিনি ছিলেন সাতবাহন বংশের সপ্তদশ রাজা। তাঁর রাজত্বকালের স্থায়িত্ব ছিল মাত্র পাঁচ বছর। রাজা হাল নিজে কবি ছিলেন, সেইসঙ্গে ছিলেন কাব্যরসিক। এই কাব্যগ্রন্থটি যে তাঁর একক রচনার নিদর্শন নয় সে কথা তিনি স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন প্রথম শতকের তৃতীয় সংখ্যক গাথাটিতে। তিনি বলেছেন, অলংকারে সুসজ্জিত কোটি কোটি গান লোকমুখে চলে আসছে তার মধ্যে থেকে তিনি মাত্র সাত শত গান গেয়ে গেলেন। এই স্বীকারোক্তিই বলে দেয় যে, তিনি তাঁর

পূর্ববর্তী ও সমসাময়িককালের কবিতা থেকে এই সাতশত গাথা নির্বাচন করেছেন। সাতজন মহিলা কবিসহ, এখানে মোট দুইশত ষাটজন কবির নাম পাওয়া যায়। অবশ্য অনামী ও অজ্ঞাত কবির সংখ্যাও নেহাত কম নয়।

এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত গাথাগুলিতে দক্ষিণ ভারতের বিশেষ একটি অঞ্চলের সমাজ জীবনের বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে। সেইসঙ্গে সেখানকার নারী সমাজ সম্বন্ধেও অনেক কথা জানা যায়। যেমন কয়েকটি গাথায় 'সতীদাহের' কথা আছে (৫।৭, ৫।৪৯, ৭।৩৩)। পর্দা বা অবরোধ প্রথাও ছিল। তবে অভিজাত ঘরের বধূর প্রসঙ্গেই তার উল্লেখ রয়েছে (৬।২৫)। সংসারে গৃহিণীর যথেষ্ট মর্যাদা থাকলেও, সপত্নী নিয়ে অনেক নারীকেই ঘর করতে হত। সতীনজ্বালার কথা আছে একাধিক গাথায় (১।৭৯, ২।৬, ২।৭৩, ৪।৬২, ৪।৮২, ৬।২৮)। মেয়েরা লেখাপড়া জানতেন, কারণ প্রবাসী স্বামী বা প্রিয়জনকে তাঁরা লিপিপ্রেরণ করছেন সে কথা বলা হয়েছে অনেক গাথায় (৩।৪৪, ৬।৭১, ৬।৭৭)। এমনি আরও নানা কথা জানা যায়। তবে সবচেয়ে বিস্ময়ের বিষয় হল, রাজা হাল যখন কাব্য সংকলন করতে বসলেন তখন শুধু পুরুষ কবির লেখা নয়, নারীর রচনাকেও মর্যাদা দিলেন। এর থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় নারীরা সমাজে অপাঙ্‌ক্তেয় ছিলেন না। তাই তাঁরা কেউ কেউ মনের সুখে কাব্যচর্চাতে মনোনিবেশ করতেন। যদিও পুরুষ কবিদের তুলনায় তাঁরা সংখ্যায় নগণ্য।

মহিলা কবিদের লেখায় বাস্তব অনুভূতির কথা অনায়াসভঙ্গিতে প্রকাশ পেয়েছে। প্রেম-বিষয়ক গাথা রচনাতেই তাঁদের বিশেষ আগ্রহ ছিল দেখা যায়। এখানে নারীসুলভ ভাষা- ভঙ্গিও দেখা যায়। সাতজন মহিলা কবির রচনা থেকে কিছু উদাহরণ তুলে দেওয়া যাক :

বদ্ধাবহীএ নামক কবির রচনা প্রথম শতকের সত্তর-সংখ্যক গাথাটি। এখানে দেখা যায় প্রোষিত-ভর্তৃকা কোনো এক প্রিয়বিরহিণীর মনে উৎকণ্ঠা উপস্থিত হওয়ায় তিনি দাবানলের ধোঁয়ায় আবছা হয়ে যাওয়া বিন্ধ্য পর্বতকে মেঘ বলে ভুল করেছেন। কিন্তু সখী এসে তাঁর সেই ভুল ভেঙে দিতে চাইলেন।

গিম্‌হে দবগ্‌গি-মসি-মইলি-আঁই দীসন্তি বিঞ্ঝো-সিহরাইং।
অস্‌সু পাউত্থব্বইএণ হোন্তিণব-পাউসব্‌ ভাইং। (১।৭০)

সসিপহাএ-রচিত গাথায় দেখা যায়, আত্মসমর্পণকারিণী প্রিয়অনুরাগিণীর স্বীকারোক্তি—প্রিয়তম তাঁকে যে ছন্দে নাচাবেন, তিনিও সেই ছন্দেই নাচবেন। ঠিক যেন তরুর বুকে চঞ্চল বায়ুপ্রবাহে আন্দোলিত লতাটি।

জহ জহ বাত্রেই পিত্ত তহ তহ ণচ্চামি চঞ্চলেপেম্মে।
বল্লী বলেই অঙ্গং সহাব-থদ্ধে বিরুকখমি ॥ (৪।৪)

রোহা-এদেখিয়েছেন এক কলহান্তরিতা নায়িকাকে। অপরাধী প্রেমিকের কাছেই তিনি মন প্রাণ সমর্পণ করেছেন। এ যেন সেই অগ্নি যা নগরধ্বংসের কারণ, আবার সেই অগ্নিই

সকলের প্রিয়।

জেণ রিণা ন জিবিজ্জই অণুণিজ্জই সোকআবরাহোবি।
পত্তে বিণঅর দাহে ভণ বাস্সণ বল্লহো অগ্গী ।। (২।৬৩)

অণুলচ্ছীএ তাঁর রচিত একটি গাথায় দেখিয়েছেন— প্রিয়বিরহে নায়িকার জীবনে দশমী দশা উপস্থিত এবং দূতী নায়কের নিকট সেই সংবাদটি বহন করে এনেছে।

জংতুজ্ঝ সঈ জাআঅসঈও জংচ সুহঅ অম্হেবি।
তা কিং ফুট্টউ বীঅংতুজ্ঝ সমাণো জআণত্থি ।। (৩।২৮)

সাতজন মহিলা কবির মধ্যে অণুলচ্ছী বা অসুলব্ধী অর্থাৎ অণুলক্ষ্মীর রচিত ছয়টি গাথা এই সংকলনে স্থান পেয়েছে (২।৭৭; ২।৭৮; ৩।২৮; ৩।৬৩; ৩।৭৪; ৪।৭৬)। এর থেকে অনুমান করা যায় যে সে যুগে তিনি হয়তো একজন প্রতিষ্ঠাসম্পন্না জনপ্রিয় কবি ছিলেন। রেবা নামক কবির রচনা দুইটি (১।৮৭ ; ১।৯০)। অন্যান্যদের রয়েছে একটি করে কবিতা— মাহবী বা মাধবী (১।৯১); প্রহতা বা পৃথিবী (১।৮৬); রোহা (২।৬৩); সসিপ্পাহা বা শশিপ্রভা (৪।৪) ও বদ্ধাবহী (১।৭০)। এই সব কবির ব্যক্তি-পরিচয় চিরকালের মতো কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে।[৪৮]

এ ছাড়া অবন্তি সুন্দরী - রচিত তিনটি প্রাকৃত কবিতা পাওয়া যায় হেমচন্দ্র-রচিত অভিধান ‘দেশী নামমালা’য়। অবন্তি সুন্দরী ছিলেন প্রসিদ্ধ সংস্কৃত কবি ও আলংকারিক রাজশেখরের বিদুষী স্ত্রী।[৪৮]

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মধ্যযুগে ভারতীয় নারী সমাজ ও সংস্কৃতি

ভারতীয় ইতিহাসে মধ্যযুগ বলতে আমরা সাধারণত বুঝে থাকি ১২০০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৮০০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সময় সীমাকে। এই সময় ভারতের শাসন ব্যবস্থা প্রধানত ইসলাম ধর্মাবলম্বী বিদেশী শাসকদের হস্তগত হয়। সেইসঙ্গে নানা কারণে এ সময়ে নারীদের জীবনে নেমে এসেছিল চরম দুর্গতি। ধীরে ধীরে যে-সব সামাজিক নিয়মকানুনের প্রবর্তন ঘটল, যা একান্তভাবে রমণীজীবনে উন্নতির পরিপন্থী। কয়েকটি কুপ্রথা দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত ছিল। এই জাতীয় কয়েকটি হীন প্রথার সামান্য আলোচনা কবা যেতে পারে।

সতীদাহ বা সহমরণ

ঠিক কোন্ সময় থেকে এদেশে সতীদাহ বা সহমরণ এবং অনুমরণ রীতি দেখা গেল, সঠিক ভাবে সে সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। তবে মধ্যযুগে উত্তর পশ্চিম ও পূর্বভারতে ব্যাপকভাবে, এমন-কি দাক্ষিণাত্যের কোনো কোনো অঞ্চলে সতীদাহ প্রথা ছিল। ধর্মের অনুশাসন হিসাবেই শুধু নয়, আত্মমর্যাদা রক্ষা ও গৌরব ঘোষণার জন্যও অনেকে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিতেন। যেমন রাজপুত নারীরা 'জহরব্রত' পালন করতেন-সতীত্ব রক্ষার জন্য। বৈধব্য ঘটলে কোনো কোনো নারীর জীবনে দুঃখ-দুর্দশার সীমা থাকত না, অনশনে, অর্ধাশনে, বা দাসী- বৃত্তি করে, পরের গলগ্রহ হয়ে কোনোক্রমে বেঁচে থাকতে হত। এই সব কারণে অনেকেই স্বেচ্ছায় 'সতী' হতেন।

বাল্যবিবাহ

ভারতের সর্বত্রই যে বাল্য বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল, তা নয়। কিন্তু অধিকাংশ অঞ্চলে এই নিয়ম ছিল। অনেকে পাঁচ-সাত বছর বয়সেই মেয়ের বিবাহ দিতেন। তবে আট থেকে দশ বছরেই বেশির ভাগ মেয়ের বিবাহ হত। নবাব-বাদশাহ, আমীর ওমরাহ কিংবা রাজা বা জমিদার শ্রেণীর মানুষরা সে সময়ে বিলাসব্যসনে নিমজ্জিত থাকতেন। তাঁদের মনোরঞ্জনের জন্য ছলে-বলে কৌশলে সুন্দরী নারী সংগ্রহ করা হত। বিবাহিতা নারীদের ক্ষেত্রে এই ভয় কিছুটা কম ছিল। অনেকের অনুমান, এই কারণেই তখন থেকে ব্যাপক বাল্যবিবাহ প্রথা দেখা গেল।

বহুবিবাহ

প্রাচীন দিন থেকে পরবর্তীকালেও রাজা ও অভিজাত শ্রেণীর পুরুষরা একাধিক বিবাহ করতেন। মধ্যযুগে দেখা গেল শুধু বহুবিবাহ ভিন্ন, উপপত্নী বা রক্ষিতা রাখবার রীতিটি আভিজাত্যের

লক্ষণ বলে গণ্য করা হত। বাদশাহ, নবাব সুলতান ও আমীর-ওমরাহদের দেখাদেখি, সাধারণ ধনী নাগরিক এমন-কি সম্পন্ন গৃহস্থরাও বহুবিবাহ করতেন। সেই কারণে নারীজীবনে সপত্নী সমস্যা ও আনুষঙ্গিক নানা জ্বালা যন্ত্রণা ভোগ করতে হত।

অবরোধ প্রথা বা 'পর্দা'

প্রাচীন দিনে রাজকন্যা, রাজরানী বা অভিজাত ঘরের মেয়েরা ছিলেন 'অসূর্যম্পশ্যা'। মধ্যযুগে দেখা যায় শুধু তাঁরা নন, সাধারণ ভদ্র গৃহস্থ ঘরের নারীদেরও কঠোর অবরোধ প্রথা মেনে চলতে হত। কারণ রাজাবাদশাহ ও তাঁদের সঙ্গী সাথীরা ভোগ বিলাসের মধ্যে জীবনযাপন করতেন এবং নারীকে তাঁরা ভোগ্য পণ্য রূপে গণ্য করতেন। এই কারণেই আত্মমর্যাদা রক্ষার তাগিদে, ভদ্র গৃহের বধূ ও কন্যারা নিজেরাই কঠোর পর্দা প্রথা মেনে চলতেন। নবাব-বাদশাহের অনুকরণে তখনকার দেশীয় রাজা ও ধনী ব্যক্তিরা, গড়ে তুলতেন 'পত্নী-নিবাস' অর্থাৎ 'হারেম' বা 'শুদ্ধান্তঃপুর'।[৪৯]

এই সব রীতি ও সমস্যা ভিন্ন আরও নানা ধরণের বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছিল এ সময়ে, যার দরুন এদেশের পুরনারীরা শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণ অথবা সাহিত্য শিল্প, সংগীত কিংবা অন্য কোনো ধরণের সাংস্কৃতিক জীবনে অংশ গ্রহণে ছিলেন অপারগ। নিতান্ত শৈশবে বালক-বালিকারা একত্রে পাঠশালায় সামান্য লেখাপড়ার সুযোগ পেতেন মাত্র। বিবাহের পর উচ্চশিক্ষা লাভের কোনো সম্ভাবনা থাকত না, নারী জীবনে। অবশ্য কিছু নারী ছিলেন ব্যতিক্রম। তাঁরা পিতা, স্বামী, পুত্র বা ভ্রাতার সহায়তায় কোনো- না-কোনোভাবে শিক্ষা, সাহিত্য, সংগীত বা শিল্পের সাধনায় ব্যাপৃত থাকতেন। এঁদের মধ্যে শুধু হিন্দুনারী নন, কয়েকজন অ-হিন্দু নারীর পরিচয়ও পাওয়া যায়।

মধ্যযুগের ধর্মসাধিকা

মধ্যযুগে যাঁরা এদেশে ভক্তিধর্মের প্লাবন এনেছিলেন, তাঁদের মধ্যে বিশেষ করে যাঁদের নাম করতে হয় তাঁরা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিলেন। উত্তর-পশ্চিম ভারতে নানক, মীরাবাঈ, কবীর, দাদূ, রুইদাস, তুলসীদাস; পূর্ব ভারতে শ্রীচৈতন্যদেব, মধ্য ভারতে রামানন্দ, দাক্ষিণাত্যে 'আড়বার' সাধকগণ প্রভৃতি। এঁরা সকলে ভক্তিমার্গের মধ্যে দিয়ে নানা ধর্ম ও সম্প্রদায়ের সমন্বয় সাধন ঘটিয়েছিলেন। সেই ধারা প্রবাহিত হয়ে এসেছে আধুনিক যুগ পর্যন্ত।

নারী সাধিকারাও সংখ্যায় খুব কম ছিলেন না। মীরাবাঈ ও করমেতিবাঈ-এর নাম সকলের নিকট পরিচিত। আরও যাঁদের নাম করা যায় তাঁরা হলেন — নানীবাঈ, মাতাবাঈ (এঁরা ছিলেন দাদূর কন্যা), আর ছিলেন ক্ষেমা, পদ্মাবতী, সহজোবাঈ, দয়াবাঈ প্রভৃতি। যোধপুরের তপস্বিনী অজনেশ্বরী, বিকানীরে গৌরাঁজী, জনাবাঈ, মহারাষ্ট্রের সখুবাঈ, পান্টারপুরের কানহুপাত্রা, পুনার বাবা জান, মহীশূরের শান্তিবাঈ ইত্যাদি। জনাকয়েক সূফী সাধিকার কথাও জানা যায়। তাঁদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হলেন, দিল্লীর বাউরী সাধিকা। বারাণসীর বিখ্যাত সাধিকা ছিলেন

মাতাজী। ইনি ছিলেন কাশীর রাধাস্বামী সম্প্রদায়ের পণ্ডিত ব্রহ্ম শঙ্কর মিশ্রের ভগিনী— মাহেশ্বরী দেবী। তপস্বিনী মহারানী বুআজী নামে সকলের কাছে পরিচিত ছিলেন।[৫০]

মধ্যযুগের উল্লেখযোগ্য কয়েকজন ভক্ত সাধিকার স্বতন্ত্র পরিচয় দেওয়া হল :

মীরাবাঈ (১৫০৪-১৫৭৪)

কৃষ্ণপ্রেমিকা মীরাবাঈ ছিলেন ষোড়শ শতাব্দীর একজন সিদ্ধ সাধিকা। রাজস্থানের কুড়কী গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পিতা রাঠোর বংশীয় রত্নসিংহ ও মাতা ঝালা বংশীয়া বীর কুঁয়ারী। ইনি শৈশবকালে এক সাধুর কাছ থেকে পেয়েছিলেন তাঁর "গিরিধারী গোপাল"কে। তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়েছে। তখন থেকেই তিনি হরি ভিন্ন আর কিছুই জানতেন না।

"হরী মেরে জীবন প্রাণ-অধার।
ঔর আসরো নাঁহী তুম বিন্ তিনুঁ লোক মঁঝার ॥
আপ বিনা মোহি কছুন সুহাবৈ নিরাখৌ সব সংসার।
মীরা কহৈ মৈঁ দাস রাবরী দীজ্যৌমতী বিসার ॥"

অনুবাদ :

হরি, তুমি মম জীবন আধার
তোমা ছাড়া ওগো কোনো আশা নাহি ত্রিভুবনে হে আমার।
আর তো কিছুই নাহি হেরি চোখে, থাক্ পড়ে সংসার।
মীরা বলে থাক্ তব পায়ে মতি, সে চিরদাসী তোমার। [৫১]

পরবর্তীকালে মীরার বিবাহ হয় চিতোরের শিশোদিয়া বংশের রাণা সংগ্রামসিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র ভোজরাজের সঙ্গে। কিন্তু সে বিবাহ সুখের হয়নি। রাণা বংশের ইষ্টদেবতা ছিলেন একলিঙ্গজী শিব। কৃষ্ণপ্রাণা মীরাবাঈকে তাঁরা ভালো মনে গ্রহণ করতে পারেন নি। অথচ মীরার একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান ছিলেন সেই গিরিধারী গোপাল।

তিনি বলেছেন—

'মেরে তো গিরিধারী গোপাল,
দুস্‌রো ন কোঈ।
জাঁকে সির মোর মুকুট,
মেরে পতি সোঈ।
তাত মাত ভ্রাত বন্ধু
আপনো ন কোঈ । ইত্যাদি

বিবাহের কয়েক বছর পরেই মীরার বৈধব্য ঘটে। সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন

ভোজরাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিক্রমজিৎ। তিনি মীরার উপর নানা ধরণের নির্মম অত্যাচার করতেন। মীরাকে হত্যা করার জন্য তিনি সুখাদ্য বলে, মাবাত্মক বিষ ও ফুলের মালায় ঢেকে বিষধর সাপ পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু করতে পারেন নি। এক সময় মীরা বিবাগী হয়ে চলে গেলেন বৃন্দাবনে। শেষ জীবন তিনি কাটিয়েছিলেন দ্বারকায় রণছোড়জীর আশ্রয়ে। অলৌকিক সব কাহিনী শোনা যায় তাঁর সম্পর্কে। মীরা নাকি রণছোড়জীর মূর্তিতে লীন হয়ে গেছেন।

অণ্ডাল বা অব্বার রঙ্গনায়কী

দশম শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যে এই সাধিকার আবির্ভাব ঘটেছিল। তাঁর রচিত 'তিরুপ্পাবৈ' গাথার মধ্যে রয়েছে তাঁর প্রেম সাধনার পরিচয়। বৈষ্ণবাচার্য রামানুজের কণ্ঠে ধ্বনিত হত ঐ গান । আজও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বৈষ্ণবরা এই মহাসাধিকাকে দেবী জ্ঞানে পূজা করে থাকেন।

দক্ষিণ দেশের আড়বার বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের দ্বাদশ সিদ্ধ-সাধিকার মধ্যে সকলেই পুরুষ, একমাত্র নারী হলেন এই অণ্ডাল। তামিল 'আড়বার' শব্দের 'আড়' অর্থে 'নিমগ্ন' এবং 'বার' অর্থ হল যিনি এইভাবে অবস্থান করেন। এক কথায় বুঝতে হবে— যিনি সর্বদাই ঈশ্বরপ্রেমে নিমগ্ন থকেন। [৫২] আড়বাব সম্প্রদায়ভুক্ত সাধক-সাধিকারা পুরুষ নারী নির্বিশেষে সকলেই কান্তাভাবের সাধনা করেছেন। সাধিকা অণ্ডালের মধ্যে কান্তারূপে সাধনার মাধুর্যভাবের চরম বিকাশ ঘটেছিল। শোনা যায় ইনি ছিলেন শ্রীবিল্লি পুত্তরের শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিবের আচার্য বিষ্ণুচিত্তের পালিতা কন্যা। বিষ্ণুচিত্তও ছিলেন দ্বাদশ মহাসাধকদের একজন। উত্তরকালে তাঁরই কন্যা মহা-সাধিকারূপে পরিচিত হলেন। পবিত্র পরিবেশে লালিত পালিত হয়ে অণ্ডাল রঙ্গনায়কীর মধ্যে দেখা দিল সহজাত কৃষ্ণপ্রেম।

দাক্ষিণাত্যের সাধিকাদের মধ্যে বিষ্ণুভক্তি যেমন ছিল, তেমনি আবার শিবভক্তিও কম ছিল না। 'শৈব নয়না'র সম্প্রদায়ের মোট তেষট্টিজন সাধক-সাধিকার কথা জানা যায়। এঁদের তিনজন ছিলেন মহিলা —কারাইক্কাল আম্মেয়ার, তিলক বতীয়ার ও মাঙ্গাইয়াক্কাবা সেয়ার। 'আর' কথাটি এখানে সম্মানসূচক অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে। এঁরা ছাড়াও কনক বতীয়ার প্রভৃতি আরও অনেক ভক্ত সাধিকা ছিলেন। উত্তর ভারতের তুলনায় দক্ষিণভারতে ভক্তিমতী ও বিদুষী নারীর সংখ্যা কিছুমাত্র কম নয়।

করমেতিবাঈ

নাভাজী-রচিত 'ভক্ত মাল' গ্রন্থে আমরা এই ভক্তিমতী ধর্মশীলা নারীর কথা পাই। দাক্ষিণাত্যের খাজল গ্রামের অধিবাসী রাজপুরোহিত পরশুরামের কন্যা ছিলেন ইনি। পরম বৈষ্ণব পিতার কন্যা করমেতিও কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হয়ে থাকতেন। পিতার আদেশ শিরোধার্য করে বিবাহ করতে বাধ্য হলেও, ইনি সংসার ত্যাগ করে চলে যান বৃন্দাবনে। সেখানে তিনি কৃষ্ণভক্তিতে নিমজ্জিত থেকে আজীবন সাধনা করেছিলেন।[৫৩]

সাহিত্য সাধনায় মধ্যযুগের ভারতীয় নারী

মধ্যযুগে নানা আঞ্চলিক ভাষায় যে-সব নারীর রচনার সন্ধান আজও পাওয়া যায়, তার মধ্যে ধর্মপ্রাণা নারীদের রচিত কিছু গান ও কবিতাই প্রধান। এঁদের রচনায় দেখতে পাওয়া যায় ধর্ম ও সাহিত্য একই সূত্রে বাঁধা পড়েছে। মীরাবাঈ-এর কথা মনে রাখলেই কথাটির অর্থ সুস্পষ্টভাবে বোঝা যাবে।

ষোড়শ শতাব্দী থেকে শুরু করে মধ্যযুগের শেষ পর্যন্ত হিন্দী সাহিত্যে অনেক মহিলা কবির সন্ধান পাওয়া যায়। আধুনিক যুগেও সেই ধারা অব্যাহত আছে।

প্রবীণাবাঈ

ষোড়শ শতাব্দীতে একজন মহিলা কবি– যিনি রাজসভার কবিও ছিলেন। বুন্দেলখণ্ডের রাজসভায় যে কজন জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি ও কবি ছিলেন, তাঁদের মধ্যে বিদুষী প্রবীণাবাঈ ছিলেন অন্যতমা। ইনি ছোটো ছোটো কবিতা রচনা করতেন। শোনা যায় আকবর বাদশাহ নাকি তাঁর কবিখ্যাতি শুনে তাঁকে সাধুবাদ জানিয়েছিলেন।[৫৪] তাজ ও সেখ নামে দুই মুসলিম নারী- কবির কথা জানা যায়, এঁরা সপ্তদশ শতাব্দীতে হিন্দীতে কাব্যচর্চা করতেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর কবিদের মধ্যে রানী বকাবতী (১৭১৭-?) এবং সাধক চরণ দাসের দুই শিষ্যা দয়াবাঈ ও সহোজাবাঈ (১৭০৩-১৭৮২)–এর কথা জানা যায়। উনিশ শতকের কবিদের মধ্যে যে-সব নাম শুনতে পাওয়া যায় তাঁরা হলেন রূপনগর ও কৃষ্ণগড়ের রাজকুমারী— সুন্দরীকুমারী (১৮৩৫-?); রত্নকুমারী (১৮৫০-?); প্রতাপকুমারীবাঈ (১৮৫০-?), বঘেলী বিষ্ণুপ্রসাদ কুমারী (১৮৭০-?) ইত্যাদি।

লছিমাদেবী

ইনি মিথিলারাজ শিবসিংহের পত্নী ছিলেন। কাব্যানুরাগিণীও বটে, নিজেও কবিতা রচনা করতেন। মিথিলার সভাকবি বিদ্যাপতি সেই কারণে তাঁর কবিতায় একই সঙ্গে রাজা শিবসিংহ ও রানী লছিমা বা লক্ষ্মীদেবীর নাম উল্লেখ করেছেন, তাঁদের গুণগ্রাহিতার জন্য।

গুজরাতী সাহিত্যে গরবীবাঈ (১৭৫৯-?) ও দিবালীবাঈ (১৭৯১-?)–এর নাম শোনা যায়। মারাঠী সাহিত্যে অনেক ভক্ত মহিলা কবির আবির্ভাব ঘটে। তাঁদের মধ্যে মুক্তাবাঈ (ত্রয়োদশ শতাব্দী), জনাবাঈ (পঞ্চদশ শতাব্দী), সোয়েরাবাঈ, সপ্ত কাঁহোপাত্রা, কবিনাবাঈ (সপ্তদশ শতাব্দী) প্রভৃতিই প্রধান। কাশ্মীরী ভাষায় একজন বিখ্যাত মহিলা কবি ছিলেন, তাঁর নাম লল্লাদেবী (১৩৭৭-৯৩)। ওড়িয়া ভাষায় ভক্ত নারী-কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কবি ছিলেন ষোড়শ শতাব্দীর বৃন্দাবতী দাসী। এ ছাড়া উত্তর, পশ্চিম ও পূর্বভারতে উর্দু, অসমীয়া ও বাংলা ভাষায় এমনি আরও অনেক মহিলা কবির সন্ধান পাওয়া যায়, যাঁরা নিজেদের রচনার দ্বারা ভারতীয় সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে গেছেন।

দাক্ষিণাত্যে বেশ-কয়েকজন ভক্তনারী তামিল, কানাড়ী প্রভৃতি দক্ষিণ ভারতীয় ভাষায় সংগীত

ও কাব্য রচনা করে গেছেন। তামিল ভাষায় অবৈর বা অবৈয়ার (দশম শতাব্দী) নামে যে বিদুষী ব্রাহ্মণ দুহিতা ছিলেন, তাঁকে সকলে স্বয়ং বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর কন্যা বলে মনে করতেন।

মধুর বাণী

এই ভক্তিমতী মহিলা সপ্তদশ শতাব্দীতে তাঞ্জোরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ঐ রাজ্যের রাজা রঘুনাথ ভূপাল ছিলেন যথার্থ বিদ্যানুরাগী। তাঁরই অনুরোধে মধুর বাণী রামচরিত্রের গুণকীর্তন করে কাব্য রচনা করেন। আজও বাঙ্গালোর-এর মালেশ্বর বেদ-বেদান্ত মন্দিরে তাঁর লেখা তালপাতার পুঁথিটি রক্ষিত আছে। বীণাবাদনেও ইনি ছিলেন পারদর্শিনী।

মোহনাঙ্গিনী

দাক্ষিণাত্যের রাজা কৃষ্ণরয়ালুর কন্যা ছিলেন ইনি। রাজা রামরয়ালুর সঙ্গে এঁর বিবাহ হয়। ছেলেবেলা থেকেই কাব্যচর্চা করতেন, পরবর্তীকালে নানা শাস্ত্রপাঠ করেন। দুঃখের বিষয় যে, যৌবনেই এঁর বৈধব্য ঘটে এবং শোকাভিভূত হয়ে ইনি স্বামীর চিতায় প্রাণত্যাগ করেন।

মল্লী

দাক্ষিণ্যত্যের এক কুম্ভকারের কন্যা ছিলেন মল্লী। এঁর রচনায় আশ্চর্য মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। রাজা কৃষ্ণদেবের সময় ইনি সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। শোনা যায় রোজ চুল শুকাবার সময়টি ছিল তাঁর কাব্য রচনার সময়। এইভাবে ইনি নিজস্ব ভঙ্গিতে একটি রামায়ণ রচনা করেন, যা বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

এমনি আরও কত বিদ্যাবতী ও গুণবতী প্রতিভাময়ী নারীরা হয়তো সেকালে ছিলেন— যাঁদের কোনো পরিচয় আমরা আজ জানি না। তাঁদেব বচিত গ্রন্থ অনাদৃত ও অবহেলিত হয়ে পড়ে থেকে শেষ পর্যন্ত লুপ্ত হয়ে গেছে লোকচক্ষুর সামনে থেকে।

রাজ্য শাসন ও পালনে হিন্দু ও মুসলিম মহিলা

কিম্বদন্তীমূলক কাহিনীতে আমরা শুনতে পাই যে, প্রাচীন ভারতের কোনো এক প্রান্তে ছিল 'প্রমীলারাজ্য'— যেখানে নারীরাই নিজেদের বিদ্যাবুদ্ধি ও বাহুবলের দ্বারা বিশেষ যোগ্যতার সঙ্গে রাজ্য পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। কিন্তু শুধুমাত্র পুরাণ কাহিনী নয়, রীতিমতো ঐতিহাসিক বিবরণের মধ্যেও আমরা একাধিক বীরাঙ্গনা নারীর বীর্যবত্তার পরিচয় পাই। তাঁদের মধ্যে অনেকে আবার প্রত্যক্ষভাবে না হলেও, পরোক্ষভাবে রাজ্য পরিচালনার কাজে সাহায্য করেছেন। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেত পারে প্রাচিন যুগে মৌখরী রাজবংশীয় কন্যা ও শেষ কনৌজরাজের মহিষী রাজ্যশ্রীর কথা। ইনি ছিলেন থানেশ্বরের অধিপতি প্রভাকর- বর্ধনের কন্যা এবং রাজা গ্রহবর্মার রানী। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর সপ্তম শতাব্দীতে মৌখরী রাজবংশীয়েরা অত্যন্ত প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন। মালবরাজ দেবগুপ্ত ও গৌড়েশ্বর শশাঙ্কের হাতে কনৌজরাজ

গ্রহবর্মা নিহত হলে, রাজ্যশ্রী বন্দিনী হন। জ্যেষ্ঠভ্রাতা রাজ্যবর্ধন তাঁকে উদ্ধারের চেষ্টা করেন। তিনি নিহত হলে কনিষ্ঠ ভ্রাতা হর্ষবর্ধন তাঁকে উদ্ধার করেন। হর্ষবর্ধন যখন একই সঙ্গে কনৌজ ও থানেশ্বর রাজ্য শাসন করেন, তখন তাঁকে শাসনকার্য পরিচালনার কাজে বিশেষভাবে সাহায্য করতেন ভগিনী রাজ্যশ্রী। সেই কারণেই হর্ষবর্ধন তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

দক্ষিণ ভারতে একাধিক সুদক্ষ শাসনকর্ত্রীর নাম শোনা যায়। যেমন কাকতীয় রাজকন্যা রুদ্রদেবী (১১৮৩ খ্রীস্টাব্দে), বিজয়নগর সম্রাট কম্পরায়ের মহিষী গঙ্গাদেবী প্রভৃতি। পূর্ব ভারতে মিথিলারাজ্যের অধিপতি পদ্মসিংহের রানী বিশ্বাস দেবীরও এ বিষয়ে যথেষ্ট খ্যাতি ছিল।

সংযুক্তাদেবী (দ্বাদশ শতক)

ইনি ছিলেন দিল্লীর চৌহান বংশের রাজমহিষী এবং সম্রাট অনঙ্গপালের দৌহিত্রী ও কনৌজরাজ জয়পালের কন্যা। পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে, স্বইচ্ছায় ইনি হস্তিনাপুরের শেষ হিন্দুরাজা বীর পৃথ্বিরাজকে স্বামীরূপে বরণ করেন। পরে গজনীর সুলতান মুহম্মদ ঘুরী দিল্লী আক্রমণ করেন এবং তাঁর সঙ্গে তরাইনের যুদ্ধে (১১৯২ খ্রীস্টাব্দে) পৃথ্বিরাজ বীরের মতো প্রাণত্যাগ করেন। সেইসঙ্গে সংযুক্তাও গৌরবময় মৃত্যু বরণ করেন।

রাজস্থানে একাধিক বীরাঙ্গনা নারীর কথা জানা যায়:

কর্ণদেবী

ইনি ছিলেন মেবার রাজ্যের রানী। চিতোর ছিল মেবারের রাজধানী। কর্ণদেবী হলেন রাণা সঙ্গের পত্নী ও বিক্রমজিতের মাতা। রাণা সঙ্গের মৃত্যুর পর, নাবালক পুত্রের হয়ে তিনি রাজ্য পরিচালনা করেন। বিপদের দিনে তিনি দিল্লীর বাদশাহ হুমায়ুনের সঙ্গে রাখী বন্ধন করে ভাই ও ভগিনী সম্বন্ধ পাতান। হুমায়ুনও আন্তরিকতার সঙ্গে তাঁর আবেদনের মর্যাদা রক্ষা করেন।

ধাত্রীপান্না

ইনি আত্মত্যাগের জন্য ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। নিজের পুত্রের জীবনের বিনিময়ে তিনি রাণা সঙ্গের নাবালক পুত্রের প্রাণরক্ষা করেন।

পদ্মিনী

ইনি ছিলেন চিতোরের রাণা ভীমসিংহের অপরূপ রূপসী রানী। তাঁর রূপের খ্যাতি শুনে দিল্লীর সুলতান আলাউদ্দীন খিলজী (১২৯৬-১৩১৬ খ্রী.) চিতোর আক্রমণ করেন। আত্মসম্মান রক্ষার্থে রানী পদ্মিনী তাঁর আটশত সখী সহ জহরব্রত অনুষ্ঠান ক'রে, জ্বলন্ত বিরাট অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিলেন। এই অসীম সাহসিকতা ও আত্মত্যাগের কাহিনী ভারতের ইতিহাসে উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা আছে।

মোগলযুগের পূর্বে ও পরে কয়েকজন কৃতী ও গুণবতী মুসলিম নারীর কথা জানা যায় — যাঁরা যুদ্ধ পরিচালনা ও রাজ্যশাসনে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। মোগল-পূর্ব যুগে তুর্কী-আফগান যুগের সর্বপেক্ষা উল্লেখযোগ্য নারী হলেন, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে দিল্লীর সুলতানা রাজিয়া।

সুলতানা রাজিয়া (রাজত্বকাল ১২৩৬-১২৪০ খ্রী.)

সুলতান ইলতুতমিসের জ্যেষ্ঠা কন্যা ও তৃতীয় সন্তান ছিলেন রাজিয়া। সুলতানের অন্যান্য অযোগ্য পুত্রেরা যখন ভোগবিলাসের স্রোতে গা ঢেলে দিল, তখন তাঁর বিদুষী ও সুযোগ্যা কন্যা রাজিয়াকে ইল্‌তুত্‌মিস্‌ সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করলেন। তার ফলে পূর্বে বঙ্গদেশ এবং পশ্চিমে সিন্ধু পর্যন্ত বিরাট ভূখণ্ডের তিনি অধিকারিণী হলেন। অথচ রাজধানীতে গোপনে রাজিয়ার বিরুদ্ধে বিরাট ষড়যন্ত্র চলতে লাগল। তাঁদের কাছে রাজিয়ার সবচেয়ে বড়ো অপরাধ ছিল বোধ হয়— নারী হয়েও তাঁর সিংহাসনারোহণ। রাজিয়া ছিলেন নির্ভীক মহিলা। উন্মুক্ত দরবারে বসে তিনি দক্ষতার সঙ্গে শাসনকার্য ও বিচার পরিচালনা করতেন। শিকারেও ছিল তাঁর দুর্দান্ত উৎসাহ। কিন্তু তাঁকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল, অসন্তুষ্ট আমীর-ওমরাহ ও মোল্লাদের চক্রান্ত। জমালউদ্দীন ইয়াকুত নামে যে হাবসী সৈনিককে রাজিয়া 'আমীর–ই–আখৌর' উপাধি দিয়েছিলেন, সেই ব্যক্তি নিহত হন। অবশেষে তিনি সরহিন্দের শাসনকর্তা ইলতুনিয়াকে বিবাহ করেন, তাঁর সহায়তা পাবার জন্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিরুদ্ধ পরিবেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তাঁকে পরাজিত হতে হল। রাজিয়া নিহত হলেন। তবে রাজিয়া বেগম সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা গৌরবের কথা হল এই যে, তিনিই একমাত্র মুসলিম নারী— যিনি স্বয়ং দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন এবং আশ্চর্য সাহস ও যোগ্যতার সঙ্গে শাসনকার্যও পরিচালনা করেছিলেন।[৫৭]

মকদুম জানান (পঞ্চদশ শতাব্দী)

দাক্ষিণাত্যে বাহমনী রাজ্যের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নিজাম শাহের (১৪৬১-১৪৬৩ খ্রী.) মাতা মকদুম জানান ছিলেন শাসনকার্যে পারদর্শিনী। ইনি আট বছরের নাবালক পুত্রকে সিংহাসনে বসিয়ে, নিজে অভিভাবিকা বা রাজমাতারূপে, আমীর ও মন্ত্রীদের সাহায্যে রাজ্য পরিচালনা করতেন।[৫৮]

চাঁদ সুলতানা (ষোড়শ শতাব্দী)

সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের জন্য দাক্ষিণাত্যের চাঁদ সুলতানা ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন। বাদশাহ আকবরের আমলে দাক্ষিণাত্যের বিশাল বাহমনী রাজ্য পাঁচ ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল— আহম্মদনগর, বিজাপুর, খান্দেশ, গোলকুণ্ডা ও বিজয়নগর। বিখ্যাত 'তালিকোটের যুদ্ধে' (১৫৬৫ খ্রী.) হিন্দুরাজ্য বিজয়নগর ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, অন্য চারটি রাজ্যের সুলতানদের আক্রমণে। আকবর বাদশাহ দিল্লী থেকে একই দিনে চারজন দূত প্রেরণ করেন, যাতে ঐ চারজন সুলতান তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন। খান্দেশ ভিন্ন, অন্য সুলতানরা প্রথমে

বশ্যতা স্বীকার করেন নি। ১৫৯৩ খ্রীস্টাব্দে শাহ্‌জাদা মুরাদ, সেনাপতি আব্দুর রহিমখান্-ইখানানকে নিয়ে আহম্মদনগর অবরোধ করেন। এই সময় আহম্মদনগরের সুলতান ছিলেন মুজাফর শাহ। চাঁদ সুলতানা ছিলেন আহম্মদনগরের পূর্ববর্তী সুলতান নিজামশাহের কন্যা ও বিজাপুরের সুলতান আদিলশাহের বিধবা পত্নী। বিপন্ন ভ্রাতুষ্পুত্র মুজাফর শাহকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এলেন চাঁদ সুলতানা। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। তিনি বুঝলেন যে, মোগলদের সঙ্গে সন্ধি করাই শ্রেয়। সন্ধির শর্তগুলিতে দেখা গেল যে, মোগলরাই বেশি লাভবান হয়েছে। সেই কারণে আহম্মদনগরের আমীর- ওমরাহরা সন্দেহ করল যে, চাঁদ সুলতানা হয়তো তাদেব বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন। সেই সন্দেহের বশবর্তী হয়ে তাবা তাঁকে হত্যা করে। তবে অনেকের মতে, চাঁদবিবি নিজেই সম্মান রক্ষা করার জন্য আত্মহত্যা করেছিলেন।

এই শ্রেণীর আরও কয়েকজন হিন্দু রমণীর কথা বলা যেতে পারে :

রানী দুর্গাবতী (ষোড়শ শতাব্দী)

রানী দুর্গাবতী ছিলেন চন্দেল্লবংশের রাজা শালিবাহনের কন্যা এবং মধ্যপ্রদেশের গন্ডোয়ানা অঞ্চলের রাজা দলপতের রানী। রাজার আকস্মিক মৃত্যুতে, তিনি তাঁর পাঁচ বছর বয়স্ক নাবালকপুত্র রাজা বীরনারায়ণকে সিংহাসনে বসিয়ে, ষোলো বছর ধরে আশ্চর্য দক্ষতা ও সাহসের সঙ্গে রাজ্য পরিচালনা করেছিলেন। শিকারেও রানী দুর্গাবতীর ছিল বিশেষ অনুরাগ। তাঁর লক্ষ্য ছিল অব্যর্থ।

বাদশাহ আকবর তাঁর রাজ্যসীমা বিস্তারের উদ্দেশ্যে গন্ডোয়ানা রাজ্য আক্রমণ করেন। তাঁর আদেশে এলাহাবাদের শাসক খাজা আবদুল মজিদ আসফখান প্রায় অর্ধ লক্ষ মোগল সৈন্য নিয়ে ১৫৬৪ খ্রীস্টাব্দে গন্ডোয়ানা আক্রমণ করেন। অথচ রানী দুর্গাবতী মুষ্টিমেয় সৈনিক নিয়ে, শুধুমাত্র শৌর্যবীর্য সম্বল করে প্রাণপণে যুদ্ধ করেন। যুদ্ধক্ষেত্রে তীরবিদ্ধ হয়ে আহত হয়ে, তিনি বুঝলেন তাঁর পরাজয় সুনিশ্চিত, তখন তিনি নিজ অঙ্গে ছুরিবিদ্ধ করে মৃত্যু বরণ ক'রে আত্মমর্যাদা রক্ষা করেন। রাজ্যের অন্যান্য নারীরা 'জহরব্রত' করে অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন।

জিজাবাঈ

মারাঠাবীর শিবাজীর মাতা জিজাবাঈ ছিলেন একজন প্রকৃত বীরাঙ্গনা নারী।

তারাবাঈ (সপ্তদশ শতাব্দী ১৬৭৫-১৭৬১ খ্রী.)

মারাঠা রমণী তারাবাঈ যেমন সমরকুশলী ছিলেন, তেমনি বুদ্ধিমতী ও শাসনকার্য পরিচালনাতেও ছিলেন সিদ্ধহস্তা। তিনি প্রজাসাধারণের শ্রদ্ধা অর্জন ও আস্থাভাজন হতে পেরেছিলেন।

তারাবাঈ ছিলেন শিবাজীর সৈন্যাধ্যক্ষ হাম্বির রাও-এর কন্যা এবং শিবাজীর পুত্র রাজারামের পত্নী। ১৬৭৫ খ্রীস্টাব্দে মাত্র আট বছর বয়সে রাজারামের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ১৭০০ খ্রীস্টাব্দে

মোগল শক্তির সঙ্গে যুদ্ধে রাজারামের জীবনাবসান ঘটে। নাবালক পুত্র তৃতীয় শিবাজীকে সিংহাসনে স্থাপন করে, তারাবাঈ অত্যন্ত ধৈর্য ও সাহসের সঙ্গে পাঁচ বছর শাসন পরিচালনা করেন। পরে অন্তর্বিরোধের ফলে তিনি ক্ষমতাচ্যুত হন। ১৭৬১ খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

অহল্যাবাঈ (অষ্টাদশ শতাব্দী— ১৭২৫।২৬-১৭৯৫ খ্রী.)

ইন্দোরের রানী অহল্যাবাঈ একদিকে তাঁর শাসননৈপুণ্য ও রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন, অন্যদিকে তাঁর অনলস কর্মক্ষমতা, দয়াদাক্ষিণ্য, দানশীলতা ও সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপন প্রণালীর কথাও জানা যায়। অহল্যাবাঈ-এর পিতার নাম আনন্দ রাও সিন্ধিয়া। ১৭২৫/২৬ খ্রীস্টাব্দে আহমদনগরে পাথরষি গ্রামে তাঁর জন্ম। ইন্দোরের হোলকার বংশের প্রতিষ্ঠাতা মলহর রাও-এর পুত্র খন্ডেরাও হোলকারের সঙ্গে ১৭৩৮ খ্রীস্টাব্দে তাঁর বিবাহ হয়। যুদ্ধে ১৭৫৪ খ্রীস্টাব্দে খন্ডেরাও-এর মৃত্যু হয়। পুত্র মালেরাও ছিল তাঁদের অযোগ্য সন্তান। মালেরাও -এর অকালমৃত্যু হলে, অহল্যাবাঈ নিজে রাজ্য শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু এই ব্যবস্থা তাঁর রাজ্যের কিছু কর্মচারী ভালো মনে মেনে নেয় নি। যুদ্ধবিগ্রহ পরিচলনার কাজে অহল্যাবাঈ তুকোজি হোলকার নামে এক বীর সৈনিককে সেনানায়কের পদে নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি সুশাসনের দ্বারা মালব দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনেছিলেন। অহল্যাবাঈ অনাড়ম্বর ভাবে পবিত্রজীবন যাপন করতেন এবং দেশের ও দশের মঙ্গল চিন্তায় ও ধর্মকার্যে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। বহু মন্দির, ধর্মশালা ও রাজপথ তিনি নির্মাণ করিয়েছিলেন। বিভিন্ন তীর্থস্থানে তিনি মুক্তহস্তে দান করতেন। তার পরিচয় বহন করছে বারাণসী, গয়া, দ্বারকা, কেদারনাথ, রামেশ্বরম্ প্রভৃতি বিখ্যাত হিন্দুতীর্থ স্থানগুলি। [১০]

লক্ষ্মীবাঈ (উনিশ শতক)

লক্ষ্মীবাঈ ছিলেন বুন্দেলখণ্ডের ক্ষুদ্ররাজ্য ঝাঁসির শেষ শাসনকর্ত্রী (শাসনকাল—১৮৫৩-১৮৫৮ খ্রী.)। পূর্বে মারাঠা শাসনকালে এই রাজ্যটি ছিল পেশোয়া রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। পরবর্তীকালে এই রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

অপুত্রক রাজা রঘুনাথ রাও-এর মৃত্যুর পর ঝাঁসির উত্তরাধিকারী হলেন, তাঁর ভাই গঙ্গাধর রাও (১৮৩৮ খ্রী.)। প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর পর, গঙ্গাধর রাও দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন, মোরোপন্ত তাম্বের কন্যা মনুবাঈকে। তিনিই লক্ষ্মীবাঈ নামে পরিচিত। লক্ষ্মীবাঈ-এর পুত্রের শৈশবেই মৃত্যু ঘটে। তাঁরা ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দে আনন্দ রাও নামে এক আত্মীয়পুত্রকে দত্তক গ্রহণ করেন। তার নতুন নাম হয় দামোদর গঙ্গাধর রাও। গঙ্গাধর রাও-এর মৃত্যুর পর, ব্রিটিশ সরকার, তাঁদের দত্তক পুত্রের অধিকার অস্বীকার করে। তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড ডালহৌসি এই রাজ্যটি আত্মসাৎ করতে চাইলেন। তেইশ বছর বয়স্কা রানী লক্ষ্মীবাঈ এই অন্যায়ের তীব্র প্রতিবাদ করেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময়, রানী লক্ষ্মীবাঈ, বিদ্রোহী দলে যোগদান করে অসীম বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে যুদ্ধক্ষেত্রেই বীরাঙ্গনার মতো মৃত্যু বরণ করেন (১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দের ১৮ জুন)।

মোগল হারেমে স্ত্রী শিক্ষা ও সংস্কৃতি

স্মরণাতীত কাল থেকেই ভারতে বিদেশীদের আনাগোনা দেখা যায়। কিন্তু মধ্যযুগে বিদেশী শাসকের হাতে এদেশের শাসন ক্ষমতা ন্যস্ত হয়। ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের দ্বারা শাসনকার্য পরিচালনার ফলে, এদেশে ঐশ্লামিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রসার ঘটতে লাগল।

খাস্ বাদশাহ ও বাদশাজাদাদের 'হারেম্' বা শুদ্ধান্তঃপুরের আবহাওয়া কেমন ছিল --তার সম্পর্কে নানাজনের নানান ধারণা। অনেকে ভাবেন— ঐ–সব নারীরা আজীবন 'অসূর্যস্পশ্যা' হয়ে হয়তো কোনোক্রমে জীবন কাটাতেন। কিন্তু এঁদের বৈচিত্র্যহীন জীবনে যে কিছু পরিমাণে বৈচিত্র্য ছিল তার সম্পর্কে স্যার যদুনাথ সরকার বলেছেন—

"ইরাণ হইতে আগত শিক্ষয়িত্রী তুরাণের ফেরীওয়ালী অথবা আরবের স্ত্রী-হার্জা প্রায়ই দেশ-বিদেশের হাওয়া হারেমের মধ্যে আনিয়া দিত। প্রবীণা বিধবা রাজপুত ললনাগণও তীর্থযাত্রা করিতেন। এইরূপে জ্ঞানের আদানপ্রদানের পথ খোলা ছিল। পালকীটা সব সময়ে ঘেরাটোপ দিয়া ঢাকা থাকিত না।"[৬১]

এইসব পুরনারীরা সাহিত্য, শিল্প বা সংগীতের যে-সব চর্চা করতেন, পরিতাপের বিষয় হল— তার অধিকাংশ নিদর্শন কালের কবলগ্রস্ত হয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে মোগল সাম্রাজ্যের ভাঙনের সঙ্গে সঙ্গে এইসব নারীদের জীবনের নিরাপত্তা ও শান্তি সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়, সেইসঙ্গে তাঁদের সৃষ্টি ও রচনা বেশির ভাগই লোপ পেয়েছিল। বিগতযুগেব সাক্ষী হিসাবে তাব সামান্য কিছু অংশ বর্তমানে অবশিষ্ট আছে।

যৌবনে পদার্পণ না করলে মোগল বাদশাজাদীদের বিবাহের কোনো প্রশ্নই উঠত না। অথচ সাধারণ বা প্রকাশ্য কোনো বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে তাদের লেখাপড়া শোখানোব রীতিও ছিল না। কাজেই 'হারেমে' বসেই, পাঁচ বছর বয়স থেকে তাদের 'আতুন্' বা গৃহশিক্ষিকার কাছে লেখাপড়া, আদবকায়দা, শিল্পচর্চা, সংগীত সাধনা, সাহিত্যপাঠ ইত্যাদির অনুশীলন করানো হত। এ সময় অনেক বাদশাহ্ কন্যা-সন্তানের বিবাহ দিতেন না, পাছে সিংহাসনের উত্তরাধিকারীর সংখ্যা ও তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বৃদ্ধি পায়। কারণ ইসলাম ধর্মে কন্যা সন্তানের সম্পত্তিতে অধিকার স্বীকৃত ছিল। যেমন কোরান বলে "– পিতা-মাতার রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে ভাই যা পাবে বোন পাবে তার অর্ধেক। অপুত্রক পিতা-মাতার একমাত্র কন্যা পাবে তাদের অর্ধেক সম্পত্তি, একাধিক হলে পাবে দুই– তৃতীয়াংশ।"[৬২] সুতরাং অনেক নারী, ধর্ম, সঙ্গীত, শিল্প ও সাহিত্য সাধনা করে জীবন কাটিয়ে দিতেন, অর্থের প্রাচুর্য ও অবসর বাহুল্য তাঁদের পরিশীলিত রুচিকে অনেক সময় মৌলিক সৃষ্টিকর্মে নিয়োজিত করত। এ সম্পর্কে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন—

"আমরা ভাবি মোগল বাদশাহদের অন্দরটা বুঝি ছিল কেবলি আলস্য আর বিলাসের লীলাভূমি, কিন্তু গুলবদন বেগম, নূরজাহাঁ, তাজ বিবি, জাহাঁনারা, জেবুন্নিসা প্রভৃতি কতকগুলি নাম এ অপবাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছে।"[৬৩]

মোগল ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যে-সব গুণবতী মহিলার নাম উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা আছে তাঁদের কয়েকজনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল:

বেগম গুলবদন

বেগম গুলবদন ছিলেন মোগল সাম্রাজের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট বাবরের কন্যা। 'হুমায়ূন নামা' নামক গ্রন্থের রচয়িত্রী রূপে ইনি বিখ্যাত হয়ে আছেন। হুমায়ূন ছিলেন এঁর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। সম্রাট আকবরের পিসিমা ছিলেন ইনি। দীর্ঘজীবী এই মহিলা বহুদিন ধরে মোগল সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় ও অনেক বিপর্যয় সংঘটনের সাক্ষী ছিলেন। যদিও ইনি নিজে কোনো দিন প্রত্যক্ষভাবে ঐ- সব রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েননি। কিন্তু গভীর মনোযোগ সহকারে ঐ- সব পারিবারিক ও রাজনৈতিক ঘটনা পরম্পরা নিরীক্ষণ করেছিলেন।

আনুমানিক ১৫৮৭ খ্রীস্টাব্দে (৯৯৫ হিজরা) গুলবদন তাঁর 'হুমায়ূন-নামা' গ্রন্থটি রচনা করেন। তিনি অত্যন্ত ধর্মশীলা, স্নেহময়ী ও কর্তব্যপরায়ণা মহিলা ছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিরাট গ্রন্থাগার, তাঁর অধ্যয়ন নিষ্ঠার পরিচয় দেয়। শুধু মাত্র হুমায়ূনের জীবনী নয়, ফার্সি ভাষায় ইনি অনেক ছোটো ছোটো কবিতাও রচনা করেছিলেন। উদাহরণ হিসাবে দুটি মাত্র ছত্র উল্লেখ করা হল—

"হর পরী বোর্ত, বা-আশিক্-ই-খুদ্ ইয়ার নীস্ত। /তূইয়াকীন মীদান্ কি হেচ্অজ্ উমর বর্ খুরদার নীস্ত।" অর্থাৎ— "নিজ প্রেমিকের প্রতি বিমুখ প্রত্যেক পরী। নিশ্চয় জানিয়ো যে. কেহই জীবন-রূপ ফল পূর্ণরূপে আস্বাদন করে না। অর্থাৎ জীবন নশ্বর তাহার মধ্যে যতটুকু পার সুখভোগ করিয়া লও।"[৬৪]

সলীমা সুলতান বেগম

এই মহিলা ছিলেন বাবরের দৌহিত্রী ও হুমায়ূনের বৈমাত্রেয় ভগিনীর কন্যা। শোনা যায়, সম্রাট আকবরের হারেমে ইনিই ছিলেন সর্বাপেক্ষা সুচতুরা, বুদ্ধিমতী ও বাক্পটু নারী। তাঁর বিবাহ হয়েছিল, সেনাপতি বয়রাম খাঁর সঙ্গে। কিন্তু বিবাহের মাত্র তিন বছরের মধ্যেই তাঁর স্বামী এক গুপ্ত ঘাতকের হাতে নিহত হন।

যথেষ্ট পড়াশুনা করে ইনি পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন এবং ফার্সি ভাষায় অনেক কবিতা রচনা করেছিলেন "মুখ্ফী" (গুপ্তব্যক্তি) এই ছদ্মনামে। সেকালে সলীমার রচিত একটি 'বয়েৎ' খুব জনপ্রিয় ছিল—

"কাকুলৎরা মন্ জেমস্তী রিস্তা-ই-জান-গোফ্তা আম্। /মস্ত বুদম্ জী সবব হর্ফই পরেশান্ গোফ্ তা আম্।" অর্থাৎ "মোহবশে তোমার চাঁচর কেশকে 'জীবন সূত্র' বলিয়াছি, ইহা উন্মত্ত প্রলাপ।"[৬৫]

মাহম্ আনগা

ইনি ছিলেন আকবরের ধাত্রী এবং সেকালের একজন উল্লেখযোগ্য শিক্ষিতা মহিলা। আকবরের হারেমে এঁর যথেষ্ট প্রভাব ছিল। এই বিদুষী মহিলা শিক্ষা প্রসার কামনায়, দিল্লীতে একটি মাদ্রাসা স্থাপন করিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে এই বিদ্যালয় বা মাদ্রাসাটি 'মাহম্ আনগার মাদ্রাসা' নামে পরিচিত হয়।

নূরজাহান

শুধু রূপলাবণ্যের জন্যই নূরজাহনের খ্যাতি ছিল— তা নয়, বুদ্ধিমত্তার দিকে থেকেও তিনি ছিলেন 'জগতের আলো'। জাহাঙ্গীরের জীবনে সকল কাজের প্রেবণা ছিলেন তিনি। এই নারীর জীবনকাহিনী খুবই আশ্চর্যজনক ও চমকপ্রদ। শোনা যায় পারস্যদেশ থেকে নূরজাহানের পিতা-মাতা যখন মরুভূমি অতিক্রম করে ভারতে আসছিলেন তখনই মরুপ্রান্তরে তাঁর জন্ম হয়। পিতা মীর্জা ঘিয়াস কন্যার নাম দিয়েছিলেন মেহেরুন্নিসা। জাহাঙ্গীর যখন 'কুমার সেলিম' ছিলেন, তখন তিনি মেহিরুন্নিসার অসামান্য রূপলাবণ্য দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। প্রথম যৌবনে মেহেরের বিবাহ হয় শের আফগানের সঙ্গে। কিন্তু সেলিম সিংহাসনে আরোহণ করে যখন 'জাহাঙ্গীর' হলেন, তখন তিনি কৌশলে শের আফগানকে হত্যা করিয়ে মেহেরকে বিবাহ করেন এবং নতুন নাম দিলেন 'নূরজাহান'। ঐতিহাসিকরা অনেকেই বলেছেন, জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে জাহাঙ্গীর নামে মাত্র 'বাদ্শা' ছিলেন— প্রকৃত রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব বহন করতেন নূরজাহান। প্রজাসাধারণ তাদের সম্রাজ্ঞীকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সম্মান করত। কোনো প্রার্থীকে বিফল মনোরথ হয়ে তাঁর কাছ থেকে ফিরে যেতে হত না। স্বইচ্ছায় ইনি প্রায় পাঁচশত অনাথ বালিকার বিবাহের ব্যয়ভার বহন করেছিলেন।

সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্না ও সুন্দরী এই নারীর বহুমুখী মৌলিক প্রতিভার কথা শুনতে পাওয়া যায়। 'অতর-ই-জাহাঙ্গীরী' নামে গোলাপের নির্যাস থেকে আতর তৈরি নাকি এঁরই কীর্তি। সাজপোশাক সম্বন্ধে ইতি অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। এঁর নির্দেশে নতুন নতুন অলংকাব ও পোশাক- পরিচ্ছদ নির্মিত হত। 'পেশোয়াজ' ও 'ওড়না' ব্যবহারের রীতি ইনিই প্রবর্তন করেন। নূরজাহান রন্ধন নিপুণাও ছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের খাদ্য তৈরি ও পরিবেশনের রীতি এবং ভোজনাগারকে অভিনব রূপে সুসজ্জিত করার পরিকল্পনা তাঁর ছিল বলে শুনতে পাওয়া যায়। সংগীত সাধনাতেও নৈপুণ্য অর্জন করেছিলেন। শিকারে ছিল তাঁর অব্যর্থ লক্ষ্য। তিনি নাকি চারটি বাঘকে নিজ হাতে গুলিবিদ্ধ করেছিলেন। এক সভাসদ এজন্য একটি দ্ব্যর্থবোধক কবিতা রচনা করেছিলেন তাঁর সম্পর্কে—

"নূর জাহান গর্‌চে বাসুরৎ জন্ অস্ত।
দর্ সফ্-ই- মর্দান জন-ই-শের আফকন অস্ত্।"

অর্থাৎ নূরজাহান আকৃতিতে স্ত্রীলোক হলেও বীরপুরুষদের মধ্যে তিনিই ব্যাঘ্রহন্ত্রী (অথবা বিশেষ অর্থে তিনি শের আফগানের স্ত্রী)।[৬৬]

নূরজাহান খুব ভালোভাবে আরবী ও ফার্সি ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন। ফার্সি ভাষায় তাঁর রচিত অনেক কবিতা আছে।

মমতাজমহল

সম্রাট শাহজাহান পত্নী সম্পর্কে একটি কথা মনে হয় যে, যদি তিনি শুধুমাত্র জগদ্‌বিখ্যাত সুন্দরীই হতেন, তাহলে কি সম্রাট গভীরভাবে তাঁকে ভালোবেসে 'তাজমহল' গড়ে যেতেন ? সম্ভবত তাঁর রূপের সঙ্গে গুণেরও আশ্চর্য সমন্বয় ঘটেছিল— তাই এত মর্যাদা পেয়েছেন তিনি। পতিব্রতা নারী ও স্নেহময়ী জননী ছাড়াও উদারতা, দয়াদাক্ষিণ্য ও বদান্যতা ও ছিল তাঁর চরিত্রে। মমতাজ বিদ্যানুরাগিণী ছিলেন এবং পারসিক বা ফার্সি ভাষায় রচিত তাঁর কিছু কবিতাও পাওয়া যায়।

জাহানারা

ইনি ছিলেন শাহজাহান ও মমতাজমহলের জ্যেষ্ঠা কন্যা। 'জহান্ আরা' বা 'জগতের অলংকার' তাঁর এই নামকরণ সকল দিক থেকেই সার্থক হয়েছিল। রূপের যেমন আকর ছিলেন, তেমনি আবার তাঁর নানা গুণেরও সীমা ছিল না। শিক্ষা, ধর্মবোধ, শিষ্টাচার ও সৌজন্যবোধ প্রভৃতি সকল দিক থেকেই যাতে তিনি শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারেন, সেজন্য খুব শৈশব কাল থেকেই তাঁর জন্য একজন উপযুক্ত শিক্ষিকা নিযুক্ত করেছিলেন মমতাজমহল; সেই শিক্ষিকার নাম সতীউন্নিসা। জাহানারা ছিলেন চিরকুমারী। তাঁর পিতৃভক্তির তুলনা নেই। বৃদ্ধ-বন্দী শাহজাহানকে তিনি মায়ের মতো যত্নে সেবা করতেন ও সাহচর্য এবং সান্ত্বনা দিতেন। জাহানারাব মধ্যে ছিল সূক্ষ্ম রাজনৈতিক প্রতিভা। সংযম ও মাধুর্যের সমন্বয়ে তাঁব চবিত্রে অনমমীয় দৃঢ়তার পরিচয়ও পাওয়া যায়। তাঁর হস্তাক্ষর ছিল নাকি মুক্তার মতো সুন্দর। ধর্ম সম্পর্কে জাহানারার খুব আগ্রহ ও নিষ্ঠা ছিল। তিনি অনেকগুলি ধর্মগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। সূফী ধর্মমতে ছিল তাঁর বিশ্বাস। আজমীরের বিখ্যাত সাধু মৈনুদ্দীন্ চিশ্‌তী ও তাঁর কয়েকজন শিষ্যের জীবন কাহিনী অবলম্বনে রচিত 'মুনিস্-উল-আরওলা' নামক গ্রন্থটি বিখ্যাত। ফার্সি ভাষায় রচিত কবিতাগুলিব মধ্যে তাঁব মনোবেদনার অন্তরঙ্গ পরিচয় ফুটে উঠেছে। দিল্লীর সেখ নিজামউদ্দীন আউলিয়ার বিশাল সমাধি প্রাঙ্গণের এককোণে, একটি স্বল্প পরিসর স্থানে জাহানারার কবর আছে। সেখানকার স্মৃতিফলকে উৎকীর্ণ আছে তাঁর নিজেরই রচিত একটি কবিতা—

'হু-আল্ হাই- আল কিউম্
বঘাএর্ সব্জা ন পোশদ্ কসে
মজার-ই-মরা
কে কবর্ পোস্ -ই-ঘরিবান্ ঃ

গিয়া ব সস্ত্।
আল্-ফকীরা অ.ল্-সনীয়া জহান্-আরা
মুরীদ্-ই-খ্বাজ্ গান্-ই-চিশ্‌তী
বিন্ত্-ই-শাহজহান্
বাদ্‌শাহ্ আনারুল্লা বুর্হানুহ্ সনে ১০৯২।"

অর্থাৎ—তিনি জীবন্ত আত্মসত্ত্ব। (কুরাণ তৃতীয় অধ্যায়)। আমার সমাধিতে তৃণ ভিন্ন কোনো (বহুমূল্য) আবরণে আবৃত কোরো না। দীন আত্মাদের পক্ষে এই তৃণই যথেষ্ট সমাধি-আবরণ। শাহ্‌জাহান-দুহিতা, চিশতী-সাধুদের শিষ্যা, বিনশ্বর ফকীরা জহান্-আরা—১০৯২ হিজ্‌রা।"[৬৭]

সতীউন্নিসা

পারস্যদেশের মাজেন্দ্রানের এক সম্ভ্রান্ত ঘরের কন্যা ছিলেন ইনি। এঁদের পরিবারের খ্যাতি ছিল পাণ্ডিত্য ও চিকিৎসাশাস্ত্রে দক্ষতার জন্য। গুণের জোরেই তাঁরা সুদূর পারস্য থেকে এদেশে এসে, আজও স্মরণীয় হয়ে আছেন। সতীর স্বামী ছিলেন বিখ্যাত চিকিৎসক। ভ্রাতা ছিলেন জাহাঙ্গীরের সভাকবি তালিক-ই-আমুলী। তিনি নিজে ছিলেন জাহানারার শিক্ষয়িত্রী।

জেবুন্নিসাবেগম

সম্রাট ঔরঙ্গজেবের একাধিক রূপবতী ও গুণবতী কন্যা ছিলেন। সকলের মধ্যে জ্যেষ্ঠা জেব্-উন্নিসা ছিলেন অতুলনীয়া। অবনীন্দ্রনাথ সকৌতুকে আক্ষেপ করেছেন--

"বাদশাহ ঔরঙ্গজেব— রস কোনো অবসর পেলো না যার অন্তরে প্রবেশ করতে— তারি অন্দরে জন্মালো সুরসিকা, সুকবি জেবুন্নিসা। বড় দুঃখের জীবন সে বহন করে গেল এবং সেই অতি বড় দুঃখই দিয়ে গেল তাকে কবির অমরত্ব...।"[৬৮]

জেবুন্নিসা ছিলেন মোগল সম্রাট আলমগীর ঔরঙ্গজেব ও দিল্‌রস্‌বানু বেগমের কন্যা। তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১০৪৮ হিজরী অর্থাৎ ১৬৩৬ খ্রীস্টাব্দে। বাদশাহী নিয়ম অনুসারে ধাত্রীদের উপর সন্তান পালনের ভার থাকত। জেবুন্নিসার ধাত্রী 'মিয়াবাঈ' ছিলেন একজন নিষ্ঠাবতী মুসলিম মহিলা। তাঁর কুরান পাঠ শুনে, বালিকা জেবুন্নিসার মুখস্থ হয়ে যায়। বাদশাহ ঔরঙ্গজেব একদিন কন্যার স্মরণ-শক্তির পরিচয় পেলেন এবং খুশি হয়ে তাকে ৩০ হাজার স্বর্ণ মুদ্রা পুরস্কার দিলেন। কন্যাকে নিয়মিত কোরান পড়াবার জন্য 'মরিয়ম' নামে এক স্ত্রীলোক 'হাফেজ' নিযুক্ত করলেন। আদ্যন্ত কোরান মুখস্থ করে জেবুন্নিসা নিজে 'হাফেজ' উপাধি লাভ করেন। এ ছাড়া তাঁর উপযুক্ত লেখাপড়া শেখার ব্যবস্থাও বলবৎ ছিল। আরবী ও ফার্সি উভয় ভাষাতেই জেবুন্নিসা কবিতা রচনা করেতন। ফার্সি ছিল তাঁর মাতৃভাষা। এই ভাষায় রচিত তাঁর দু-একটি কবিতার নমুনা দেওয়া যায়—

"দখ্‌তর্-এ-শাহম্ ওলেকিন্ রুব ফকর আউরদাঅম্
জেব্ ও জিনত্ বস্ হমীনম্ নাম-এ-মন্ জেবুন্নিসা।"

অনুবাদ— "বাদশাহের কন্যা আমি কিন্তু গরীবের রূপ ধরিয়াছি। বেশভূষা আমার এই— এরূপের যে আমি, আমার নাম 'জেবুন্নিসা' অর্থাৎ 'স্ত্রী-ভূষণ'।" ৬৯.

আর— একটি কবিতা—

"হরকস্ দর আমদ্ দর জাঁহা
আখির্ ব মত্‌লবহা রশিদ।
পীরশুদ জেবুন্নিসা
উ-র খরিদারে ন শুদ।"

অর্থাৎ—যে-কেউ সংসারে এসেছিল, সে-ই অবশেষে উদ্দেশ্য সিদ্ধি করে গেল; কিন্তু জেবুন্নিসা বৃদ্ধ হয়ে গেল, তবু তার খরিদার মিলল না; অর্থাৎ কারো সঙ্গে তার মিলন হল না।[৭০]

বহু মূল্যবান গ্রন্থের সংগ্রহ ছিল জেবুন্নিসার। ফার্সি ভাষা শিক্ষার প্রণালী সম্পর্কে একটি গ্রন্থ তিনি রচনা করেন 'জেবুন্‌মনশাত' নামে। তাঁর 'মখফী' ভণিতাযুক্ত কবিতাবলী 'দিওয়ান্-এ-মখ্‌ফী' নামে পরিচিত। জেবুন্নিসাবেগম তাঁর মহলে প্রায়ই 'মুশারা' বা কবি সম্মেলন আহ্বান করতেন। তবে নিজের শিক্ষক ভিন্ন অন্য কোনো পুরুষের সামনে তিনি যেতেন না। সুতরাং পর্দার আড়ালে বসেই, ঐ কবি সম্মেলনে যোগ দিতেন তিনি।

বাদশাহ কন্যাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন, এমন— কি সময় সময় রাজকার্য বিষয়ক জটিল সমস্যার সমাধানেও তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করতেন; তথাপি তিনি একবার সন্দেহের বশবর্তী হয়ে জেবুন্নিসাকে 'সলিমগড়' বা 'নূরগর' দুর্গে নজরবন্দী করে রেখেছিলেন। জেবুন্নিসার অপরাধ ছিল, সে তার বিদ্রোহী ভ্রাতা আকবরের সঙ্গে চিঠিপত্রের আদানপ্রদান করেছিল।

শোনা যায় পারস্যদেশীয় এক সুপুরুষ পণ্ডিতব্যক্তি— আকিল খাঁ ছিলেন জেবুন্নিসার প্রণয়ী। নিষ্ঠুর আওরঙ্গজেবের আদেশে শোচনীয় ভাবে তার মৃত্যু ঘটে। সেই শোকে মুহ্যমানা জেবুন্নিসার মৃত্যু হয় সম্ভবতঃ ১৬৬৮ খ্রীস্টাব্দে। লাহোরে তাঁর সমাধি মন্দিরের উপর লেখা আছে স্বরচিত কবিতা- -

'বর মজার-এ-মা গরীবাঁ নে চেরাগ ও নে গুলে
নেপার-এ-পরওয়ানয়ে ও নে সদা-এ-বুলবুলে'।

অনুবাদ—

'দীন আমি পতঙ্গের পক্ষ দহিবারে
জ্বলে না আলোক মম সমাধি আগারে।
আকর্ষিতে বুল্‌কুল্ আকুল সঙ্গীত
কোর না কুসুম দামে কবর ভূষিত।'

(সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)

মোগল হারেমে আরও অনেক রূপসী, বিদুষী ও গুণবতী মহিলা ছিলেন, তাঁদের সকলের

পরিচয় তুলে ধরা এখানে সম্ভব নয়। তবে আরও কয়েকজনের নাম করা যায়। যেমন 'জহান্-জেববানু' — শাহজাহানের জ্যেষ্ঠপুত্র দারাশিকোর কন্যা— এঁর ডাক নাম ছিল 'জানীবেগম'; 'বদরউন্নিসা'— সম্রাট আওরঙ্গজেবের তৃতীয়া কন্যা; প্রথম বাহাদুর শাহের পত্নী 'নুরউন্নিসা' — ইনি হিন্দীতে সুন্দর সুন্দর কবিতা রচনা করেছিলেন। এ ছাড়া বাদশাহ বা নবাবদের যাঁরা সভাসদ বা আমীর-ওমরাহ ছিলেন, তাঁদের ঘরের অন্তঃপুরিকারাও লেখাপড়া, শিল্পকলা, সাহিত্য ও সংগীতের যথেষ্ট চর্চা করতেন।

মধ্যযুগের কতিপয় সঙ্গীতজ্ঞা নারী

মধ্যযুগের ভারতীয় ইতিহাসে বেশ কয়েক জন সংগীত-নিপুণা নারীর কথা আমরা জানতে পারি। সাধিকা মীরাবাঈ-এর জীবনে, সংগীতই ছিল একমাত্র সাধনার অবলম্বন। তিনি নিজে তাঁর ইষ্ট দেবতা কৃষ্ণজীর উদ্দেশে সংগীত রচনা করতেন এবং তন্ময় হয়ে গাইতেন সেই গান।

সংগীতজ্ঞা রানী মৃগনয়নীর কথা শোনা যায়। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে গোয়ালিয়রের রাজা ছিলেন সংগীতপ্রেমিক মান। মৃগনয়নী ছিলেন তাঁরই রানী। জাতিগত দিক থেকে এঁরা ছিলেন গুজরাটি। স্বামী হরিদাস ছিলেন এঁদের গুরু। তাঁর কাছে সংগীত শিক্ষার উদ্দেশ্যে, প্রায়ই তাঁরা যেতেন বৃন্দাবনে। রাজার মৃত্যুর পর রাণী দীর্ঘ পঁচিশ বছর বেঁচে ছিলেন, তখন তাঁর একমাত্র কাজ ছিল গান গাওয়া ও অন্যকে গান শেখানো। কিম্বদন্তীমূলক কাহিনী থেকে জানা যায়, মিয়া তানসেনের সংগীত প্রতিভা বিকাশের ক্ষেত্রে, রানী মৃগনয়নীর কৃতিত্ব কম নয়। রানীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্য, তানসেন রানীকে সম্বোধন করে অনেকগুলি ধ্রুপদ গান রচনা করেছিলেন।[৭১]

এই সময়কার আর- একজন সংগীত পারদর্শিনী হলেন— রানী রূপমতী। মালবরাজ বজবাহাদুর ও রূপমতীর প্রেম কাহিনী নিয়ে একাধিক হিন্দীকাব্য রচিত হয়েছে। এই রূপমতী ও তানসেন এঁরাও সংগীত শিক্ষা করেছিলেন হরিদাস স্বামীর কাছে।

মৃগনয়নীর এক সংগীতসিদ্ধা শিষ্যা প্রেমকুমারী বা 'হোসেনী-ব্রাহ্মণী'। গোয়ালিয়রে ইনি মৃগনয়নীর কাছে গান শিখতেন। সেই সংগীতচর্চার সূত্র ধরেই তানসেন, যাঁর পূর্বনাম ছিল 'রামতনু'— তাঁর সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়। রানী মৃগনয়নীর সহায়তায় তাঁদের বিবাহ সংঘটিত হয়। সেই প্রেমকুমারী, ধর্মান্তরিতা হয়ে হলেন 'হোসেনী-ব্রাহ্মণী' অর্থাৎ মিয়া তানসেনের সহধর্মিণী।

হিন্দুস্থানী সংগীতে অন্যতম দিকপাল তানসেনের কন্যা সরস্বতীও ছিলেন অসাধারণ সংগীতপ্রতিভার অধিকারিণী।

মধ্যযুগে ভারতে নারীরা যে শিক্ষা- সভ্যতা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়লেন, তার প্রধান কারণ হিসাবে অনুমান করা যায়, নিরপত্তার অভাব। বিদেশী ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের হাতে ছিল তখন শাসন ক্ষমতা। একের পর এক লুণ্ঠনকারীদের আক্রমণে নানা বিপর্যয়ের সঙ্গে নারীরা

নানাভাবে নির্যাতিত হয়েছিলেন। একাদশ শতাব্দীতে এলেন গজনীর সুলতান মামুদ, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মোঙ্গল লুণ্ঠনকারী চেঙ্গিস খান, চতুর্দশ শতাব্দীতে এলেন তুর্কী-চাঘতাই লুন্ঠনকাবী তৈমুর লঙ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে পারস্য থেকে এলেন নাদির শাহ। বার বার এদের আক্রমণে ও পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড ও লুণ্ঠন চলেছিল— নারীহরণ ও ধর্ষণের সীমা সংখ্যা ছিল না। স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা একান্তভাবে অন্তঃপুরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলেন। এইভাবে বেশ– কিছুকালের জন্য তাঁদের জীবনে উন্নতির পথ নিরুদ্ধ হল।

নির্দেশিকা

প্রথম পরিচ্ছেদ

১। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, (জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ) খণ্ড ৯, পৃ. ৩৩

২। শশিভূষণ দাশগুপ্ত, 'ভারতের শক্তি সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য' (১ম সংস্কবণ, ১২৬৭ বঙ্গাব্দ)। নিবেদন অংশ। পৃ. - ?।

৩। সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধায়, 'তন্ত্রের কথা'— (প্রথম প্রকাশ - ১৯৭৮), পৃ. ১২৬।

৪। স্বামী অভেদানন্দ 'হিন্দু নারী' (শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তমঠ), ৪র্থ সংস্করণ-১৩৬৮ বঙ্গাব্দ) পৃ. ৮৯।

৫। তদেব, পৃ. ২২।

৬। সুকুমার সেন, 'বিচিত্র সাহিত্য' (২য় খণ্ড), "বাংলায় নারীর ভাষা" নামক প্রবন্ধ,

৭। 'দুই বোন'— রবীন্দ্র রচনাবলী ৯ম খণ্ড জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, পৃ. ৭৯৭।

৮। স্বামী অভেদানন্দ, 'হিন্দুনারী' পৃ. -১৮০।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

৯। ঋগ্বেদ সংহিতা ১ম খণ্ড (হরফ প্রকাশনী) ৫।২৫।৫, পৃ. ৪৭৪; ঋগ্বেদ সংহিতা ২য় খণ্ড হরফ প্রকাশনী, পৃ ৬৫৯; অথর্ববেদ সংহিতা (হরফ প্রকাশনী), ৩।১।৩ পৃ. ৭৪; ৬।২।৩ পৃ. ১৮৪

১০। রমেশচন্দ্র মজুমদার, 'বিদ্যাসাগর : বাংলা গদ্যের সূচনা ও ভারতের নারী প্রগতি' "স্মৃতিশাস্ত্রের যুগে ভারতীয় নারী" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

১১। সুকুমার সেন, 'বিচিত্র সাহিত্য'— । ২য় খণ্ড, পৃ. ২০১

১২। স্বামী সোমেশ্বরানন্দ, 'ধর্ম কুসংস্কার ও লোকাচার' (রামকৃষ্ণ মিশন), "কুসংস্কার" প্রবন্ধ, পৃ. ১৫।

১৩। Arthur Avalon, *Mahanirvana Tantra*, p. 187.

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১৪। *The Status of Women in Ancient India* (2nd edition– 1995), p. 22

১৫। ক্ষিতিমোহন সেন, 'প্রাচীন ভারতে নারী' (সংস্করণ- ১৩৫৭), পৃ. ২৩

১৬। তদেব, পৃ. ৬

১৭। স্বামী অভেদানন্দ, 'হিন্দুনারী', শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ পৃ. ১০

১৮। বাণী চক্রবর্তী, 'সমাজ সংস্কারক রঘুনন্দন', পৃ. ১২০

১৯। ক্ষিতিমোহন সেন, 'প্রাচীন ভারতে নারী', পৃ. ৭

২০। তদেব, পৃ. ৫

২১। তদেব, পৃ. ৪

২২। Dr. Roma Chowdhuri, "Women's Education in Ancient India", in *Great Women of India,* 2nd edition, 1982

২৩। স্বামী অভেদানন্দ, 'হিন্দুনারী' 'পরিশিষ্ট', সং, পৃ. ১৬৯

২৪। মনোনীত সেন, 'প্রাতঃস্মরণীয়া পঞ্চকন্যা', (১ম সংস্করণ ১৯৬০, পৃ. ১০১

২৫। ক্ষিতিমোহন সেন, 'প্রাচীন ভারতে নারী', পৃ. ৫০-৫১

২৬। D. C. Sirkar, "Great Women in North India" *in Great Women of India*, p. 286.

২৭। (ক) Ibid., p. 207–88

২৭। (খ) 'ভারতকোষ', চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৫৩

২৮। R. C. Mazumdar, H.C. Roychaudhiri and Kalikinkar Dutta, *An Advanced History of India* (3rd Edition), p. 189

২৯। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'চিত্রাঙ্গদা' (কাব্যনাট্য) রবীন্দ্র-রচনাবলী। (জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ) ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪৭০।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

৩০। স্বামী অভেদানন্দ, 'হিন্দুনারী', পৃ. ১৫০-৫১

৩১। Dr. Roma Chowdhuri, "Women's Education in Ancient India" by *Great Women of India* (2nd Edition), p. 107.

৩২। Umakant. Ifidi, "Great Women in Jainism"

৩৩। শ্রীমতী হীরাকুমারী বোথরী, 'পুণ্যশীলা জৈন নারী' (প্রবন্ধ), 'উদ্বোধন পত্রিকা' শ্রীশ্রীমা শতবর্ষ জয়ন্তী সংখ্যা, (১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দ) পৃ. ১২২।

৩৪। ঈশানচন্দ্র ঘোষ অনূদিত, 'জাতকের পুরাতত্ত্ব' (নারীজাতি) (পুনর্মুদ্রণ, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ) ২য় খণ্ড। ভূমিকা অংশ পৃ. ২২।

৩৫। ড. বিমলাচরণ লাহা, 'বৌদ্ধ রমণী', (১৯২৯ খ্রী.) পৃ. ৭৫।

৩৬। ধর্মনন্দ কোসাম্বী, 'ভগবান বুদ্ধ', চন্দ্রোদয় ভটাচার্য -অনুদিত (সাহিত্য একাডেমী) পৃ. ৬৩।

৩৭। ড. বিমলাচরণ লাহা, 'বৌদ্ধ রমণী' (১৯২৯ খ্রী.)

৩৮। তদেব, পৃ. ৮২

৩৯। ভিক্ষু শীলভদ্র, 'থেরীগাথা', পৃ. ৫৮-৬২

৪০। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, 'ভারতমহিলা', পৃ. ৬৭।

৪১। Dr. N. K. Dutta, "The Spread of Buddhism"

৪২। স্বামী অভেদানন্দ, 'হিন্দু নারী', পৃ. ১৪৮

৪৩। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, 'ভারত মহিলা', (১৯৬৫) পৃ. ৬৯।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

৪৪। ঋগ্বেদসংহিতা। ১ম ও ২য় খণ্ড। হরফ প্রকাশনী মূল উদ্ধৃতিগুলি এই গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত।

৪৫। কবিতাবলী। সংস্কৃত ও প্রাকৃত (নারী কবিগণ কর্তৃক রচিত)-রমা চৌধুরী - অনুদিত। (বিশ্বভারতী। প্রথম সংস্করণ। ১৩৫৩)

৪৬। বিস্তৃত পরিচয় দ্রষ্টব্য— "The Contribution of women to Sanaskrit Literature" (Part A: Select Verses) Vol. II– "Sanskrit Poetesses" (With a supplement of Prakrit Poetesses), ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী - সম্পাদিত।

৪৭। ভিক্ষুশীলভদ্র 'থেরী গাথা' (মহাবোধি সোসাইটি) দ্বিতীয় সংস্করণ। ডঃ নলিনাক্ষ দত্ত - রচিত 'মুখবন্ধ' (পৃষ্ঠা ।।) অংশ থেকে উদ্ধৃত।

৪৮। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত 'ভারত মহিলা' (বৌদ্ধযুগ) পৃ. ৭৫

৪৯। যে -সব গ্রন্থের সাহায্যে এই অংশটি রচিত হয়েছে সেগুলি হল :

ক) Dr. J.B. Chaudhuri. Ed., "The Contribution of women to Sanskrit Literature"– *Sanskrit and Prakrit Poetesses*–Part A.

খ) রমা চৌধুরী কর্তৃক অনূদিত, 'কবিতাবলী' (সংস্কৃত ও প্রাকৃত)

গ) ভিক্ষুশীলভদ্র প্রণীত 'থেরী গাথা'— (মহাবোধি সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত)

ঘ) বিজয়রত্ন মজুমদার রচিত কাব্যানুবাদ 'থেরীগাথা'—

ঙ) ডক্টর রাধাগোবিন্দ বসাক, সাতবাহন নরপতি হালের গাথা সপ্তশতী— (১৯৫৬) — (মুলসহ সমগ্র অনুবাদ)

চ) অধ্যাপক পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য, 'গাহা সপ্ত সঈ'— (মুলসহ কাব্যানুবাদ)—

ছ) ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, বিদ্যাসাগর ঃ বাংলা গদ্যের সূচনা ও ভারতের নারী প্রগতি—

জ) ডঃ সুকুমার সেন, 'ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস'—

ঝ) অনুরূপাদেবী 'সাহিত্যে নারী— স্রষ্ট্রী ও সৃষ্টি'— (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

৫০। জ্যোতির্ময়ী দেবী, 'রাজা-রাণীর যুগ', 'নারী শালা — হারেম নারী' অধ্যায়টি দ্রষ্টব্য, পৃ. ৬৯-৭৩

৫১। ক্ষিতিমোহন সেন, 'প্রাচীন ভারতে নারী', পৃ. ১২-১৩

৫২। ইন্দ্রনাথ দে, সম্পাদিত ও অনূদিত - 'মীরাপদ শতদল' (সংগীত সঙ্কলন)

৫৩। শঙ্করনাথ রায়। 'ভারতের সাধিকা', ১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ, পৃ. ১০

৫৪। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, 'ভারতীয় বিদুষী', ২য় সংস্করণ ১৩১৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৮৫-৯১।

৫৫। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'মোগলযুগের স্ত্রী শিক্ষা', । অধ্যাপক যদুনাথ সরকার - রচিত 'ভূমিকা' অংশ থেকে উদ্ধৃত।

৫৬। ড. যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী, "ভারতীয় আঞ্চলিক বিভিন্ন ভাষায় নারীভক্ত কবি"— (প্রবন্ধ), 'উদ্বোধন' পত্রিকা (শ্রী শ্রী মা- শতবর্ষ জয়ন্তী সংখ্যা)।

৫৭। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, 'ভারতীয় বিদুষী', পৃ. ৯৩-৯৮ ।

৫৮। ড. মাখনলাল রায়চৌধুরী শাস্ত্রী, 'ভারতবর্ষের ইতিহাস (মধ্যযুগ)', (১৩৬৯ বঙ্গাব্দ) পৃ. ৫০-৫১

৫৯। তদেব, পৃ. ৩২৬

৬০। 'ভারতকোষ' ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৩-৯৪।

৬১। 'ভারতকোষ', ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪৪৮।

৬২। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'মোগলযুগের স্ত্রী শিক্ষা', অধ্যাপক যদুনাথ সরকার রচিত- 'ভূমিকা' অংশ থেকে গৃহীত।

৬৩। মওলানা মহম্মদ তাহের সাহেব, 'রমণীর মান', ২য় সংস্করণ।

৬৪। 'জেবুন্নিসা বেগম', সমরেন্দ্রচন্দ্র দেবশর্মা, (১৩৩৬ বঙ্গাব্দ), অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর - রচিত ভূমিকা' অংশ থেকে গৃহীত, পৃ. ১

৬৫। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'মোগলযুগের স্ত্রী শিক্ষা'।

৬৬। তদেব

৬৭। তদেব

৬৮। তদেব

৬৯। সমরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা, 'জেবুন্নিসা বেগম', ভূমিকা, পৃ. ১-১।

৭০। তদেব, পৃ. ১০।

৭১। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, 'ভারতীয় বিদুষী', ২য় সংস্করণ, ১৩১৭ বঙ্গাব্দ।

৭২। বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ও প্রফুল্লকুমার দাস, 'হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ইতিহাস', ২য় সংস্করণ। (১৯৬৫ খ্রী.) পৃ. ২৯।



দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বঙ্গীয় সংস্কৃতিতে নারী

উনিশ শতকের সংস্কৃতি ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে বঙ্গনারীর অবদান সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে, প্রথমে জানতে হবে বাঙালি জাতির উদ্ভব ও তার ক্রমবিকাশের ধারার রেখাচিত্রটি। তবেই বুঝতে পারা যাবে কোন্ পশ্চাৎপটের উপর ফুটে উঠেছিল এদেশের নারীর মৌলিক রূপটি।

বাঙালি জাতি ও তার বৈশিষ্ট্য

বাঙালি জাতির জন্মক্ষণটি সম্পর্কে সঠিক হিসাব কেউ এ পর্যন্ত দিতে পারেন নি । কিন্তু বর্ণ সাঙ্কর্যের দ্বারাই যে এই জাতির উদ্ভব ঘটেছে, এ কথা নিঃসংশয়ে ঘোষণা করেছেন নৃতাত্ত্বিকেরা। অনার্য—অস্ট্রিক, নেগ্রিটো, প্রোটো অস্ট্রালয়েড, দ্রাবিড় প্রভৃতি জাতির সঙ্গে পরবর্তীকালে কিছু পরিমাণে আর্যরক্তের সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছিল বাঙালি জাতি। ভিন্ন জাতিরূপে পরিগণিত হবার পরে, ধীরে ধীরে দেখা দিতে লাগল—জাতিগত বৈশিষ্ট্য বা স্বাতন্ত্র্য। সেই কারণে বাঙালিরা—ভারতীয় হয়েও, নিজস্ব বৈশিষ্ট্যর ভিত্তিতে কিছু পরিমাণ স্বাতন্ত্র্যের দাবি রাখেন।

যতদূর জানা যায়, আর্যকরণের পূর্বেই, একাধিক আর্যেতর জাতির সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিল বাঙালি জাতি। যে সময়ে বঙ্গের অধিবাসীরা আর্যদের কাছে ছিলেন ব্রাত্য ও অপাঙ্‌ক্তেয়। ভারতের পূর্ব অঞ্চলের অধিবাসীদের ভাষা যে আর্যদের কাছে দুর্বোধ্য ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় ঐতরেয় ব্রাহ্মণের মধ্যে। 'বয়াংসি বঙ্গবগধাশ্চের পাদাঃ' অর্থাৎ বঙ্গ, মগধ, চের ও পাণ্ড্যের অধিবাসীদের এঁরা পক্ষী জাতীয় বলে মনে করতেন।[১] প্রথম দিকে এই অঞ্চলের বিভিন্ন নাম পাওয়া যায়— সুহ্ম, ব্রহ্ম, বঙ্গ, গৌড় ইত্যাদি। তবে 'বঙ্গ' নামটির প্রথম সংশয়াতীত উল্লেখ দেখা যায় বৌধায়নের ধর্মসূত্রে!

পেরিপ্লাস-রচিত গ্রন্থে ও গ্রীক-ভূ-বিজ্ঞানী টলেমির বিবরণে আছে, 'গঙ্গারিদই' বা 'গঙ্গারীড' জাতির কথা। খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে গ্রীক বীর আলেকজান্ডার দিগ্‌বিজয় করতে বেরিয়ে ভারতের উত্তর-পশ্চিম অংশে এসে শুনেছিলেন এদের কথা।[২]

উপযুক্ত তথ্যের অভাবে প্রাচীন বঙ্গের বিস্তারিত ধারাবাহিক ইতিহাস আজও অজানাই থেকে গেছে। বিচ্ছিন্ন কিছু কিছু উপাদানের সাহায্যে ও অনুমানের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে এদেশের প্রাচীনযুগের ইতিহাস। ভারতে মৌর্য অধিকার বিস্তৃত হবার পর থেকে বঙ্গের ধারাবাহিক ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায়। এই সময় থেকে প্রকৃত ঐতিহাসিক যুগের আরম্ভ বলা যেতে পারে।

নানা আঘাত-সংঘাত গ্রহণ-বর্জন ও সংমিশ্রণের ফলে বাঙালির মনে দেখা দিয়েছে সমন্বয়বাদী মনোভাব। আজও বাঙালির সভ্যতা সংস্কৃতি, আচার–আচরণের মধ্যে মিশে আছে, আদিম অধিবাসীদের বেশ–কিছু রীতি-নীতি, চাল-চলন ও মনোভাব। যেমন ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে অনার্যদের ভক্তি-বিশ্বাস, পূজা-অর্চনার ধারার সঙ্গে এসে মিশে গেছে, আর্যদের যাগ-যজ্ঞ বিধি। নদীমাতৃক বঙ্গভূমি প্রধানত ছিল কৃষি-নির্ভর ও বাণিজ্য প্রধান। প্রকৃতির অকৃপণ দানে শস্যশ্যামলা এই দেশের মানুষগুলি হয়ে উঠেছিল কিছু পরিমাণে অলস প্রকৃতির ও বিলাসপ্রবণ। মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ তাদের মনকে করে তুলেছিল কল্পনাবিলাসী ও ভাবপ্রবণ। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও, অবসর সময়ে তাঁরা সাহিত্য, সংগীত ও শিল্পের চর্চা করতেন। উদার আতিথেয়তার গুণে, বাঙালিরা কোনোদিন বিদেশীদের সন্দেহের চোখে দেখেন নি— অন্যান্য ভারতীয়দের মতোই।

গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, পদ্মা, তিস্তা, ব্রহ্মপুত্র ইত্যাদি বড়ো বড়ো নদীগুলির তীরে গড়ে উঠেছিল অনেক জনপদ ও বর্ধিষ্ণু সব গ্রাম, কালক্রমে ·দীর গতিপথের পরিবর্তনের সঙ্গে আবার কোথায় হারিয়ে গেছে সেই সব সমৃদ্ধ নগরী বন্দর ও গ্রামগুলি। মোটামুটি ভাবে হিসাব নিলে দেখা যাবে যে, বঙ্গের উত্তরে ছিল গৌড়, পুণ্ড্রবর্ধন ও বরেন্দ্রভূমি; পূর্ব ও দক্ষিণে ছিল সমতট, হরিকেল, বঙ্গ বা বঙ্গাল; পশ্চিমে ছিল রাঢ় ও তাম্রলিপ্তি।

খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে রাজা চন্দ্রবর্মা এদেশে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করে গেছেন, তার পরিচয় পাওয়া যায় বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পাহাড়ের শিলালিপিতে। পরবর্তী কালে সপ্তম শতাব্দীতে রাজা শশাঙ্ক ছিলেন সার্বভৌম নরপতি। বহরমপুরের নিকটে কর্ণ সুবর্ণ ছিল তাঁর রাজধানী। ইনি সম্ভবত ছিলেন শৈব ধর্মাবলম্বী। তারপর দীর্ঘকাল ধরে চলেছিল 'ম্যাৎস্যন্যায়'। অষ্টম শতাব্দীতে গোপাল প্রতিষ্ঠা করলেন পালবংশের। পাল রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষক। এঁরা ছিলেন পরধর্মসহিষ্ণু, উদারপন্থী ও সুদক্ষ শাসক। দেশে শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করলেন তাঁরা এবং সেইসঙ্গে সামাজিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ঘটল প্রভূত উন্নতি।

একাদশ শতাব্দীতে কর্ণাটদেশীয় সেনবংশীয়েরা রাজত্ব শুরু করেন। এঁরা ছিলেন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সমর্থক। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষদিকে অকস্মাৎ তুর্কী আক্রমণের ফলে এদেশের মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হল। বক্তিয়ার খিলজি বঙ্গদেশ জয় করলেন— তখন দিল্লীর সিংহাসনে রাজত্ব করছিলেন সুলতান কুতুবুদ্দিন। তুর্কী আক্রমণের সঙ্গে এদেশে প্রাচীন যুগের অবসান ঘটল ও মধ্যযুগের সূচনা হল। বেশ-কিছুকাল ধরে তুর্কী আফগান, মোগল ইত্যাদি ইসলামী শাসন চলল। তারপর ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দী থেকে পর্তুগীজ, ইংরেজ, ফরাসি, ওলন্দাজ, দিনেমার, জার্মান প্রভৃতি একাধিক ইউরোপীয় জাতি, বাণিজ্য সূত্রে এবং খ্রীস্ট ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যেই প্রথম এসেছিল। তাদের নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলত, এদেশে আধিপত্য বিস্তারের জন্য। শেষ পর্যন্ত শক্তি পরীক্ষায় ইংরেজরা জয়ী হল। পলাশীর যুদ্ধে (১৭৫৭

খ্রীস্টাব্দে) নবাবী শাসনের অবসান হল—শুরু হল ইংরেজের প্রভুত্ব। এখান থেকেই আধুনিক যুগের সূত্রপাত হল।

বঙ্গীয় সংস্কৃতির পরিচয় সূত্র

প্রাচীন দিনের কিছু শিলালিপি, মুদ্রা, দেবদেবীর মূর্তিসমূহ, নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক তথ্য উদ্‌ঘাটনে সাহায্য করেছে। সংস্কৃত প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষায় রচিত শাস্ত্রসমূহ-- স্মৃতিশাস্ত্র, পুরাণ, চর্যাপদ, দোঁহাকোষ, সদুক্তিকর্ণামৃত, প্রাকৃত-পৈঙ্গল, রামচরিত, পবনদূত ইত্যাদি কাব্যে তৎকালীন বাংলা ও বাঙালি জাতির বেশ-কিছু পরিচয় নিহিত আছে। তা ছাড়া বিভিন্ন যুগে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বহু পর্যটক এসেছেন এদেশে— তাঁদের রচিত বিবরণী এবং বাৎস্যায়ন--রচিত 'কামসূত্র', পাণিনি-রচিত 'অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণ', কৌটিল্যের রচিত 'অর্থশাস্ত্র' প্রভৃতি গ্রন্থে আমরা গুপ্তপূর্ব ও গুপ্তযুগের বঙ্গের জীবনযাত্রা প্রণালী ও তখনকার নরনারীদের সম্পর্কে অনেক সংবাদ পাই।

সংস্কৃতির দুই ধারা—অভিজাত ও লৌকিক

সকল দেশের সংস্কৃতিতেঃ থাকে দুটি ধারা— অভিজাত ও লৌকিক। বড়ো বড়ো পণ্ডিত ও প্রতিভাবান ব্যক্তির সহায়তায়— ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, শিল্প ও সংগীতের অভিজাত ধারাটি গড়ে ওঠে— যেখানে ফুটে ওঠে জাতির অন্তরতম, চিরন্তন ও সর্বাঙ্গীণ পরিচয়। অন্যদিকে আপামর জনসাধারণের মধ্যে গড়ে ওঠে স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণবান লৌকিক সংস্কৃতির ধারাটি। লোক-সাহিত্য, শিল্প, সংগীত, নৃত্য-নাটকের মধ্যে একটি ভিন্নতর রূপের পরিচয় পাওয়া যায়। দুই ধারাই সমান্তরালভাবে চিরপ্রবহমান থাকে। বঙ্গ-সংস্কৃতিতেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি।

সংস্কৃতি বিবর্তনশীল

প্রাণবান একটি প্রাণীর মতো সংস্কৃতিও বিবর্তনশীল। সকল দেশে ও কালে সংস্কৃতি পরিবর্তিত হয়। বঙ্গীয় সংস্কৃতিতেও এই জাতীয় বিবর্তনধারা পরিলক্ষিত হয়। বঙ্গের প্রাচীন যুগ বলতে আমরা প্রধানত বুঝে থাকি—অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত কালসীমাকে অর্থাৎ পাল ও সেন রাজাদের আমলকে। সেকালে প্রধানত ধর্মের ভিত্তিতেই নিয়ন্ত্রিত হত জনজীবন। পাল রাজারা ছিলেন উদার মতাবলম্বী। এটি ছিল সমৃদ্ধির যুগ। পাল রাজাদের সময়ে বৌদ্ধ, জৈন ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সম্মিলিত রূপ ও শান্তিপূর্ণ জীবনের কথা জানা যায়। পাল রাজাদের পর এলেন সেন রাজারা। এঁরা ছিলেন ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষক।

মধ্য যুগের আরম্ভ তুর্কী আক্রমণের পর। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এর সময়সীমা। বৈষ্ণব ও শাক্তধর্ম ছাড়াও, এ সময়ে ছিল নানা লৌকিক দেবদেবীর প্রাধান্য। ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের রাজত্বকালে দেশীয় মানুষের মনে, ধর্ম ও সংস্কৃতি নাশের প্রবল ভয় দেখা দিল। তার ফলে নিজেদের ধর্ম ও সংস্কারকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরার একটা প্রবল

আকাঙ্ক্ষা ও প্রবণতা দেখা গেল। 'কূর্মবৃত্তি' অবলম্বনের ফলে তাঁরা নিজেদের নিপীড়িত করে ফেলেছেন অনেক পরিমাণে। সেইসঙ্গে নারী সমাজে দেখা গেছে মহাসংকট। নানা ধরণের কঠোর বিধি-নিষেধের নিগড়ে তাঁরা বাঁধা পড়ে গেছেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে যখন ইংরেজ শাসন দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হল, তখন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবধারার সংঘর্ষে একই সঙ্গে দেখা দিল আধুনিক যুগ ও নবজাগরণ বা 'রেনেসাঁ। তারই সঙ্গে বঙ্গীয় নারী জীবনে দেখা দিল পরিবর্তন ও প্রগতির ঢেউ।

২

প্রাক্-আধুনিক যুগের বঙ্গীয় নারী সমাজ

বঙ্গবাসীর জীবনে কিছু পরিমাণে শৌর্যবীর্যের পরিচয় পাওয়া গেলেও সে যে গৃহগত-প্রাণ, এ কথা প্রায় সর্বজনবিদিত। গৃহের কেন্দ্রে যাঁরা অবস্থান করতেন, সেই নারীদের অধিকার সেকালে গৃহের বাইরে বিস্তৃত হবার সুযোগ না থাকলেও, ঘরের চৌহদ্দির ভিতরে ছিল তাঁদের অখণ্ড প্রতাপ। এর একটা কারণ হয়তো এই যে, অনার্য জাতির সমাজ ও সংসার ছিল মাতৃপ্রধান। কালক্রমে তারই ক্ষীণ প্রভাব থাকা অসম্ভব নয়। এ সম্পর্কে বাঙালি জাতির ইতিহাসকার বলেছেন-- "প্রাচীন বংলার প্রতিমা-সাক্ষ্যে দেখা যায়, উমা-মহশ্বেরের যুগল মূর্তিরূপ এবং শিবের বৈবাহিক বা কল্যাণসুন্দররূপ সমসাময়িক বাঙালির হৃদয়াবেগ ও চিত্তেব স্পর্শাল্পতা প্রত্যক্ষগোচর, তেমনই অন্যদিকে বাঙালি চিত্তে নারীর প্রাধান্য ও নারী-ভাবনার প্রসারও সমান প্রত্যক্ষ।[৩]"

আমাদের ধর্ম-কর্মের অনুষ্ঠানে মূর্তিপূজা প্রাধান্য পেয়েছে এবং পুরুষদেবতা অপেক্ষা নারীদেবতার আধিক্য দেখা যায়। কাবণ হিসাবে বলা যায়, মাতৃকাতন্ত্রের দেবী মূর্তির প্রতি বাঙালির গভীর আস্থা। ঠিক এই জাতীয় প্রবণতাই আমাদের সাংসারিক জীবনেও দেখা যায়। গার্হস্থ্য জীবনে নারীর একাধিপত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সত্য অথচ সরস মন্তব্যটি স্মর্তব্য --

"একটা কথা মনে রাখিতে হইবে, বঙ্গদেশে পুরুষের কোনো কাজ নাই। এ দেশে গার্হস্থ্য ছাড়া আর কিছু নাই, সেই গৃহগঠন এবং গৃহবিচ্ছেদ স্ত্রীলোকেই করিয়া থাকে। আমাদের দেশে ভালোমন্দ সমস্ত শক্তি স্ত্রীলোকের হাতে; আমাদের রমণীরা সেই শক্তি চিরকাল চালনা করিয়া আসিয়াছে। একটি ক্ষুদ্র ছিপ্‌ছিপে তক্‌তকে স্টীমনৌকা যেমন বৃহৎ বোঝাই-ভরা গাধা বোটটাকে স্রোতের অনুকূলে ও প্রতিকূলে টানিয়া লইয়া চলে, তেমনি আমাদের দেশীয় গৃহিণী লোকলৌকিকতা আত্মীয় কুটুম্বিতা -পরিপূর্ণ বৃহৎ সংসার এবং স্বামী নামক একটি চলৎশক্তিরহিত অনাবশ্যক বোঝা পশ্চাতে টানিয়া লইয়া আসিয়াছে। অন্য দেশে পুরুষেরা সন্ধিবিগ্রহ রাজ্যচালনা প্রভৃতি বড়ো বড়ো পুরুষোচিত কার্যে বহুকাল ব্যাপৃত থাকিয়া নাবীদের হইতে স্বতন্ত্র একটি প্রকৃতি গঠিত করিয়া তোলে। আমাদের দেশে পুরুষেরা গৃহপালিত, মাতৃলালিত, পত্নীচালিত।[৪]"

লক্ষ্মীমন্ত, পতিব্রতা ও কল্যাণী বধূ ও ধরিত্রীর মতো সর্বংসহা মাতা হওয়াই ছিল, এদেশের নারীজীবনের চিরদিনের আদর্শ। শৈশবে পঞ্চম বর্ষের বালিকা বয়স থেকেই নানা বারব্রত পালনের মধ্য দিয়ে চলত এর মানসিক প্রস্তুতি। প্রায় আজীবন সংকল্প গ্রহণের মতোই বার বার তাদের মুখে উচ্চারিত হত ব্রতের মন্ত্রতন্ত্রগুলি। সে–সব কথা ও ভাবগুলি তাদের মনে ও হৃদয়ে গাঁথা হয়ে থাকত। উদাহরণস্বরূপ এই জাতীয় একটি মন্ত্রের উল্লেখ করা যায়—

"সীতার মতন সতী হব,
রামচন্দ্রের মতো পতি পাব,
লক্ষ্মণের মতো দেওর হবে,
কৌশল্যার মতো শাশুড়ী হবে,
দশরথের মতো শ্বশুর হবে,
পতির কোলে পুত্র দোলে,
একগলা গঙ্গা জলে
মরণ হোক হরির চরণতলে।"

এ দেশের কন্যা বা বধূরা নিজেদের জন্য কোনোদিনই খুব একটা আকাশচুম্বী রঙিন স্বপ্ন বা উচ্চাকাঙ্ক্ষা মনের মধ্যে পোষণ করতেন না। যেমন 'অন্নদামঙ্গলে'র ঈশ্বরী পাটনীর আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছিল ছদ্মবেশী অন্নদাদেবীর কাছে— 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে' — এও যেন সেই রকম। বাঙালি মেয়েদের কাম্য ছিল সহজ সরল সুখ ও শান্তিপূর্ণ সৎ ও সার্থক একরঙা জীবন।

অতীত বঙ্গের বিস্তৃত পরিচয় জানা যায় না বটে, তবে বিভিন্ন সূত্র থেকে বিক্ষিপ্ত কিছু পরিচয় ধরা পড়ে। বঙ্গের নারীরা প্রাচীন দিনেও তাদের মধুর স্বভাবের জন্য সুখ্যাতি লাভ করেছিলেন তার প্রমাণ মেলে বাৎস্যায়নের 'কামসূত্রে'। "বাৎস্যায়ন তাহাদিগকে [বঙ্গনারীদের] মৃদুভাষিণী কোমলাঙ্গী ও অনুরাগবতী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।"[৫] সেকালে ভারতের অন্যত্র যেমন পুরুষ-প্রধান-সমাজ ছিল, এ দেশেও সেই রকম নারীদের কোনো স্বাধীনতা বা স্বাতন্ত্র্য ছিল না। বিশেষ করে বল্লাল সেনের (১২ খ্রীস্টাব্দ) আমলে 'কৌলীন্য প্রথা' প্রবর্তনের পর নারীদের জীবনযাপনের রীতিনীতি ও অনুশাসনগুলি আরও কঠিনতর রূপ নিল। বাল্য বিবাহ প্রচলিত ছিল, সেইসঙ্গে বাল-বিধবা ও অন্যান্য বিধবাদের মেনে চলতে হত কঠোর নিয়মচর্যা। সতীদাহ প্রচলিত ছিল ব্যাপকভাবে। কৌলীন্য প্রথা ও অবরোধ প্রথা ছিল। পৈত্রিক বা স্বামীর সম্পত্তিতে নারীর অধিকার ছিল না। পুরুষের মধ্যে বহু বিবাহের প্রচলন ছিল, সুতরাং অধিকাংশ নারীকে একাধিক সপত্নী নিয়ে ঘর করতে হত। মধ্যযুগে বাংলার নারীসমাজে অবশ্য শুধু হিন্দু নারীই ছিলেন, তা নয়— বৌদ্ধ, জৈন, মুসলিম সম্প্রদায়ের মেয়েরাও ছিলেন কিন্তু তাঁরা ছিলেন সংখ্যালঘু; তাই ভিন্ন রীতিতে তাঁরা সামাজিক জীবন যাপন করলেও সে সব কথা তেমন কিছু

জানা যায় না। এদেশের সমাজপতিরা শ্রদ্ধা অথবা অনুকম্পাবশত নারীদের প্রতি কোনোদিন কোনো কঠোর দণ্ড বিধানের আদেশ দেন নি; এমনকি গুরুতর অপরাধের জন্যও। এদিকে আবার স্মৃতিশাস্ত্রকাররা পতি ও পত্নীর স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করেন নি। তাই মৃত্যুতিথি ভিন্ন অন্য সময়ে স্ত্রীর আত্মার উদ্দেশে পৃথক পিণ্ডদানের কোনো রীতি নেই। সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে দেখা যায়, স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রীর ছিল ভোগ স্বত্ব—দান বা বিক্রয়ের কোনো অধিকার ছিল না। স্ত্রী-ধনেই ছিল একমাত্র নারীদের অখণ্ড অধিকার। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাহ-বন্ধন ছিল অচ্ছেদ্য।

ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলে ধর্মের ক্ষেত্রে ও সমাজে এক গুরুতব পরিবর্তনের সূচনা হল। তাঁর প্রচারিত প্রেমধর্মের প্রভাবে শুধুমাত্র উচ্চ-নীচ জাতিভেদ প্রথায় কঠোরতা হ্রাস পেল তা নয়, সেইসঙ্গে নারীদের জীবনেও অভূতপূর্ব পরিবর্তনের সূচনা হল। স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে কঠোর পর্দা প্রথার কঠোরতা শিথিল হল। তা ছাড়া নারীকুলের একাংশ প্রকৃত মানবীয় মর্যাদায় ভূষিত হলেন। জনৈক ঐতিহাসিক এই সময়কার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন — "স্ত্রীলোকের অবস্থারও উন্নতি দেখা দিল। বলরাম দাসের পদে আছে "সংকীর্তন মাঝে নাচে কুলের বৌহারি" নাচে অর্থাৎ কুলবধূরাও প্রকাশ্যে সংকীর্তনে যোগ দিতেন। শিবানন্দ সেনের স্ত্রী ও পরমেশ্বর মোদকের মাতার দৃষ্টান্ত হইতে মনে হয় বহু নারী প্রতি বৎসর রথযাত্রার সময় শ্রীচৈতন্যকে দর্শন করিতে পুরী যাইতেন। নিত্যানন্দের পত্নী জাহ্নবী দেবী খেতুড়ি মহোৎসবের সময় গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বহু শিষ্যকে মন্ত্রদানও করিয়াছিলেন। অদ্বৈত-পত্নী সীতাদেবী পুরুষের প্রকৃতি ও বেশ ধারণ করিয়া যে সাধনার রীতি প্রবর্তিত করেন তাহা তাঁহার শিষ্যা নন্দিনী ও জঙ্গলীর বিবরণ হইতে জানা যায়। শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যা হেমলতা ঠাকুরাণীও বহু শিষ্যকে মন্ত্র দিয়াছিলেন।"[৬]

বৌদ্ধযুগে যেমন বেদ-বিরোধী বৌদ্ধধর্ম নারীজীবনে উজ্জীবনের মন্ত্র এনে দিয়েছিল, চৈতন্য যুগে প্রেমধর্মের প্রভাবেও অনুরূপ ঘটনা ঘটতে দেখা গেল। শ্রীচৈতন্যের দিব্য- জীবনকথা অবলম্বন করে যেমন চরিত সাহিত্য গড়ে উঠল, সীতাদেবীর জীবনকথা নিয়ে লেখা হল 'সীতা চরিত্র', লেখক লোকনাথ দাস; বিষ্ণুদাস আচার্য লিখলেন 'সীতা-গুণ-কদম্ব'। শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যা হেমলতা ঠাকুরাণীর প্রশস্তি গেয়েছেন তাঁরই শিষ্য যদু- নন্দন দাস তাঁর 'কর্ণানন্দ' নামক গ্রন্থে—

'শ্রী আচার্য প্রভুর কন্যা শ্রীল হেমলতা।
প্রেমকল্প বল্লী কিংবা নিরমিল ধাতা।
সেই দুই চরণ পদ্ম হৃদয়ে বিলাস।
কর্ণানন্দ রস কহে যদুনন্দন দাস।'[৭]

নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর পুত্রবধূ সুভদ্রাদেবী তাঁর শ্বশ্রুমাতা ঠাকুরাণী জাহ্নবীদেবী সম্পর্কেসংস্কৃতে

একটি কাব্য রচনা করেন, 'অনঙ্গ কদম্বাবলী' নামে। বৈষ্ণবীরা অনেকে রীতিমতো পড়াশুনা ও শাস্ত্র আলোচনা করতেন। পাশ্চাত্য রীতিতে মেয়েদের জন্য স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত, তাঁরাই অভিজাত ঘরের আবরোধবাসিনী কন্যা ও বধূদেব শিক্ষাদানের ভার বহন করে চলেছিলেন। জোড়াসাঁকের ঠাকুরবাড়ির মতো আলোকপ্রাপ্ত গৃহেও বৈষ্ণবীদের যাতায়াত ছিল। স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁর 'সেকেলে কথা' রচনার মধ্যে একথা বলেছেন--

"আহার বিরাম পূজা অর্চনার ন্যায় সেকালেও আমাদের অন্তঃপুরে লেখাপড়া মেয়েদের মধ্যে একটি নিত্য নিয়মিত ক্রিয়ানুষ্ঠান ছিল। প্রতিদিন প্রভাতে গয়লানী যেমন দুগ্ধ লইয়া আসিত, মালিনী ফুল যোগাইত; দেবজ্ঞ ঠাকুর পাঁজি-পুঁথি হস্তে দৈনিক শুভাশুভ বলিতে আসিতেন, তেমনি স্নানবিশুদ্ধা, শুক্লবসনা, গৌরী বৈষ্ণবী ঠাকুরাণী বিদ্যালোক বিতরণার্থে অন্তঃপুবে আবির্ভূতা হইতেন। ইনি নিতান্ত সামান্য বিদ্যাবুদ্ধি সম্পন্না ছিলেন না। সংস্কৃত বিদ্যায় ইহার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল, অতএব বাঙ্গালা জানিতেন, ইহা বলা বাহুল্য। উপরন্তু ইহার চমৎকার বর্ণনাশক্তি ছিল। কথকতা ক্ষমতায় ইনি সকলকে মোহিত করিতেন। যাঁহাদের বিদ্যালাভের ইচ্ছা নাও বা থাকিত, তাঁহারাও বৈষ্ণবী ঠাকুরাণীর দেবদেবী বর্ণনা, প্রভাত বর্ণনা শুনিতে কুতূহলী হইয়া পাঠগৃহে সমাগত হইতেন।"

শুধুমাত্র এক গৌরী বৈষ্ণবীই নয়, সেকালে এমন আরও কত বৈষ্ণবী ছিলেন যাঁদের বিদ্যাবত্তার প্রভূত খ্যাতি ছিল। যেমন মহারাজা সুখময় রায়ের পৌত্রী ও রাজা শিবচন্দ্র রায়ের কন্যা হরসুন্দরী মাত্র পাঁচ বছর বয়সেই এক বৈষ্ণবীর কাছে সংস্কৃত শিক্ষা করেন।

৩

স্ত্রী শিক্ষা

বাঙালী জাতির মধ্যে জ্ঞান আহরণ ও শিক্ষা দীক্ষা গ্রহণের ইচ্ছা প্রবল। শোনা যায় অতীতকালে বাঙালিরা পদব্রজে কাশ্মীরে যেতেন জ্ঞানানুসন্ধিৎসার বশবর্তী হয়ে। প্রাচীন ও মধ্যযুগে এদেশে বালিকাদের প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে প্রেরণ করে ব্যাপকভাবে স্ত্রী শিক্ষা দানের রীতি প্রচলিত ছিল না। অথচ তখনকার দিনের কয়েকজন বিদুষী নারীর কথা শোনা যায়। তাঁরা অনেকেই নিজেদের চেষ্টায় বাড়িতে বসে জ্ঞান অর্জন করতেন। এই ব্যাপারে তাঁদের সহায় হতেন জ্ঞানী ও পণ্ডিত পিতা, ভ্রাতা, স্বামী প্রভৃতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজন।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে লেখাপড়া জানা নারীদের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন 'কবিকঙ্কণচণ্ডী'তে লহনা, খুল্লনা ও লীলাবতীর পত্র রচনা ও পত্রপাঠের কথা আছে। দয়ারামের 'সারদামঙ্গলে' রাজকুমার ও রাজকুমারীদের একত্রে পাঠশালায় যাবার কথা পাওয়া যায়। রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' ও অন্নদামঙ্গল' কাব্যের নায়িকা বিদ্যা ছিলেন উচ্চশিক্ষিতা। বাস্তবের অনুরূপ বিষয়ই হয়তো এখানে বলা হয়েছে।[৮]

নাটোরের রানী ভবানী ছিলেন রীতিমতো সুশিক্ষিতা মহিলা। এই শিক্ষার গুণেই তিনি তাঁর বিশাল জমিদারি দক্ষতা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে পরিচালনা করতেন। মৈমনসিং-এর মহিলা কবি চন্দ্রাবতী এবং বিক্রমপুরের আনন্দময়ী ও গঙ্গামণি দেবীও ছিলেন বিদ্যাবতী নারী।

চতুষ্পাঠীর যুগে বেশ কয়েকজন সংস্কৃতে পারদর্শিনী বঙ্গনারীর কথা জানা যায়। এঁদের মধ্যে ফরিদপুর অঞ্চলের কোটালী পাড়ার প্রিয়ম্বদাদেবী, বৈজয়ন্তীদেবী, শ্যামাসুন্দরী দেবী এবং রাঢ়দেশের হটী বিদ্যালঙ্কার, রূপমঞ্জরী বা হটু বিদ্যালঙ্কার ও দ্রবময়ীর নাম বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য।

হটী বিদ্যালঙ্কার ছিলেন রাঢ়দেশের এক কুলীন কন্যা ও বালবিধবা। সংস্কৃত ব্যাকরণ, কাব্য, স্মৃতি ও নব্য ন্যায়ে ইনি অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন এবং 'বিদ্যালঙ্কার' উপাধি লাভে সমর্থ হন। পরবর্তী জীবনে ইনি কাশীতে গিয়ে একটি চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। সভায় উপস্থিত হয়ে ইনি পুরুষ পণ্ডিতদের সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত হতেন। পুরুষ অধ্যাপকদের মতো। 'বিদায়' বা দক্ষিণা গ্রহণ করতেন। ইনি ছিলেন দীর্ঘজীবী। ১৮১০ খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

হটু বিদ্যালঙ্কার বা রূপমঞ্জরী— ইনি ছিলেন রাঢ় দেশের এক ব্রাহ্মণের কন্যা। পিতা নারায়ণ দাস তাঁর কন্যার ধীশক্তি ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পেয়ে যত্নসহকারে তাকে লেখাপড়া শেখান। ইনি ছিলেন চিরকুমারী। প্রথমদিকে এক বৈয়াকরণিকের কাছে কিছুদিন পাঠ গ্রহণ কবেন। পরে গুরুগৃহে গিয়ে ছাত্রদের সঙ্গে একত্রে বসে তিনি সাহিত্য, আয়ুর্বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। শোনা যায় ইনি মস্তক মুণ্ডন করে পুরুষ পণ্ডিতের মতো শিখা রেখে, ধুতি চাদর ব্যবহার করতেন। প্রায় একশো বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু (১২৮২ বঙ্গাব্দে) ঘটে।

দ্রবময়ী—ইনি ছিলেন এক বিদুষী ব্রাহ্মণ কন্যা। খানাকুল কৃষ্ণনগরের নিকটবর্তী বেড়াবাড়ি গ্রামের অধিবাসী ব্রাহ্মণ চণ্ডীচরণ তর্কালংকারের কন্যা। বাল্যকালে তাঁব বৈধব্য ঘটে। তখন তিনি পিতার টোলে পড়াশুনা আরম্ভ করে। অল্প সময়ের মধ্যে তিনি ব্যাকরণ, কাব্যালংকাব, ন্যায়শাস্ত্র, পুরাণ, ভাগবতাদি নানাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। মাত্র চৌদ্দ বৎসর বয়সে তিনি পিতার সঙ্গে বসে টোলের ছাত্রদের পড়াতেন। সংস্কৃতভাষায় অনর্গল কথা বলে তিনি অনেক শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতদের বিচার ও বিতর্কে পরাজিত করেন।[৯]

সেকালে নানা ভ্রান্ত ধারণা ও কুসংস্কারের প্রভাবে পড়ে মেয়েদের লেখাপড়ার আগ্রহ নষ্ট হয়ে যেত। সেকালে প্রচার করা হত যে, লেখাপড়া শিখলে নাকি নারীদের বৈধব্য ঘটে ইত্যাদি। এ ছাড়া সামাজিক কিছু কুপ্রথা যথা বাল্য বিবাহ, কঠোর অবরোধ প্রথা প্রভৃতি ছিল মেয়েদের শিক্ষা গ্রহণের অন্তরায়। তবুও কোনো কোনো অঞ্চলের নারীদের বিদ্যাচর্চার খ্যাতি ছিল। যেমন গঙ্গার পশ্চিমতীরে হুগলী জেলার গুপ্তিপাড়া নামক অঞ্চলের মেয়েদের বাক্‌চাতুর্যের খুব খ্যাতি ছিল। বিখ্যাত কবিওয়ালা ভোলাময়রা তাঁর কবিগানে শান্তিপুরের মেয়েদের খোঁপা ও গুপ্তিপাড়ার মেয়েদের 'চোপা' অর্থাৎ বাক্‌চাতুর্যের কথা বলে গেছেন। তার কারণ হয়তো এই যে, "বিভিন্ন

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বংশের মেয়েরোও যে শাস্ত্র-চর্চার সরগরম পরিবেশে আবাল্য প্রতিপালিত হয়ে, সমস্যা পূরণ ও তর্কবিতর্কের কথা শুনে শুনে বাক্চতুর হয়ে উঠবেন, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।[১০] এই অঞ্চলটিতে সেকালে রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যদের আধিপত্য ছিল এবং বিদ্যাচর্চার প্রাচুর্যও ছিল। ছেলেদের দেখাদেখি মেয়েরাও সম্ভবত কিছু পরিমাণে বিদ্যাশিক্ষা করতেন— তারই জন্য তাঁদের মুখের ভাষার ধরণ- ধারণের মধ্যে হয়তো বেশ-কিছুটা স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় পাওয়া যেত। এইভাবে লক্ষ্য করা যায় অঞ্চল বিশেষে নারীশিক্ষার তারতম্য ছিল। দেখা যায় সম্ভ্রান্ত পরিবারে ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মেয়েরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লেখাপড়ার চর্চা করতেন।

৪

জমিদারি পরিচালনায় বঙ্গনারী

মধ্যযুগের পুরুষশাসিত সমাজে কয়েকজন বীরাঙ্গনা ও শাসনকার্যে পারদর্শিনী বাঙালি মহিলার সন্ধান পাওয়া যায়, তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের বিশেষ পরিচয় এখানে দেওয়া হল:

ভবশঙ্করী (ষোড়শ শতাব্দী)

আকবরের রাজত্বকালে বঙ্গের এক গ্রাম্য জমিদারের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন ভবশঙ্করী। বাল্যকাল থেকে ভবশঙ্করী অশ্বারোহণ, তীর নিক্ষেপ, অসিচালনায় পারদর্শী হয়ে ওঠেন। তাঁর বীরত্ব দর্শনে মুগ্ধ হয়ে দক্ষিণ রাঢ়ের ভুরশুটের রাজা রুদ্রনারায়ণ তাঁকে বিবাহ করেন। রাজার মৃত্যুর পর ভুরশুট রাজ্য শাসনের ভার রানী ভবশঙ্করীকেই গ্রহণ করতে হয়। ঐ সময় স্থানীয় এক অধিবাসী পাঠান সর্দার ভুরশুট আক্রমণ করে। রানী অসমসাহসিকতার সঙ্গে সসৈন্য অগ্রসর হয়ে তাকে পরাজিত ও নিহত করেন। এই বীরত্বের কাহিনী শুনে সম্রাট আকবর ভবশঙ্করীকে "রায়বাঘিনী" উপাধিতে ভূষিত করেন।[১১]

রানী জানকী (অষ্টাদশ শতাব্দী)

মেদিনীপুর অঞ্চলে একাধিক রানীর কথা জানা যায়, যাঁরা দক্ষতার সঙ্গে শাসনকার্য পরিচালনা করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে রানী জানকী অন্যতমা। মোগল আমলে মেদিনীপুরের মহিষাদলের জমিদারি লাভ করেন জনার্দন উপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তি। তাঁর উত্তর পুরুষ ছিলেন আনন্দলাল উপাধ্যায় এবং রানী জানকী ছিলেন এঁর পত্নী। আনন্দলালের মৃত্যু হয় ১৭৭০ খ্রীস্টাব্দে। তখন রানী জানকী রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। রানীর সম্বন্ধে বিস্তৃত পরিচয় জানা না গেলেও, তমলুকের এক বৃদ্ধ তর্জা-গায়কের রচিত লোকসংগীত থেকে জানা যায় যে, রানী জানকী ছিলেন একজন জনপ্রিয় ও ধর্মে-কর্মে নিষ্ঠাবতী মহিলা। ঐ গানে বলা হয়েছে—

"মারহাট্টায় কাট্টা কুট্যা লুট্টপুট্টা খায়।
মায়ের মতো রাণী জানকী বাঁচায় সেই দায়।।

ধর্মে মতি রাণী জানকী আন্দিলালের জায়া।
দেউল কীর্তি রাখি শেষে ছাড়িলেক মায়া।"[১২]

ইনি মারা যান ১৮০৪ খ্রীস্টাব্দে।

রানী শিরোমণি (অষ্টাদশ শতাব্দী)

রানী শিরোমণি জঙ্গলমহল অঞ্চলে বিশাল এক জমিদারির শাসনভার গ্রহণ করেছিলেন। কর্ণগড়ের শেষ রাজপুরুষ ছিলেন বীর যোদ্ধা রাজা অজিত সিংহ। রাজার দুই বিবাহ। রানী শিরোমণি ছিলেন তাঁর কনিষ্ঠা পত্নী। অপুত্রক রাজার মৃত্যুব পর শিরোমণি রাজ্যশাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর প্রজারা চুয়াড় বিদ্রোহের সঙ্গে যুক্ত আছে এই সন্দেহে ইংরেজ সরকার রানী শিরোমণি ও তাঁর জমিদারির তত্ত্বাবধায়ক চুনিলাল খানকে কলকাতায় দীর্ঘকাল আটক করে রেখেছিল। বৃদ্ধা রানী শিরোমণির মৃত্যু হয় ১৮১২ খ্রীস্টাব্দে।[১৩]

রানী চৌধুরী (অষ্টাদশ শতাব্দী)

উত্তরবঙ্গের রংপুর অঞ্চলের এক ব্রাহ্মণ জমিদার গৃহিণীর কথা জানা যায়, তিনি হলেন রানী চৌধুরী। জমিদার ঘরণী হলেও, এক সময় ইনি রণরঙ্গিণী মূর্তি নিয়ে ইংরেজের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। বিদ্রোহের এক বিশেষ কারণ ছিল। ১৭৭০ খ্রীস্টাব্দে উত্তরবঙ্গে দারুণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। অথচ তখন সেখানকার কোম্পানির ইজারাদার ও খাজনা আদায়কারী দেবী সিং ও গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ জনসাধারণের উপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁরা খাজনা আদায়ের জন্য প্রজাদের ঘর পুড়িয়ে দিতেন এমন-কি ঘরের মেয়েদের উপরও অত্যাচার করতেন। এই অত্যাচারের প্রতিবাদ স্বরূপ আবির্ভূত হলেন রানী চৌধুরী নামক এই দুঃসাহসী তেজস্বিনী মহিলা। ইনি বজরায় থাকতেন। ভবানীপাঠক নামে এক মৈথিলী ব্রাহ্মণকে সেনাপতি নিযুক্ত ক'রে ইনি ইংরেজের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হন। ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে ভবানী পাঠক প্রাণ হারান।[১৪]

"Hunter district Gazetteer"— এ এই ঘটনার বিবরণ আছে। এই নারীকেঅবলম্বন করে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাস রচনা করেন। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন্ন "ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরাণী নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক ব্যক্তি কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাদের কাল্পনিক জীবনী ভিত্তি করিয়া উপন্যাসে না লিখিলে আজ বাংলাদেশে কেহই তাঁহাদের নাম জানিত কিনা সন্দেহ।"[১৫]

রানী কাত্যায়নী সিংহ (অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতক)

কাত্যায়নী ছিলেন মুর্শিদাবাদ-কান্দির দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের পৌত্র কৃষ্ণচন্দ্র সিংহের (যিনি 'লালাবাবু' নামে পরিচিত) পত্নী। কৃষক কন্যার 'বেলা যে গেল' ডাক শুনে, লালাবাবুর মনে আকস্মিকভাবে এমন বৈরাগ্যের সঞ্চার হল যে, তিনি ত্রিশ বছর বয়সে গৃহধর্ম ত্যাগ করে

বৃন্দাবনে চলে গেলেন। তখন থেকে রানী কাত্যায়নী অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে মুর্শিদাবাদ ও উত্তর প্রদেশের বিশাল জমিদারি পরিচালনা করেছিলেন।

রানী ভবানী (অষ্টাদশ শতাব্দী) (১৭২২-১৮০২)

নাটোরের রানী ভবানীর নাম ইতিহাসে উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা আছে। ইংরেজ শাসনের পূর্বে নবাবী আমলে তাঁর আবির্ভাব ঘটেছিল। রাজশাহী জেলার ছাতিমগ্রামের এক সম্পন্ন গৃহস্থ আত্মারাম চৌধুরীর কন্যা ছিলেন ভবানী। তাঁর সঙ্গে বিবাহ হয় নাটোরের রাজা রামজীবন রায়ের দত্তক পুত্র রামকান্ত রায়ের। (?-১৭৪৮)

স্বামীর মৃত্যুর পর মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে রানী ভবানী বিপুল সম্পত্তির অধিকারিণী হলেন। তাঁর জমিদারির আয় ছিল দেড়কোটি টাকা। দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে ইনি নৈপুণ্যের সঙ্গে রাজকার্য পরিচালনা করেন। শাসন পরিচালনার কাজে তাঁকে সাহায্য করতেন দেওয়ান দয়ারাম। অত্যাচারী নবাব সিরাজদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করতে যে ষড়যন্ত্র হয়েছিল, রানী ভবানী তাতে যোগ দেন। ইংরেজের সঙ্গে এঁর ছোটোখাটো অনেক সংঘর্ষ হয়। ধর্মকার্য ও আর্তের সেবায় ইনি মুক্তহস্তে দান করে গেছেন। নিজে অত্যন্ত সাধারণ ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন। শেষ জীবনে রানী পালিত পুত্র রামকৃষ্ণের হাতে রাজ্যভার দিয়ে বালবিধবা কন্যা তারাসুন্দরীকে নিয়ে বড়নগরে বাস করতেন। সেকালে বড়নগরেকে বলা হত 'বাংলার বারাণসী'। সেখানে আশি বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু ঘটে ১৮০২ খ্রীস্টাব্দে।

রানী রাসমণি (১৭৯৩-১৮৬১)

রানী রাসমণি বিখ্যাত দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরের প্রতিষ্ঠাত্রী। শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে ইনিই মন্দিরের পুরোহিত পদে নিযুক্ত করেন। রাসমণি এক দরিদ্র কৃষিজীবী কৈবর্তের ঘরে জন্মেছিলেন। তাঁর পিতার নাম হরেকৃষ্ণ দাস। রানীর রূপের খ্যাতি শুনে ১৮০৪ খ্রীস্টাব্দে কলকাতার বিখ্যাত ধনী প্রীতিরাম মাড়ের পুত্র রাজচন্দ্র মাড়ের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। অপরিণত বয়সে ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দে রাজচন্দ্রের মৃত্যুর পর, তাঁর সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হন রানী রাসমণি। স্বামীর সহায়তায় ও নিজের চেষ্টায় তিনি কিছু লেখাপড়া শিখেছিলেন। স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধি ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতাও তাঁর মধ্যে যথেষ্টই ছিল। ইংরেজের সঙ্গে তাঁর কিছু মতবিরোধ ও সংঘর্ষ উপস্থিত হয়েছিল। তিনি সর্বদাই দেশবাসীর পক্ষ নিয়ে ইংরেজ সরকারের সঙ্গে সংগ্রাম করেছেন এবং জয়ী হয়েছেন। ধর্মের ও লোকহিতের কারণে তিনি প্রচুর অর্থব্যয় করে নিজের কীর্তি অক্ষয় করে রেখে গেছেন।

৫

প্রাক্-আধুনিক যুগের বাঙালি মহিলা কবি

সেকালের বাংলা সাহিত্যে শুধুমাত্র কাব্যের ধারাটিই ছিল প্রবহমান। এই কাব্য সাহিত্যের ভাণ্ডারে

মুষ্টিমেয় কয়েকজন মহিলা কবির কাব্য-সম্ভার রক্ষিত আছে। তার প্রধান কারণ নারীরা তখন জীবনের মুক্তাকাশে পক্ষ বিস্তারের সুযোগ পেতেন না। বিশেষ করে আত্মভাব–প্রকাশক্ষম ভাষা শিক্ষার সহজ অধিকার থেকেও অধিকাংশ নারী ছিলেন বঞ্চিত।

সংস্কৃত সাহিত্য চর্চায় বঙ্গনারী

বহুকাল ধরে সমগ্র ভারতে এবং সেইসঙ্গে বঙ্গদেশেও সাহিত্য ও সংস্কৃতির একমাত্র ভাষা ছিল সংস্কৃত। রাজদরবারে, পণ্ডিত সমাজে ও কাব্যচর্চায় সংস্কৃত ভিন্ন, অন্য কোনো স্থানীয় ভাষার মর্যাদা ছিল না। সেকালের বাঙালিরা বিশিষ্ট 'গৌড়ীরীতি'তে সাহিত্য চর্চা করে খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন। এমন-কি "সংস্কৃত কাব্যের ইতিহাসে মহিলা কবিগণের একটি উল্লেখযোগ্য স্থান আছে। বাঙ্গালীর গৌরবের বিষয় এই যে, এই দেশের কয়েকজন মহিলা কবিও স্বীয় কবিত্বের স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন।"[১৬]

সংস্কৃত কাব্যচর্চায় যে-সকল মহিলা কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্তত দুজনের নাম বিশেষভাবে স্মরণ করা উচিত— প্রিয়ম্বদা দেবী ও বৈজয়ন্তী দেবী।

প্রিয়ম্বদা দেবী (সপ্তদশ শতাব্দী)

অবিভক্ত বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার কোটালীপাড়া গ্রামের বিখ্যাত পণ্ডিত শিবরাম সার্বভৌমের কন্যা ছিলেন প্রিয়ম্বদা। পিতার চতুষ্পাঠীতেই শিক্ষা লাভ করেছিলেন। তাঁর বিবাহ হয় পিতার এক পশ্চিম দেশীয় ছাত্র রঘুনাথ মিশ্রের সঙ্গে। ছেলেবেলা থেকে প্রিয়ম্বদা অনর্গল সংস্কৃতে কথাবার্তা বলতে পারতেন। নানা শ্লোক রচনা করে ইনি কবিত্ব শক্তির পরিচয় দান করেন। প্রিয়ম্বদা ছিলেন সুগৃহিণী, সুযোগ্যা মাতা, উপরন্তু তিনি সাহিত্য রচনাতেও ছিলেন পারদর্শিনী-– যা ছিল সেকালের বঙ্গনারীদের মধ্যে দুর্লভ।

পিতার অনুরোধে প্রিয়ম্বদা তাঁদের কুলদেবতা শ্রীগোবিন্দের রূপবর্ণনা করে চমৎকার একটি শ্লোক রচনা করেন। সেই শ্লোকটি হল—

"কালিন্দীপুলিনেষু কেলিকলনং কংসাদিদৈত্যদ্বিষম্।
গোপালীভির ভিষ্টুতং ব্রজবধূ নেত্রোৎপলৈরর্চিতম্।
বর্হালঙ্কৃতমস্তকং সুললিততরঙ্গৈস্ত্রিভঙ্গং ভজে।
গোবিন্দং ব্রজসুন্দরং ভব হরং বংশীধরং শ্যামলম্।

অর্থাৎ যে কৃষ্ণ বাল্যকালে যমুনাতটে নানাবিধ ক্রীড়া করেছিলেন, যিনি গোপীদের নয়নরূপ পদ্মদ্বারা অর্চিত হয়ে অর্থাৎ যাঁকে গোপীরা নির্নিমেষ নয়নে অবলোকন করে চক্ষু সফল করেছেন— যাঁর চূড়া ময়ূরপুচ্ছ দ্বারা অলংকৃত, সেই শ্যামবর্ণ মনোহর ব্রজসুন্দর বংশীধর ভবভয়হারী ত্রিভঙ্গমূর্তি শ্রীগোবিন্দকে আমি ভজনা করি।[১৭]

শোনা যায় প্রিয়ম্বদা তাঁর গৃহদেবতা রঘুনাথচক্র ও শ্রীধরচক্র নামক দুই শালগ্রাম শিলার

উদ্দেশে প্রতিদিন পূজার সময় এক-একটি নূতন শ্লোক রচনা করে প্রণাম নিবেদন করতেন। শ্লোক রচনা ভিন্ন তিনি 'শ্যামা রহস্য' নামে এক তন্ত্রগ্রন্থ, মদালসা উপাখ্যানের দার্শনিক টীকা এবং মহাভারতের মোক্ষধর্মের একটি সুবিস্তৃত টীকা রচনা করেন।

বৈজয়ন্তী দেবী (সপ্তদশ শতাব্দী)

ফরিদপুরের ধানুকাগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন বৈজয়ন্তী দেবী। পিতা মুরভট্টের টোলে তাঁর প্রথম শিক্ষা। তাঁর বিবাহ হয় ঐ অঞ্চলের কোটালীপাড়া নিবাসী পণ্ডিত কৃষ্ণনাথ সার্বভৌমের সঙ্গে। কৃষ্ণনাথ ও বৈজয়ন্তী উভয়ের মধ্যেই ছিল কবিত্ব শক্তি। দুজনে একত্রে একটি চম্পূকাব্য রচনা করেন—"আনন্দ লতিকা" (১৬৫২ খ্রীস্টাব্দ) নামে। শুধু কাব্য নয়, বৈজয়ন্তী ব্যাকরণ, পুরাণ, ধর্মশাস্ত্র, অলংকার, দর্শন ও ন্যায়শাস্ত্রেও পাণ্ডিত্য অর্জন করেন।

বৈজয়ন্তী সম্পর্কে একটি গল্প শোনা যায় যে, তিনি কুরূপা ছিলেন বলে দীর্ঘকাল তাঁকে পিত্রালয়ে থেকে বিরহ যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছিল। অবশেষে নিতান্ত কাতর হয়ে তিনি রূপকের মাধ্যমে অনুষ্টুপ ছন্দে একটি শ্লোক রচনা করে স্বামীর নিকট প্রেরণ করেন। কৃষ্ণনাথও তাঁকে কবিতায় উত্তর লেখেন। পর পর কবিতায় পত্রোত্তর চলতে থাকে। বৈজয়ন্তীর কবিত্ব শক্তিতে মুগ্ধ হয়ে তাঁর স্বামী তাঁকে সাদরে নিজ গৃহে নিয়ে আসেন।

এঁরা ছাড়াও আরও কোনো কোনো মহিলা কবির নাম জানা যায়। যেমন— দ্বাদশ শতকে লীলাবতী নামে এক কবি ছিলেন বগুড়া জেলার নিসিন্দা গ্রামে। তাঁর স্বামীর নাম বল্লভাচার্য। ইনিও সংস্কৃতে কাব্য রচনা করেছিলেন। হয়তো এই ধরণের আরও কত মহিলা সেকালে অন্তঃপুরে বসে কাব্যচর্চা করে গেছেন, আজ আর আমরা তাঁদের রচনা বা নাম কিছুই জানতে পারি না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রাক্-উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা কাব্যে মহিলা কবি

এদেশের প্রাচীন ও মধ্যযুগের কবি ও সাহিত্যিকদের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে নানা মতবিরোধ আছে, তার প্রধান কারণ তাঁদের রচিত গ্রন্থে সুস্পষ্টভাবে সন তারিখ উল্লেখ করার প্রথা প্রচলিত ছিল না। অনেক পণ্ডিত ও গবেষকসহজিয়া সাধক কবি চণ্ডীদাসের সাধন-সঙ্গিনী রামীকে. প্রথম মহিলা কবির মর্যাদা দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে বলা চলে 'চণ্ডীদাস-সমস্যার' যেমন সুষ্ঠু সমাধান আজও হয় নি, সেই রকম রামীর আবির্ভাব কালও সংশয়াতীত নয়। নানা কারণে অনেকে মনে করেন যে, রামীর আবির্ভাব ঘটেছিল, চন্দ্রাবতীর পরবর্তী কালে। বাংলা সাহিত্যের এক বিশিষ্ট ইতিহাসকার নানা যুক্তি ও প্রমাণ সহকারে বলেছেন— "চন্দ্রাবতীই বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা কবি।" [১৮]

চন্দ্রাবতী (সপ্তদশ শতাব্দী)

সপ্তদশ শতকেই সম্ভবত চন্দ্রবতীর জন্ম হয় ময়মনসিং জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার পাটওয়ারী গ্রামে। তাঁর পিতা ছিলেন বিখ্যাত 'মনসামঙ্গল'-রচয়িতা দ্বিজ বংশীদাস ও মাতা ছিলেন সুলোচনা। চন্দ্রাবতী তাঁর রামায়ণ পালায় বংশ পরিচয় দিয়েছেন—

'সুলোচনা মাতা বন্দি দ্বিজবংশী পিতা।
যার কাছে শুনিয়াছি পুরাণের কথা।

ইত্যাদি

বাল্যকাল থেকেই চন্দ্রাবতী কাব্যরচনায় পটু ছিলেন। হয়তো পিতার কাব্যরচনাগুণেব প্রভাব তাঁর মনকে প্রভাবিত করেছিল। চন্দ্রাবতীর রচিত রামায়ণ পালা অসম্পূর্ণ, তাঁর অকাল-মৃত্যুই এর কারণ হতে পারে। চন্দ্রবতী-রচিত রামায়ণের যে অংশটুকু সংগৃহীত হয়েছে সেখানে প্রথম পরিচ্ছেদে—রাবণের স্বর্গমর্ত্যাদি অভিযান এবং রামের জন্ম বর্ণনা; দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে— সীতাব বারমাসী এবং তৃতীয় পরিচ্ছেদ— সীতার বনবাসের পূর্ব সূচনা পর্যন্ত পাওয়া যায়। এই রামায়ণের কাহিনীর সঙ্গে বাল্মীকি অথবা কৃত্তিবাসী রামায়ণের খুব ঘনিষ্ঠ যোগ নেই। পিতার সঙ্গে চন্দ্রাবতী মনসার ভাসান গান রচনা করেন। তা ছাড়া 'মলুয়া' ও 'কাজীর বিচার' এবং 'কেনারাম' পালা রচনা করেন। এখানে নারী মনের কোমলস্পর্শ অনুভব করা যায়। তার সঙ্গে সেকালের সমাজ জীবনের কিছু চিত্র ও সমস্যাবলীও প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর রচনা-সংগ্রহ সম্পর্কে একটি আক্ষেপের বিষয় হল এই যে, কাব্যগুলিতে মূল ভাষা কোথাও পাওয়া যায় না। কারণ সংগ্রহকর্তা চন্দ্রকুমার

দে মহাশয় এগুলির ভাষা-সংস্কারে মন দিয়েছিলেন। তিনি আঞ্চলিক গ্রাম্য ভাষায় রচিত পালাগানগুলিতে মার্জিত ও আধুনিক 'শহুরে' ভাষা বসিয়ে দিয়েছেন, এজন্য এগুলির আসল রূপটি মুছে গেছে। দু-চার ছত্র উদাহরণ দিলেই তা পরিস্ফুট হবে। 'সীতার বারমাসী'র সামান্য অংশ—

'আমি কিগো জানি সখি কাল সর্প বেশে।
এমনি করিয়া সীতায় গো ছলিবে রাক্ষসে।।
প্রণাম করিনু আমি গো পড়িয়া ভূতলে।
উড়িয়া গরুড় পাখী গো সর্প যেমন গেলে ।।
রথেতে তুলিল মোরে গো দুষ্ট লঙ্কাপতি।
দেবগণে ডাকি কহি গো দুঃখের ভারতী।।'

কবি নয়ান চাঁদ– রচিত "চন্দ্রাবতী" পালায় তাঁর জীবনের করুণ কাহিনী শুনতে পাওয়া যায়। চন্দ্রাবতী মনেপ্রাণে ভালোবেসেছিলেন পাঠশালার সহপাঠী বন্ধু জয়ানন্দকে। অথচ নবযৌবনে জয়ানন্দ আকৃষ্ট হলেন এক রূপবতী যবনীর প্রতি। শৈশবসঙ্গীর প্রতারণায় দুঃখিত হয়ে চন্দ্রাবতী চিরকুমারী থাকার সংকল্প গ্রহণ করেন। পিতা তাঁর জন্য এক শিবমন্দিব প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে তিনি নিত্য নিয়মিত শিবের পূজায় রত থাকতেন ও কাব্যচর্চা করতেন। জয়ানন্দেব ভুল ভাঙল কিছুকাল পরে। কিন্তু চন্দ্রাবতী তাঁর কাছে আর ধরা দিলেন না। সেই দুঃখে ফুলেশ্বরী নদীর জলে জয়ানন্দ আত্মবিসর্জন দিলেন। এই আঘাত বেশিদিন সইতে পারলেন না চন্দ্রাবতী। অল্প কিছু কালের মধ্যে তাঁরও মৃত্যু হল।

রামী (আনুমানিক সপ্তদশ শতাব্দী)

প্রাক্-চৈতন্যোত্তর যুগের যে বিপুল বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য পাওয়া যায়, সেখানে কয়েকজন পদকর্ত্রীর সন্ধানও মেলে। বিষ্ণুপুরের মল্লরাজারা ছিলেন পরম বৈষ্ণব। তাঁদের অন্তঃপুরচারিণী মহিলারা অনেকেই ছিলেন সুশিক্ষিত ও বৈষ্ণব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। তাঁরা অনেকে পদ রচনা করেছিলেন বলে শোনা যায়। বৈষ্ণব পদ-সঙ্কলন গ্রন্থে নারীর ভণিতায় যেমন 'রসময়ী দাসী' বা 'দুখিনী' ইত্যাদি কিছু কিছু পদ পাওয়া যায়। কিন্তু এঁরা প্রকৃতপক্ষে নারী ছিলেন কি না, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। গোপী ভাবে ভাবিত হয়ে, অনেক সময় পুরুষ ভক্তরাও ঐ জাতীয় ভণিতা ব্যবহার করেছেন।

চণ্ডীদাস ও রামী সম্পর্কে কিম্বদন্তীমূলক কাহিনী প্রচলিত আছে। বাশুলী দেবীর মন্দিরের পূজারী ছিলেন চণ্ডীদাস। রামী বা রামমণি অথবা রামতারা কিংবা তারাধুবুনী ছিলেন ঐ মন্দিরের পরিচারিকা। তিনি প্রতিদিন ঐ মন্দির মার্জনা করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতেন এবং সেজন্য নিয়মিতভাবে দেবীর প্রসাদ পেতেন। কালক্রমে নিত্যপূজারী চণ্ডীদাসের সঙ্গে তাঁর 'কামগন্ধহীন' প্রেমেব সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ক্রমশ রামী চণ্ডীদাসের ন্যায় পদরচনাতেও

পারদর্শিনী হয়ে ওঠেন। রামীর রচিত পুঁথির একটি পাতা পণ্ডিত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় আবিষ্কার করেছেন। তার পরিচয় হল— "একখানি পাতা, উপকরণ তুলোট কাগজ। আকার ১০১/৪ X ৫ ইঞ্চি। প্রতি পৃষ্ঠায় ১১ পঙ্ক্তি, অক্ষর প্রাচীন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ পুস্তকাগারে রক্ষিত।"[১৯]

রামী-রচিত দুটি পদে কবিত্ব শক্তি এবং নিবিড় ও গভীর প্রেম-ব্যাকুলতার সন্ধান পাওয়া যায়। শোনা যায় চণ্ডীদাসকে উচ্চবর্ণের সমাজে গ্রহণ করার প্রস্তাব এসেছিল, তখন রামী তাঁর সঙ্গে বিচ্ছেদের আশঙ্কায় ব্যাকুল হয়ে যে পদ রচনা করেন তাতে একদিকে মনে হয় অক্রূর বুঝি কৃষ্ণকে মথুরায় নিয়ে চলে যাচ্ছে। সেই কারণে শ্রীরাধিকা বিলাপ করছেন। অন্যদিকে মনে হতে পারে চণ্ডীদাসের সঙ্গে বিচ্ছেদের আশঙ্কায় রামীর মন ব্যাকুল হয়ে পড়েছে। সমাজের পক্ষে এখানে যিনি অক্রূরের সমগোত্রীয় ছিলেন তিনি নকুল ঠাকুর। দ্ব্যর্থবোধক শব্দ দ্বারা রচিত পদটির সামান্য কিছু অংশ উদ্ধার করা যায়—

"কোথা যাও ওহে প্রাণ বঁধু মোর, দাসীরে উপেক্ষা করি।
না দেখিয়া মুখ, ফাটে মোর বুক, ধৈরয ধরিতে নারি ।।
বাল্যকাল হ'তে, দেহ সঁপিনু মনে আন নাহি মানি।
কি দোষ পাইয়া, মথুরা যাইবে, বল হে সে কথা শুনি।।

ইত্যাদি

আনন্দময়ী (১৭৫২-৭২)

অখণ্ড বাংলাদেশে ঢাকা অঞ্চলের জপসা গ্রামে রামগতি সেনের কন্যা রূপে আনন্দময়ী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মাতার নাম কাত্যায়নী। পিতার নিকট তাঁর শিক্ষা সম্পন্ন হয়। সংস্কৃত ভাষা তিনি ভালোভাবেই আয়ত্ত করেছিলেন। শোনা যায় আনন্দময়ীর পিতার নিকট রাজা রাজবল্লভ অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের প্রমাণ ও প্রতিকৃতি চেয়ে পাঠিয়েছিলেন কিন্তু ঐ সময় তাঁর পিতা গৃহে না থাকায়, তিনি নিজেই নির্ভুলভাবে সমস্ত তথ্য সরবরাহ করেন। আনন্দময়ী তাঁর খুল্লতাত জয়নারায়ণকে 'হরিলীলা' নামক গ্রন্থ রচনায় সাহায্য করেছিলেন। পয়গ্রামের অধিবাসী অযোধ্যারামের সঙ্গে আনন্দময়ীর বিবাহ হয়। যখন তাঁর স্বামীর মৃত্যু হয় তখন তিনি পিত্রালয়ে অবস্থান করছিলেন। শোক সংবাদ শুনে তিনি স্বামীর ব্যবহৃত কাষ্ঠপাদুকা নিয়ে অনুমৃতা হয়েছিলেন।

সেকালে পূর্ববঙ্গে বিবাহ, অন্নপ্রাশন ইত্যাদি নানা শুভ অনুষ্ঠানে গান গাওয়ার রীতি ছিল। এই জাতীয় বহু গান তিনি রচনা করে গেছেন। 'উমার বিবাহ' নামক গীতের দু-চার ছত্র এখানে উদাহরণ স্বরূপ দেওয়া হল—

'পাণি গ্রহণের পর কর একাইল।
অশোকের কিশলয়ে কমল জড়িল।
দুর্গা বলি জয়কার দিয়া সবে নিল।

উঠিয়া বশিষ্ঠ শুভদৃষ্টি করাইল।
লাজ হোম পরে ধূম নয়নে পশিল।
নীলোৎপল দল ছাড়ি রক্তোৎপল হইল ।।
সিন্দূরের কৌটা দিল রজত থুইতে।
হাতে ধরি উমা নেয় বাসর-গৃহেতে।
শুভক্ষণে হরগৌরীর মিলন হইল।
আনন্দে আনন্দময়ী রচনা করিল।[২০]

গঙ্গামণি দেবী

গঙ্গামণি ছিলেন লালারামপ্রসাদ রায়ের কন্যা। ইনি ছিলেন আনন্দময়ীর বয়ঃকনিষ্ঠ পিতৃস্বসা। ইনিও ছিলেন এক বিদুষী কবি। তাঁর স্বামীর নাম প্রাণকৃষ্ণ সেন। মঙ্গলানুষ্ঠানে গাইবার উপযোগী অনেক গান ইনিও রচনা করেছিলেন। রাম-সীতার বিবাহ বর্ণনা করে যে-সব গান তিনি রচনা করেছিলেন— সেখানে সেকালের বাঙালি জীবনের চিত্রই ফুটে উঠেছে চমৎকার ভাবে। একটি গানে সীতার অলংকাব পরিধানের যে বর্ণনা পাওয়া যায়—তা প্রকারান্তরে অলংকারপ্রিয় বঙ্গললনারই ছবি। যেমন—

'জনক নন্দিনী সীতা হরিযে সাজায় রাণী।
শিরে শোভে সিঁথি পাত, হীরা, মণি চুণী।
নাসার অগ্রেতে মতি বিম্বাধর পরি।
তরুণ নক্ষত্র ভাতি জিনি রূপ হেরি।।
মুকুতা দশন হেরি লাজে লুকাইল।
বারীন্দ্রের কুম্ভ মাঝে মজিয়া রহিল।।
গলে দিল থরে থরে মুকুতার মালা।
রবির কিরণে যেন জ্বলিছে মেখলা।।
কেয়ূর, কঙ্কণ দিল আর বাজুবন্ধ।
দেখিয়া রূপের ছটা মনে লাগে ধন্দ (দ্বন্দ্ব)।।
বিচিত্র ফণীত শঙ্খ কুল-পরিচিত।
দিল পঞ্চ কঙ্কণ পৌঁছি বেষ্টিত।।
মনের মত আভরণ পরাইয়া শেষে।
রঘুনাথ বরিতে যান মনের হরিষে।'[২১]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বঙ্গনারীর শিল্পরুচি

বাঙালি জীবনযাত্রার প্রায় ক্ষেত্রেই বঙ্গনারীর মার্জিত শিল্পরুচির পরিচয় পাওয়া যায়। পালযুগে বাংলার শিল্পকলা খুবই উন্নত ছিল। রাজশাহীর পাহাড়পুর ও সোমপুর বিহারের ভাস্কর্য ও স্থাপত্য এবং লামা তারানাথের রচিত বিবরণীতে শিল্পী বীতপাল, ধীমানের ভূয়সী প্রশংসার মধ্যে তার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। তবে নারীরা সে যুগে শিল্পকলায় কতখানি দক্ষতা অর্জন করেছিলেন, তার স্বতন্ত্র কোনো উল্লেখ আমরা পাই না। তবে অভিজাত শিল্পধারার পাশাপাশি, লোকশিল্পের ধারায় নারী জাতির যে একটি বিশিষ্ট স্থান আছে সে কথা অবশ্য স্বীকার করতে হয়। বিশেষ করে বার-ব্রত উপলক্ষে আলপনা আঁকায়, কাঁথার নক্‌শা রচনায়, পুতুল গড়ায় এবং বিবাহ বা কোনো শুভ অনুষ্ঠানের নানা প্রয়োজনে হাঁড়ি, সরা, কুলো, পিঁড়ি চিত্রিত করতে বঙ্গললনারা ছিলেন সিদ্ধহস্ত। এ সম্পর্কে পরবর্তী অংশে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

নৃত্য-গীত

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বঙ্গদেশে নৃত্য-গীত-বাদ্যের যে যথেষ্ট প্রচলন ছিল তার উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় সাহিত্যে। কহ্লন-রচিত 'রাজতরঙ্গিণী' গ্রন্থে এদেশের এক নৃত্যগীত-পটীয়সী নারীর কথা আছে। তিনি হলেন অষ্টম শতাব্দীতে পুণ্ড্রবর্ধন নগরীর আশ্চর্য এক নর্তকী, যাঁর নাম ছিল কমলা।[২২]

'সেক-শুভোদয়া' গ্রন্থে সংগীতনিপুণা বিদ্যুৎপ্রভার কথা আছে। ইনি গাঙ্গো নামে এক নটের পুত্রবধূ ছিলেন। গাঙ্গো ছিলেন রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভার গায়ক।[২৩]

ধর্মকে কেন্দ্র করে নৃত্যগীতের চর্চা এদেশে বহু কাল ধরে চলে এসেছে। বাংলা সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন 'বৌদ্ধগান ও দোঁহা' হল বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের রচিত সাধন সংগীতের সমষ্টি। সন্ধ্যা-ভাষায় রচিত এই সব পদে নানা প্রসঙ্গের উল্লেখ আছে। সেকালের সামাজিক আচার-বিচার, রীতিনীতির মধ্যে আছে নাচ-গানের কথা এবং নাটকাভিনয়ের কথা। কাহ্নপাদ-রচিত একটি পদে আছে—

'এক সো পাদুমা চৌষঠী পাখুড়ী
তাঁহি চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী।'

অন্য একটি পদে—

'নাচন্তি বাজিল গাঅন্তি সোঈ
বুদ্ধ নাটক বিষমা হোই।

সেকালে নিশ্চয়ই নারীরা নাচ, গান ও অভিনয়ে অংশ নিতেন, তার থেকেই এই উপমা বা উদাহরণ দেখা যায়। চর্যাপদগুলিতে নির্দেশ দেওয়া আছে কোন্ রাগ-রাগিণীতে সেগুলি গাওয়া হবে। ভৈরবী, পটমঞ্জরী, মল্লরী, কামোদ, মালশী প্রভৃতি রাগের সঙ্গে 'বঙ্গাল' নামে এক রাগেরও উল্লেখ দেখা যায়। এই যুগের সংগীত-শিল্পীদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ড. সুকুমাব সেন মন্তব্য করেছেন— "প্রত্ন বাংলা একাধিক চর্যাগানে সংগীতপ্রিয় এবং গন্ধর্ব-অপ্সরার মতোই স্বৈরাচারী ডোম্ব-ডোম্বিনীর উল্লেখ পাওয়া যায়। এই ডোম্ব-ডোম্বিনীদের গানবাজনার রীতি তান্ত্রিক-অতান্ত্রিক জৈন ও শৈব যোগী সাধকেরা গ্রহণ করেছিলেন। প্রত্ন বাংলায় লেখা কিছু চর্যা গান থেকে মনে হয় যে কোনো কোনো তান্ত্রিক যোগী সম্প্রদায় যেমন নিজেদের শবর-শবরী বলতেন তেমনি কোনো কোনো সম্প্রদায় নিজেদের ডোম-ডোমনী বলত। জাতি হিসাবে ডোম-ডোমনী আমাদের দেশে এখনও অনবলুপ্ত। গানে নয়, তবে ঢোলের বাজনায় ডোমেদের নৈপুণ্য এখনও বজায় আছে।"[২৪]

প্রাচীন ও মধ্যযুগে এ দেশের অভিজাত সমাজে নর্তকী ও গায়িকাদের বিশেষ সমাদর ছিল। দেবদাসীরা মন্দিরে নৃত্যগীত পরিবেশন করতেন। সমাজে তাঁরা ছিলেন শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্রী। শোনা যায় দ্বাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত কবি জয়দেব নিজে সংগীতবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন এবং তাঁর স্ত্রী পদ্মাবতীও ছিলেন নৃত্যগীতপটীয়সী। জনশ্রুতি আছে যে, পদ্মাবতী প্রথম জীবনে ছিলেন উড়িষ্যার মন্দিরের দেবদাসী এবং জয়দেব ছিলেন সেখানকার গায়ক। 'শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ' কাব্যে জয়দেব 'পদ্মাবতী চরণ চারণ চক্রবর্তী' বলে ভণিতা দিয়েছেন দেখে অনেকেই এ কথা বিশ্বাস করেন। এ কথা কোনোক্রমেই অস্বীকার করা যায় না যে, মন্দিরের দেবদাসীদের মাধ্যমে উচ্চাঙ্গেব নৃত্যগীতের ধারাকে প্রচলিত রাখা সম্ভব হয়েছিল।

বড়ু চণ্ডীদাস-রচিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের মধ্যে আমরা 'প্রবন্ধ সঙ্গীত'-এর ধারার পরিচয় পাই। প্রাচীন ও মধ্যযুগে নাটগীত ও পাঁচালি গাওয়া হত। শ্রীচৈতন্যদেব কৃষ্ণলীলার অভিনয় করতেন, সে কথা পাওয়া যায় তাঁর জীবনীগ্রন্থে। বাংলার নিজস্ব কিছু বাদ্যযন্ত্র আছে—শঙ্খ, ঘণ্টা, ডম্ফ, মৃদঙ্গ, জগঝম্প, ডমরু ও বিষাণ।[২৫]

পাঁচালী গানে যিনি প্রধান গায়ক, তিনি এক হাতে চামর নিতেন ও অন্য হাতে মন্দিরা এবং পায়ে নূপুর পরে নেচে নেচে গান পরিবেশ করতেন। তার সঙ্গে তাল দিত মৃদঙ্গবাদক। বাউলরা একতারা বাজিয়ে ও নূপুর পায়ে আজও নেচে নেচে গান গায়। পরবর্তীকালে যাত্রাগান ও কবিগান, তরজা, খেউড় প্রভৃতির জনপ্রিয়তা দেখা যায়। এ-সব ক্ষেত্রে পুরুষের প্রাধান্য থাকলেও জনাকয়েক নারীকেও দেখা গেছে।

বাঙালির জীবনে গানের সর্বব্যাপী প্রভাব সম্বন্ধে জনৈক বিজ্ঞব্যক্তি বলেছেন "ছেলেমেয়ে হলে মায়েরা গান গাইত। গান গেয়ে মায়েরা ছেলেদের ঘুম পাড়াতো। বিয়ে বা অন্য শুভ অনুষ্ঠানেও মেয়েরা গান গাইত। মরে গেলেও লোককে শ্মশানঘাটে নিয়ে যাওয়া হত সংকীর্তন গান গেয়ে। তারপর শ্রাদ্ধের সময়ও নাম কীর্তন করা হত।"[২৬]

বিশেষ কোনো কারণে মধ্যযুগে ভদ্র শ্রেণীর নারীদের মধ্যে নাচ ও গানের চর্চা নিষিদ্ধ হলেও কিছু ব্যতিক্রম যে ছিল না, তা নয়। কারণ মঙ্গলকাব্যগুলিতে আমরা অল্পবিস্তর সেকালের বাস্তবচিত্র খুঁজে পাই। 'মনসামঙ্গল' কাব্যে নৃত্যগীতপটীয়সী বেহুলার কথা পাই। এই চরিত্রটি কাল্পনিক হলেও সেকালে ধনী ঘরের কোনো কোনো মেয়ে নাচগানের চর্চা হয়তো করতেন, তবে সর্বসাধারণের সামনে পরিবেশনের উদ্দেশ্যে নয়, আত্মসন্তুষ্টির কারণে। সমাজবর্হির্ভূত মেয়েরা অবশ্য প্রকাশ্যে নাচ গান করে জনসাধারণ বা রাজদরবারের সভাসদদের মনোরঞ্জন করতেন, তার উল্লেখ আছে মঙ্গলকাব্যে। উদাহরণস্বরূপ রূপরাম– রচিত 'ধর্মমঙ্গল' কাব্য থেকে কয়েকটি ছত্র উদ্ধার করা যায়—

'সনকা নটিনী নাম গৌড় নিবাসী
দেবকন্যা সমতুল্য সাক্ষাৎ উর্বশী
চিন্তামণি পরিপাটী বেউশ্যার ঠাট
রাজ দরবারে গিয়া উসারিল নাট।[২৭]

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে এদেশে কীর্তন ও বাউল গানের বহুল প্রচলন দেখা গেল। বাঙালির প্রাণের সুর ধ্বনিত হয়েছে এই সব গানে। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বলেছেন—

'কীর্তনে আর বাউলের গানে
আমরা দিয়েছি খুলি,
মনের গোপনে নিভৃত ভুবনে
দ্বার ছিল যতগুলি।'

বহু বৈষ্ণবী ও কীর্তনীয়ার কথা শোনা যায়, যাঁরা চমৎকার সুরেলা কণ্ঠে সুরের মায়াজাল সৃষ্টি করে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতেন শ্রোতৃবর্গকে।

রন্ধনপটীয়সী বঙ্গনারী

ভোজনবিলাসী বলে বাঙালির যেমন খ্যাতি আছে, বাঙালি মেয়েদের রন্ধননৈপুণ্যেরও তেমনি প্রশংসা শোনা যায়। প্রাচীনযুগে সহজ সরল জীবনযাপন প্রণালীর সঙ্গে সংগতি রেখে খাওয়াদাওয়ার রীতিও ছিল ভারি সহজ সুন্দর। 'প্রাকৃত পৈঙ্গল' নামে প্রাকৃত ভাষায় রচিত একটি ছন্দগ্রন্থে অপভ্রংশ ভাষায় রচিত একটি পদে সেকালের বাঙালির ভোজনরীতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় আছে—

'ওগ্গর ভত্তা রম্ভয় পত্তা গাইক ঘিত্তা দুগ্ধসজুত্তা।
মোইলি মচ্ছা নালিচ গচ্ছা দিজ্জই কন্তা খা(ই) পুনবন্তা।।

অর্থাৎ গরম ভাত কলার পাতায় করে ঘি ও দুগ্ধ সহ পরিবেশন করছেন বাঙালি ঘরের গৃহিণী, তার সঙ্গে আছে মৌরলা মাছ ও নালতে শাক ভাজা যিনি খাচ্ছেন তিনি পুণ্যবান তো বটেই।

মধ্যযুগে এসে বাঙালির ভোজনবিলাসিতা বৃদ্ধি পেয়েছে, সেইসঙ্গে রন্ধন প্রণালীতে এসেছে জটিলতা ও বৈচিত্র্য। অভাব অভিযোগ থাকলেও বাঙালির শুধু ঝোল ভাতে মন ওঠে নি, সে চেয়েছে—

'ওদন পায়াস পিঠা পঞ্চাশ ব্যঞ্জন মিঠা
অবশেষে ক্ষীর খণ্ড কলা।' ২৮

বাঙালির ভোজনপ্রিয়তা ও আহার্যের তালিকা পাওয়া যায় 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে', কৃষ্ণদাস কবিরাজের রচিত 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে', মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে (ফুল্লরার রন্ধননৈপুণ্যের দীর্ঘ বর্ণনা), ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে (মজুমদার পত্নীর বিস্তারিত রন্ধনের বিবরণ) প্রভৃতিতে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মহাপ্রভুর ভোজনবিলাসের দুটি বর্ণনা আছে, দুটিই কিন্তু নিরামিশ খাদ্য তালিকা। তার কারণ নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবের খাদ্য তালিকায় আমিষভোজ্য স্থান পাবে না, সে কথা বলাই বাহুল্য। প্রথমটি আছে অদ্বৈতাচার্যের গৃহে আহারের আয়োজনের কথা (মধ্যলীলার তৃতীয় পরিচ্ছেদ)। অদ্বৈতপত্নী সীতাদেবী ঐ-সব ব্যঞ্জন ও মিষ্টান্ন যত্নসহকারে প্রস্তুত করেছিলেন। অন্য তালিকায় আছে সার্বভৌম ভট্টাচার্যের গৃহে মহাপ্রভুর জন্য আহারের আয়োজন (মধ্যলীলা, পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ)। এখানে দেখি মহাপ্রভু 'লাফরা' নামক একটি ব্যঞ্জন খেয়ে এতই মুগ্ধ হলেন যে, আবার চেয়ে খেলেন—

'সার্বভৌম পরিবেশন করেন আপনে
প্রভু কহে মোরে দেহ লাফরা ব্যঞ্জনে।'

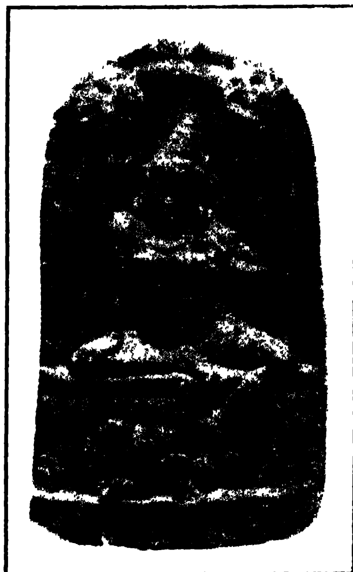
শ্রীচৈতন্যের পিতামাতা দুজনেই ছিলেন অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ। দূরদূরান্ত থেকে তাঁদের গৃহে অতিথি এসে উপস্থিত হতেন এবং সেবা পেয়ে তুষ্ট হতেন। জানা যায় যে একবার মাধবেন্দ্রপুরী ও শ্রীরঙ্গপুরী তাঁদের গৃহে অতিথি হয়েছিলেন। যখন শ্রীচৈতন্যদেব ভারত- পরিক্রমায় গেলেন তখন তিনি শ্রীরঙ্গপুরীর কাছে সেকথা জানতে পারেন। শ্রীরঙ্গপুরী শচীদেবীর রন্ধননৈপুণ্যের কথা উল্লেখ করে বলেন যে, তাঁর হাতে রান্না করা মোচার ঘণ্টের স্বাদ তখনও যেন তাঁর মুখে লেগে আছে।

ষোড়শ শতাব্দীতে মুকুন্দরামের যুগে দেশীয় খাদ্যবস্তুর যত বর্ণনা পাওয়া যায় অথবা যে-জাতীয় খাদ্যের কথা জানা যায়, অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতচন্দ্রের যুগে তার বেশ- কিছু পরিবর্তন ঘটে গেছে। এই সময় নবাবী সংস্কৃতির প্রভাবে আহারের ক্ষেত্রে বিলাসিতা ও রাজসিক ভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই কারণে মুসলমানী রান্না— যাকে আমরা 'মোগলাই খানা' বলে থাকি তার বেশ-কিছু পরিচয় পাওয়া যায়।

বঙ্গনারীর সাজসজ্জা

সাজপোশাকের ব্যাপারেও বাঙালির নিজস্বতা ছিল। প্রাচীন দিনে পুরুষ পরতেন ধুতি ও চাদর এবং মেয়েদের পরনে ছিল শাড়ি। পল্লীবাসিনী ও নগরবাসিনীদের সাজসজ্জার পার্থক্য ছিল।

অলঙ্কার শোভিতা দেবীমূর্তি



ইন্দ্রাণী (রাজসাহী যাদুঘর)



গঙ্গা (একাদশ শতাব্দী)

অলঙ্কার শোভিতা দেবীমূর্তি



সরস্বতী-মূর্তি (ছাতিনগ্রাম)

ধনী ঘরের মেয়েরা পরতেন নানা ধরণের বহুমূল্য রেশমবস্ত্র। মঙ্গলকাব্যে আমরা নানা চিত্র-বিচিত্র করা কাঁচুলির উল্লেখ দেখতে পাই। তা ছাড়া ওড়না ব্যবহারেরও রীতি ছিল। বাংলা দেশের বস্ত্রশিল্প ছিল খুব উন্নত ধরণের। চতুর্দশ শতাব্দীতে তীরভুক্তিবাসী জ্যোতিরীশ্বর তাঁর 'বর্ণ-রত্নাকর'-এ বাংলা দেশের নানা ধরণের পট্ট ও নেত বস্ত্রের উল্লেখ করেছেন— 'মেঘ-উদুম্বর', 'গঙ্গাসাগর', 'লক্ষ্মীবিলাস', 'দ্বারবাসিনী', 'সিলহটী', 'গাঙ্গেরি' প্রভৃতি।[২৯]

প্রাচীনবঙ্গে নারীর সাজসজ্জা কেমন ছিল পালযুগে চিত্র ও ভাস্কর্যে এবং পরবর্তীকালেব কাব্যে সাহিত্যে তার সন্ধান পাওয়া যায়। বহুকাল ধরে এদেশের মেয়েরা শাড়ি পরে আসছেন। এই পোশাকটিতে আছে সৌন্দর্যবোধ ও শালীনতাবোধের পরিচয়। হয়তো আধুনিক যুগে শাড়ি পরার রীতিতে বেশ-কিছুটা পার্থক্য দেখা যায়। কিন্তু প্রাচীন ও মধ্যযুগেও ঐ এক শাড়িই ছিল নারীদের পরিধান। বহু আগে এদেশের মেয়েরা, পুরুষদের ধুতি পরার ধরণে শাড়ি পরতেন শুধু নিম্নাঙ্গে মেখলা বা চন্দ্রহার দিয়ে বেল্টের মতো করে তাকে আঁটসাঁট করে ধরে রাখা হত। উত্তমাঙ্গে পরতেন তাঁরা বক্ষাবরণ বা কাঁচুলি। তার উপর ব্যবহার করতেন ওড়না। পাহাড়পুরের পাথরে খোদাই নারীমূর্তিতে পাওয়া গেছে এই জাতীয় সাজপোশাকের পরিচয়।[৩০]

নানা শ্রেণীর মেয়েদের সাজসজ্জার তারতম্য দেখা যেত। যেমন গৃহবধূ পল্লীবাসিনী ও নগরবাসিনীর সাজ এক ধরণের ছিল না, আবার নটী বা গণিকাদের বেশবাস ছিল ভিন্ন ধরণের। সেকালের কবিদের লেখনীতে পল্লীবধূর সাজের চমৎকার বর্ণনা ফুটে উঠেছে—

'ভালে কজ্জল বিন্দুরিন্দুকিরণস্পর্ধী মৃণালাঙ্কুরো
দোর্বল্লীষু শলাটুফেণিফলোত্তং সশ্চ কর্ণাতিথিঃ।
ধম্মিল্লস্তিলপল্লবাভিষবণ স্নিগ্ধঃ স্বভাবাদয়ং
পান্থান্ মন্থর যত্র্যানাগর বধূবর্গস্য বেশ গ্রহঃ।[৩১]

অর্থাৎ কপালে কাজলের টিপ, হাতে ইন্দুকিরণস্পর্ধী সাদা পদ্মডাঁটার বালা ও তাগা, কানে কচি রীঠা ফলের দুল, কেশ স্নানস্নিগ্ধ এবং কবরীতে তিন পল্লব নিবদ্ধ পল্লীবধূবর্গের এই বেশ স্বতই পান্থদের গমন মন্থর করে দেয়। সাধারণ গৃহস্থ ঘরের মেয়েদের সাজপোশাক ও প্রসাধন দ্রব্যে শাঁখা, সিন্দূর ও কাজলের ব্যবহারই ছিল প্রধান। বেশ বিন্যাসের নানা রীতি ছিল। স্নানের সময় তাঁরা পায়ে মাখতেন হলুদ ও কুঙ্কুম। আমলকী দিয়ে চুল ধুতেন। ধূপের ধোঁয়ায় চুল শুকানোর রীতি ছিল। চন্দন ইত্যাদি সুগন্ধি দ্রব্য গায়ে লেপন করতেন। অভ্রের চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়াতেন। মাথায় ঘোমটা বা অবগুণ্ঠন দেবার রীতিও ছিল। লক্ষ্মীধর- রচিত একটি কবিতায় বঙ্গকুলললনার চমৎকার চিত্র পাওয়া যায়—

'শিরো যদবগুণ্ঠিতং সহজ রূঢ় লজ্জানতং
গতং চ পরিমন্থরং চরণ কোটি লগ্নে দৃশৌ।
বচঃ পরিমিতং চ যন্মধুর মন্দ মন্দাক্ষরং
নিজং তদীয়মঙ্গনা বদতি নূনমুচ্চৈঃ কুলম্।।

অর্থাৎ ঘোমটা-ঘেরা মাথা স্বতই লজ্জায় নত, চলন ধীর, চোখ পায়ের দিকে নিবদ্ধ. বাক্য স্বল্প এবং মৃদু মধুর—এই সব দিয়ে যেন এই মহিলা উচ্চ স্বরে নিজের কুলমর্যাদা প্রকাশ করছেন।[৩২]

"সদুক্তিকর্ণামৃত' গ্রন্থের বহু কবিতায় আমরা সেকালের নারীদের হুবহু বর্ণনা খুঁজে পাই।

বড়ুচণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে সেকালের মেয়েদের সাজপোশাকের বর্ণনা আছে—

'চঞ্চল নয়ন তোর সিসতে সিন্দূর
বাহুতে বলয়া শোভে পাএতে নূপুর।

সে সময়ে মেয়েরা সাতনরী হার এবং বক্ষাবরণী পরতেন—

'কাঞ্চুলী ভাঙ্গিআঁ, তন বিগুতিল,
ছিঁড়ি সাতেসরী হারা।'

পঞ্চদশ শতাব্দীতে কৃত্তিবাস-রচিত রামায়ণে নারীদের বিবিধ অলংকার ব্যবহারের কথা আছে—

'নাকেতে বেশর দিল মুক্তা সহকারে।
পাটের পাছড়া দিল সকল শরীরে।।
গলায় তাহার দিল হার ঝিল্‌মিলি।
বুকে পরাইয়া দিল সোনাব কাঁচলি।।
উপর হাতেতে দিল তাড় স্বর্ণ ময়।
সুবর্ণের কর্ণ ফুলে শোভে কর্ণ দ্বয় ।।
দুইবাহু শঙ্খেতে শোভিল বিলক্ষণ।
শঙ্খের উপরে সাজে সোনার কঙ্কণ।।
দুই পায়ে দিল তার ব্যজন নূপুর।
কপালে তিলক আর নির্মল সিন্দূর।।'

এ সময়ে শুধু তো হিন্দু নারীরা নন, মুসলমান সম্প্রদায়ের নারীদের সংখ্যাও কম ছিল না। তাঁদের সাজপোশাক ছিল কিছুটা ভিন্ন ধরণের। যেমন— "শাঁখের বালা ও সিঁদুরের পরিবর্তে মুসলমান রমণীরা সোনার চুড়ি ও ফাগের গুঁড়া ব্যবহার করতেন। খ্রীস্টীয় চতুর্দশ- পঞ্চদশ শতাব্দী থেকেই বাঙালি সমাজে মুসলমানী গহনার প্রচলন শুরু হয়। ঝাপ্টা, 'চিক্', 'তাজ', 'মাকড়ি' প্রভৃতি অলংকাব এই পর্যায়ে পড়ে। উত্তরকালে হিন্দু মহিলারাও এ-সকল আভরণ ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন।"[৩৩]

বঙ্গললনারা চিরকালই অলংকারপ্রিয়। সেকালের মেয়েরাও কত রকমের সোনা, রুপা ও হাতির দাঁতের তৈরি এবং মণিমাণিক্যখচিত অর্থাৎ জড়োয়া অলংকার পরতেন তার পরিচয় পাওয়া যায় সেকালের সাহিত্যে নারী রূপের বর্ণনার মধ্যে। মুকুন্দরাম-রচিত 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে আমরা

দেখি ফুল্লরার জন্য কালকেতু কিছু অলংকার ও পোশাকপরিচ্ছদ কিনেছিল। যেমন—

'হীরা, নীলা, মতি, পলা কলধৌত কণ্ঠমালা,
কুণ্ডল কিনিল স্বর্ণচুড়ি।
পুরাতে জায়ার সাধ, কিনিল পাটের জাদ।
মণিময় মুকুতার বেড়ী।'

মাণিক গাঙ্গুলীর 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যে নারীর সাজেব কথা আছে—

'কজ্জলে কুরঙ্গ আঁখি করিল শোভন।
অষ্ট অঙ্গে অষ্ট শোভা অষ্টআভরণ।।
কটিতটে সুকিঙ্কিণী কনক বিশাল।
রুণুনু ঝুনুনু বাজে শুনিতে রসাল।।
বিনোদ কাচলিবুকে বিচিত্র অভেদ।
রাধাকৃষ্ণ লেখা তায় রাস পরিচ্ছেদ।।'

শুধুমাত্র উচ্চবর্ণের নারীরাই অলংকার পরিধান করতেন ও প্রসাধনপ্রিয় ছিলেন তা নয়; নিম্ন সমাজের মেয়েরাও নিজেদের রুচি ও পছন্দমতো সাজসজ্জায় রত হতেন। যেমন, রামেশ্বর ভট্টাচার্য-রচিত 'শিবায়ন' কাব্যে এক বাগ্‌দিনীর সাজের বর্ণনা পাই—

'দু-হাতে দু গাছি মেঠে কাপড় পরেছে এঁটে,
খাট করি হাঁটুর উপর।
গলায় রসের কাটি হিঙ্গুলের পলা দুটি,
পুঁথি বেড়ে সেজেছে সুন্দর।।
অঞ্জন রঞ্জন আঁখি, গঞ্জন খঞ্জন পাখী,
সুললিত নাকে নাকচোনা।
নবীন নীবদ তনু, তরুণ তিমির ভানু,
রূপে আলো কৈল কাল সোনা।।
ভুবন মোহন খোঁপা, সন্ধী শালুকের ঝাঁপা,
পেট্যা পাড়ি পরেছে সিন্দূর।
কমল কলিকা কুচ বুকেতে হয়েছে উচ,
কদম্ব কুসুম কর্ণপুর।
পিত্তলের ঝুট্যা পায়, যাবক রঞ্জিত তায়,
করাঙ্গুলে পিত্তল অঙ্গুরী।"

অন্তঃপুরচারিণী নারীদের অলংকার পরিধানের অবকাশ ছিল বলে, সেকালে অলংকারের প্রাচুর্যও ছিল। যে-সব অলংকারের মোটামুটি চলন ছিল তার একটা তালিকা এখানে তুলে ধরা

যায়—সিঁথি, বেশর (নথ), কুণ্ডল (কানবালা), হার, চক্রাবলী, অনন্ত, কেয়ূর, বাজু, তাবিজ, কবচ, জসম, রতনচূড়, শাঁখা ও খাড়ু, মল, তোড়া। বিশেষ ধরণের কয়েকটি অলংকারের উল্লেখ আছে, যেমন— হীরামঙ্গল কড়ি বা মদন কড়ি— সম্ভবত কড়ির আকৃতির মতো কর্ণভূষণ; গ্রীবাপত্র হয়তো চিক্ বা হাঁসুলী ধরণের কোনো অলংকার। 'হাত পদ্ম—হাতের পাতায় পরার উপযোগী কঙ্কণের সঙ্গে যুক্ত পদ্মাকৃতি অলংকার; উজ্মটিকা বা উঞ্ছট— চুটকির মতো পায়ের আঙুলে পরা হত।[৩৪]

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বাংলার লোক-সংস্কৃতি ও নারী সমাজ

বাংলার লোক-সংস্কৃতির সঙ্গে নারীরা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে বা মিশে আছেন—তা সে, সাহিত্য, সংগীত, নৃত্য বা শিল্পকলা কিংবা যে-কোনো উপাদানই হোক-না-কেন। লোক-সংস্কৃতির স্রষ্টাদের ব্যক্তি পরিচয় কিছু জানা যায় না। প্রাচীন দিন থেকে বাংলার লোকসাহিত্য বা শিল্পের ভাণ্ডারে যা-কিছু উপাদান সঞ্চিত আছে, তার মধ্যে রয়েছে প্রাগৈতিহাসিক ও আর্যেতর মানুষের মনের ছাপ। লোকসাহিত্যে থাকে স্বভাবজাত কবিমনের পরিচয় এবং লোকশিল্পের মধ্যে থাকে স্বভাবসুন্দর শিল্পীমনের চিহ্ন। নিরক্ষর মানুষও সৃষ্টির প্রেরণা অনুভব করে এবং তাদের মধ্যেও প্রতিভার জাগরণ ঘটে। লোকশিল্প ও সাহিত্য— প্রাণবন্ত ও জীবনরসসমৃদ্ধ হলেও উচ্চকোটি মানুষের সৃষ্টির সঙ্গে তার কিছুটা পার্থক্য আছে। এখানে যে বর্ণ, গন্ধ ও স্বাদ তা অভিজাত সংস্কৃতির ধারা থেকে ভিন্নতর। অনেকক্ষেত্রে পরিশীলিত রুচি, ভাবধারা ও ভাষার অভাব থাকলেও তা উপভোগ্য এ কথা প্রকৃত রসিক যিনি, তিনি কখনোই অস্বীকার করবেন না। হাল আমলে নানা কারণে বঙ্গের লোকসংস্কৃতির ধারাটি দুর্বল ও স্তিমিত হয়ে আসছে। সামাজিক জীবনযাপন পদ্ধতির দ্রুত বিবর্তনই এর প্রধান কারণ বলে মনে হয়। শহরমুখী জীবন যাপনের প্রবণতাই যে পল্লী-কেন্দ্রিক লোক-সংস্কৃতির ধারাকে বিপন্ন করে তুলেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এদেশে ধীর মন্থর গতিতে যখন জীবনস্রোত প্রবাহিত হত, তখন স্বাভাবিক প্রেরণায় লৌকিক সাহিত্য ও শিল্প সৃষ্টির যে তাগিদ তারা অনুভব করত, বিজ্ঞানমুখী বিপরীত আবহাওয়ায় সেই সব পুরোনো বিশ্বাস ও সংস্কার এবং ভাব ও ভাষা মনে মনে লালন করা যেন আর সম্ভবপর নয়। স্বাভাবিক ভাবেই এই ধারা অবলুপ্তির দিকে চলেছে।

নর নারী নির্বিশেষে সমবেত প্রচেষ্টাতেই গড়ে উঠেছিল লোক-সংস্কৃতির ধারা। বিশেষ কোনো কোনো শাখায়—নারী জাতির প্রাধান্যকে অগ্রাহ্য করা যায় না। বিশেষ ধরণের বিষয়বস্তুর অবতারণা, প্রকাশভঙ্গি ও মেয়েলী ভাষাই তুলে ধরে সে পরিচয়। বিশেষ ধরণের ছড়া, রূপকথা, উপকথা, ব্রতকথা, বিবাহের বা মাঙ্গালিক অনুষ্ঠানের গান, ছড়া, প্রবাদ-প্রবচন রচনায় নারীর প্রাধান্য অনস্বীকার্য। লোকশিল্পের ক্ষেত্রে বিশেষ করে আলিম্পন রচনায়, পুতুল গড়ায় ও কাঁথা তৈরিতে নারীদের একাধিপত্য দেখা যায়। সংসারের চৌহদ্দির মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে মেয়েরা গণ্ডীবদ্ধ জীবন যাপন করে ও সাংসারিক অজস্র দায়-দায়িত্ব পালন করেও যে কল্পনাপ্রবণতা ও কলাকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন, তা বিস্ময়কর। প্রিয়জন পরিবৃত হয়ে সুখস্বপ্নে বিভোর হয়ে

তাঁরা বসবাস করেছেন এবং শৈশব থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত নানা বার ব্রত ও পূজার অনুষ্ঠান পালন করেছেন—প্রিয়জনদের মঙ্গলাভিলাষে। প্রয়োজনবোধে মনস্তুষ্টির কারণে রচনা করেছেন ব্রতের মন্ত্র বা কথা। শিশুর মনোরঞ্জনের জন্য তৈরি করেছেন রকমারি ছেলে ভুলানো ছড়া, রূপকথা, উপকথা ইত্যাদি। প্রিয়জনদের জন্য তৈরি করেছেন নক্শীকাঁথা। ব্রতের কামনা পূরণের উদ্দেশ্যে পিটুলীগোলা দিয়ে আলপনার পদ্মফুল ও নানা লতাপাতা ইত্যাদি এঁকেছেন মনের মতো করে। হাতে-টেপা পুতুল তৈরি করে মন জুগিয়েছেন ছেলেমেয়েদের। এমনিভাবে স্বর্গীয় মাধুর্যে ভরপুর প্রেমপ্রীতি ভালোবাসাভরা স্নেহের নীড় গড়ে উঠেছে।

লোকসাহিত্য

সাধারণভাবে নিরক্ষর মানুষের সৃষ্ট মৌখিক সাহিত্যের ধারাকেই আমরা লোকসাহিত্য নামে অভিহিত করে থাকি। ছড়া, গান, গীতিকা, কথা, ধাঁধা, প্রবাদ ইত্যাদি বিভিন্ন শাখায় তারা বিভক্ত। প্রতিটি শাখার আবার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বর্তমান। বাংলার লোকসাহিত্য কেমনভাবে তার নিজস্বরূপ লাভ করেছে সে সম্পর্কে লোকসাহিত্য-বিশেষজ্ঞ ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন—"বাংলাদেশ পলিমাটির দেশ সুতরাং ভাঙাগড়ার দেশ তার নিত্য ভাঙাগড়ার ভিত্তির উপর নির্ভর করেই, তার জীবন দর্শন; ধর্ম কর্ম সবই পরিকল্পিত হয়েছে; সুতরাং তার সামনে কোন দিন জীবনের কোন অবিচল আদর্শ ছিল না, তা নিয়ে তার মধ্যে কোন রক্ষণশীল মনোভাবও গড়ে উঠতে পারে নি।"[৩৫]

ছড়া ও প্রবাদ

আপাতদৃষ্টিতে ছড়া ও প্রবাদ-প্রবচনগুলিকে অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হলেও, প্রকৃতপক্ষে কিন্তু এদের গুরুত্ব নেহাত কম নয়। প্রাচীনত্বের দিক থেকে এর যেমন মূল্য আছে, তেমনি আবার অনেক সময় সামাজিক ইতিহাস ও রীতিনীতিগুলি এদের মধ্যে বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়িয়ে আছে। ছড়ার জগৎ একটি বিচিত্র জগৎ। বিশেষ সুরে ও ছন্দে মুখে মুখে আবৃত্তির জন্যই এগুলি সৃষ্টি হয়েছে। শব্দে মালা গেঁথে দিলে তার মধ্যে থেকে ফুটে ওঠে অসংলগ্ন ও বিচ্ছিন্ন কয়েকটি চিত্র এবং সেইসঙ্গে থাকে কিছু সুর-ঝংকার। এরা মনের মধ্যে একটি মোহাচ্ছন্ন ভাব সৃষ্টি করে ও তার সঙ্গে আবর্তিত হয় রূপলোক। স্বয়ং কবি রবীন্দ্রনাথের মনকে ছড়া কি ভাবে আকৃষ্ট করেছিল 'ছেলেবেলা'য় সে সম্পর্কে তিনি বলেছেন– "বৃষ্টি পড়ে টাপুর-টুপুর নদী এল বান" এই ছড়াটি বাল্যকালে আমার নিকট মোহমন্ত্রের মতো ছিল এবং সেই মোহ এখনো আমি ভুলতে পারি নাই।"[৩৬]

ছড়ার মধ্যে আবার রকমফের আছে— ছেলে ভুলানো ছড়া, মেয়েলী ব্রতের ছড়া, নৈসর্গিক ও ঐন্দ্রজালিক ছড়া—এমনি আরও কত কী। এরা এক হিসাবে চিরপুরাতন হয়েও, চিরনূতন। মূল্যবান এই দেশজ সম্পদ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তাঁর দেশের মানুষকে অবহিত করে তুলতে চেয়েছিলেন, এই কথা বলে— "বহুকাল হইতে আমাদের দেশের মাতৃভাণ্ডারে এই ছড়াগুলি

রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে; এই ছড়ার মধ্যে আমাদের মাতৃমাতামহীগণের স্নেহ-সংগীতস্বর জড়িত হইয়া আছে...”।[৩৭] অনুমানের ওপর নির্ভর করে বলা যায়— ছড়ার প্রথম স্রষ্টা হয়তো নারীরাই— তাই “... হয়তো বা পুরুষের আগেই শিশু-পুরুষকে মানুষ করে তোলবার জন্য মেয়েদের মধ্যেই প্রথম কাব্য-প্রতিভা দেখা দিয়েছিল।”[৩৮]

অধিকাংশ ছড়ার মেয়েলী বাক্‌রীতি ও খণ্ড ক্ষুদ্রচিত্রগুলি নারীজগৎ ও জীবনের অনেক রহস্য উদ্ঘাটিত করে দেয় আমাদের চোখ ও মনের সামনে। এগুলি শুনলে মনে হয় কত যুগ যুগ ধরে অসংখ্য মানুষের সুখ দুঃখ ব্যথা ও বেদনার স্মৃতি জড়িয়ে আছে এর সঙ্গে। প্রাণহীন দেশাচার ও লোকাচারের যূপকাষ্ঠে কত নারীর জীবন যে ব্যর্থ হয়ে গেছে— তাদের অনেকেব দীর্ঘশ্বাস যেন এগুলির মধ্যে শোনা যায়, ছড়ার অসংলগ্ন কথায় ও সুরে। ছড়ার জগৎ, এক হিসাবে যে নারী জগৎ—সে কথা বোঝাতে গিয়ে ড. বিজনবিহারী ভট্টাচার্য মহাশয় বলেছেন— “গ্রাম্য রমণীদের মধ্যে সেকালে কথায় কথায় ছড়া কাটার রেওয়াজ ছিল। বস্তুতঃ প্রবাদে-প্রবচনের অর্ধাংশ, হয়তো তাহারও বেশী, মেয়েলী ছড়া অথবা মেয়েলী ছড়ারই রূপান্তর। জন্ম-মৃত্যু বিবাহ ঘর-সংসার হাসিকান্না মিলনবিরহ ক্রিয়াকর্ম হাটবাট- ঘাট গোয়াল ঘর রান্নাঘর আঁতুড়ঘর ঢেঁকিশাল বাপের বাড়ী শ্বশুরবাড়ী ননদ-জা ভাসুর ভাদ্রবধূ সতীন-সতীনপো মাসি-বোনঝি দেবর-ভাজ প্রভৃতি বিবিধ বিচিত্র বিষয় আশ্রয় করিয়া যে শত সহস্র ছড়া মুখে মুখে জন্মিয়া মুখে মুখে ছড়াইয়া পড়িয়াছে সেগুলির দিকে একটু নজর দিলেই তাহাদের ‘অপৌরুষেয়ত্ব’ উপলব্ধি করিতে বিলম্ব হইবে না।”[৩৯]

দু-একটি ছড়ার ছত্র বিশ্লেষণ করলে, কত রহস্যের আবরণ উন্মোচিত হয়। যেমন একটি ছড়া শোনা যায়—

‘পরের বেটা মারলে চড়।
কানতে কানতে খুড়োর ঘর।
খুড়ো দিলে বুড়ো বর ॥’

পরের গলগ্রহ হয়ে থাকা কোনো মেয়েকে তার খুড়ো ‘কৌলীন্য প্রথা’র চাপে পড়ে বুড়ো বরের হাতে তুলে দিয়েছিলেন কিন্তু সেই কন্যা সুখী হতে পারে নি। স্বামীর সোহাগের পরিবর্তে, তার কপালে জুটেছিল চড়-চাপড়। তার মনের রোষ ক্ষোভ ও অভিযোগ এখানে যেন পুঞ্জীভূত হয়ে আছে।

আর-একটি ছড়া—

‘মায়ে দিল সরু শাঁখা বাপে দিল শাড়ি।
ভাই দিলে হুড়কো ঠেঙা ‘চল্ শ্বশুর বাড়ী’।’

হয়তো অপাত্রে কন্যা দান করতে বাধ্য হলেন পিতামাতা— বাল্য বিবাহ প্রথার দরুন। কিন্তু সতীনদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে না পেরে— কন্যা প্রত্যাবর্তন করল পিত্রালয়ে। মা-বাবা

অকৃপণ স্নেহ বর্ষণ করেন ও সাধ্যমতো উপহার দিয়ে তার মন ভোলাতে চান কিন্তু তার নিষ্ঠুর ভাইয়ের হাতে তার নিস্তার নেই। বোনরূপ 'আপদটি'কে বিদায় করতে পারলেই ভাই-এর মনে শান্তি হয়। আরও অনেক ছড়ার ছত্র উদ্ধার করে প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে যে, বহুবিধ নারী নানা নির্যাতনের কথা তাঁরা নিজেরাই সুকৌশলে ও সংক্ষিপ্ত ভাষণের মধ্যে দিয়ে জানিয়ে গেছেন ছড়ার মধ্যে।

প্রাণহীন পণপ্রথার চলন কতদিন থেকে এদেশে চলেছে তার সঠিক হিসাব দেওয়া যাবে না। বালিকা বয়সে আদরের মেয়েটি সকলকে কাঁদিয়ে ও নিজে কেঁদে যখন পরের ঘরে যেত, তার সঙ্গে পিতাকে দিতে হত সিন্ধুক ভরা টাকা—

'আজ দুর্গার অধিবাস কাল দুর্গার বিয়ে।
দুর্গা যাবেন শ্বশুর বাড়ী সংসার কাঁদায়ে।

...

বাপ কাঁদেন বাপ কাঁদেন দরবারে বসিয়ে
সেই যে বাপ টাকা দেছেন সিন্ধুক সাজায়ে।।

...

সেকালে পাত্রপক্ষই শুধু পণ নিতেন না, অনেক সময় অনেক হৃদয়হীন পিতামাতা, কন্যার বিনিময়ে পাত্রপক্ষের কাছ থেকে মোটা পণ আদায় করতে দ্বিধাবোধ করতেন না। কারণ "একালে যেমন বরপক্ষ কন্যাপক্ষের কাছে বর পণ নেন মধ্যযুগে ছিল বিপরীত রীতি—বরের পিতা কন্যা পণ দিতেন। এখনও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে এই প্রথা দেখা যায়।[৪০] তাই প্রবাদ বাক্য শোনা যায় 'কনের মা এক চোখে কাঁদে ও আর এক হাতে টাকার পুঁটুলি বাঁধে। কিংবা ছড়ার মধ্যে কন্যার অভিমান ভরা কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়া যায়—

'এত টাকা নিলে বাবা, দূরে দিলে বিয়ে।
এখন কেন কানছ বাবা গামছামুড়ি দিয়ে।।'

কারণ অর্থলোভী পিতা হলেও তাঁর স্নেহাতুর মনটি বিকল হয়ে গেল দূর অজানা দেশে বালিকাকে পাঠাতে গিয়ে। অথচ স্পষ্টবাদী কন্যা তার পিতাকে খোঁটা দিতে ভুলল না।

শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে কন্যাকে যদি সুখে ঘরকন্না করতে হয় তা হলে সকলের, বিশেষ করে শাশুড়ি ঠাকরুনের মনকে ভোলাতে হবেই। সেকথা পুঁটুরানীর মা-বাবার অজানা ছিল না বলেই তাঁরা শাশুড়ি ভোলানোর পন্থাটি কী নিলেন ?

'উড়কি ধানের মুড়কি দেব শাশুড়ি ভোলাতে।' অথবা আদরের মেয়েকে যাতে শ্বশুর বাড়ির লোকেরা গঞ্জনা না দেয়, সেজন্য আম-কাঁঠালের বাগান দেব ছায়ায় ছায়ায় যেতে।'

বধূ নির্যাতন শুধু একালের একচেটিয়া ঘটনা নয়— এদেশে সেকালেও বধূর লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা ছিল বড়ো মর্মান্তিক। কোমল বালিকা-বধূ শ্বশুর বাড়ির অত্যাচার সয়ে যখন হতাশ হয়ে

পড়ত তখন নদীর ওপারে তার পিত্রালয়ের গ্রামের দিকে তাকিয়ে থাকত। এমন সময় হয়তো বর্ষার ঘন কালো মেঘে ঢাকা পড়ে যেত। ঝমাঝম্ বৃষ্টি শুরু হত। তখন তার মনটি বড়ো উতলা হয়ে উঠত— আর সেইসঙ্গে আর্থিক অনটনক্লিষ্ট 'গুণবতী' ভাইটি'র আশ্বাসবাণী কানে ধ্বনিত হত—

'এ মাসটা থাক দিদি, কেঁদে ককিয়ে
ও মাসেতে নিয়ে যাব পাল্কী সাজিয়ে'

কিন্তু নির্যাতনের অতিশয্যে প্রাণ রাখা যখন দায় হয়ে পড়ল তখন নদীর শীতল জলে শরীর ও মনের জ্বালা জুড়োবার জন্য সে ব্যাকুল হয়ে উঠল—

'হাড় হল ভাজা ভাজা মাস হল দড়ি
আয়রে আয় নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ি।'

নাম না জানা কত মেয়ের করুণ জীবনের ইতিহাস এইভাবে এখানে লুকিয়ে আছে, কে বলতে পারে ? যে মা কন্যার বিরহে ব্যাকুল হয়ে সান্ত্বনা দেবেন তাকে, তিনি নিজের কথা ভেবেই তো আবার আকুল হয়ে পড়েন। চিরন্তন নিয়মে মেয়েদের পরের ঘরে যেতে হয়। নিজেও একদা তাই করেছেন। তাই মনকে চোখ ঠেরে বলে ওঠেন—

'কেঁদে কেন মর,
আপনি ভাবিয়া দেখ কার ঘর কর।'

শোনা যায় মেয়েরাই মেয়েদের সবচেয়ে বড়ো শত্রু। ঘরের কোণে বসে অনেক নারী তাঁদের সংকীর্ণচিত্ততার পরিচয় রেখে গেছেন স্বরচিত ছড়ার মধ্যে। যেমন কোনো নারী তাঁর ভাইপোকে সুকৌশলে কর্তব্য পরায়ণ করে তুলতে চাইছেন— স্বার্থপরের মতো। তার মাসির বেলায় কিন্তু ভিন্নভাব পোষণ করতে বলেছেন—

বাপের বোন পিসি
ভাত কাপড়ে পুষি।
মায়ের বোন মাসি
কাদায় ফেলে ঠাসি।'

পিসির এত সমাদর অথচ মাসির এত অনাদর, একে কি সুবিচার বলা যায় ? কারণে অকারণে মাসির অপবাদ রটানোর চেষ্টা অন্যত্রও লক্ষ্য করা যায়—

'মাসি পিসি বনকাপাসি বনের ধারে ঘর,
কখনও মাসি বলে নাকো খই মোয়াটা ধর।'

পুরুষরা তখন বহু বিবাহ করতেন, কাজেই অধিকাংশ মেয়েকে বিয়ের পর সতীন নিয়ে ঘর করতে হত। শিশুকালেই তাদের মনে সতীনজ্বালার চিন্তা জেগে উঠত। তাই বিদ্বিষ্ট মনোভাব

নিয়ে তারা ব্রতের ছড়া কাটত—

'ময়না ময়না ময়না।
সতীন যেন হয় না।
হাতা হাতা হাতা।
খা সতীনের মাতা।

কাল্পনিক সতীন সম্পর্কে কটূক্তির চরম হল—

'বঁটি বঁটি বঁটি।
সতীনের শ্রাদ্ধে কুট্‌নো কুটি।
অসৎ কেটে বসত করি
সতীন কেটে আলতা পরি।'

সেঁজুতিব্রতের মন্ত্রে এমন শিক্ষা পেয়েও কিন্তু অনেকক্ষেত্রে দেখা যেত বিয়ের পর মেয়েরা অনেকে সতীনকে নিয়ে সহোদরা ভগিনীর মতো সদ্ভাব বজায় রেখে আজীবন ঘর সংসার করে গেছে।

ছেলে-ভুলানো ছড়াগুলিতে আছে 'আদিম সৌকুমার্য'। কারণ 'দুনিয়ার সার, ভালবাসা মা'র।' শিশুরা যেমন মায়ের সান্নিধ্য খোঁজে, মায়ের মনও তাকে নিয়ে স্বপ্নলোকে বিচরণ করতে চায়। এই সব ছড়ায় মায়ের মুখের উক্তিগুলি আতিশয্যে পরিপূর্ণ। একটি মাত্র উদাহরণ দিলেই তা বোধগম্য হবে—

'ধনকে নিয়ে বনকে যাব, সেখানে খাব কী,
নিরলে বসিয়া চাঁদের মুখ নিরখি।'

বিশাল চিত্র প্রদর্শনীর মতো, একটির পরে একটি ছড়ার চিত্র সাজিয়ে দেওয়া যেতে পারে। নারী-রচিত প্রবাদ ও ছড়ায় দেখা যায় "নারীর দৃষ্টিতে নারীর চরিত্রই এখানে ব্যাখ্যাত হয়েছে।"[৪১]

যেমন বাড়ির ঝি আর বধূকে জব্দ রাখার উপায় সম্বন্ধে প্রবাদ কী বলে? প্রবাদ বলে— 'ঝি জব্দ শিলে আর বউ জব্দ কিলে।' বাঙালি ঘরের মেয়ে বউদের কত সহজে সংযত ও শিষ্টাচারসম্পন্ন করে তোলা যায়, তার দাওয়াই জানতেন অভিজ্ঞ গৃহিণীরা। অহরহ তাঁদের মুখে শোনা যেত—

'রাঁধি বাড়ি যেবা নারী পুরষের আগে খায়,
ভরা কলসির জল তরাসে শুকায়।
এলায়ে মাথার কেশ ফিরে পাড়া পাড়া,
লক্ষ্মী বলে, সেই নারী যেন লক্ষ্মী ছাড়া।'

এই সব প্রবাদ বাক্যে অনেক সময় কিন্তু নারীদের গাল-মন্দ করা হয় প্রকারান্তরে। পুরুষশাসিত

সমাজে নারীর অমর্যাদার প্রতিবাদ তেমনভাবে শোনা যেত না। তাই তারা বলত—

'নদী, নারী, শৃঙ্গধারী
এ তিনে বিশ্বাস না করি।'

অথবা 'গরু, জরু, ধান,
না দেখলেই যান।'

এমন-কি সমাজে ও সংসারে ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা যে অবহেলার পাত্রী, সে কথা জোর গলায় ঘোষণা করে বলতেন—

'পুতের মুতে কড়ি,
মেয়ের গলায় দড়ি।'

মায়ের কাছে অবশ্য বত্রিশ নাড়ীছেঁড়া ধন সন্তান মাত্রেই আদরের ধন—

'মায়ে জানে পুতের বেদন অন্যে জানবো কি,
মায়ের বুকের লৌ পুত্র আর ঝি।'

কৃষিকর্ম সম্বন্ধীয় এক জাতীয় ছড়া প্রচলিত আছে, সেগুলিও নারীদেরই রচনা। কিম্বদন্তীর বিদুষী খনার নামে এগুলি চিহ্নিত। এই প্রবচন ও ছড়া সম্পর্কে বিশিষ্ট এক সমালোচক বলেছেন- –"খনার বচনগুলির উদ্ভবের মূলে মাতৃতান্ত্রিক কৃষিজীবী সমাজের মৌলিক প্রেরণার অস্তিত্ব থাকতে পারে, সেইসূত্রেই খনার বচনগুলিও মূলত নারীর রচনা হওয়া সম্ভব।"[৪২]

কথা

বহুকাল থেকে এদেশে লোকপরম্পরায় চলে আসছে রূপকথা, উপকথা ও ব্রতকথাগুলি, যা একান্তভআবে নারী মনেরই সৃষ্টি! ব্রতকথার মধ্যে যে জাতীয় ধর্মবোধের পরিচয় আছে, তার মধ্যে আছে নিজস্ব বিশেষত্ব। সেটি হল— "বাংলার মেয়েরা যে ব্রত পালন করে, তাহাদের মধ্য দিয়া তাহাদের স্বর্গ বা মোক্ষলাভের কামনা প্রকাশ পায় না বরং ঐহিক জীবনের অভাব-অনটন হইতে পরিত্রাণের কামনাই প্রকাশ পায়। স্বচ্ছল গৃহবাসই তাহাদের স্বর্গবাস, মানবিক সম্পর্কের বন্ধনের মধ্যেই তাহাদের মোক্ষের আনন্দ।"[৪৩]

লৌকিক দেবতাদের নিয়ে গড়ে উঠেছে বাংলার ব্রতকথাগুলি। কুমারী, সধবা সকল শ্রেণীর নারীরাই বিভিন্ন ব্রতের অনুষ্ঠান করতেন। এই সব ব্রতের ছড়াগুলি খাঁটি মেয়েলী ভাষায় রচিত মন্ত্র বিশেষ। তাদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, ঐ সব ছড়ায় এক ধরণের ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা আছে। নারী মনের একান্ত কামনা-বাসনাগুলি রূপ পেয়েছে ঐ-সব মন্ত্রে। তোষ্‌লাব্রতের মন্ত্রটি স্মরণ করা যেতে পারে—

'কোদাল-কাটা ধন পাব,
গোহাল-আলো গরু পাব,
দরবার আলো বেটা পাব,

সভা-আলো ঝি পাব,
আড়ি-মাপা সিন্দূর পাব।
ঘর করব নগরে,
মরব গিয়ে সাগরে
জন্মাব উত্তম কুলে,
তোমার কাছে মাগি এই বর
স্বামী পুত্র নিয়ে যেন সুখে করি ঘর।'[৪৪]

ব্রতকথাগুলি সম্পর্কে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মন্তব্য করেছেন— "খাঁটি মেয়েলি ব্রতগুলি ঠিক কোন দেবতার পুজো নয়, এর মধ্যে ধর্মাচরণ কতক কতক উৎসব, কতক চিত্রকলা, নাট্যকলা, গীতকলা ইত্যাদিতে মিলে একটুখানি কামনার প্রতিচ্ছবি, কামনার প্রতিধ্বনি, কামনার প্রতিক্রিয়া।"[৪৫]

লক্ষ্মীপূজা বা মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত ছাড়াও আরও নানা ধরণের ব্রত প্রচলিত ছিল— পুণ্যিপুকুর, যমপুকুর, সেঁজুতি, ভাদুলি, মাঘমণ্ডল, তুষতুষালি, বসুধারা, অনন্ত, আদর সিংহাসন, সাবিত্রী, হরিচরণ, ইতু, গোকাল, ষষ্ঠী, অশত্থপাতা, সন্ধ্যামণি ইত্যাদি। এই সমস্ত ব্রতের পূজায়, পুরোহিতের কোন স্থান ছিল ন। মেয়েরা নিজেরাই মন্ত্র বলে পূজা করতেন।

গীতিকা

দীর্ঘ আখ্যায়িকামূলক গীতিকা ("Ballad") রচনায় নারীরাও পটু ছিলেন। প্রমাণস্বরূপ সপ্তদশ শতাব্দীর বিশিষ্ট মহিলা কবি চন্দ্রাবতী-রচিত একাধিক গীতিকার সন্ধান পাওয়া যায়। 'মৈমন সিংহ গীতিকা' ও 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'য় একাধিক ধর্মনিরপেক্ষ মানবিক প্রেমকাহিনী–সংবলিত গীতিকায় স্থান লাভ করেছে মানুষের হৃদয়ানুভূতি। সৌন্দর্য চেতনা ও প্রকৃতিপ্রেম নিয়ে যে-সব গীতিকা একদা রচিত হয়েছিল—তার সম্পর্কে একজন ঐতিহাসিক উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বলেছেন—"এই গীতিকাগুলির ভাষা অমার্জিত ও গ্রাম্য পূর্ববঙ্গীয় কথ্যভাষা। কিন্তু ইহাতেই অপরিসীম কাব্যসৌন্দর্য স্ফূর্ত হইয়াছে। এই ভাষার মধ্য দিয়া যেন আমরা রূপকথার জগতে উত্তীর্ণ হই। ইহার মধ্যে ব্যবহৃত শব্দ ও বাকাংশগুলি যেন রূপকথার মায়াঞ্জনজড়িত, অথচ সেগুলি যেমনই স্বাভাবিক তেমনই প্রাণবন্ত।"[৪৬]

গীতি

লৌকিক গীতির মধ্যে মেয়েলী গীতিগুলি মেয়েরাই গাইতেন। পুরুষের কোনো সংস্রব থাকত না এখানে। নারী সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত, এ-সব অনুষ্ঠান। যেমন বিবাহ, সাধ ভক্ষণ, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন প্রভৃতি নানা ধরণের পারিবারিক ও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে এই সব গান গাওয়া হত।

মেয়েদের রচিত এই সকল বিবাহ সংগীতগুলি কিছু পরিমাণে বৈচিত্র্যহীন। পূর্ববঙ্গেই বিশেষ করে এর চলন ছিল। শিব-দুর্গা বা রাম-সীতাকে কেন্দ্র করেই এই গান রচিত হত তার কারণ রাম-সীতা বা শিব-দুর্গার পবিত্র দাম্পত্য জীবনই ছিল আমাদের কাছে শাশ্বত আদর্শ।

লোকশিল্প

বাংলার লোকশিল্পের ক্ষেত্রে বাঙালি মেয়েদের যে সূক্ষ্ম ও সহজাত সৌন্দর্যানুভূতি এবং তার সঙ্গে শিল্পকুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়—এক কথায় তা বিস্ময়কর। গৃহকে কেন্দ্র করেই বয়ে চলেছে বাঙালির জীবন, সুতরাং বঙ্গনারীর সৌন্দর্যবোধের পরিচয় ফুটে ওঠে দৈনন্দিন জীবনের নানা কাজ ও ব্যবহারিক বস্তুর মধ্যে দিয়ে। লোকশিল্পের এই সব উপাদানের মধ্যে একদিকে আছে বৈচিত্র্য, অন্যদিকে আছে ঐক্য। যেমন—"কাঁথা আর আলপনার জগৎ থেকে গৃহগত জীবনকে যাতে বাস্তবক্ষেত্রে খুব কিছু দূরে সরে আসতে না হয় সেইদিকে দৃষ্টি রেখেই গড়ে তোলা হয়েছিল নিত্য ব্যবহারের নানা জিনিসের আকৃতি আর নক্শা, পূজা পার্বণের আলপনা আর পুতুলের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক ছিল চিত্রিত ঘট, পট, সরা আর কুলোর।"[৪৭]

কাঁথার নকশা বা প্রথাগত আলপনার মধ্যে আমরা দেখতে পাই দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত অনেক খুঁটিনাটি বস্তুকে. গাড়ি, পাল্কী, নৌকা ইত্যাদি সেকালের যানবাহন, হাঁড়ি-সরা, কুন্কে-গাড়ু, ধামা-ধুচনী, থালা-বাসন ইত্যাদি নানা তৈজসপত্র, আরশি, চিরুনী, শাড়ি, গয়না, সিঁদুর কৌটা, লক্ষ্মীর ঝাঁপি— এমনি আরও কত কী।

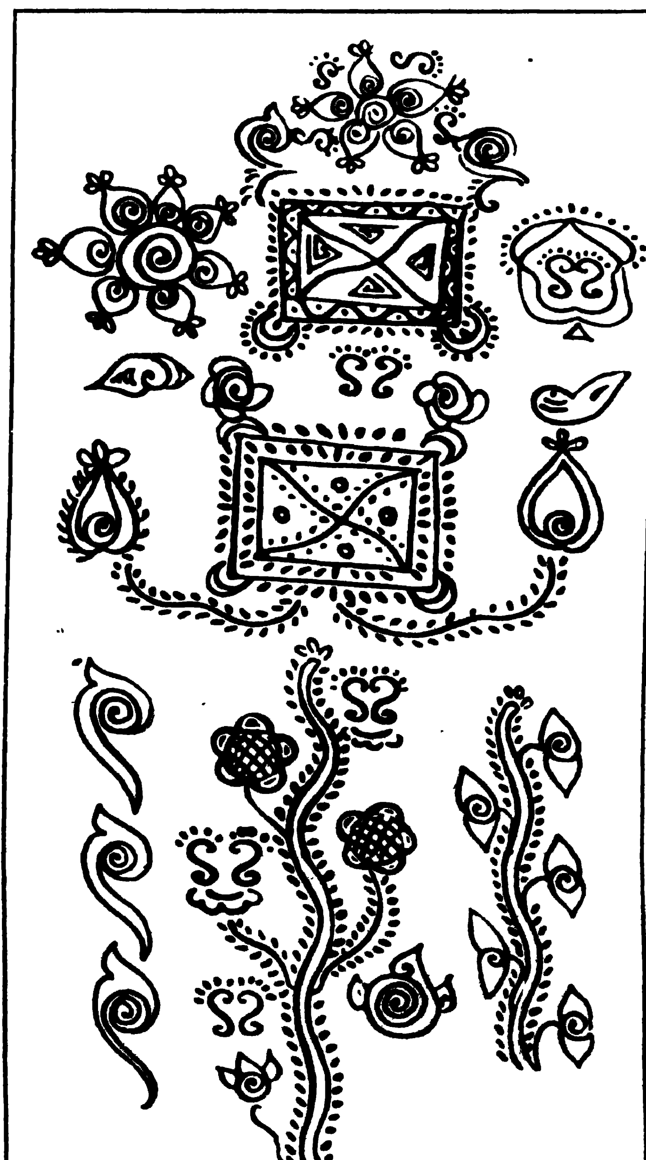
আলপনা

একদা বাঙালি ঘরের মেয়েরা অশৈশব যত বার-ব্রত ও পূজা-পার্বণ করতেন, আলপনা ছিল তার অপরিহার্য অঙ্গ। পূজার স্থানে এটিকে একটি বিশেষ মাঙ্গলিক চিহ্ন রূপে গ্রহণ করা হত। ভারতের অন্যত্র এই আলপনার সমগোত্রীয় রূপে দেখা যায়— গুজরাট বা মহারাষ্ট্রের 'রঙ্গোলী', দক্ষিণভারতে 'কোলম্' এবং উড়িষ্যায় 'ঝুঁটি'। কিন্তু বাংলার মেয়েদের আলপনার সূক্ষ্ম ছন্দময় লীলায়িত ভঙ্গিটি অন্যত্র দুর্লভ।

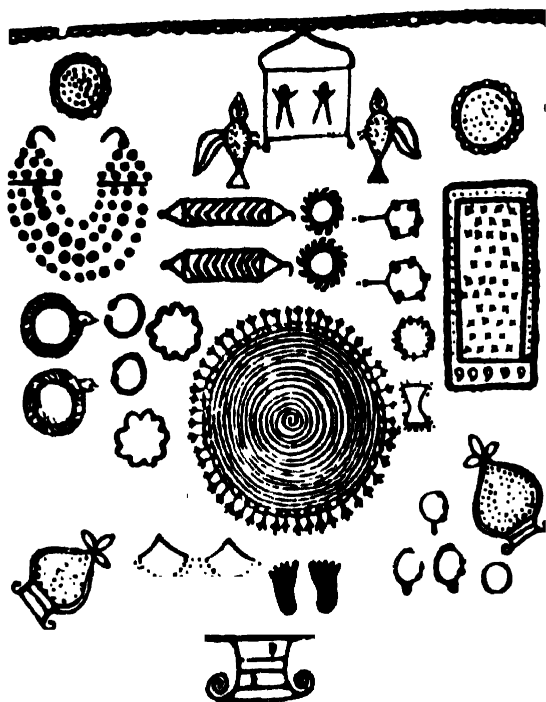
আলিম্পন অঙ্কনের প্রবর্তন সম্পর্কে গবেষকরা বলেন, আদিম কালে মানুষের মনে ছিল জাদুবিদ্যার ("magic") প্রতি গভীর আস্থা। মেয়েরা নানা হেঁয়ালীভরা প্রতীক চিহ্ন এঁকে প্রিয়জনদের বা নিজের জন্য মঙ্গল ও সমৃদ্ধি কামনা করতেন। প্রথম দিকে আলপনা ছিল, ব্রতের জাদুভিত্তিক প্রক্রিয়া। ক্রমে ঐ-সব বিশেষ ধরণের রেখাঙ্কনগুলি মিশে গেল চিত্রের সঙ্গে। তার সঙ্গে সংমিশ্রণ ঘটল সৌন্দর্যবোধের। এইভাবে সৃষ্টি হল, আলপনার রূপ ও অলংকরণ রীতির। পল্লী বাংলার মেয়েদের কল্পনাপ্রবণ মন ও তাদের সহজাত চিত্রাঙ্কন প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে ব্রতের ও পূজার আলপনাগুলি।

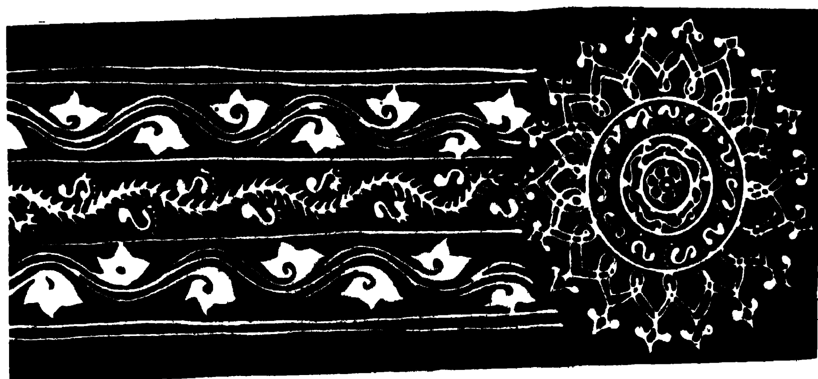
আলপনার প্রধান উপকরণ হল, পিটুলীগোলা চাল ভিজিয়ে ও বেটে এটি তৈরি করা হয়। তার মধ্যে তুলো ভিজিয়ে নিয়ে হাতের নানা কৌশলে আঁকা হয় চিত্র। সাদা রঙই প্রধান, কারণ

লক্ষ্মীপূজার আলপনা



লক্ষ্মীপূজার আলপনা





ত্রিগুণাতীত সার্বভৌমত্বের প্রতীক এই সাদা রঙ। অনেক সময় নানা রঙ মিশিয়ে রঙিন আলপনাও দেওয়া হয়। আঁকা হয় নানা জ্যামিতিক নক্‌শা, গাছপালা, পশুপাখি, মানুষ, ঘরবাড়ি, যান-বাহন, ঘর-গৃহস্থালীর নানা সাজ সরঞ্জাম, পুকুর, নদ-নদী, সূর্য, চন্দ্র, তারা এমন আরও অনেক কিছু। ব্রতের মন্ত্রগুলির সঙ্গে ঐ-সব আলপনার একটা ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র থাকে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় মধ্যস্থলে আঁকা হয় বহুদলবিশিষ্ট বড়ো একটি পদ্ম। এই প্রস্ফুটিত পদ্মটি হল সাফল্যের প্রতীক। অনেক সময় শক্তির উৎসমূল, সূর্যের প্রতীক হিসাবেও দেখানো হয় পদ্মটিকে। কতকগুলি নক্‌শার স্বতন্ত্র মর্যাদা ও পরিচয় আছে। যেমন— শঙ্খলতা হল পবিত্রতার প্রতীক চিহ্ন। বিবাহের আলপনায় মাছ বা প্রজাপতির বিশেষ গুরুত্ব আছে।

লৌকিক ধর্মাচরণে আলপনার সাহায্যে মেয়েরা তাদের মনের বাসনা ও আকাঙ্খাকে প্রতিফলিত করে দেখাতে চান। কামনার বস্তুগুলির প্রতিচ্ছবি আঁকা থাকলে এবং তার উপর ফুল ধরে কামনা জানালেই তা সফল হবে। এই হল তাৎপর্য। মেয়েদের স্বভাবজাত ধর্মবোধ, বিশ্বাসের সঙ্গে মিলেছে সৌন্দর্যবোধ— তাই সেটি এমন প্রাণবন্ত, মনোরম ও তৃপ্তিদায়ক হতে পেরেছে। একালে বারব্রতের প্রতি নিষ্ঠা ও আস্থা নেই কারণ পূর্বের সেই অখণ্ড বিশ্বাস ও নির্ভরতার লাঘব ঘটেছে। তাই যে-কোনো শুভ উৎসব বা অনুষ্ঠানে অলংকরণের কাজে, নতুন রীতির নক্‌শায়, মণ্ডন শিল্পটিকে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। এই বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে আলপানার রীতিটি স্থায়িত্ব লাভ করেছে।

কাঁথাশিল্প

সীবনরীতির গুণপনার সঙ্গে এসে মিশেছে শিল্পরীতি, তারই পরিচয় দেয় 'নক্‌শী কাঁথা'। এদেশের মেয়েরা সেকালে সাংসারিক কাজ কর্মের অবসরে, বসে বসে পুরোনো পরিত্যক্ত কাপড়ের ওপর রঙিন সুতো দিয়ে নানা ধরণের ফোঁড় তুলে এই নক্‌শা ও কারুকার্য (embroidary) করতেন। বাংলার প্রায় সর্বত্র কাঁথা তৈরি হত, তবে পূর্ব বাংলার ঢাকা, ফরিদপুর, যশোহর ও খুলনার মেয়েদের হাতে তৈরি কাঁথার তুলনা নেই। এ ছাড়া বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, রাজশাহী, ফরিদপুর ও ত্রিপুরা অঞ্চলেও কিছু কিছু উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কাঁথা, জাদুঘরের জন্য সংগৃহীত হয়েছে।

অনেক সময় সূক্ষ্ম কারুকার্যময় একটি কাঁথা একজন নারীর জীবদ্দশায় সম্পূর্ণ হত না, মা-মেয়ে-নাতনী পরম্পরায় সেই কাঁথা শেষ হতে দেখা গেছে।

শীতের দিনে দেহাবরণ হিসেবেই এগুলির ব্যবহার হত; দৈর্ঘ্য সাধারণত হত চার বা পাঁচ হাত। ছোটো মাপের কাঁথাও তৈরি হত অনেক সময়, আরশি চিরুনি মুড়ে রাখার উদ্দেশ্যে বা বাক্স-পেঁটরা ঢেকে রাখার জন্য। যাঁরা অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে এইসব কাঁথা তৈরি করতেন, তাঁরা নিজেরা কোনোদিন তা ব্যবহার করতেন না।

উপহার দেবার মানসেই এগুলি তৈরি হত। তার বিনিময়ে তাঁদের প্রাপ্য ছিল আশীর্বাদ স্নেহ ও ভালোবাসা। এটি ছিল যেন বাঙালি নারীর জীবনে একটি পবিত্রকর্ম। এই কাঁথা ব্যবহারের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শিল্পগবেষক ড. কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন: "ভগবান বুদ্ধ এবং তাঁর শিষ্যেরা যে পরিচ্ছদ ব্যবহার করতেন, সেই পরিচ্ছদ তৈরি হত লোক-পরিত্যক্ত জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডের সমষ্টি থেকে। নূতনই জীর্ণ হয় আর যাঁদের জ্ঞান উন্মেষিত হয়েছে তাঁদের কাছে নূতন এবং জীর্ণের কিছু পার্থক্য থাকে না।"[৪৮] ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যের ভিক্ষার ঝুলিও প্রস্তুত হয়েছে পুরাতন ও জীর্ণ কাপড় সেলাই ক'রে।

এই সব কাঁথায় নকশা ফুটিয়ে তুলতে, শাড়ির পাড়ের যে-সব রঙিন সুতার ব্যবহার দেখা যায় সেখানে তিন রঙ প্রধান— হলুদ, লাল আর কালো। এরা হল সৃষ্টির তিনটি গুণ— সত্ত্ব, রজ ও তম-র প্রতীক। প্রত্যক্ষযোগ না থাকলেও, আলপনার ও কাঁথার নক্শার মধ্যে একটা গভীর সাদৃশ্য অনুভব করা যায়। এইসব নক্শী কাঁথা বাঙালি মেয়েদের শিল্প-মানসিকতার পরিচায়ক।

পুতুল

বাংলার মৃৎশিল্প বাঙালির গৌরবের বস্তু। এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ আছে বাংলার নারীর। প্রথম যুগে মৃৎশিল্পী কারা ছিলেন তার আলোচনা করে জনৈক গবেষক বলেছেন—

"প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ও নৃতত্ত্বদ্দিের মতে এই মৃৎশিল্প বিপ্লবের প্রধান নায়ক অথবা নায়িকা হলেন কৃষকপত্নী ও কৃষক কন্যাবা। অর্থাৎ মানব সমাজের প্রথম বা আদি মৃৎশিল্পী নারী এবং নব্য প্রস্তর যুগের অন্ততঃ দশ-বারো হাজার বছর আগে মৃৎশিল্পের আবির্ভাব।"[৪৯]

শিশুদের খেলার সামগ্রীরূপে, ঘর সাজানোর উপকরণ হিসাবে এবং মেয়েদের বার-ব্রতের সহায়রূপে মাটির পুতুল গড়া হয়েছে অজস্র। বর্তমানে হয়তো পুতুল তৈরি হয় নর ও নাবীর মিলিত প্রয়াসে। কিন্তু প্রথম এই পুতুল তৈরির প্রেরণা জেগেছিল হয়তো কোনো মায়েব মনে— তার শিশুকে খেলার সামগ্রী জোগাবার তাগিদে। সহজলভ্য কাদামাটির উপকরণের সঙ্গে মিশে ছিল সেখানে কল্পনা ও শিল্পনৈপুণ্য। এদেশে প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন রূপে পোড়া মাটির পুতুল অনেক পাওয়া গেছে। চন্দ্রকেতুগড়, তমলুকের হরিনারায়ণপুর, বাঁকুড়ার পোখরণা, দিনাজপুরের বাণগড় প্রভৃতি স্থানের পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনের মধ্যে তার স্বাক্ষর আছে। বিশেষ একটি রীতিতে কাদামাটি দিয়ে টিপে টিপে তৈরি করা হত—বিশেষ এক ধরণের টেপা পুতুল। পাখির ঠোঁটের মতো নাক, চোখের কাছে গর্ত আর নিরাবরণ দেহ। কোথাও আবার আলাদা মাটি দিয়ে তৈরি হত চোখ; গহনা এ সব। কোনো সময় ধারালো কোনো বস্তুর সাহায্যে আঁচড় কেটে তৈরি হত চোখ, চুল, গয়নাগাঁটি। তারপর এই সব পুতুলগুলিকে পুড়িয়ে শক্ত করে নেওয়া হত। প্রাচীন মহেন্জোদাড়ো ও হরপ্পার ধ্বংসাবশেষ থেকে পাওয়া গেছে ঠিক একই ধরণের পুতুল। একজন শিল্পবিদ্ এ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন— "বাংলা দেশে প্রচলিত পুতুলের এমন কতকগুলি শ্রেণী আছে, যা দেখলে একথা প্রতীয়মান না হয়ে যায় না যে, পুতুলের নির্মাণ

কৌশলে ও আকৃতিতে একটা বহু সহস্র বৎসরের প্রাচীন সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য প্রবহমান রয়েছে।"[৫০]

কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীরা কিন্তু ভিন্ন রীতিতে বাস্তবানুগ পুতুল গড়েন। শুধু মাটি নয়— কাঠ, পাথর, ধাতু, হাতির দাঁত, শোলা এমন-কি তালপাতা বা কাগজ দিয়েও পুতুল গড়া হয়। কিন্তু মেয়েদের পুতুল গড়ার বৈচিত্র্য বা রকমফের আছে। বারব্রতের অঙ্গ হিসাবে ক্ষীর, পিটুলী, এমন-কি গোবর দিয়েও পুতুল তৈরি করেন তাঁরা।

সুখের বিষয় হল আজও অনেক নারী শিল্পী বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে সেই পুরাতন প্রথায় পুতুল গড়ে থাকেন। যেমন হুগলীর নূতনগ্রাম, মেদিনীপুরের নাড়াজোল, চব্বিশ পরগনার মজিলপুর, নদীয়ার নবদ্বীপ, বীরভূম ও বাঁকুড়ার কোনো কোনো অঞ্চলে আজও তাঁরা সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের ধারাকে বজায় রেখে পুতুল গড়ে চলেছেন।

কবিগান ও যাত্রার আসরে বঙ্গনারী

উনিশ শতকের জাগরণের সূচনা হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে। এই সময় বাণিজ্য- প্রধান কলকাতাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল এক নতুন জন-সমাজ। বাণিজ্যসূত্র ধরে পর্তুগীজ, ফরাসি ওলন্দাজ, দিনেমার, জার্মান প্রভৃতি পাশ্চাত্য জাতির আনাগোনা চলতে লাগল। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে এদেশের মানুষের মনে পরিবর্তনের ঢেউ উঠল। পুরোনো আমলের হালচাল, রীতিনীতি, আমোদআহ্লাদ ও রুচির দ্রুত পরিবর্তন ঘটে গেল। সেইসঙ্গে মূল্যবোধেরও বিবর্তন ঘটল। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় পটপরিবর্তনের সঙ্গে, সাংস্কৃতিক আবহাওয়ার রূপান্তর দেখা গেল। দীর্ঘকাল ধরে যে ধরণের যাত্রাগানের আসর, কথকতা, কীর্তন এদেশের মানুষের মনে আনন্দ সঞ্চার করেছে এবং প্রকারান্তরে লোকশিক্ষা দিয়েছে তার অবসান ঘটল। নতুন রীতির যাত্রা, পাঁচালী, কবিগান, হাফআখড়াই, টপ্পা, নাটগীতি দেখা দিল। সেইসঙ্গে পুরুষ কবিওয়ালা, যাত্রাওয়ালাদের পাশাপাশি জনাকয়েক কবিওয়ালী ও যাত্রাওয়ালীদেরও সন্ধান মেলে, যাঁরা সমসাময়িক যুগের মানুষের মনে রসসিঞ্চন করেছিলেন।

কবিগান

কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র ছিলেন মধ্যযুগের শেষ প্রতিভাশালী কবি। তাঁর মৃত্যুর (১৭৬০ খ্রীস্টাব্দ) পর থেকে, কবি ঈশ্বর গুপ্তের আবির্ভাব কাল (১৮১১ খ্রীস্টাব্দ) পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময় ধরে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে চলেছিল অরাজকতা। উল্লেখযোগ্য কোনো কবির আবির্ভাব ঘটে নি এ সময়ে। যাঁরা কোনোক্রমে কাব্যের ধারাটিকে সঞ্জীবিত রেখেছিলেন, তাঁরা ছিলেন কবিওয়ালা। অর্থাৎ প্রকৃত কবির মর্যাদা এঁদের দেওয়া চলে না ভেবেই হয়তো 'ওয়ালা' এই অবজ্ঞাসূচক শব্দটি তাঁদের নামের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। কাব্যরস পরিবেশনের রীতিটিও ছিল ভিন্ন ধরণের। যুগসন্ধিকালের সাহিত্যের আসরে কবিওয়ালাদের আকস্মিক আবির্ভাব সম্পর্কে

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"একদিন হঠাৎ গোধূলির সময়ে যেমন পতঙ্গে আকাশ ছাইয়া যায়, মধ্যাহ্নের আলোকেও তাহাদিগকে দেখা যায় না এবং অন্ধকার ঘনীভূত হইবার পূর্বেই তাহারা অদৃশ্য হইয়া যায়– এই কবির গানও সেইরূপ এক সময়ে বঙ্গসাহিত্যের স্বল্পক্ষণস্থায়ী গোধূলি আকাশে অকস্মাৎ দেখা দিয়াছিল; তৎপূর্বেও তাহাদের কোনো পরিচয় ছিল না, এখনও তাহাদের কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না।"[৫১] এই কবিগানের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কবি মন্তব্য করেছেন— "উপস্থিতমত সাধারণের মনোরঞ্জন করিবার ভার লইয়া কবিদলের গান— ছন্দ এবং ভাষার বিশুদ্ধি ও নৈপুণ্য বিসর্জন দিয়া কেবল সুলভ অনুপ্রাস ও ঝুঁটা অলংকার লইয়া কাজ সারিয়া দিয়াছে, ভাবের কবিত্ব সম্বন্ধেও তাহার মধ্যে বিশেষ উৎকর্ষ দেখা যায় না।"[৫২] এদের উৎপত্তিস্থলের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা যায়- "মূলতঃ নাগরিক জীবনের চত্বরেই ভূমিষ্ঠ হয়েছে এবং সেই পরিবেশেই লালিত হয়েছে।"[৫৩]

কবিগান পরিবেশনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। গানের আসরে দুই মূল গায়েন তাঁদের দোহার বা সঙ্গীদের নিয়ে উপস্থিত হতেন। বিশেষ কোনো একটি বিষয় সম্পর্কে একদল সপক্ষে এবং অন্যদল বিপক্ষে— 'চাপান' ও 'উতোর' দিতেন। কবিগানের মধ্যে "মালসী" ছিল দেবদেবী বিষয়ক গান। 'সখী-সংবাদ' ও 'বিরহে' থাকত রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলা এবং 'খেউড়' অংশে নিম্ন পর্যায়ের ব্যক্তিগত আক্রমণ ও বাদপ্রতিবাদ হত। অশ্লীলতা ছিল এই অংশের অপরিহার্য অঙ্গ।

প্রথম কে এই কবিগানের সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন, তা নিয়ে সন্দেহ আছে। সাধারণভাবে গোঁজলা গুঁইকে আদি কবিওয়ালা বলে গণ্য করা হয়। এঁর প্রধান তিনজন শিষ্য ছিলেন— রঘুনাথ দাস, লালু-নন্দলাল ও রামজী দাস। তাঁদের আবার শিষ্য প্রশিষ্য পরম্পরায় দীর্ঘকাল ধরে চলেছিল কবিওয়ালা সম্প্রদায়। উল্লেখযোগ্য কবিওয়ালা বলতে অনেকের নাম করা যায় : রাসু-নৃসিংহ, নীলু-রামপ্রসাদ ঠাকুর, হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাঙ্গী বা হরু ঠাকুর, ভোলাময়রা, নিতাই বৈরাগী, ভবানী বণিক, রামবসু, কেষ্ট মুচি, ঠাকুরদাস সিংহ, অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি প্রভৃতি। এই প্রসঙ্গে 'নিধুবাবু' বা রামনিধি গুপ্ত এবং 'রূপচাঁদ পক্ষী'র নামও মনে আসে।

সে সময়ে পুরুষ কবিওয়ালাদের প্রাধান্য থাকলেও, কোনো কোনো মেয়ে-কবি আসর জাঁকিয়ে বসতেন। এই কবিওয়ালীদের পরিচয় দিতে হলে বলতে হয়ঃ "উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বহু নীচ জাতীয়া নারী, তাঁদের মধ্যে বৈষ্ণবী এবং প্রবীণা পতিতার সংখ্যাই বেশি, কবির দল করে গান গেয়ে এবং কবির লড়াই-এর অনুকরণে সদ্য রচিত কবিতায় প্রতিপক্ষের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করে জীবিকা উপার্জন করতেন।"[৫৪]

এক সময় বৈষ্ণবীরা গৃহস্থের বাড়ি বাড়ি গিয়ে হরিনাম শুনিয়ে ভিক্ষা করতেন। তাঁরা অনেকে নিজেরাই ঐ-সব গান রচনা করে গাইতেন। এঁরা অনেক সময় 'নেড়ী-কবি (বৈষ্ণবী) নামে অভিহিত হতেন।' "১৮২৬ খ্রীস্টাব্দে গোলকমণি, দয়ামণি এবং রত্নমণি নাম্নী তিনজন

'নেড়ীকবি' অর্থাৎ বৈষ্ণবী কলকাতায় গাওনা করতে এসে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন।"[৫৫] মেয়ে কবিরা অন্তঃপুরে প্রবেশ করে মেয়েদের অনুষ্ঠানে বিশেষ করে 'দ্বিতীয় বিবাহ', 'সাধভক্ষণ' ইত্যাদি উপলক্ষে গান গাইতেন। নিজেরা কবিদল গড়ে তুলেছিলেন, এমন কয়েকজন কবিওয়ালীর নামও শোনা যায়।

যজ্ঞেশ্বরী

যে স্ত্রী-কবিওয়ালা প্রথম কবির দল গড়ে খ্যাতি অর্জন করেন তাঁর নাম যজ্ঞেশ্বরী। ইনি সেকালের পুরুষ কবিদের প্রায় সমকক্ষ ছিলেন। প্রথম দিকে ইনি নীলু ঠাকুরের দলে গান বেঁধে দিতেন। পরে নিজেই একটি কবিদল গড়ে তোলেন এবং সর্বসমক্ষে কবিগানের আসরে পুরুষ কবিওয়ালাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হতেন। শোনা যায় বিখ্যাত কবিওয়ালা বামবসুর অনুগৃহীতা নারী ছিলেন ইনি। পুরাতন কবিগান সংগ্রহে, যজ্ঞেশ্বরী–রচিত দু-একটি গান স্থান পেয়েছে।

যজ্ঞেশ্বরীর বংশ পরিচয় বা পিতৃপরিচয় কিছুই জানা যায় না। তিনি ছিলেন অজ্ঞাতকুল-শীলা। কিন্তু কবিগান রচনা করার মতো বিদ্যাবুদ্ধি ও কলাকৌশল কেমনভাবে তিনি আয়ত্ত করতে সমর্থ হলেন, সে বিষয় কিছু জানা যায় না। তবে তিনি যে ভালো বাঁধনদার ছিলেন তা বোঝা যায়। তার কারণ অন্য কবির দলেও তাঁর রচিত গান গাওয়া হত। কাজেই বিশ্বাস করা যায় যে, "অনেক দিনের পরে সখা দেখতে পেলাম তোমাকে" প্রভৃতি গান তাঁরই রচনা। এখানে নারী মনের যে প্রচণ্ড অভিমান প্রকাশ পেয়েছে তার অন্তরালে সেকালে প্রচলিত একটি সামাজিক কু-রীতির পরিচয়ও পাওয়া যাচ্ছে। "সেকালের পুরুষ সমাজের, বিশেষতঃ শিক্ষাদীক্ষা–বর্জিত ধনকুবেরের দল বিবাহিত পত্নীর চেয়ে স্বাধীনা নারীকুলের প্রতি অধিকতর আসক্ত ছিল। তাদের হতভাগিনী স্ত্রীরা সধবা হয়েও বিধবার জীবন যাপন করতে বাধ্য হত।"[৫৬]

যজ্ঞেশ্বরী-রচিত গানে বেশ-একটু তির্যক ভঙ্গিতে নারীমনের উষ্মা প্রকাশ পেয়েছে। যেমন—

"মেল্‌তা ॥ আমি কুলবতী নারী পতি বই আর জানিনে,
এখন অধীনী বলিয়ে ফিরে নাহি চাও।
মহড়া ॥ ঘরের ধন ফেলে প্রাণ, পরের ধন আগুলে বেড়াও।
নাহি চেন ঘর বাসা, কি বসন্ত, কি বরষা,
সতীরে করে নিরাশা অসতীর আশা পুরাও।
খাদ ॥ রাজ্যে থেকে ভার্য্যার প্রতি কার্য না কুলাও ॥" ইত্যাদি

শোনা যায় একবার বিখ্যাত কবিওয়ালা ভোলা ময়রার প্রতিদ্বন্দ্বিনী রূপে তিনি একটি গানের আসরে উপস্থিত হন। গানের মধ্যে দিয়ে তিনি নিজেকে ভগবতী ও ভোলাকে মহাদেব আখ্যায় ভূষিত করেন। তার উত্তর দিতে গিয়ে ভোলা ময়রা তাঁকে এমন অশ্লীল ভাষায় কুৎসিত ইঙ্গিত

ও আক্রমণ করেন যে, মানের দায়ে যজ্ঞেশ্বরী রণে ভঙ্গ দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। তবে তিনি যে একজন প্রতিভাশালিনী কবিওয়ালী ছিলেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

মোহিনী দাসী

মোহিনী দাসী নামে এক মেয়ে-কবির কথা জানা যায়। অনাথকৃষ্ণ দেব ('বঙ্গের কবিতা'। ১ম। পৃ. ৩২৩) এঁর সম্পর্কে প্রথম উল্লেখ করেন—"কবিওয়ালা শ্রেণীতে মোহিনী দাসী বলিয়া আর এক স্ত্রী-নাম দৃষ্ট হয়।"[৫৭] ইনি সর্বানন্দ কবিয়ালের শিষ্যা ছিলেন। এঁর বাসভূমি ছিল মেদিনীপুরের ঘাটাল মহাকুমার খাঞ্জাপুর-মনোহরপুর গ্রামে। ওখান থেকেই মোহিনীর কিছু গান প্রাচীন ব্যক্তিদের মুখ থেকে সংগৃহীত হয়েছে। যদিও তার মধ্যে প্রাচীন রূপটি অক্ষুণ্ন নেই। ইনি ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে জীবিত ছিলেন বলে জানা যায়। সমসাময়িক যুগের মানুষের কাছে ইনি যথেষ্ট সমাদর পেয়েছিলেন, তাই তৎকালীন জনসমাজে ইনি 'মন-মোহিনী' নামেই পরিচিত ছিলেন। জনসাধারণের মন হরণে সমর্থ ছিলেন বলেই— এই নামকরণ, সেকথা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

ক'বেল কামিনী

যশোহর অঞ্চলের খ্যাতিসম্পন্না মেয়ে-কবি ছিলেন ক'বেল কামিনী। এখানে অন্যান্য খ্যাতিমান কবিওয়ালাও ছিলেন—তাবক কাঁড়াল, পাঁচু দত্ত, গোবিন্দ তাঁতি, রূপে পাঠা, হারাণ ঠাকুর, হরমোহন, মথুর সরকার প্রভৃতি।

ক'বেল কামিনী ছিলেন নিরক্ষর, নিম্নশ্রেণীর পোদ জাতীয়া রমণী। জপ্‌সা গ্রামে ছিল এঁর নিবাস। ভগিনীপুত্র তারাচাঁদ ও অন্যান্য কবিওয়ালাদের দলে ইনি গান বেঁধে দিতেন। 'কবিওয়ালা' শব্দের সংক্ষিপ্তরূপ 'ক'বেল' শব্দটি তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। ইনি সম্ভবত ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বর্তমান ছিলেন। কামিনীর আত্মপরিচয়জ্ঞাপক একটি শ্লোক পাওয়া যায়—

'পরগণে হোগলার মধ্যে গ্রাম জাপুসা।
গীত গড়িয়ে গারস্তালী করে ক'বেল মাতা ।।'

কামিনীর রচিত তিনটি শ্যামা বিষয়ক কবিতা পাওয়া যায়। তার মধ্যে তাঁর ভক্তির আবেগ সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। উদাহরণ—

'কালো বেটি কত খাঁটি সে যে ফুলের মাথার পরে,
চরণ দু'টি কত কোটি চাঁদ সূরযে আলো করে ।।
কত শলক কত রশ্মি কালী মায়ের পায়,
ধানের ক্ষেতে ঢেউ উঠিয়ে কালী কালের ঢেউ দেখায়।"[৫৮]

নিরক্ষরা ও অল্পশিক্ষিতা আরও অনেক মহিলা কবির কথা জানা যায়, যাঁরা উনিশ শতকে কবিগানের আসরকে রসসিক্ত করে রেখেছিলেন—শশিমুখী, মাধবীলতা, সহচরী, অক্ষয়া বায়তিনী, শ্রীমতী প্রভৃতি।

অকাবাই বা অক্ষয়াবায়তিনী

মধ্যযুগ থেকে এদেশে পাঁচালী গানর যথেষ্ট সমাদর ছিল। মূল গায়ক বা দলপতি একছত্র গান গাইতেন এবং তাঁর সঙ্গীসাথী অর্থাৎ দোহাররা মিলে তারপর সুরে তালে তা আবৃত্তি করতেন। এই বিশেষ ভঙ্গিতে অনেক দিন ধরে গাওয়া হত রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ও মঙ্গলকাব্যের কাহিনী। অল্পশিক্ষিত জনসাধারণের নিকট পাঁচালী গান ছিল বড়ো প্রিয়।

উনিশ শতকে বিখ্যাত পাঁচালীকার ছিলেন দাশু রায় বা দাশরথি রায় (১৮০৬-৫৮)। অকাবাই বা অক্ষয়া বাইতিনী ছিলেন এঁর প্রণয়িনী। জাতিতে ছিলেন নিম্নশ্রেণীর চর্মকার জাতীয় স্ত্রীলোক। স্বামী-পরিত্যক্তা অক্ষয়া পীলা গ্রামে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রেশমের কুঠিতে, কাটুনীর কাজ করতেন। দাশরথিও ছিলেন ওখানকার এক কর্মচারী। সেই সূত্রেই দুজনের দেখাশুনা ও আলাপ পরিচয় হয়। পরবর্তীকালে অক্ষয়া কাটুনীর কাজ ছেড়ে দিয়ে এক কবির দল তৈরি করেন। সেই দলে দাশরথি ছিলেন বাঁধনদার। অক্ষয়া ভিন্ন 'চোয়াড়' জাতির তিন–চারটি পুরুষ এই দলে ছিল। কুলভ্রষ্টা হলেও অক্ষয়া ছিলেন সুকণ্ঠী ও সংগীত– নিপুণা। সেই কারণে দাশরথি তার কাছে ধরা দিয়েছিলেন। পরে অবশ্য আত্মীয়স্বজনের চাপে পড়ে, ব্রাহ্মণ সন্তান দাশরথি কুলমর্যাদা রক্ষার কারণে অকাবাই-এর সঙ্গ ত্যাগ করেন। এরপর অক্ষয়ার জীবনের পরিণতি সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না।[৫৯]

শ্রীমতী

শ্রীমতী নামে এক নারীর কথা শোনা যায়, যিনি "সংগীতাদি কলাবিদ্যায় অসাধারণ নিপুণ ছিলেন।"[৬০] এঁর জীবন সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। তবে তাঁর সংগীতনৈপুণ্যের দ্বারা তিনি রামনিধি গুপ্ত (১৭৪১-১৮৩৯) অর্থাৎ নিধুবাবুকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেন, সে কথা জানা যায়। শ্রীমতীই ছিলেন নিধুবাবুর সংগীত প্রতিভা বিকাশের প্রেরণাদাত্রী। সেকালে দীর্ঘদিন ধরে সংগীতজ্ঞ কুলুইচন্দ্র সেনের ভাগিনেয়— রামনিধি গুপ্ত মহাশয় টপ্পা ও আখড়াই গানের আসরে একাধিপত্য করে গিয়েছেন।

যাত্রাগানের আসরে বঙ্গনারী

যাত্রা গান বা নাটগীতের অসাধারণ জনপ্রিয়তা ছিল এক সময়ে। নাট্যাভিনয়ের মতো হলেও এখানে রঙ্গমঞ্চ বা দৃশ্যপট পরিবর্তনের কোনো বালাই ছিল না। বিস্তৃত উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে তৈরি হত এই আসর। বিশেষ একটি স্থানে গায়ক ও বাদকদের বসার ব্যবস্থা থাকত। সেখানেই অভিনেতারা যে যার ভূমিকা অনুযায়ী সাজসজ্জা ক'রে, সাজঘর থেকে এসে অভিনয় করতেন। অন্যদিকে বসতেন দর্শক সাধারণ। খুব আবেগ ও উচ্ছ্বাসভরে অভিনয় করতেন এই সব অভিনেতারা। 'জুড়ী' গানের চল ছিল। স্ত্রীলোকের ভূমিকায় তখনকার দিনে পুরুষরাই অভিনয় করতেন। সাধারণ ভাবে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ কাহিনী অবলম্বনে লেখা হত যাত্রার পালা। যাঁরা রচনা ও পরিচালনা করতেন, তাঁদের বলা হত 'অধিকারী'।

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে বাংলার প্রান্তীয় অঞ্চলে—মিথিলা, নেপাল ও আসামে দেশীয় ভাষায় নাটগীতি রচিত ও অভিনীত হত। কিন্তু "বাংলা দেশে চৈতন্যদেবের পর এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে বাংলা নাটযাত্রার বিশেষ কোনো নমুনা দেখা যায় না। সুতরাং বাংলার নাটগীত ও যাত্রাগানের যথার্থ আরম্ভ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকেই ধরতে হবে।"[৬১]

অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে যাত্রাগান অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠল। গ্রাম-গঞ্জ মফস্বল শহর এবং সেইসঙ্গে কলকাতার অধিবাসীরাও যাত্রাগানের আসর নিয়ে মেতে উঠেছিলেন। ভক্তিমূলক কৃষ্ণযাত্রা বা কালীয়দমন যাত্রা, রাসযাত্রা, চৈতন্যলীলা, মনসার ভাসান, চণ্ডীযাত্রা ইত্যাদি রচিত হত। পেশাদারী যাত্রাদলের পাশাপাশি অনেক সখের যাত্রাদলও গড়ে উঠেছিল। এই সময়কার বিখ্যাত যাত্রাওয়ালারা হলেন— শিশুরাম, পরমানন্দ, শ্রীদাম-সুবল, গোবিন্দ অধিকারী, নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণকমল গোস্বামী।

পরবর্তীকালে ভাঁড়ামিপূর্ণ আদিরসাত্মক 'বিদ্যাসুন্দর' পালার জনপ্রিয়তা দেখা গেল। ভক্তিরসপ্রধান যাত্রার জনপ্রিয়তা দিনে দিনে মন্দীভূত হয়ে এল।

এই সময় রামচাঁদ মুখোপাধ্যায় নামে এক যাত্রাওয়ালা তাঁর যাত্রাগানে এক নতুনরীতির প্রবর্তন করেন। তিনি স্ত্রী বা স্ত্রীলোকের ভূমিকায় বালিকাদের দিয়ে অভিনয় করাতেন। এক্ষেত্রে অবশ্য প্রথম দৃষ্টান্ত দেখা গিয়েছিল— শ্যামবাজারের নবীন বসুর বাড়িতে 'বিদ্যাসুন্দর' নাটকের (১৮৩৫ খ্রী.) যে অভিনয় হয় সেখানে। "এতে বিদ্যার ভূমিকায় রাধামণি বা মণি, রাণী ও মালিনীর ভূমিকায় রাজকুমারী বা রাজু নামে কয়েকটি বালিকা ও স্ত্রীলোক অভিনয় করেছিলেন।"[৬২] সেকালে রঙ্গমঞ্চে নারীদের অভিনয় অনেকেই সুনজরে দেখেন নি। অনেক কটু সমালোচনা শোনা গিয়েছিল এই ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে।

উনিশ শতকের বিখ্যাত যাত্রাওয়ালারা ছিলেন— মদন মাস্টার, গোপাল উড়ে, মতিলাল রায়, ব্রজমোহন রায় প্রভৃতি। এই সময়কার একটি বড়ো ঘটনা হল 'মেয়ে-যাত্রা'র প্রবর্তন। বঙ্গের প্রত্যন্তদেশগুলিতে আগেই ছিল মেয়ে-যাত্রার দল। একবার কলকাতায় এসে মণিপুরের এক মেয়ে-যাত্রার দল অভিনয় করে যায় কৃষ্ণলীলার। তারা প্রথম অভিনয় করে কলুটোলার মতিলাল শীলের বৈঠকখানায়। এই সংবাদটি 'সমাচারদর্পণ' পত্রিকায় (১৮২৬, ১৯ আগস্ট) প্রকাশিত হয়। অভিনব এই ব্যাপারটিকে কেন্দ্র করে অনেকে ব্যঙ্গাত্মক কবিতাও রচনা করেন—

'আশ্চর্য সম্প্রদায় এই স্ত্রী লোকের দল।
স্ত্রীলোকতে কৃষ্ণসাজি করয়ে কৌশল॥' ইত্যাদি

এই ঘটনাটি কলকাতা শহরে বেশ-একটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। কারণ 'স্ত্রী-পুরুষ সমস্ত ভূমিকাই মণিপুরী স্ত্রীলোকদের দ্বারা অভিনীত হয়েছিল। পুরুষ শুধু বাদ্য বাজাত।"[৬৩]

এই ঘটনার অল্প কিছুদিন পরেই এদেশে নারী-পরিচালিত যাত্রাদল গড়ে উঠল— নবদ্বীপের বৌ-কুণ্ডুর দল, কলকাতার বউ-মাস্টারের দল, ত্রৈলোক্য তারিণীর দল, রাধারানী যাত্রা সম্প্রদায় প্রভৃতি।

বউ-মাস্টারের দল

চন্দননগর ও চুঁচুড়া অঞ্চলে মদন নামে এক ব্যক্তি একটি (সম্পূর্ণ নাম মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়) যাত্রাদল গড়ে তোলেন। দলটির কয়েকটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ছিল—অভিনয়, কলাকৌশল ও সাজপোশাকের ব্যাপারে কিছু নূতনত্ব ছিল। মদনের মৃত্যুর পর যাত্রাদলটি পরিচালনা করতেন তাঁর পুত্র নবীন। তখন এই দলকে সকলে বলত 'নবীন মাস্টারের দল'। নবীনের অকালমৃত্যু ঘটলে, তাঁর স্ত্রী কৈলাসবাসিনী এই যাত্রাদলের পরিচালক হলেন। তখন থেকেই দলটি 'বউ-মাস্টারের দল' নামে পরিচিতি হল। প্রধানত কলকাতাতেই এই দলের অভিনয় হত। কৈলাসবাসিনী বেশ দক্ষতার সঙ্গেই এই দলটিকে পরিচালনা করতেন।

বউ-কুণ্ডুর দল

বউ-মাস্টারের দলের সাফল্য দর্শনে, কলকাতার বাইরেও মহিলা-পরিচালিত যাত্রাদল গড়ে উঠতে লাগল। নবদ্বীপের এক কুণ্ডু পরিবারের বউ গড়ে তুললেন 'বউ-কুণ্ডুর দল' (সম্ভবত ১২৮৫ বঙ্গাব্দে)। দলটি দীর্ঘদিন ধরে কলকাতাতেও অভিনয় করেছিল।[৬৪]

এই যাত্রাদল গড়ে তোলাব সংক্ষিপ্ত ইতিহাস হল এই, নীলমণি কুণ্ডু ও রত্নমণি কুণ্ডু এই দুই ভাই ছিলেন খুব বড়ো বাবসায়ী ও ধনীব্যক্তি। নীলমণি কুণ্ডুর মৃত্যুর পর তাঁর বিধবা পত্নী মুক্তামণির সঙ্গে দেবর রত্নমণির বিবাদ চরমে গিয়ে পৌঁছল। তারপর মুক্তামণি তাঁর জামাতা রজনী কুণ্ডুর সহায়তায় গড়ে তোলেন এই যাত্রাদল। 'প্রহ্লাদ চরিত্র' 'ব্রজলীলা' প্রভৃতি পালা খুব নৈপুণ্যের সঙ্গে এঁরা পরিবেশন করতেন।[৬৫]

ত্রৈলোক্যতারিণীর যাত্রাদল

বিখ্যাত যাত্রাওয়ালা মতিলাল রায়ের আদর্শে কলকাতার সোনাগাছি অঞ্চলেব এক স্ত্রীলোক ত্রৈলোক্যতারিণী একটি যাত্রাদল গড়ে তোলেন। বিংশ শতাব্দীতেও এই মেয়ে- দলের যাত্রার অভিনয় হত। এই দলের অধিনায়ক যতীন্দ্রনাথ ঘোষ দুর্ঘটনায় মারা গেলে দলটি উঠে যায়।

রাধারানীর যাত্রা সম্প্রদায়

মহিলা-পরিচালিত আরও একটি যাত্রাদলের কথা শুনতে পাওয়া যায়, সেটি হল 'রাধারানীব যাত্রা সম্প্রদায়'। এঁরা কলকাতায় অভিনয় করেন নি। অণ্ডাল নামক স্থানে এঁদের দলের অভিনয় হয়েছিল বলে শোনা যায়।[৬৬]

উনিশ শতকের শেষ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্যন্ত এই যে একাধিক মহিলা-পরিচালিত যাত্রাদলের সন্ধান পাওয়া যায়— সেকালের সামাজিক পরিবেশের কথা মনে রাখলে ঘটনাটিকে খুবই চমকপ্রদ বলে মনে হয় আমাদের কাছে। প্রতিকূল আবহাওয়াকে উপেক্ষা করে এই জাতীয় নারী প্রগতি যে তখন দেখা গিয়েছিল, তা একদিক থেকে আশ্চর্যজনক এবং সেইসঙ্গে এই ঘটনা তাঁদের অসীম সাহস ও সাফল্যের পরিচয়ও বটে।

প্রাচীন ও মধ্যযুগে সমাজ ও সংসারে বঙ্গনারীর স্থান

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাসে সমাজ ও সংসারে নারীর যে চিত্র পাওয়া যায় তা অত্যন্ত করুণ। পুরুষের একাধিপত্যে, নারীর স্বাধিকার কিছুমাত্র স্বীকৃতি পায় নি। অবশ্য শুধু বঙ্গদেশ নয়, ভারতের অন্যান্য প্রদেশে, এমন-কি পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই নারীদের প্রায় একই চেহারা দেখা যায়।

সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য শাস্ত্রকাররা যে-সমস্ত কঠোর অনুশাসন রচনা করেছিলেন—সেগুলি বিশেষভাবে যেন প্রযোজ্য ছিল স্ত্রীলোকদের প্রতি। সমাজে বাল্য বিবাহের প্রচলন ছিল; সুতরাং ঋতুমতী হবার পূর্বেই বালিকা কন্যাকে পাত্রস্থ করতে হত, বিবাহ ছিল চিরকালের বন্ধন—একথা নারীদেরই বিশ্বাস করতে হত মনে প্রাণে। সেই সূত্রে ব্যাপক হারে হত 'সতীদাহ'। প্রাণহীন পণপ্রথার দরুন বধূ নির্যাতন বলবৎ ছিল; কৌলীন্যপ্রথার সুবাদে পুরুষরা বহু বিবাহ করতেন অথচ সতীন জ্বালা সইতে হত অধিকাংশ নারীকে; বালবিধবার জীবনে দুঃখের সীমা ছিল না; কঠোর পর্দা প্রথা মেনে চলতে হত; শিক্ষার স্বাভাবিক অধিকার থেকে নারীরা ছিলেন বঞ্চিত; সম্পত্তিতে তাঁদের প্রকৃত অধিকার ছিল না। এই জাতীয় পক্ষপাতদুষ্ট আইনের বলে, সামাজিক ভারসাম্য বজায় রাখা সম্ভব নয়। সুতরাং রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং নৈতিক সকল দিকেই দেখা দিল সংকট। পাল ও সেন বংশের রাজত্বের অবসানে, দেশের শাসন ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়েছিল প্রধানত ইসলামধর্মাবলম্বীদের উপর। তাঁরা ভোগবিলাসিতায় নিমজ্জিত হয়ে, শাসনের নামে অবাধ শোষণ চালাতেন। সুলতানী ও নবাবী আমলে সামাজিক বৈষম্যের চিত্র খুঁজে পাওয়া যাবে সমসাময়িক সাহিত্যে। বিশেষ করে মঙ্গলকাব্যগুলিতে "নারীগণের পতিনিন্দা" অংশগুলি বিশ্লেষণ করলে অনেক নির্যাতন ও করুণ কাহিনী উদ্ঘাটিত হবে।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে সমাজে বিশিষ্ট ব্যক্তি বলে যাঁরা গণ্য হতেন, তাঁদের পরিচয় ছিল কী রকম ?

"তারে বলি সুকৃতি যে দোলা ঘোড়া চড়ে,
দশ-বিশজন যার আগে পিছে নড়ে।"

অথচ অষ্টাদশ শতাব্দীতে রামেশ্বরের কাব্যে দেখতে পাই আর-এক ধরণের চেহারা। কুলীনরা একদা সমাজে সম্মানের পাত্র ছিলেন কিন্তু সেই কুলীন পিতার ঘরেই আর্থিক অনটন। তাই তিনি আর-এক কুলীনের হাতে কন্যাদান করে করুণ মিনতি করেছেন—

"কুলীনের শোকে অন্য কি বলিব আমি,
কন্যার অশেষ দোষ ক্ষমা করো তুমি।
আঁঠু ঢাকি বস্ত্র দিহ পেট ভরি ভাত,"[৬৭]

ইত্যাদি

মেয়ে তাঁদের ঘরে এমনই কৃপার পাত্রী যে, তার জন্য মোটা ভাত কাপড়ের ব্যবস্থা যদি কোনোক্রমে হয়---তা হলেই তাঁরা কৃতার্থ হতেন। আরও একটি দৃষ্টান্ত দিলে সেকালের নারী সমাজের শোচনীয় চিত্র সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। সেটি হল নারীর সামাজিক পদমর্যাদা-সম্পর্কিত সমস্যা।

যে-কোনো ব্যক্তি তাঁর নামের সঙ্গে ব্যবহার করে থাকেন সামাজিক মর্যাদাজ্ঞাপক 'পদবী'। আশ্চর্য এই যে দীর্ঘকাল ধরে এদেশে কেবলমাত্র পুরুষরাই তাঁদের নামের সঙ্গে পদবীর ব্যবহার করে এসেছেন। নারীদের ক্ষেত্রে নামের সঙ্গে বিশেষ পদবী ব্যবহারের বালাই ছিল না। নিজের নাম ব্যবহারেরও তেমন কোনো গুরুত্ব ছিল না। যদি অবিবাহিতা বালিকা হয়, তা হলে পিতার নামেই ছিল তার পরিচয়---'অমুকের কন্যা', বিবাহিতা হলে 'অমুকের স্ত্রী', আবার বৃদ্ধ বয়সে পুত্রের নামে ছিল তার পরিচয়---'অমুকের মা'। শুধুমাত্র রাজরানী বা ব্রাহ্মণী হলে--তাঁদের নামের সঙ্গে 'রানী' বা 'দেবী' ব্যবহার করা হত, অব্রাহ্মণ বা শূদ্রা হলে 'দাসী' এই সাধারণ পদবী ব্যবহৃত হত। দীর্ঘ কাল ধরে চলেছিল এই রীতি। এ বিষয়ে আলোচনা করে জনৈক গবেষক একটি প্রশ্ন তুলে ধরেছেন চমৎকার ভাবে। সেটি হল— "নারীদের ক্ষেত্রে দেবী ও দাসী হিসাবেই ছিল পরিচয়। স্বতন্ত্র পদবীর প্রয়োজন হত না। এখানে পুরুষ ভিন্ন নারীর কোনো গুরুত্ব নেই— সেই জাতীয় অবজ্ঞাই কি প্রকাশ পায় না ? অথবা প্রচলিত দেশাচার বা লোকাচার বলেই মেনে নেওয়া হত এই প্রথা।"[৬৮]

প্রাগাধুনিক যুগে সামাজিক এই পরিস্থিতিতে নারীদের যে দুর্গতি দেখা যায়, তার বিচার ও বিশ্লেষণ করলে এই কথাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, তখনকার বাঙালি মেয়েদের মর্যাদা, স্বাধিকার বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রশ্নটি যেন বাহুল্য মাত্র।

নির্দেশিকা

প্রথম পরিচ্ছেদ

১। নীহার রঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস, পৃ. ১২৮

২। রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস (১ম খণ্ড) পৃ. ১৮

৩। নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস (সংক্ষেপিত সংস্করণ) পৃ. ৪৪৫-৪৬

৪। নরনারী (প্রবন্ধ), পঞ্চভূত রবীন্দ্র-রচনাবলী (জন্মশতবার্ষিকী), সংস্করণ খণ্ড ১৪, পৃ. ৬৪৫

৫। রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস। ১ম খণ্ড (১ম সংস্করণ ১৩৫২ বঙ্গাব্দ পৃ. ১৮৩

৬। রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস-(২য় খণ্ড) ৩য় সংস্করণ-১৩৮৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৬৪

৭। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত। ৩য় খণ্ড, ১ম পর্ব। (২য় সংস্করণ) পৃ. ৬৭৩
৮। রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস (২য় খণ্ড) ৩য় সংস্করণ, পৃ. ২৯৯
৯। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, চতুষ্পাঠীর যুগে বিদুষী বঙ্গমহিলা [সাহিত্যসাধক চরিতমালা ৮৯]
১০। বিনয় ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, (১ম সংস্করণ) পৃ. ৪৭১
১১। বাঙ্গালীর চরিতাভিধান (সাহিত্য সংসদ), পৃ. ৩৭২
১২। বিমলচন্দ্র দত্ত, বাংলার খেতাবী রাজ-রাজড়া, ১ম সংস্করণ, পৃ. ১০৯
১৩। বিনয় ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, পৃ. ৩৬০
১৪। ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, বাঙ্গালীর ইতিহাস, পৃ. ১৮৬-৮৭
১৫। রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, (৩য় খণ্ড) ২য় সংস্করণ। পৃ. ২৩
১৬। ড. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙ্গালীর দান, পৃ. ১০৬
১৭। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বঙ্গের মহিলা কবি, পৃ. ৪৬৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১৮। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৪৪ (যে সকল পণ্ডিত ও গবেষক রামীকে প্রথম মহিলা কবির মর্যাদা দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে প্রধান দুজন হলেন—দীনেশচন্দ্র সেন ('বঙ্গভাষা ও সাহিত্য') এবং যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ('বঙ্গের মহিলা কবি')।
১৯। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বঙ্গের মহিলা কবি, (দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৬০ বঙ্গাব্দ) পৃ. ১১
২০। তদেব, পৃ. ৩০
২১। তদেব, পৃ. ৩১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

২২। নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস (সংক্ষেপিত সংস্করণ), পৃ. ১৯৬
২৩। সুকুমার সেন, প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী, (বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ) পৃ. ৫২-৫৩
২৪। সুকুমার সেন, চৈতন্যাবদান। 'দেশ' পত্রিকা, ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫, পৃ. ১৭
২৫। রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস। (মধ্যযুগ) ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০৯
২৬। ড. অতুল সুর, 'বাঙলা ও বাঙালী' গ্রন্থের "পশ্চিম বাঙলার লৌকিক জীবন" (প্রবন্ধ), পৃ. ৩৬
২৭। সুকুমার সেন, প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী, পৃ. ৫৬

২৮। তদেব, পৃ. ৫৮

২৯। সুকুমার সেন, মধ্য যুগের বাংলা ও বাঙালী, পৃ. ৬৩

৩০। বেলা দে, প্রাচীন বাংলার নারী (১৩৬০ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৬৩

৩১। সুকুমার সেন, প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী, পৃ. ৪৬

৩২। তদেব, পৃ. ৫৯

৩৩। অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গলক্ষ্মীর ঝাঁপি, পৃ. ৩৯

৩৪। রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, ২য় খণ্ড। পৃ. ৩০৮

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

৩৫। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি— 'বাংলার লোক সাহিত্য' (প্রবন্ধ) (১৯৭০) পৃ. ৬৪।

৩৬। লোকসাহিত্য— 'ছেলেভুলানো ছড়া' (প্রবন্ধ) রবীন্দ্র-রচনাবলী (জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ), খণ্ড ১৩, পৃ. ৬৬৬

৩৭। তদেব, পৃ. ৬৮৯-৯০

৩৮। হেমলতা দেবী - রচিত 'আলোর পাখী' কাব্যগ্রন্থের ভূমিকা দ্রষ্টব্য। ভূমিকার রচয়িত্রী শান্তা দেবী, পৃ

৩৯। বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, 'বঙ্গভাষা ও বঙ্গসংস্কৃতি' গ্রন্থের "বাংলা প্রবাদ প্রবচন" (প্রবন্ধ)-পৃ. ২০৫

৪০। রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস. ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০০

৪১। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোক সাহিত্য, পৃ. ৪০২

৪২। তদেব, পৃ. ৫৩৩

৪৩। তদেব, পৃ. ৪০২

৪৪। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাংলার ব্রত (বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ) পৃ. ৩৩

৪৫। তদেব, পৃ. ৩৮

৪৬। রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলা দেশের ইতিহাস (মধ্যযুগ) ২য় খণ্ড। পৃ. ৪১৯

৪৭। ড. কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, বাংলার লোকশিল্প (১৯৬১), পৃ. ১৯

৪৮। তদেব, "কাঁথা ও আল্পনা শিল্প" প্রবন্ধ, পৃ. ৭১

৪৯। বিনয় ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, 'বাংলার মৃৎশিল্পের সমাজতত্ত্ব' (প্রবন্ধ), পৃ. ২০৪

৫০। ড. কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, বাংলার লোকশিল্প, "পুতুল" (প্রবন্ধ) পৃ.১১৩

৫১। 'কবি সঙ্গীত' প্রবন্ধ, লোকসাহিত্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী (জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ) খণ্ড ১৩, পৃ. ৭০৯

৫২। তদেব, পৃ. ৭১২

৫৩। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ৪র্থ খণ্ড। (১ম সংস্করণ ১৯৭৯), পৃ. ৪৭

৫৪। অনুরূপা দেবী, সাহিত্যে নারী স্রষ্ট্রী ও সৃষ্টি (জুন ১৯৪৯) পৃ. ১১৪

৫৫। তদেব পৃ. ১১৪

৫৬। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দুই নারী ও তিন নায়িকা (১ম সংস্করণ, ১৯৭৬), পৃ. ১১৩

৫৭। ড. নিরঞ্জন চক্রবর্তী, উনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালা ও বাংলা সাহিত্য, পৃ. ১৩৪

৫৮। সতীশচন্দ্র মিত্র, যশোহর খুলনার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৬৭-৬৮

৫৯। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দুই নারী ও তিন নায়িকা- পৃ. ১১৭-২৩

৬০। তদেব, পৃ.১০৩

৬১। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত। ৪র্থ খণ্ড পৃ. ৪৫২-৫৩

৬২। তদেব, পৃ. ৫৪৭

৬৩। তদেব, পৃ. ৫৪৩

৬৪। তদেব, পৃ. ৫৫৪

৬৫। তদেব, পৃ. ৫৫৪-৫৫

৬৬। তদেব, পৃ. ৫৫৫

৬৭। সুকুমার সেন, মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী— (বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, ১৩৫২ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৫১

৬৮। লোকেশ্বর বসু, আমাদের পদবীর ইতিহাস, পৃ. ৭১।



তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

উনিশ শতকের সামাজিক পরিবেশ ও বঙ্গনারী

জগতের যেমন ক্রমবিকাশ আছে— মানব সমাজও তেমনি পরিবর্তনশীল। সমাজভুক্ত বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ একটি অদৃশ্য যোগসূত্রে আবদ্ধ থাকে পরস্পরের সঙ্গে। দেশ কাল ও পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার উপর নির্ভব করে গড়ে ওঠে নানা রীতি-নীতি ও আচার-বিচার। প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে মানবদেহেব যেমন রূপান্তর দেখা যায়, কালের আবর্তনের সঙ্গে তেমনি সমাজদেহেও বিবর্তন ঘটে— ভাবধারা, রীতিনীতি-পদ্ধতি, রুচি ও মূল্যবোধের পরিবর্তন দেখা যায়। তবে কখনো দ্রুত গতিতে কখনো মন্দ গতিতে এই পরিবর্তনের স্রোত বইতে থাকে। কিন্তু "যেমন ব্যক্তিগত মানুষের পক্ষে তেমনি তাব সমাজের পক্ষে, একটি সত্যের কেন্দ্র থাকা চাই। নইলে সে বিচ্ছিন্ন হয়, দুর্বল হয় তার অংশগুলি পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করতে থাকে।"[১]

সমাজ ও সংসাবকে সুন্দর ও সংহত রূপ দেবার জন্য নানা নিয়ম ও সংযমের বন্ধন সৃষ্টি করা হয়। যেমন "ভারতবর্ষ একদিন নিয়মের দ্বারা সমাজকে খুব করিয়া বাঁধিয়াছিল। মানুষ সমাজের মধ্য দিয়া সমাজকে ছাড়াইয়া যাইবে বলিয়াই বাঁধিয়াছিল। ঘোড়াকে তাহার সওয়ার লাগাম দিয়া বাঁধে কেন, এবং নিজেহ বা তাহার সঙ্গে রেকাবের দ্বারা বদ্ধ হয় কেন ছুটিতে হইবে বলিয়া। ভারতবর্ষ জানিত, সমাজ মানুষের শেষ লক্ষ্য নহে, মানুষের চির অবলম্বন নহে, সমাজ হইয়াছে মানুষকে মুক্তির পথে অগ্রসর করিয়া দিবার জন্য।"[২]

আশ্চর্য এই যে, মানুষ অনেক সময় ভাবে এক অথচ হয় আর। কোনো কোনো সময় সামাজিক অনেক নিয়ম কানুন, সমাজভুক্ত মানুষের পক্ষে হয়ে ওঠে প্রাণান্তকর। এদেশে বিশেষ করে মধ্যযুগে কয়েকটি নিষ্ঠুর সামাজিক প্রথা নারীজাতির জীবনকে পঙ্গু করে দিয়েছিল। সেই জাতীয় কয়েকটি কুপ্রথা ও তার প্রভাবের কথা এখানে আলোচনা করা হয়েছে। তার মধ্যে কয়েকটি প্রায় আধুনিক কাল পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। এমন-কি তার কোনো কোনোটি আজও কিছু পরিবর্তিত আকারে রয়ে গেছে।

সামাজিক কুপ্রথাগুলিকে দূরীভূত করাব জন্য অভূতপূর্ব আলোড়ন জেগে উঠেছিল উনবিংশ শতাব্দীতে। এক-একটি প্রথার উচ্ছেদ সাধনের সঙ্গে যুগ-যুগব্যাপী কুসংস্কার, অজ্ঞতা ও মোহান্ধতার অবসান ঘটতে লাগল। সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের

পট-পরিবর্তনের সঙ্গে দেখা গেল সমাজ-সংস্কার সাধনের তৎপরতা। এই জাতীয় কর্মের হোতাদের মধ্যে ছিলেন রাজা রামমোহন রায, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন ও আরও অনেকে। এঁরা নারীদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন। স্বামী বিবেকানন্দ নির্যাতিত নারীদের রক্ষাকল্পে তাঁর ওজস্বী ভাষায় ঘোষণা করলেন— "নারীদিগের সম্বন্ধে আমাদের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার শুধু তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া পর্যন্ত, নারীগণকে এমন যোগ্যতা অর্জন করাইতে হইবে, যাহাতে তাহারা নিজেদের সমস্যা নিজেদের ভাবে মীমাংসা করিয়া লইতে পারে, তাহাদের হইয়া অপর কেহ এ কার্য করিতে পারে না, করিবার চেষ্টা করাও উচিত নহে। আর জগতের অন্যান্য দেশের মেয়েদের মতো আমাদের মেয়েরাও এ যোগ্যতা লাভে সমর্থ।"[৩]

দিকপাল সাহিত্যিকরাও উৎসাহ জুগিয়েছিলেন নানা ভাবে। কবি মধুসূদন আশ্চর্য সব নারী চরিত্র সৃষ্টি করেছিলেন। প্রমীলা, চিত্রাঙ্গদা (মেঘনাদবধ কাব্য), 'বীরাঙ্গনা'র নায়িকাবৃন্দ প্রভৃতি সেকালের বাস্তব নারীদের অনুরূপ না হলেও, যেভাবে ব্যক্তিময়ী ও তেজস্বিনী রূপে আবির্ভূত হলেন তার মধ্য দিয়ে নতুন যুগের আভাস ফুটে উঠেছে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'সাম্য' নামক প্রবন্ধে ঘোষণা করলেন— 'সংসার বৈষম্যপরিপূর্ণ।' সেখানে তিনি (পঞ্চম পরিচ্ছেদে) বলেছেন— "মনুষ্যে মনুষ্যে সমানাধিকার বিশিষ্ট। স্ত্রীগণও মনুষ্যজাতি, অতএব স্ত্রীগণও পুরুষের তুল্য অধিকারশালিনী। যে যে কার্য্যে পুরুষের অধিকার আছে, স্ত্রীগণেরও সেই সেই কার্য্যে অধিকার থাকা ন্যায়সঙ্গত।"[৪] সর্বোপরি আছেন রবীন্দ্রনাথ। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তিনি নারীকল্যাণমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

এদেশের নারীরা বহুদিন ধরে সমাজে যথোচিত সম্মানলাভে বঞ্চিত ছিলেন। সহমরণ, পুরুষের বহুবিবাহ ও কৌলীন্য প্রথা, বাল্যবিবাহ, বিধবা-নিগ্রহ, পণপ্রথা, অবরোধপ্রথা, অশিক্ষা প্রভৃতিই তার প্রধান কারণ। অবমাননার হাত থেকে নারীদের রক্ষা করার সংকল্প নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন সব মহৎপ্রাণ পুরুষ, তাঁরা তাঁদের সংকল্পকে সার্থক করে তুলবার জন্য নিজেদের জীবনকে বিপন্ন করতেও দ্বিধাবোধ করেন নি। এইভাবে প্রথম এদেশে নারীমুক্তি আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে।

সতীদাহ প্রথা ও তার উচ্ছেদ সাধন

নারী জাগৃতি আন্দোলনের প্রথম পদক্ষেপ— সতী প্রথার উচ্ছেদ। ধর্মের নামে এদেশে অনেক অধর্ম, অমানবিক প্রথা ও অনাচার দেখা গেছে, তার মধ্যে 'সতীদাহ' ছিল অন্যতম ও প্রধান। এত দীর্ঘকাল ধরে দেশে এই নৃশংস ব্যাপার কেমনভাবে চলেছিল সেকথা ভাবলে বিস্ময় জাগে। গবেষকরা বলেন যে, আদিমকালে পৃথিবীর নানাস্থানে 'সতীদাহ'রূপ বর্বর প্রথার প্রচলন ছিল। কিন্তু একমাত্র ভারতেই এই প্রথা আধুনিক যুগ পর্যন্ত চলে এসেছে। বেদ-পরবর্তী যুগেই সম্ভবত ভারতে সতীদাহের বিস্তার ঘটেছিল। কাব্য, পুরাণ, ইতিহাসে সতীদাহের কথা পাওয়া যায়।

রামায়ণের 'অযোধ্যাকাণ্ডে'র ষষ্ঠ সর্গে আছে যে, রাজা দশরথের মৃত্যুতে রানী কৌশল্যাদেবী সহমৃতা হবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। 'লঙ্কাকাণ্ডে'র দ্বাত্রিংশ সর্গে (২০।৩২ শ্লোক) দেখা যায় অশোক বনে বন্দিনী সীতা, রামের ছিন্ন মায়ামুণ্ড দেখে সতী হতে চেয়েছিলেন। বাল্মীকি-রামায়ণের 'উত্তরাখণ্ডে'র সপ্তদশ সর্গে ব্রাহ্মণ-কন্যা বেদবতীর মাতা সহমৃতা হয়েছিলেন। মহাভারতে 'সতীদাহে'র বেশ কয়েকটি উদাহরণ পাওয়া যায়। পাণ্ডুরাজার মৃত্যুতে মাদ্রীদেবী সহমৃতা হন। তাই তাঁর দুই পুত্র নকুল ও সহদেবকে তাঁর সপত্নী কুন্তীদেবী যত্নসহকারে লালন পালন করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যুতে তাঁর পিতা বসুদেব যোগ অবলম্বনে মৃত্যুবরণ করেন। এই সময় বসুদেবের চারজন স্ত্রী— দেবকী, রোহিণী, ভদ্রা ও মদিরা স্বামীর চিতায় প্রাণ বিসর্জন দিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে, শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যুতে তাঁর স্ত্রী রুক্মিণী দেবী প্রভৃতি সহমৃতা হয়েছিলেন। ভাগবতে আরও এই জাতীয় দৃষ্টান্ত আছে। যেমন স্বায়ম্ভূব মনুর বংশধর রাজা পৃথুর স্ত্রী অর্চিদেবী 'সতী' হয়েছিলেন।

ভারতে সতীদাহ অনুষ্ঠানের প্রথম ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায় প্রসিদ্ধ গ্রীক ঐতিহাসিক ডিওডোরাস সিকিউসাসের রচনায়।[৫]

বহু প্রচলিত স্মৃতিগ্রন্থ 'মনুসংহিতা'য় কিন্তু সহমরণের নির্দেশ দেওয়া হয় নি, বিধবাদের জন্য। তিনি বলেছেন— স্ত্রীলোকদের স্বামী ব্যতীত পৃথক যজ্ঞ নেই, স্বামীর অনুমতি ব্যতীত ব্রত, উপবাস ইত্যাদি নেই। এককথায় তাঁর মতে পতিসেবার দ্বারাই স্ত্রীরা স্বর্গে গমন করেন। মনুসংহিতাকার বিধবা নারীদের নিষ্ঠা সহকারে ব্রহ্মচর্য পালনের নির্দেশই দিয়েছেন (পঞ্চম অধ্যায় -- ১৫৫-১৬০ শ্লোক)। তাঁর মতে—

'মৃতে ভর্ত্তরি সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য ব্যবস্থিতা।
স্বর্গং গচ্ছত্যা পুত্রাণি যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ ।।

(মনু. ৫।১৬০)

প্রামাণিক স্মৃতিগ্রন্থ মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতিতে সহমরণের অনুমোদন না থাকলেও, অর্বাচীন অনেক স্মৃতিতে সতীদাহের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হয়েছে। যেমন বিষ্ণু সংহিতা (১৫।১৪ সূত্র), অত্রি সংহিতা (২০।৯) ব্যাস সংহিতা (২।৫৩) দক্ষ সংহিতা (৪।১৯-২০) প্রভৃতিতে দেখা যায় সতীদাহের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সেইসঙ্গে ব্রহ্মচর্যের কথাও আছে। সতীদাহ বাধ্যতামূলক, এ কথাও বলা হয় নি।

অঙ্গীরা নামক স্মৃতিশাস্ত্রকার পতিব্রতা নারীদের প্রলোভন দেখিয়ে বলেছেন—

'মৃতে ভর্তরি যা নারী সমারোহেদ্ধুতাশনে।
সারুন্ধতী সমাচারা স্বর্গলোকে মহীয়তে ।।'

অর্থাৎ যে নারী স্বামীর সঙ্গে চিতারোহণে প্রাণ বিসর্জন দেবে সে অরুন্ধতীর সমগোত্রীয় হয়ে স্বর্গসুখ উপভোগ করবে। 'পরাশর সংহিতা'তেও সতী হলে অক্ষয় স্বর্গলাভের কথা বলা

হয়েছে--

'মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী ব্রহ্মচর্যে ব্যবস্থিতা।
সামৃতা লভতে স্বর্গং যথাতে ব্রহ্মাচারিণঃ ।।
তিস্রঃ কোট্যর্দ্ধ কোটী চ যানি রোমানি মানবে।
তাবৎ কালং বসেৎ স্বর্গং ভর্ত্তারং যানু গচ্ছতি ।।
ব্যালগ্রাহী যথা ব্যালং বিলাদুদ্ধরতে বলাৎ।
এবমদ্ধৃতা ভর্ত্তারং তেনৈব সহ মোদতে।।' (৪।২৭-২৯)

অথাৎ যে নাবী স্বামীর মৃত্যুতে ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করেন, তিনি মৃত্যুর পর ব্রহ্মচারীদের মতো স্বর্গলাভ করেন। কিন্তু যে নারী স্বামীর চিতায় সহমৃতা হন, তিনি মানবদেহে সাড়ে তিনকোটী লোমের সমান বহুকাল ধবে স্বামীর সঙ্গে স্বর্গসুখ ভোগ করেন। ব্যালগ্রাহী অর্থাৎ সাপুড়ে যেমন সাপকে গর্ত থেকে টেনে বার করে, তেমনি ভাবে সহমৃতা স্ত্রী স্বামীকে নরক থেকে উদ্ধার করে স্বর্গসুখ লাভে সমর্থ হয়।

এই সময় ব্রাহ্মণ ভিন্ন অব্রাহ্মণদের পক্ষে দেবভাষা বা সংস্কৃত শিক্ষা নিষিদ্ধ ছিল। সুতরাং ব্রাহ্মণ পুরোহিতবা শাস্ত্রীয় বিধানের বিকৃত ব্যাখ্যা দিলেও, সাধারণ মানুষের পক্ষে তা বোঝার উপায় ছিল না। তাই দেখা যায় সতীদাহের সময় ব্রাহ্মণরা যে দুটি ঋগ্বেদের শ্লোক (১০।১৮।১৭-৮) উচ্চাবণ করতেন তাব সঙ্গে সতীদাহের কোনো সম্পর্কই নেই। ঐ কথাগুলি বলা হয়েছে, মৃতব্যক্তির বিধবাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য। যেমন প্রথম শ্লোকটি হল--

'ইমা নারীব-বিধবাঃ সুপত্নীরাঞ্জনেন সর্পিষা সং বিশন্তু।
অনশ্রবোহ-নমীবাঃ সুরত্না আরোহন্তু জনয়ো যোনিমগ্রে।।'
(খগ্বেদ সংহিতা ১০।১৭।৭)

অর্থাৎ এ-সকল নারী বৈধব্য দুঃখ অনুভব না করে, মনোমতো পতিলাভ করে অঞ্জন ও ঘৃতের সাথে গৃহে প্রবেশ করুন। এ-সকল বধূ অশ্রুপাত না করে, রোগে কাতর না হয়ে উত্তম উত্তম রত্ন ধারণ করে সর্বাগ্রে গৃহে আসুন।' পরবর্তী শ্লোকটির অর্থ— হে নারি সংসারের দিকে ফিরে চলো, গাত্রোত্থান করো, তুমি যাঁর নিকট শয়ন করতে যাচ্ছ, সে গতাসু অর্থাৎ মৃত হয়েছে। চলে এসো। যিনি তোমার পাণি গ্রহণ করে গর্ভাধান করেছিলেন, সে পতির পত্নী হয়ে যা-কিছু কর্তব্য ছিল সকলি তোমার করা হয়েছে।' (খগ্বেদ ১০।১৮।৮)[৬]

এই দুটি শ্লোকের মধ্যে সপ্তম শ্লোকের শেষে 'আরোহন্তু জনয়ঃ যোনিং অগ্রে'' না বলে, পুরোহিতরা 'অগ্রের' স্থানে বলতেন 'অগ্নেঃ'। এই শব্দ পরিবর্তনের প্রকৃত কারণ কী তা বলা কঠিন—অজ্ঞতা, অথবা ভ্রমবশত, কিংবা ইচ্ছাকৃত ছিল তা জানা যায় না।

সহমবণ পদ্ধতিটি কেমন ছিল তার বর্ণনা পাওয়া যায়। যে ব্যক্তির জীবনাবসান হত, তার পুত্রদের বা নির্দিষ্ট অধিকারীকে দিয়ে যথাবিধি মৃতের মুখাগ্নি করানো হত। তারপর তার সাধ্বী

স্ত্রীকে স্নান করিয়ে, নূতন বস্ত্র পরিয়ে পূর্বমুখী করে বসিয়ে, আচমন করানো হত। এরপর তার হাতে কুশ, তিল, জল দিয়ে সংকল্প মন্ত্র পাঠ করানো হত। তাকে দিয়ে বলানো হত যে, পিতৃ, মাতৃ ও শ্বশুরকুলকে পবিত্র করার জন্য এবং অনন্ত স্বর্গসুখ কামনায় সে মৃত পতির সঙ্গে আনন্দিত চিত্তে জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করছে। এই প্রার্থনা জানাবার পর ঐ নারী তিনবার চিতা প্রদক্ষিণ করে আগুনে ঝাঁপ দিতেন। তখন ব্রাহ্মণরা ঋগ্বেদের মন্ত্র ও পৌরাণিক মন্ত্র উচ্চারণ করতেন।[৭]

যে-কোনো কারণেই হোক মধ্যযুগ থেকে উনিশ শতকের তৃতীয় দশক পর্যন্ত এদেশে ব্যাপকভাবে সতীপ্রথার অনুষ্ঠান হত। মধ্য যুগে রচিত বিভিন্ন আখ্যায়িকামূলক কাব্যে— চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, ময়নামতীর গান প্রভৃতিতে একাধিক সতীদাহের বাস্তবনিষ্ঠ বর্ণনা পাওয়া যায়। বালিকা, যুবতী, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা এবং ধনী, দরিদ্র নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর নারীরাই 'সতী' হতেন। উদাহরণস্বরূপ দুটি প্রকৃত ঘটনার বিবরণ দেওয়া যায়। প্রথমটি হল অতিশয় এক বৃদ্ধার সতী হওয়ার কাহিনী। "১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গের তথা ভারতের অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক নবদ্বীপ নিবাসী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাপণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় গোপাল ন্যায়ালংকার মহাশয়েব মৃত্যুতে তাঁহার অশীতিবর্ষ বয়স্কা সহধর্মিণী জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করেন।"[৮]

বিপরীত রীতির সহমরণও দেখা যেত। যেমন "১৮২১-এর ১৫ অগষ্ট সালকের নামকরা ধনী তারিণীচরণ বাড়ুয্যে মারা যান। তাঁর স্ত্রীর বয়স ১৭।১৮। অসাধারণ সুন্দরী সে, চোখে মুখে নিষ্পাপ সরলতা। স্বামীহারা হবার পর সতী হতে যখন সে সালকের ঘাটে আসে, তখন সমবেত হাজার হাজার জনতার মধ্যে নেমে আসে গভীর বিষাদের ছায়া। আহা, এমন মেয়েকেও সতী হতে হবে, আগুনে এমন সোনার অঙ্গ পুড়বে। সবাই শোকার্ত। মেয়েটিব বাবা পয়সাওয়ালা লোক, সতী না হলে মেয়েটিকে যে আর্থিক কষ্টের বা অবহেলা -অনাদরের মধ্যে পড়তে হবে না, তা জোর করে বলা যায়। অনায়াসে আরো বহু বছর সে বেঁচে থাকতে পারত। কিন্তু একবার সঙ্কল্প গ্রহণের পর সম্পদের প্রতিশ্রুতি, বন্ধুদের বিষাদমাথা মুখ, মা-বাপের স্নেহ ভালবাসা, মৃত্যুব যন্ত্রণাময় বিভীষিকা— পৃথিবীর আর কোন কিছুই তাদেব সঙ্কল্প পাল্টাতে পারে না। বেলা ১টার সময় তারিণীচরণ মারা যায়। আর তাঁর স্ত্রী চিতায় গিয়ে ওঠে বেলা ৫টায়।"[৯]

স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে এদেশের কত শত-লক্ষ নারী 'সতী' হয়েছিলেন, আজ আর তার কোনো সঠিক সংখ্যা জানা যায় না। বিদেশী পর্যটকরা পর্যন্ত তাঁদের বিববণীতে সতীদাহেব প্রত্যক্ষ বিবরণ রেখে গেছেন। কত বিদেশী ভদ্রলোক অসহায় নারীদের, স্বামীর চিতা থেকে উদ্ধার করেছেন। কেউ কেউ তাদের বিবাহ পর্যন্ত করেছেন। কলিকাতা নগরীর প্রতিষ্ঠাতা রূপে প্রসিদ্ধ ইংরেজ ভদ্রলোক জোব চার্নক সম্পর্কে শোনা যায়, তিনি এক সুন্দরী তরুণী ব্রাহ্মণীকে তার স্বামীর চিতা থেকে বল প্রয়োগে উদ্ধার করেন এবং পরে তাঁকে বিবাহ করে দীর্ঘকাল সন্তান সন্ততিসহ সুখে বাস করেন। বিখ্যাত কবিওয়ালা অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি, যিনি জাতিতে ছিলেন পর্তুগীজ, এমনই এক ব্রাহ্মণীকে নিয়ে সংসার পেতেছিলেন। তাঁরই প্রেরণাতে তিনি কলকাতায় 'ফিরিঙ্গি কালী'র প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রেমের দায়ে বা বিশেষ কোনো কারণে অনেক নারী স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে 'সতী' হতেন বটে, কিন্তু ধর্মের দোহাই দিয়ে, স্বার্থের খাতিরে কিংবা বংশমর্যাদা বৃদ্ধির কারণে; অনেককে স্বামীর চিতায় জোর করে পুড়িয়ে মারা হত। এই রকম একটি মর্মান্তিক ঘটনার কথা জানা যায়, চব্বিশ পরগনা জেলার মজিলপুর গ্রামে। পিতার মৃত্যু ঘটলে তার উপযুক্ত পুত্র জোর করে নিজের মাকে পুড়িয়ে মেরেছিল। তার মা আগুনের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে চিতা ছেড়ে পালিয়ে যান। কিন্তু বংশমর্যাদার হানি ঘটবে ভেবে ছেলে নির্মমভাবে মাকে জোর করে ধরে বেঁধে পুড়িয়েছিল।[১০]

অনেক নারীই মনে মনে 'সতী' হবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত আবার মৃত্যুভয়ে পিছিয়ে যেতেন। তাই একটি প্রবাদ শুনতে পাওয়া যায়— 'পুড়বে সতী উড়বে ছাই, তবেই সতীর গুণ গাই।'

রাজধানী কলকাতা শহরেই প্রতিবছর সরকারি হিসেবে দেখা যায় সতীদাহের সংখ্যা প্রতিবছর বেড়েই চলেছিল।

স্থান	১৮১৫	১৮১৬	১৮১৭	১৮১৮	মোট সংখ্যা
কলিকাতা	২৫৩	২৮৯	৪৪২	৫৪৪	১,৫২৮ ১১

জনৈক গবেষক তাঁর গ্রন্থে নিজের অভিমত প্রকাশ করেছেন, কেন দীর্ঘকাল ধরে বঙ্গদেশে ব্যাপক হারে সতীদাহ চলেছিল— "ইহা দেশ প্রচলিত একটি প্রথা বা রীতি বিশেষ। কিন্তু কতকগুলি বিশেষ কারণে ইহা এক সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় হিন্দু সমাজদেহে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। এই ব্যাধি দীর্ঘ দেশ ও কালব্যাপী হইলেও ইহা কখনো সমগ্র হিন্দু সমাজের মধ্যে আদৃত হয় নাই। সর্বজনমান্য মনু ও মনুকল্প স্মৃতিকারগণের কেহই ইহাকে বিধবার একমাত্র অবশ্য কর্তব্য কর্ম বলিয়া বিধি দেন নাই। স্মার্তরাজ রঘুনন্দন ইহার উচ্চ মহিমা কীর্তন করাতে ইহা বিধবার শ্রেষ্ঠ কর্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। স্মার্ত শিরোমণি রঘুনন্দনের এই মহিমা কীর্তনের মূলে একটি বিশিষ্ট কারণ আবিষ্কার করা কঠিন নহে। স্মার্ত চূড়ামণি যখন নবদ্বীপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তখন বঙ্গদেশে মুসলমান রাজ্য নানা বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার লীলাক্ষেত্র হইয়া উঠিয়াছিল। শাসন ব্যবস্থার শিথিলতার সুযোগে নৈতিক ধর্মভ্রষ্ট আচারহীন ব্যক্তিগণ যথেচ্ছাচার করিত এবং কুমারী ও বিশেষ করিয়া বিধবাদের মান সম্ভ্রম পবিত্রতা অব্যাহত রাখিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করা খুবই কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। ইহা ব্যতীত বল্লাল সেনের কৌলীন্য প্রথার ব্যাপক প্রচলনে হিন্দু পরিবারের মধ্যে ঈর্ষা, বিদ্বেষ ও সংকীর্ণতা বৃদ্ধি পাইতেছিল। একজন পুরুষ বহু নারীর পাণি গ্রহণ করিত, কিন্তু সকল স্ত্রীর প্রতি সমানভাবে কর্তব্য পালন করা অসম্ভব বলিয়া স্বামী সোহাগে বঞ্চিতা নারীর পক্ষে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঈর্ষাবশে পতির প্রাণনাশের কারণ হওয়া অস্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু পতির মৃত্যুতে সতী হইবার ভয়ে কেহ পতিহন্ত্রী হইতে সাহস পাইত না। এই সকল নানা কারণে বঙ্গদেশে এই প্রথার ব্যাপক প্রসার হইয়াছিল।"[১২]

লেখক এখানে সতীদাহ বিস্তারের বেশ কয়েকটি কারণ দর্শিয়েছেন ঠিকই কিন্তু মনে হয় সেকালে সহমরণের জনপ্রিয়তার একটি কারণ হল— এদেশের নারীদের মনে যে মজ্জাগত 'সতী' সংস্কার রয়েছে তারই বশবর্তী হয়ে অধিকাংশ নারী প্রাণ বিসর্জন দিতেন। পতিপ্রেমের আদর্শ দেখিয়ে পুণ্য অর্জনের স্পৃহা জেগে উঠত অনেক নারীর মনে। সতী-সীতা-সাবিত্রীর দেশের নারীরা পাতিব্রত্যের আদর্শ রক্ষাকে জীবনের চেয়েও বড়ো বলে মনে করতেন। সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসে বোধ হয় ভারতীয় নারীরাই এই দিক থেকে তুলনারহিত। কারণ— "সতীত্ব বোধ নারীর একটি নিজস্ব ও ব্যক্তিগত মর্যাদাবোধ; সমাজ বাহির হইতে ইহাব বিধি রচনা করিযা নারীকে ইহার দ্বারা শাসন করিলেও তাহার মনে যদি ইহার সম্বন্ধে ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধ জাগ্রত না হয় তবে বাহিরের শাসন ফলপ্রসূ হইতে পারে না।"[১৩]

রামায়ণ-মহাভারতের যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত, এই ধারণার তেমন কোনো পরিবর্তন ঘটে নি। সতীত্বের মহিমা রক্ষার ক্ষেত্রে নারীদের মধ্যে উচ্চ-নীচ, ধনী দরিদ্রের ভেদাভেদ নেই। সকল শ্রেণীর নারীর কাছেই এর গুরুত্ব সমান। যেমন রাজকন্যা ও রাজবধূ সীতার জীবনযাত্রার মান (standard of living) ও অত্রিমুনির পত্নী অনুসূয়ার দৈনন্দিন জীবনযাপন প্রণালী নিশ্চয়ই এক ধরণের ছিল না। অথচ সতীত্বের মর্যাদা রক্ষা ও পাতিব্রত্যের আদর্শ বোধ দুজনের মনে হুবহু একই ছিল। তাই অগ্নি সাক্ষী রেখে সীতা দেবী বিবাহ কালে যে শিক্ষা লাভ করেছিলেন তা হল পতিসেবা ভিন্ন স্ত্রীলোকের জীবনে অন্য কোনো তপস্যার প্রয়োজন নেই।

"পাণি প্রদান কালে চ যৎপুরাত্বগ্নি সন্নিধৌ।
অনুশিষ্টং জনন্যা মে বাক্যং তদাপিমে ধৃতম্।।
ন বিস্মৃতং তু মে সর্বং বাকৈঃ স্বৈধর্মচারিণী।
পতি শুশ্রূষণা নার্য্যাস্তপো নান্যদ্বিধীয়তে।'

(২।১১৮।৮-৯)
আর্য শাস্ত্র প্রকাশিত রামায়ণ।

সীতা আজীবন এই শিক্ষার মর্যাদা রক্ষা করেছিলেন। বনবাস কালে অনসূয়ার সঙ্গে সাক্ষাতের পর তাঁর মুখে তিনি একই কথা শুনেছিলেন।

মহাভারতের 'অনুশাসন পর্বে' পতিনিষ্ঠার ফলশ্রুতি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, পতি সেবারূপ ধর্মপথ অনুসরণকারিণী নারীরাই অরুন্ধতীর মতো স্বর্গে পূজা পান।

'ইমং ধর্মপথং নারী পালয়ন্তী সমাহিতা।
অরুন্ধতীব নারীণাং স্বর্গলোকে মহীয়েতে।'

মনু সতীত্বের মহিমা কীর্তন করে বলেছেন যে, হিন্দুর বিবাহ বন্ধন অবিচ্ছেদ্য, দান, বিক্রয় বা ত্যাগের দ্বারা এ বন্ধনকে ছিন্ন করা সম্ভব নয়।

'ন নিষ্ক্রিয় বিসর্গাভ্যাং ভর্তুভার্য্যা বিমুচ্যতে।
এবং ধর্ম্মং বিজানীমঃ প্রাক্ প্রজাপতি বির্ন্মিতম্ ।।
সকৃত দাহ্ দদানীতিত্রীণ্যোতানি সতাং সকৃৎ ।।'

(মনু. ৯।৪৬-৪৭)

পৌরাণিক কাহিনীতে দক্ষযজ্ঞের সময়, পতির নিন্দা শুনে সতীর দেহত্যাগের কথা আছে। শিব রুষ্ট হয়ে দক্ষেব যজ্ঞ পণ্ড করেন। ইতিহাসে 'জহর ব্রতে'র কথা বলা হয়েছে। রাজপুত রমণী পদ্মিনী সতীত্ব রক্ষার জন্য আরও শত শত নারীকে নিয়ে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। অসীম ধৈর্য ও সহনশীলতা—এদেশের নারীর মজ্জাগত ছিল। সুতরাং ধরিত্রীর মতো সহনশীলা নারীদের পক্ষে মহৎ একটি আদর্শের কারণে জীবন্ত অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করা অসম্ভব ছিল না। যেমন এদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে দেখা যায়, দেশমাতৃকার চরণে আত্মনিবেদন করে অনায়াসে বহু নরনারী স্বেচ্ছায় ফাঁসির দড়ি গলায় পরে হাসিমুখে জীবন বিসর্জন দিয়েছেন। বিশেষ করে নারীরা সাধারণত রক্ষণশীলা, শাস্ত্রকারদের প্রতি তাদের ছিল অগাধ বিশ্বাস। সুতরাং পুণ্য অর্জন ও অনন্ত স্বর্গসুখ কামনায় তাঁরা অনায়াসে এই কঠিন যন্ত্রণাদায়ক পরিণতি মেনে নিতেন। এছাড়া সেকালে ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হয়ে, মানুষের শুভবুদ্ধির বিনাশ ঘটেছিল এবং সকলকে মোহগ্রস্ত করে তুলেছিল। তার ফলে বীভৎস ও অশুভ অনুষ্ঠানকেও সকলে ধর্মের অঙ্গ বলে মেনে নিয়ে ছিল। এক সময় যেমন এদেশে নরবলি দেবার রীতি ছিল এবং আজও পশুবলি দেওয়া হয়, ঠিক তেমনিভাবেই দীর্ঘ কাল ধরে ধর্মানুষ্ঠানের নামে মৃত স্বামীর সঙ্গে জীবন্ত স্ত্রীকে পুড়িয়ে মারা হত, অন্ধকুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'পরিশেষ' কাব্যগ্রন্থে ''ধর্মমোহ'' কবিতায় যেমন আক্ষেপ করে বলেছেন--

'ধর্মের বেশে মোহ যারে এসে ধরে
অন্ধ সে-জন মারে আর শুধু মরে।'

এও যেন তাই।

অবশ্য অনেক নারী, নিজেদের অসহায় অবস্থার কথা ভেবে সহমরণে যেতেন যা আত্মহত্যারই নামান্তর। চিরজীবন পরের গলগ্রহ হয়ে, দাসীবৃত্তি করে অনাহারে তিল তিল করে মৃত্যু বরণের অপেক্ষা 'সতী' নাম নিয়ে গৌরবজনক মৃত্যুই তাঁদের কাছে শ্রেয় বলে মনে হত।

সতীদাহ নিবারণ আন্দোলন ও রাজা রামমোহন রায়
(১৭৭২।৭৪-১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দ)

আধুনিক যুগের সূচনায় রাজা রামমোহনের মতো মানুষের আবির্ভাব একটি বিস্ময়কর ঘটনা। সেকালে শুধু বঙ্গদেশ কেন, সমগ্র ভারতে এমন একটি অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানবের সন্ধান পাওয়া দুরূহ। ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য, শিক্ষা, রাজনীতি প্রভৃতি নানা বিষয় সম্পর্কে তিনি যুক্তিবাদী মনোভাব ও মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গিব পরিচয় দিয়েছেন। সমাজ থেকে নিষ্ঠুর সতী প্রথাকে উৎখাত



রাজা রামমোহন রায়

করার জন্য তিনি ছিলেন বদ্ধপরিকর। তিনিই প্রথম এদেশে নিষ্ঠা সহকারে সতীপ্রথা বিরোধী সক্রিয় ও নিয়মিত আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন, জনমত সৃষ্টি করেছিলেন, সেই কারণে চিরতরে সতীপ্রথার উচ্ছেদ ঘটেছে। অথচ একালের অনেক ঐতিহাসিক ও গবেষক, রামমোহনের যথার্থ প্রাপ্য কৃতিত্বকে অস্বীকার করার মনোভাব প্রকাশ করেছেন। তাঁরা বলতে চেয়েছেন সতী বিরোধী আন্দোলন এদেশে নতুন কিছু নয়। কারণ মোগল আমলে একাধিক বাদশাই সে চেষ্টা করেছিলেন। যেমন সম্রাট আকবর (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রী.) যখন সমাজসংস্কারমূলক কাজে ব্যাপৃত ছিলেন তখন তিনি সতীপ্রথা নিবারণের চেষ্টা করেন। তিনি নিজে একজন 'অনিচ্ছুক' রাজপুত 'সতী'কে জ্বলন্ত চিতা থেকে উদ্ধার করেছিলেন। এই কুপ্রথা দমনের উদ্দেশ্যে তিনি বিশেষ এক শ্রেণীর কর্মচারীও নিয়োগ করেছিলেন। আবুল ফজল-রচিত 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে আছে— "In every city and district vigilant and truthful inspectors were appointed to distinguish between voluntary and forced 'Sati' and to prevent the latter." (*Ain-i-Akbori*, Vol. III, p. 42)

তা ছাড়া জাহাঙ্গীর শাহজাহান প্রভৃতি একাধিক মোগল বাদশাই সে চেষ্টা করেছিলেন। পরবর্তীকালে বিদেশী শাসক লর্ড ওয়েলেস্‌লি প্রমুখ ব্যক্তিরা এবং খ্রীস্টান মিশনারিরা ধর্মের নামে' 'নারী হত্যা' বন্ধ করা চেষ্টা করেন। ডিরোজিও ও তাঁর শিষ্যবর্গ, নিজামত আদালতের প্রধানপণ্ডিত ঘনশ্যাম শর্মা অথবা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার প্রভৃতি অনেকেই সতীদাহ নিবারণের পক্ষে ছিলেন। কিন্তু নানা কারণে তাঁদের এই কল্যাণকামী সাময়িক প্রচেষ্টা সফল হয় নি। যাঁরা সাফল্য অর্জন করলেন তাঁরা হলেন রামমোহন রায় ও লর্ড বেন্টিঙ্ক। সেই কারণে এই নাম দুটি আমাদের ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে।

১৮২৯ খ্রীস্টাব্দের ৪ ডিসেম্বর তারিখে তৎকালীন ইংরেজ গভর্নর জেনালের লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক (১৮২৮-১৮৩৫) সতী প্রথাকে বেআইনী বলে ঘোষণা করেন। বেন্টিঙ্ক ভিন্ন কাউন্সিলের অন্যান্য সদস্যরা ছিলেন— চার্লস মেটকাফ, ডাবলিউ. বি. বেলি ও কম্বারমেয়র। সর্বসম্মতিক্রমে তাঁরা সতী প্রথাকে "...illegal and punishable by the criminal courts..." সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।[১৫]

প্রথম দিকে অবশ্য আইনের সাহায্যে এই কুপ্রথা দমন করতে, রামমোহনের মনে দ্বিধা ছিল। কারণ তিনি চরমপন্থী ছিলেন না, ছিলেন মধ্যপন্থী। জনসাধারণকে তিনি এই অমানবিক প্রথা সম্বন্ধে যথেষ্ট পরিমাণে সচেতন ও অবহিত করে তুলতে চেয়েছিলেন। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নানা ভাবে তিনি সে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় তিনি একাধিক সতী বিষয়ক পুস্তিকা প্রকাশ করেন, যেমন 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সংবাদ' (১৮১৮); 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ' (১৮১৯); সহমরণ বিষয়, (১৯২৩) ইত্যাদি)। কিন্তু লর্ড বেন্টিঙ্ক যখন সৎসাহসে নির্ভর করে ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে এই আইনটি পাস করালেন, তখন রামমোহন তাঁর মহত্ত্ব দেখে গভীর ভাবে অভিভূত হলেন। কলকাতার প্রগতিশীল নাগরিকদের পক্ষ থেকে ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দের ১৬ জানুয়ারি টাউন হলে বেন্টিঙ্ককে যে সংবর্ধনা

দেওয়া হয়, সোনার ফলকে লেখা অভিনন্দন পত্র সহ— তার পুরোভাগে ছিলেন রামমোহন রায়। অন্যান্যরা হলেন সূর্যশঙ্কর ঘোষাল, রায় কালীনাথ চৌধুরী (টাকী), রায় বৈকুণ্ঠনাথ চৌধুরী (টাকী), হাটখোলার দত্ত পরিবারের হরিহর দত্ত, রাজকৃষ্ণ মিত্র, রামনারায়ণ মিত্র, কুঞ্জবিহারী রায় ইত্যাদি তিনশো জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি।[১৬]

আইন প্রণয়ন করা হল দেখেও, রামমোহন এ বিষয়ে ক্ষান্ত হন নি। অনলস ভাবে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এই সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন। রামমোহন যদি সাধারণ আর পাঁচজন মানুষের মতো একই ধাতুতে গড়া হতেন, তা হলে সতীদাহ ব্যাপারটি তাঁব মনে কিছু মাত্র রেখাপাত করত না। কারণ সেকালে প্রায় সকলেই স্বচক্ষে 'সতী' হতে দেখেছেন। কিন্তু ব্যাপারটি ছিল গা-সহা গোছের। অনেকের মনে কোনো প্রতিক্রিয়াই ঘটত না। সেকালে সংবাদপত্রে প্রায়ই সতীদাহ সংক্রান্ত মর্মান্তিক অনেক সংবাদ প্রকাশিত হত। যেমন ১৮২৫ খ্রীস্টাব্দের ৮ অক্টোবর তারিখের 'সংবাদ কৌমুদী'তে প্রকাশিত একটি খবর—

"... একটি বীভৎস সংবাদে আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। ২৪ পরগণার (কলিকাতা সহরতলী) ১৫ বছরের বালক মদন মোহন চক্রবর্তীর মৃত্যুতে তার ১২ বছরের বালিকাবধূ স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় পুড়ে মরেছে।" ইত্যাদি [১৭] এই সব সংঘাতিক খবব জনসাধারণের মনে কোন রেখাপাত করত না। কারণ প্রথাগত জীবনযাপনে তারা এমনই অভ্যস্ত ছিল যে, তাদের মনটি প্রায় চেতনাহীন জড় বস্তুতে পরিণত হয়েছিল। ভারতীয় ঋষিরা যে স্বার্থ ও পরমার্থের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করে জীবনের পথে চলার উপদেশ দিয়েছিলেন— সেদিকে কেউ কর্ণপাত করতেন না। তাই 'বিকৃত ধর্ম'কে ধর্ম নামে অভিহিত করা হত এবং অসত্য আচরণ ও অমানবিক নিষ্ঠুর প্রথা ব্যাপকভাবে অনুসৃত হয়ে চলেছিল। এই বিষয়ে রামমোহনের জীবনীকার বলেছেন— "রামমোহন রায়ের সময়ে চিতানলে জীবিত সতীর মৃত্যু কে না দেখিত ? কিন্তু তন্মধ্যে তিনিই তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জগন্মোহনের স্ত্রীর সহমরণ-ব্যাপার স্বচক্ষে দেখিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যতকাল বাঁচিবেন, এই ভয়ঙ্কর প্রথা সমূলোৎপাটিত করিবার জন্য প্রাণপণে যত্ন করিবেন।"[১৮]

রক্ষণশীলদল সতীপ্রথাকে বলবৎ রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তাঁদের নেতা রাজা রাধাকান্তদেব, 'সমাচার চন্দ্রিকা' পত্রিকার সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং 'ধর্মসভা'র পক্ষের বারো জন সদস্য—গোপী মোহনদেব, মহারাজ কালীকৃষ্ণবাহাদুর, নীলমণি দেব, গোকুলনাথ মল্লিক, ভবানীচরণ মিত্র, রামগোপাল মল্লিক, নিমাইচাঁদ শিরোমণি, হরনাথ তর্কভূষণ প্রভৃতি ব্যক্তি, সতীদাহের পক্ষে এবং ঐ আইনের বিপক্ষে দুটি প্রতিবাদ পত্র পাঠালেন লর্ড বেন্টিঙ্কের কাছে। এ ছাড়া সুপ্রীম কোর্টে সতীদাহের পক্ষে ওকালতি করবার জন্য, 'ধর্মসভা'র পক্ষ থেকে অ্যাটর্নি ফ্রান্সিস বেথিকে ইংলন্ডে পাঠানো হয়। রামমোহন রায়ও হাল ছাড়েন নি। তিনি দিল্লীর মোগলবাদশাহের পক্ষে দূত হিসাবে ইংলন্ডে যান কিন্তু সেখানে গিয়েও সতীদাহের বিপক্ষে জনমত সংগ্রহ করতে লাগলেন। ফলে দেখা গেল, লর্ডস্-সভা রক্ষণশীলদলের আবেদন অগ্রাহ্য করলেন। রামমোহন যে কী পরিমাণ ধৈর্য ও অনমনীয় মনোভাব নিয়ে সতী আন্দোলনে

যোগ দিয়েছিলেন ও তাকে সম্পূর্ণ সার্থক করে তুলেছিলেন—তার পূর্ণ পরিচয় জানার পর কেউ যদি এ বিষয়ে তাঁর মুখ্য ভূমিকাকে অস্বীকার করতে চান, তা হলে তাঁকে নিতান্ত সংকীর্ণচেতা ও অকৃতজ্ঞ ভিন্ন, অন্য কিছু বলা যায় না।

নারী জাতির প্রতি রামমোহনের মনে ছিল গভীর ও অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। নারী জাতির সপক্ষে তিনি গভীর সহানুভূতি ও অকাট্য যুক্তি দেখিয়ে বলেছিলেন— "প্রথমতঃ বুদ্ধির বিষয়, স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পরীক্ষা কোন্ কালে লইয়াছেন যে, অনায়াসেই তাহার- দিগকে অল্প বুদ্ধি কহেন ? কারণ বিদ্যাশিক্ষা এবং জ্ঞানশিক্ষা দিলে পরে, ব্যক্তি যদি অনুভব ও গ্রহণ করিতে না পারে, তখন তাহাকে অল্পবুদ্ধি কহা সম্ভব হয়; আপনারা বিদ্যাশিক্ষা জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায় দেন নাই, তবে তাহারা বুদ্ধিহীন হয়, ইহা কিরূপে নিশ্চয় করেন ?... দ্বিতীয়তঃ তাহারদিগকে অস্থিরান্তঃকরণ কহিয়া থাকেন, ইহাতে আশ্চর্য জ্ঞান করি; কারণ যে দেশের পুরুষ মৃত্যুর নাম শুনিলে মৃতপ্রায় হয়, তথাকার স্ত্রীলোক অন্তঃকরণের স্থৈর্য্য দ্বারা স্বীকার উদ্দেশে অগ্নিপ্রবেশ করিতে উদ্যত হয়, ইহা প্রত্যক্ষ দেখেন, অথচ কহেন, যে তাহারদের অন্তঃকরণের স্থৈর্য্য নাই।" [১৯]

সেকালে শুধু আমাদের দেশ বলে নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে, এমন-কি সমগ্র ইউরোপ ভূখণ্ডেও নারীদের সম্পর্কে অনেক ভ্রান্ত ধারণা, অন্ধকুসংস্কার ও বিশ্বাস ছিল। ইতিহাসে 'জোয়ান অব আর্ক'-এর আত্মত্যাগের কাহিনী তার একটি জ্বলন্ত উদাহরণ। এ ছাড়া 'যুরোপের সকল দেশেই একদিন ডাইনির অস্তিত্ব বিশ্বাস করত। শত শত স্ত্রীলোক সেখানে নিরপরাধে পুড়ে মরেছে।" [২০]

শেষ পর্যন্ত রামমোহন যে জনমত গঠনে সমর্থ হয়েছিলেন তার সাক্ষ্য দেয়, লোকশিল্পীদের রচিত সতীদাহ বিরোধী মতবাদ প্রচার বিষয়ক গান—

"শোন শোন শোন সবে নরনারীগণ,
সহমরণ পেরথা নারী বধেরই কারণ।
নারী হত্যে মহাপাপ শাস্ত্রের বচন,
নারী রক্ষ্যে মহাকার্য মহৎ কারণ।
ওগো সতি, স্বামী মরলে তোমাদের চিতেয় যেতে হয়,
তোমরা মরলে পুরুষ তো কেউ কেউ সঙ্গেতে না যায়।
সতী গভ্ভে সন্তান রেখে যদি স্বামী চলে যায়,
বল কোন দোষে নরশিশু যাবে যমালয়ে।
খুন করলে খুনী ফাঁসিতে লট্‌কায়,
জ্যান্ত মানুষ পুড়িয়ে মারলে জেনো নরকগামী হয়।
তাই কলির রামমোহন দিয়েচেন ডাক

নারীর বধ রোধ তবে বাজও সবাই ঢাক।”

(বয়াতীর গান)

উপসংহারে শুধু এই কথাই বলা যায় যে, সতীদাহ আন্দোলনের সার্থকতার মূলে রামমোহনের একক ভূমিকা না থাকলেও প্রধানত তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টাতেই যে সর্বাঙ্গীণ ভাবে এ বিষয়ে সাফল্য অর্জন করা সম্ভবপর হয়েছিল তাতে কোনো সন্দেহই নেই।

উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য ও শিল্পে—‘সতীপ্রসঙ্গ’

কালের পরিবর্তনের সঙ্গে মূল্যবোধের আমূল পরিবর্তন ঘটতে দেখা যায়। যে কালে ব্যাপক হারে এদেশে যত্রতত্র ‘সতীদাহ’ দেখা যেত, তখন যাঁরা ‘সতী’ হতেন তাঁরা মনে কবতেন, একটি মহৎ আদর্শের জন্য আত্মোৎসর্গ করে তাঁরা নিজের জীবনকে সার্থক করছেন, সেইসঙ্গে পিতৃ-মাতৃ ও শ্বশুরকুলের গৌরব বৃদ্ধি করছেন। যে ব্যক্তিগণ এই কাজে সাহায্য করতেন তাঁদের ধারণা ছিল, পুণ্য কর্ম করে চলেছেন। আর যে-সব অসংখ্য দর্শক ‘সতী’কে দর্শন করতেন, তাঁদের অধিকাংশের মনপ্রাণ ভক্তি ও শ্রদ্ধায় আপ্লুত থাকত। তাঁরা ঐ নারীকে অ-লৌকিক মহিমায় ভূষিতা এক দেবী রূপেই দেখতেন এবং মনে মনে ভাবতেন ‘সতী’ দর্শনে পুণ্য সঞ্চয় হল। আজকের

—এই প্রথাটি—শাস্ত্রবিরুদ্ধ একটি নিষ্ঠুর লোকাচার ভিন্ন—এর অন্য কোনো গুরুত্ব নেই। আমরা মনে করি ‘সতী’ হওয়া প্রকৃতপক্ষে আত্মহত্যারই নামান্তর। যাঁরা ঐ-সব নারীদের এ বিষয়ে উপদেশ বা প্রেরণা দিতেন অথবা সাহায্য করতেন, তাঁরা তাঁদের আত্মহত্যা করতে প্ররোচিত করতেন মাত্র—তার বেশি কিছু নয়। যদিও তাঁরা নিজেদের সম্পর্কে ভাবতেন, একটি পরম পুণ্য কর্মে অংশ গ্রহণ করেছেন। সাহিত্যে সতী প্রসঙ্গের যে- সব বর্ণনা পাওয়া যায়, চিত্রে যে সতীদাহের দৃশ্য আঁকা হয়েছে ঐ- সব লেখক বা শিল্পীরা অনেকে স্বচক্ষে সতীদাহ দেখেছিলেন বলে মনে হয় না। কিন্তু তাঁরা কল্পনার সাহায্যে বর্ণনা করলেও বা চিত্রফলকে বিষয়টিকে প্রস্ফুটিত করে তুললেও, সকলেই যে ঘটনাস্থলের ভয়াবহ ও করুণ দিকটি দেখাতে চেয়েছেন, তা নয়। কেউ কেউ তা দেখিয়েছিলেন —আবার অনেকে সে বিষয়টিকে অস্বীকার করে তাকে এমন ভাবে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তুলেছেন তার ফলে ‘সতীদাহে’র বীভৎস দিকটি সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়েছে। কয়েকটি মাত্র নিদর্শন এখানে তুলে ধরা হল।

‘সতীদাহ’ সম্পর্কে ডিরোজিও

হিন্দু কলেজের প্রতিভাদীপ্ত সংস্কারমুক্ত যুক্তিবাদী তরুণ অধ্যাপক হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর নেতৃত্বে একদা ‘ইয়ং বেঙ্গলস্’রা, রামমোহনের গড়ে-তোলা সতীদাহ উচ্ছেদ-আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ডিরোজিওর সাহিত্যপ্রতিভার নিদর্শন বহন করছে যে সব কাব্যগ্রন্থ ও স্বতন্ত্র কবিতা, তার মধ্যে সতী বিষয়ক আখ্যায়িকামূলক ‘ফকির অফ জাঙ্গিরা’ নামক

কাব্যটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'দি ইনফ্যান্ট হিন্দু মোরনার' নামক দীর্ঘ কবিতায় যে করুণ ও মর্মস্পর্শী দৃশ্য তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন, সেটি পড়লে পাঠকের মন বেদনায় ভারাক্রান্ত ও চক্ষু অশ্রুসজল হয়ে উঠবেই। কবিতাটির প্রথম কয়েকটি ছত্র—

"Upon a woody bank I roamed at eve,
Close to the Ganges gliding stilly on,
And through a glade the sun's beam I saw" ইত্যাদি।

এই কবিতার চমৎকার একটি বাংলা অনুবাদ করেছেন কবি নচিকেতা ভরদ্বাজ। সেই কবিতার অংশ বিশেষ দেওয়া হল—

"... 'ফিরে এস, মাগো তুমি, ওমা ! মা ! মাগো আমার'।

....

উচ্চকিত ভয়াবহ কলরব ক্রমশ শান্ত হয়ে আসে,
ধোঁয়ার কুন্ডলী
এখনো উঠছে, কালো নগ্ন ভস্মরাশি উড়ছে
রৌদ্রদীর্ণ হাওয়ায় হাওয়ায়,
জনতারা চলে গেছে, কিন্তু তবু শিশুটি এখনো রয়ে গেছে,
একা একা, সেই ভয়াবহ ভোরবেলা থেকে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে,
কাঁদছে আর কাঁদছে, আর তাকিয়ে দেখছে তার মা
কোথায় গেল;
এবং কোথাও পাচ্ছে না খুঁজে! স্তূপীকৃত হয়ে আছে
চিতাভস্ম, ম্লান নির্জনতা।
আহা ! দ্যাখো, চেয়ে দ্যাখো -করুণ হতাশার
বালকের দুঃখের শূন্যতা,
বিষণ্ন শোকার্ত দৃষ্টি, ধূমাঙ্কিত ভস্মস্তূপে
স্থির হয়ে আছে সারাক্ষণ,
তিক্ততম অশ্রুরেখা ঝরে পড়ছে অবিরল,
ঘনঘন দীর্ঘশ্বাসে বিমথিত ছোট্ট শিশুটি;
এবং আবার শোনো, বিলাপী আর্তকান্না অব্যক্ত
শিশু হৃদয়ের,
"মা! মাগো ! কোথায়, কোথায় তুমি, সাড়া দাও,
প্রিয়তম জননী আমার।" [২১]

সেকালে যে-সব জননীরা শিশুসন্তানকে রেখে দিয়ে সহমরণে যেতেন, সেই মাতৃহারা

শিশুদের বুকফাটা কান্না ও অপরিসীম বেদনাকে কবি তাঁর দরদী মন দিয়ে অনুভব করে, ফুটিয়ে তুলেছেন আশ্চর্য সহানুভূতির সঙ্গে এখানে

ডি.এল. রিচার্ডসন ও তাঁর রচিত কবিতা 'সতী'

'ক্যালক্যাটা লিটারারি গেজেট' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন ডি. এল. রিচার্ডসন, তাঁর কবিখ্যাতিও ছিল। "The Suttee" নামে একটি চতুর্দশ ছত্রের কবিতা তাঁর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। "কবিতাটি অম্লান হাসিমুখে নির্ভয়ে 'সুস্থির অন্তরে' স্বহস্তে চিতা জ্বেলে তাতে সতীর আরোহণের বর্ণনা আছে।" [২২] পরে এই কবিতাটি বঙ্গানুবাদসহ 'বেঙ্গল হরকরা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই ইংরেজ ভদ্রলোক দীর্ঘকাল এদেশে বাস করেন। তাঁর কবিতাটি পড়লে মনে হয় প্রত্যক্ষভাবে কোনো 'সতী'কে দেখে প্রেরণা অনুভব করে তিনি এই কবিতা লেখেন---

"নির্ভয় রূপেতে সতী সুস্থির অন্তরে।
পার্থিব পতির চিতা আরোহণ করে।।" ইত্যাদি

মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্যে' সতীদাহ প্রসঙ্গ

আধুনিক বাংলা কাব্যধারার প্রবর্তক মহাকবি মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩) আন্তরিকতার সঙ্গে উচ্ছ্বাসভরে বীর মেঘনাদের মৃত্যুতে তাঁর বীরাঙ্গনা পত্নী সতী নারী প্রমীলাব চিতারোহণের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা অত্যন্ত মর্মান্তিক ও মর্মস্পর্শী। অন্যায় ভাবে জঘন্য ষড়যন্ত্রের ফলে নিহত হলেন রাবণের অদ্বিতীয় বীরপুত্র মেঘনাদ। সাগরতীরে তাঁর জন্য চিতা সজ্জিত হল। কবি বর্ণনা করেছেন—

"উত্তরি সাগরতীরে, রচিলা সত্বরে
যথাবিধি চিতা রক্ষঃ, বহিল বাহকে
সুগন্ধ চন্দন কাষ্ঠ, ঘৃত ভারে ভারে।"

নিখুঁত ব্রাহ্মণ্য বিধি অনুযায়ী অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আয়োজন হল—

'মন্দাকিনী-পূতজলে ধুইয়া যতনে
শবে, সুকৌষিক বস্ত্র পরাই, থুইল
দাহস্থানে রক্ষোদল; পড়িলা গম্ভীরে
মন্ত্র রক্ষঃ পুরোহিত। অবগাহি দেহ
মহাতীর্থে সাধ্বী সতী প্রমীলা সুন্দরী
খুলি রত্ন-আভরণ, বিতরিলা সবে।
প্রণমিয়া গুরুজনে মধুর ভাষিণী,
সম্ভাষি মধুর ভাষে দৈত্যবালাদলে,
কহিলা, 'লো সহচরি, এতদিনে আজি
ফুরাইল জীবলীলা জীব লীলাস্থলে আমার।"

প্রমীলা তাঁর প্রিয় সখীকুলকে 'দৈত্যদেশে' অর্থাৎ পিতার রাজ্যে (যেখান থেকে তাঁরা এসেছিলেন) ফিরে যেতে উপদেশ দিলেন। তাঁর প্রিয়তম সখী বাসন্তীর উপর গুরুতর দায়িত্ব অর্পণ করলেন তাঁর মাতাকে অন্তিম বার্তাটি নিবেদন করার জন্য—

"কহিও মায়েরে মোর, এ দাসীর ভালে
লিখিল বিধাতা যাহা, তাই লো ঘটিল
এতদিনে ! যাঁর হাতে সঁপিলা দাসীরে
পিতা মাতা, চলিনু গো আজি তাঁর সাথে;
পতি বিনা অবলার কি গতি জগতে ?
আর কি কহিব, সখি ? ভুল না লো তারে
প্রমীলার এই ভিক্ষা তোমা সবা কাছে।"

পরবর্ত্তী অংশে দেখতে পাই, হুবহু সতীদাহের রীতিনীতির বর্ণনা—

"চিতায় আরোহি সতী (ফুলাসনে যেন।)
বসিলা আনন্দমতি পতি-পদতলে;
প্রফুল্ল কুসুমদাম কবরী প্রদেশে।
বাজিল রাক্ষসবাদ্য, উচ্চে উচ্চারিত
বেদ বেদী, রক্ষোনারী দিল হুলাহুলি;
সে রবের সহ মিশি উঠিল আকাশে
হাহারব। পুষ্পবৃষ্টি হইল চৌদিকে।"

('মেঘনাদবধ কাব্য' , নবম সর্গ)

এই সতীদাহের বর্ণনার মধ্যে কিন্তু কাব্যসৌন্দর্য ফুটে উঠেছে। করুণ রূপটি প্রকাশ পেলেও বীভৎসতা ফুটে ওঠে নি। প্রমীলার প্রগাঢ় স্বামী প্রেমের পবিত্র রূপটি যেন উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে এখানে। প্রচলিত প্রথাকে অনুকরণ করেই বাঙ্গালী মধুসূদন এই বর্ণনা দিয়েছেন।

বঙ্কিম সাহিত্যে সতীদাহ

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-১৮৯৪) রচিত 'মৃণালিনী' উপন্যাসে আছে সতীদাহের বর্ণনা। উপন্যাসের পটভূমিটি ঐতিহাসিক—বখতিয়ার খিলজীর নবদ্বীপ বিজয়ের কাহিনী। মূল কাহিনীটি কিন্তু কাল্পনিক। মৃণালিনী, হেমচন্দ্র মনোরমা এবং পশুপতিকে কেন্দ্র গড়ে উঠেছে এই কাহিনী। উপন্যাসের শেষ অংশে পশুপতির মৃতদেহের সঙ্গে তাঁর বহুদিনের নিরুদিষ্টা পত্নী মনোরমার অগ্ন্যোৎসর্গের পুংখানুপুংখ বর্ণনা দিয়েছেন ঔপন্যাসিক।

অষ্টভূজার মূর্তিপূজারত পশুপতির গৃহ ভস্মীভূত হল। দুর্গাদাস নামে এক ব্রাহ্মণ ও তাঁর পুত্র ঐ দেবীমূর্তির সঙ্গে পশুপতির মৃতদেহ আবিষ্কার করেন। গঙ্গাতীরে ঐ দেহটি নিয়ে গিয়ে যখন দাহকার্যের আয়োজন চলেছে, তখনই 'মলিনবসনা, রুক্ষকেশী, আলুলায়িতকুণ্ডলা,

ভস্মধূলি সংসর্গে বিবর্ণা উন্মাদিনী'-প্রায় পশুপতির বহুকাল-নিরুদ্দিষ্টা পত্নী মনোরমা শ্মশান-ভূমিতে এসে উপস্থিত হল। অনুমরণের ভয়ে মনোরমার পিতা কেশব, কন্যাকে লুকিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু বিধাতার অমোঘ বিধানে যথাসময়ে সে সেখানে উপস্থিত হল। দুর্গাদাস ও তার পুত্রকে মনোরমা আদেশ করল—"এখন স্ত্রী জাতির কর্তব্য কাজ করিব। তোমরা উদ্যোগ করো।" তাকে সহমরণে যেতে নিরস্ত করতে চেষ্টা করলেন দুর্গাদাস। বললেন— "মা তুমি বালিকা—এ কঠিন কার্যে কেন প্রস্তুত হইতেছ?" মনোরমা ভ্রূকুটি করে তার উত্তর দিলেন—"ব্রাহ্মণ হইয়া অধর্মে প্রবৃত্তি দিতেছ কেন? ইহার উদ্যোগ করো।" তখন বাধ্য হয়ে দুর্গাদাসকে সহমরণের উপযোগী সামগ্রী আনার জন্য নগরে যেতে হল। তার মুখে সংবাদ পেয়ে হেমচন্দ্র ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে মনোরমাকে প্রতিনিবৃত্ত কবতে চাইলেন। কিন্তু মনোরমা বললেন—"ভাই, যে জন্য আমার জীবন, তাহা আজি চরম সীমা প্রাপ্ত হইয়াছে। আজ আমি আমার স্বামীর সঙ্গে গমন করিব।" তিনি তাঁর স্বামীর অপরিমিত ধন বণ্টনের নির্দেশ দিলেন এবং "নব বস্ত্র পরিধান করিয়া, দিব্য পুষ্পমালা কণ্ঠে পরিয়া, পশুপতির প্রজ্বলিত চিতা প্রদক্ষিণপূর্বক, তদুপরি আরোহণ করিলেন। এবং সহাস্য আননে সেই প্রজ্বলিত হুতাশনরাশির মধ্যে উপবেশন করিয়া নিদাঘসন্তপ্ত কুসুমকলিকার ন্যায় অনলতাপে প্রাণত্যাগ করিলেন।" বঙ্কিমচন্দ্রের এই বর্ণনার মধ্যেও কিন্তু সহমরণের ভয়ংকর রূপ প্রকাশ পায় নি।

রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্পে সতী-প্রসঙ্গ

রবীন্দ্রনাথ তাঁর "মহামায়া" গল্পের মধ্যে একই সঙ্গে কৌলীন্য প্রথা ও সহমরণের ভীষণ চিত্র এঁকেছেন। গল্পটিতে আমরা দেখতে পাই—মহামায়া রাজীবকে ভালোবাসত কিন্তু স্বাভাবিক নিয়মে তাদের বিবাহের উপায় ছিল না। কারণ "প্রবল কুলাভিমান মহামায়ার বংশে কত কাল হইতে প্রবাহিত হইতেছে—সে কি কখনো রাজীবের মতো অকুলীন ব্রাহ্মণকে বিবাহ করিতে সম্মত হইতে পারে। ভালোবাসা এক এবং বিবাহ করা আর।" শেষ পর্যন্ত নদীতীরবর্তী শ্মশানে গঙ্গাযাত্রীর ঘরে এক মুমূর্ষু বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সঙ্গে—"দুইটি অদূরবর্তী চিতার আলোকে অন্ধকারপ্রায় গৃহে মৃত্যুযন্ত্রণার আর্তধ্বনির সহিত অস্পষ্ট মন্ত্রোচ্চারণ মিশ্রিত করিয়া মহামায়ার বিবাহ হইয়া গেল।" এর ফল হল এই—"যেদিন বিবাহ তাহার পরিদিনই মহামায়া বিধবা হইল।" তারপর খুব ধুমধাম করে মহামায়াকে সহমৃতা করতে নিয়ে যাওয়া হল। সতীদাহের মর্মান্তিক দৃশ্য এখানে ফুটে উঠেছে "মহামায়ার হাত পা বাঁধিয়া তাহাকে চিতায় সমর্পণ করিয়া যথাসময়ে অগ্নিপ্রয়োগ করা হইয়াছিল। অগ্নিও ধূ ধূ করিয়া ধরিয়া উঠিয়াছে, এমন সময়ে প্রচণ্ড ঝড় ও মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল।" এই সময় যারা দাহ করতে এসেছিল তারা গঙ্গাযাত্রীর ঘরে আশ্রয় নিল— বৃষ্টির হাত থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্য। এদিকে মহামায়ার হাতের বাঁধন পুড়ে গেছে, অসহ্য দাহের যন্ত্রণায় সে কাতর। নিজেই পায়ের বাঁধন খুলে ফেলল। পরিধানের বস্ত্র দগ্ধ হয়ে মহামায়া উলঙ্গপ্রায়। তাই সে শূন্য গৃহে গিয়ে কাপড় পরে প্রদীপের আলোয় নিজের দগ্ধ বিকৃত মুখ

দর্পণে দেখে, দর্পণটি মাটিতে আছড়ে ফেলে দিল। দীর্ঘ ঘোমটা টেনে রাজীবের বাড়িতে গেল। রাজীব তাকে চিনতে পেরে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠল— "মহামায়া, তুমি চিতা হইতে উঠিয়া আসিয়াছ ?" শেষ পর্যন্ত রাজীবকে এক ভীষণ প্রতিজ্ঞা করাল সে, কখনো যেন তার মুখ সে না দেখে। এই শর্তে রাজীব রাজী না হলে সে পুনরায় চিতায় ফিরে যাবে। কিন্তু ঐ ঘোমটাই তাদের জীবনে শান্তির অন্তরায় হয়ে উঠল।— "মহামায়া এখন রাজীবের ঘরে, কিন্তু রাজীবের জীবনে সুখ নাই। অধিক নহে, উভয়ের মধ্যে কেবল একখানি মাত্র ঘোমটার ব্যবধান। কিন্তু সেই ঘোমটাটুকু মৃত্যুর ন্যায় চিরস্থায়ী, অথচ মৃত্যুর অপেক্ষা যন্ত্রণাদায়ক। কারণ, নৈরাশ্যে মৃত্যুর বিচ্ছেদ-বেদনাকে কালক্রমে অসাড় করিয়া ফেলে, কিন্তু সেই ঘোমটার বিচ্ছেদটুকুর মধ্যে একটি জীবন্ত আশা প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে পীড়িত হইতেছে।" এখানে রবীন্দ্রনাথ সতীদাহের তীব্র মর্মান্তিক রূপটি জীবন্ত করে তুলেছেন : "যখন সহমরণপ্রথা প্রচলিত ছিল তখন এমন ঘটনা কদাচিৎ মাঝে মাঝে ঘটিতে শুনা গিয়াছে।"

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় সতী-প্রসঙ্গ

রবীন্দ্রযুগের রবীন্দ্রবয়োকনিষ্ঠ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২) তাঁর 'বেণু ও বীণা' কাব্যগ্রন্থে 'সহমরণ' নামে যে কবিতাটি রচনা করেন, এই প্রসঙ্গে সেটি স্মরণযোগ্য। এখানেও কবি একই সঙ্গে কৌলীন্য ও সতীপ্রথার জন্য নারীর জীবনে যে অপরিসীম দুঃখের বোঝা বইতে হত, তার কথা বলেছেন, এক রমণী তার আত্মকাহিনী বর্ণনা করছে—

"জন্ম আমার হিঁদুর ঘরে,
বাপের ঘরে খুব আদরে,
ছিলাম বছর দশ,
কুলীন পিতা, কুলের গোলে,
ফেলে দিলেন বুড়ার গলে,
হলাম পরের বশ।"

বৃদ্ধ স্বামীর জীবনাবসানে—

"...ভাঙ্গল সুখের হাট;
খ'য়ের রাশি ছড়িয়ে পথে,
চলল নিয়ে শবের সাথে,
যেথায় শ্মশান ঘাট।"

জীবন্ত নারীর আর্তনাদ চাপা দেবার জন্য যে ধরণের বর্বরতার আশ্রয় নেওয়া হত, সে আয়োজনও হল—

"...বাজল শতেক শাঁখ;
লোকের ভিড়ে ভরেছে ঘাট—



'সতীর চিতায় আরোহণ'—শিল্পীঃ নন্দলাল বসু

ধোঁয়ায় চিতার আধ ভিজা কাট,

উঠল গর্জে ঢাক"

ইত্যাদি।

এখানেও করুণ ও অসহায় রূপটি ফুটে উঠেছে। বিংশ শতাব্দীতেও সতী কাহিনী নিয়ে গল্প উপন্যাস লেখা হয়েছে। তার মধ্যে প্রবীণা সাহিত্যিকা জ্যোতির্ময়ী দেবী (১৮৯৩-১৯৮৮) রচিত "সতী" নামে ছোটোগল্পটির কথা বলা যেতে পারে (রচনাকাল ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ— 'জ্যোর্তিময়ী দেবীর রচনাবলী', পৃ.৩৮৬-৯৪)। এখানে ঐতিহাসিক পটভূমিকায় যে মর্মস্পর্শী চিত্র ফুটে উঠেছে তা এক হিসাবে অতুলনীয় এবং সুশীল রায়-রচিত 'অনল-আয়তি' নামক উপন্যাসটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই উপন্যাসের পটভূমি হল ১৮০০-২৯ খ্রীস্টাব্দে বঙ্গদেশে প্রচলিত সতীদাহ প্রথা।

শিল্পীরা অনেকে সতীদাহের বিষয়বস্তু নিয়ে চিত্ররচনা করেছেন। শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর (১৮৮২-১৯৬৬) অঙ্কিত 'সতীর চিতায় আরোহণ' (১৯০৮) নামক চিত্রটি তুলনারহিত। এখানে শিল্পী সতীর মুখে যে সুন্দর ও পবিত্র ভাবটি ফুটিয়ে তুলেছেন, তা আমাদের মুগ্ধ ও বিস্মিত করে। অগ্নিপরিশুদ্ধা সীতা দেবীর কথা মনে পড়ে যায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিধবা বিবাহ আন্দোলন ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

প্রাচীনযুগে ভারতে বিধবা বিবাহের প্রচলন ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে উচ্চবর্ণের নারীদের মধ্যে এই রীতি অচল হয়ে যায়। বাল্যবিবাহ রীতির জন্য মধ্যযুগের বালবিধবার সংখ্যা ও তার সঙ্গে আনুষঙ্গিক অন্যান্য নানা সমস্যা দেখা দেয়। মানবদরদী বিদ্যাসাগর মহাশয় এই সমুদায় সমস্যার আংশিক সমাধানে জন্য আইনসংগত ভাবে বিধবা বিবাহ প্রচলনের প্রয়োজন অনুভব করেন এবং সেইমতো সমাজ সংস্কারের কাজে অগ্রসর হন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের (১৮২০-৯১) মতো মহানুভব ব্যক্তির নিকট বঙ্গের নারীকুল চির অনুগত, চিরকৃতজ্ঞ ও ঋণী হয়ে আছে। কী কারণে তিনি 'বঙ্গের গৌরব'?—"... দয়া নহে, বিদ্যা নহে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রের প্রধান গৌরব তাঁহার অজেয় পৌরুষ, তাঁহার অক্ষয় মনুষ্যত্ব।" ২৩

এদেশের মেয়েদের অপরিসীম দুঃখ দুর্দশা দেখে তাঁর মন দ্রবীভূত হয়েছিল, সেজন্য তিনি বেথুন সাহেবের সহায়তায় স্ত্রী-শিক্ষার সূচনা ও বিস্তারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। বালবিধবাদের প্রাণান্তকর কষ্ট দেখে, শাস্ত্রসম্মত ভাবে তিনি এইসব বিধবাদের বিবাহের রীতি প্রবর্তন করেন। পুরুষদের মধ্যে বহু বিবাহ বন্ধ করার জন্য তিনি আন্দোলন গড়ে তোলেন। বিদ্যাসাগরের মধ্যে মহাকবি মধুসূদন বিদ্যাসর্বস্ব পণ্ডিতকে দেখেন নি, কিংবা কর্মনিষ্ঠ কর্মীমাত্রকে দেখেন নি আরও কিছু দেখেছিলেন, তা হল— "He has the genius and wisdom of an ancient sage, the energy of an Englishman and the heart of a Bengali mother."

এই উক্তির সত্যতা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করা যায়।

বিদ্যাসাগর যে দুর্জয় বাধা অতিক্রম করে বিধবা বিবাহ প্রবর্তন করেছিলেন, সাধারণ মানুষের পক্ষে তা সম্ভব ছিল না। প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাঁকে অহরহ সংগ্রাম করতে হয়েছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁর একমাত্র পুত্র নারায়ণচন্দ্রের সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিলেন খানাকুল কৃষ্ণনগরের অধিবাসী শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বিধবাকন্যা ভবসুন্দরীর সহিত। পুত্র নারায়ণচন্দ্র যখন বিধবা বিবাহ করেন, বিদ্যাসাগর অন্তরের সঙ্গে তা সমর্থন করেন এবং এ সম্পর্কে তিনি ভাই শম্ভুচন্দ্রকে যে কথাগুলি লিখেছিলেন তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যটি এই উক্তির মধ্যে যেন প্রতিবিম্বিত হয়েছে—



ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

"বিধবাবিবাহ প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম, এজন্মে যে ইহার অপেক্ষা অধিকতর আর কোনও সৎকর্ম করিতে পারিব, তাহার সম্ভাবনা নাই; এ বিষয়ের জন্য সর্বস্বান্ত হইয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরাঙ্মুখ নহি।...আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নহি, নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা হওয়া উচিত বা আবশ্যক বোধ হইবেক, তাহা করিব; লোকের বা কুটুম্বের ভয়ে কদাচ সঙ্কুচিত হইব না।"[২৪]

সেকালে সমাজের নিম্নশ্রেণীর মেয়েদের মধ্যে বিধবা বিবাহের চলন ছিল। কিন্তু উচ্চবর্ণের মেয়েরা বিধবা বিবাহের কথা চিন্তাই করতে পারতেন না। কারণ হিন্দু শাস্ত্রে এ বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা না থাকলেও তা ছিল অচল। অর্থাৎ এটি ছিল দেশাচারবিরুদ্ধ কর্ম। সেজন্য হিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহ প্রচলনের প্রস্তাব হওয়া মাত্রই বিষম আলোড়ন দেখা গেল।

পরাশরবচনে কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে নারীর অন্য পতি গ্রহণের নির্দেশ আছে—

'গতে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চ স্বাপৎসু নারীণাং পতিরণ্যো বিধীয়তে ॥'

(পরাশর সংহিতা, চতুর্থ অধ্যায়)

অর্থাৎ পাঁচটি ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকের পুনর্বিবাহ শাস্ত্রবিহিত, তা হল— স্বামী অনুদ্দেশ হলে, মারা গেলে, ক্লীব বলে গণ্য হলে, সংসার ধর্ম ত্যাগ করলে কিংবা পতিত হলে।

বিদ্যাসাগরের আন্দোলনের পূর্বেই কিন্তু এদেশে বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের আন্তরিক প্রচেষ্টা দেখা গেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মহারাজ রাজবল্লভ নিজের বাল-বিধবা কন্যার জন্য বিধবা বিবাহ প্রচলনের চেষ্টা করেন ও বহু পণ্ডিতের নিকটে বিধান সংগ্রহ করেন। কিন্তু কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রবল বিরূপতায় তা কার্যে পরিণত করা সম্ভব হয় নি। রাজা রামমোহন রায় তাঁর 'আত্মীয় সভা'য় বাল-বিধবাদের জীবনের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। উনিশ শতকের তৃতীয় দশকে ডিরোজিও এবং তাঁর ছাত্ররা এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। ১৮৪২ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল ও জুলাই মাসের 'বেঙ্গল স্পেক্‌টেটর' পত্রিকায় হিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহের বৈধতা নিয়ে আলোচনা হয়। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ (১৭৮৬-১৮৪৫ খ্রী.) ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের প্রথম আচার্য ও প্রথম বাংলা অভিধান রচয়িতা। ইনি বিদ্যাসাগরের আগেই, বিধবা বিবাহের সপক্ষে মতামত দিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় এ সবই জানতেন। তাই তিনি তাঁর 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' পুস্তিকার প্রথমেই সে কথা বলেছেন— "বিধবা বিবাহের প্রথা প্রচলিত না থাকাতে যে নানা অনিষ্ট ঘটিতেছে, ইহা এক্ষণে অনেকেরই বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। অনেকেই স্ব স্ব বিধবা কন্যা ভগিনী প্রভৃতির পুনর্বার বিবাহ দিতে উদ্যত আছেন। অনেকে তত দূর পর্যন্ত যাইতে সাহস করিতে পারেন না, কিন্তু এই ব্যবহার প্রচলিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে, ইহা স্বীকার করিয়া থাকেন। বিধবা বিবাহ শাস্ত্রীয় কিনা, এ বিষয়ে ইতিপূর্বে, এতদ্দেশীয় কতিপয় প্রধান পণ্ডিতের বিচার হইয়াছিল।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, ইদানীন্তন পণ্ডিতেরা বিচারকালে, জিগীষার বশবর্তী হইয়া, স্ব স্ব মতরক্ষা বিষয়ে এত ব্যগ্র হন যে, প্রস্তাবিত বিষয়ের তত্ত্বনির্ণয় পক্ষে দৃষ্টিপাত মাত্র থাকে না।"

বিদ্যাসাগরের মনে নারীজাতির প্রতি কী গভীর সহানুভূতি ছিল তাঁর সমাজ সংস্কার বিষয়ক রচনাগুলি তার পরিচয় দেয়। যেমন তিনি বলেছিলেন— "বিধবার জীবন কেবল দুঃখের ভার। এবং এই বিচিত্র সংসার তাহার পক্ষে জনশূন্য অরণ্যাকার। পতির সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সমস্ত সুখ সাঙ্গ হইয়া যায়। এবং পতি বিয়োগ দুঃখের সহ সকল দুঃসহ দুঃখের সমাগম হয়। উপবাসদিবসে পিপাসা নিবন্ধে কিংবা সাংঘাতিক রোগানুবন্ধে যদি তাহার প্রাণাপচয় হইয়া যায়, তথাপি নির্দয় বিধি তাহার নিঃশেষ নীরস রসনাগ্রে গণ্ডূষমাত্র বারি বা ঔষধ দানেরও অনুমতি দেন না।"[২৬]

অসংখ্য বাল-বিধবার উপর অমানুষিক অত্যাচার চলেছে বিদ্যাসাগর তা স্বচক্ষে দেখেছিলেন এবং অপরিমিত মামব-প্রীতির বশবর্তী হয়েই তিনি সমাজ সংস্কারের কাজে অগ্রসর হয়েছিলেন। তাঁর 'বিধবা বিবাহ' নামক গ্রন্থে যথোচিত যুক্তি সহকারে এই প্রথা প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তার কথা প্রচার করেছিলেন। দেশবাসীকে তিনি 'ব্যভিচার দোষ' ও 'ভ্রূণ হত্যার পাপ' থেকে রক্ষা করার জন্য, বিধবা বিবাহ প্রচলনে সচেতন হতে আহ্বান করেন। মানুষ মাত্রেই ষড়রিপুর বশীভূত। নারীরাও তার ব্যতিক্রম নয়। সমাজের অমঙ্গল দূরীভূত করার উদ্দেশ্যেই তিনি বিধবা বিবাহের প্রচলন, বাল্য বিবাহ বন্ধ ও বহু বিবাহ রোধের কথা চিন্তা করেন। বিদ্যাসাগর কী ধরণের পরিস্থিতিতে বিধবার বিবাহের কথা চিন্তা করেছিলেন, তাঁর জীবনী গ্রন্থ পাঠ করলে তা জানতে পারা যায়। যেমন চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-রচিত বিদ্যাসাগর জীবনীতে বর্ণিত একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে।

ছাত্রাবস্থায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে বেদান্ত-অধ্যাপক শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতির খুব মধুর সম্পর্ক ছিল। কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে তিনি একটি সুন্দরী বালিকাকে বিবাহ করেন। সেই কারণে বিদ্যাসাগর তাঁর বাড়িতে জলস্পর্শ পর্যন্ত করেন নি, জীবনীকার তার বিবরণ দিয়েছেন—

"...বাচস্পতি মহাশয় ঈশ্বরচন্দ্রের হাত ধরিয়া বলিলেন, "তোমার মাকে দেখিয়া যাও' এই বলিয়া দাসীকে নববধূর অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিতে বলিলেন। তখন বাচস্পতি মহাশয়ের নব বিবাহিতা পত্নীকে দেখিয়া ঈশ্বরচন্দ্র অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না। সেই জননীস্থানীয়া বালিকাকে দর্শন করিয়া ও এই বালিকার পরিণাম চিন্তা করিয়া বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন।"[২৭] এই জাতীয় আরও অনেক ঘটনা প্রত্যক্ষ করে, তিনি বিধবা বিবাহের পরিকল্পনাকে কার্যকরী করতে কৃতসংকল্প হন। এ বিষয়ে বিদ্যাসাগর তাঁর পিতামাতার পূর্ণ সম্মতি লাভ করেন। মাতা ভগবতী দেবী ছিলেন একজন অনন্যসাধারণ মহিলা। গভীর মানবতাবোধে পূর্ণ ছিল তাঁর হৃদয়। কোথাও সংকীর্ণতার চিহ্নমাত্র ছিল না। মায়ের নিকট নির্দেশ পেয়েই তিনি এই কাজে অগ্রসর হন। "একদিন বীরসিংহ বাটীর চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহার পিতার

সহিত বীরসিংহ স্কুল সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার মাতা রোদন করিতে করিতে চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া একটি বালিকার বৈধব্য সংঘটনের উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, 'তুই এতদিন এত শাস্ত্র পড়িলি, তাহাতে বিধবার কি কোনো উপায় নাই।' মাতার পুত্র উপায় অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন।"[২৮]

প্রাচীন শাস্ত্রসমূহ পর্যালোচনা করে বিদ্যাসাগর যুক্তিসহ দেখালেন যে, বিধবা বিবাহ অশাস্ত্রীয় নয়। বিপুল সংখ্যক জনগণের প্রচণ্ড বিরোধিতা সত্ত্বেও ইংরেজ সরকারের সহায়তায় ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দের ২৬ জুলাই বিধবা বিবাহ আইন প্রবর্তিত হল। আইনটির পরিচয় এই— Act XV of 1856 being an Act to remove all legal obstacles to The Marriage of Hindu widows.

আইন প্রণয়নের পাঁচ মাস পরে প্রথম বিধবা বিবাহের ঘটনাটি স্মরণীয় হয়ে আছে। ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দের ৭ ডিসেম্বর, স্বয়ং বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে শ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্যের সঙ্গে বাল-বিধবা কালীমতীর বিবাহ হয়। পণ্ডিত শ্রীশচন্দ্র ছিলেন সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক। পরে ইনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ লাভ করেন। সমসাময়িক যুগের সংবাদপত্র সমূহে এই ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হয়। রাজনারায়ণ বসু তাঁর 'আত্মচরিত' গ্রন্থে এই ঘটনা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন" ...যেদিন তাঁহার (শ্রীশচন্দ্রের) বিবাহ হয় সেদিন কলিকাতার লোক এমন চমকিত হইয়া ছিল যে যুগ উল্টানোর ন্যায় একটা কি ভয়ানক ঘটনা হইতেছে।" আইনসংগত ভাবে বিধবা বিবাহের পূর্বেই— একটি অভিজাত ঘরের বিধবার বিবাহের কথা জানা যায়। সেটি হল এই, ডিরোজিওর প্রিয় শিষ্য ও পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরবাড়ির ঘর-জামাই রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় (১৮১৪-১৮৭৮) একই সঙ্গে বিধবা ও অসবর্ণ বিবাহ করেন। তিনি বর্ধমানরাজ তেজচন্দ্রের বিধবা রানী বসন্তকুমারীকে রেজিস্ট্রি করে বিবাহ করেন। এই বিবাহের একজন সাক্ষী ছিলেন 'গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য' অর্থাৎ গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য। এই ঘটনার পর দক্ষিণারঞ্জনকে চিরকালের জন্য কলকাতা পরিত্যাগ করে, লক্ষ্মৌ চলে যেতে হয়। সেখানেই তাঁর মৃত্যু ঘটে।[২৯]

প্রথম দিকে বেশ কয়েকটি বিধবা বিবাহ সংঘটিত হলে ধীরে ধীরে উৎসাহ স্তিমিত হয়ে এল। আইন প্রণয়ন করলেও, সব সময় আইনটি বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় না। বিধবা বিবাহ বাঙালি সমাজে কোনো দিনই তেমন সমাদর লাভ করে নি বা জনগণের সমর্থন পায় নি; এই কারণে বিদ্যাসাগরের মনে ক্ষোভের অন্ত ছিল না। তিনি এই কথা বলে আক্ষেপ করেছিলেন— "আমি আশা করিয়াছিলাম, কোনো সামাজিক ক্রিয়াকে শাস্ত্রসম্মত বলিয়া প্রমাণ করিতে পারিলেই এদেশের লোক তাহা অবনত মস্তকে গ্রহণ করিবে, কিন্তু আমার সে বিশ্বাস বিনষ্ট হইয়াছে। এদেশে শাস্ত্র এবং দেশাচার এক পথে না চলিয়া পরস্পর বিভিন্ন পথে চলিয়াছে।" উদারপন্থী প্রগতিশীল মানুষের অভাব ছিল বলেই, আইনসংগত হলেও তেমনভাবে এ দেশে বিধবা বিবাহ সমাদৃত হয় নি। দৈনন্দিন জীবনে তখনকার দিনে কত শত অসহায় বাল-বিধবাকে সমাজে ও পরিবারে অকথ্য নির্যাতন সহ্য করতে দেখা গেছে। সেকালে কুলীনরা বহু বিবাহ

করতেন, সেই কারণে এক ব্যক্তির মৃত্যুতে, বহুনারীকে বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করতে হত। এইজন্যই বিদ্যাসাগর প্রাণান্তকর পরিশ্রম করে এই আইন বলবৎ করলেন বটে কিন্তু দেশাচার রূপে গণ্য না হওয়ায় :– সব নারীদের জীবন-যন্ত্রণার কিছুমাত্র পরিবর্তন হল না।[৩১]

আপাতদৃষ্টিতে বিদ্যাসাগরের এই প্রয়াস ব্যর্থ বলে মনে হলেও ব্যাপক দৃষ্টিতে বিচার করলে বলতে হবে—এই ঘটনাটি নারীমুক্তি আন্দোলন পর্যায়ে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। আইন প্রবর্তিত হবার অব্যবহিত পরেই বিদ্যাসাগরকে কেন্দ্র করে সমগ্র দেশে ও সমাজে বিরাট এক আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। এমন-কি শান্তিপুর থেকে 'বিদ্যেসাগর পেড়ে' কাপড় বোনা হতে লাগল। 'পক্ষি'-রচিত পুরো একটি গান, ঐ কাপড়ের পাড়ে লেখা থাকত:

'সুখে থাকুক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে।
সদরে করেছে রিপোর্ট বিধবাদের হবে বিয়ে।
কবে হবে শুভ দিন, প্রকাশিবে এ আইন,
দেশে দেশে জেলায় জেলায় বেরবে হুকুম—
বিধবা রমণীর বিয়ের লেগে যাবে ধুম;
মনের সুখে থাকব মোরা মনোমত পতি লয়ে।
এমন দিন কবে হবে, বৈধব্য-যন্ত্রণা যাবে,
আভরণ পরিব সবে, লোকে দেখবে তাই—
আলোচাল কাঁচকলার মুখে দিয়ে ছাই,—
এয়ো হয়ে যাব সবে বরণডালা মাথায় লয়ে॥'

কবি ঈশ্বরগুপ্ত রক্ষণশীল দলের সমর্থক সেজে, ব্যঙ্গ করে লিখলেন—

'বাঁধিয়াছে দলাদলি, লাগিয়াছে গোল।
বিধবার বিয়ে হবে, বাজিয়াছে ঢোল।
* * * * *
সকলেই এইরূপ, বলাবলি করে।
ছুঁড়ীর কল্যাণে যেন, বুড়ী নাহি তরে॥
শরীর পড়েছে ঝুলি, চুলগুলি পাকা।
কে ধরাবে মাছ তারে, কে পরাবে শাঁখা।
জ্ঞানহারা হয়ে যাই, নাহি পাই ধ্যানে।
কে পড়িবে "সংবাপ" মায়ের কল্যাণে॥'

পাঁচালীকার দাশরথি রায় তখন বিদ্যাসাগরের পক্ষে লিখলেন— স্বয়ং ঈশ্বরের দূত রূপেই আবির্ভূত হয়েছেন তিনি—

'তোমরা এই ঈশ্বরের দোষ ঘটাবে কিরূপে।

রাখিতে ঈশ্বরের মত, হইয়ে ঈশ্বরের দূত,
এসেছেন ঈশ্বর বিদ্যাসাগর রূপে।'

অন্য আর-একটি কবিতায় দাশরথি, কবি ঈশ্বর গুপ্তকে ভর্ৎসনা করে বলেছেন—

'ঈশ্বরগুপ্ত অল্পয়ে, নারীর রোগ চেনে না বৈদ্য হয়ে,
হাতুড়ে বৈদ্যেতে যেন বিষ দিয়ে দেয় প্রাণে বধি।'

বিদ্যাসাগরের সহযোগিতায় যাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন— প্রগতিশীল ইয়ং বেঙ্গলস্ সম্প্রদায়, তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যবৃন্দ, সংস্কৃত কলেজের কয়েকজন, উদারপন্থী অধ্যাপক এবং বিশিষ্ট কয়েকজন নাগরিক। 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'র প্রতিষ্ঠাতা কালীপ্রসন্ন সিংহ ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। বিধবা বিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হবার পর তিনি 'সংবাদ প্রভাকরে'র পৃষ্ঠায় ঘোষণা করেন যে, যাঁরা বিধবা বিবাহ করতে ইচ্ছুক হবেন, তাঁদের প্রত্যেককে 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা' এক সহস্রমুদ্রা পুরস্কার দিতে স্বীকৃত আছেন।[৩২] অবশ্য পরবর্তীকালে তাঁরা এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেন নি।

সাহিত্যে 'বিধবা' প্রসঙ্গ

সেকালের সমাজে বিধবারা ছিলেন অপাঙ্‌ক্তেয়। বাল-বিধবা হলেও কঠোর অনুশাসনের হাত থেকে রেহাই ছিল না। পিতামাতার মনে শেলবিদ্ধ হলেও সমাজের বিরুদ্ধাচরণ করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ক্ষেমানন্দ-রচিত মনসামঙ্গল কাব্যে একটি করুণ চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। কথাগুলি কবি প্রত্যক্ষ ভাবে বেহুলা সম্পর্কে বলেছেন বটে, কিন্তু আসলে এগুলি বাল-বিধবাদের মা-বাবার মনোভাব। কচি মেয়েকে সাজসজ্জা অলংকার ও প্রসাধন দ্রব্য থেকে বঞ্চিত করতে মন চাইত না তাঁদের। অথচ সামাজিক বিধানও লঙ্ঘন করা চলবে না। সেই কারণে বিকল্প হিসাবে যে-সব দ্রব্য দিতে চেয়েছেন তা হল—

'খনি বদলে দিব কাঁচা পাটের শাড়ী
শঙ্খ বদলে দিব সুবর্ণের চুড়ি।
সিন্দূর বদলে দিব ফাউগের গুঁড়ি।।' ইত্যাদি।

সমসাময়িক যুগেও এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে অনেক কবিতা, নাটক, প্রহসন, গল্প-উপন্যাস লেখা হয়েছে। ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দের ২৫ মার্চ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' 'বরাহ নগরবাসিনী বিরহিনী বিধবা'র রচিত একটি কবিতা প্রকাশিত হয়, তার শিরোনাম হল—
"বসন্তের প্রতি বিধবার উক্তি"—

ঐ কবিতার মাঝের কয়েকটি ছত্রে তিনি বলেছেন—

'কয়জন জ্ঞানি বাবু ভ্রম নিদ্রা হত।
বিধবার বিয়ে দিতে, হোয়েছেন রত।

মন খুলে আশীর্বাদ করিতেছি সবে।
বাবুদের অভিলাষ পরিপূর্ণ হবে ॥'

এই জাতীয় রচনাগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য রচনা হল উমেশচন্দ্র মিত্র- রচিত 'বিধবা বিবাহ' নাটক (১৮৫৬)। এই নাটকের নায়িকা সুলোচনা, যুবতী ও বিধবা। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য এই নাটকটি সম্পর্কে বলেছেন— "এই নাটকের একটি চরিত্র অবলম্বন করিয়া তাহার রক্ত মাংসের দেহের কামনা বাসনার অভিব্যক্তির মধ্য দিয়া বিধবার জীবনের যে সুগভীর বেদনাটির নাট্যকার সন্ধান দিয়াছেন, তাহার মধ্য দিয়া কেবলমাত্র ইহা এই আন্দোলনের কার্যেই সহায়ক হইয়াছিল, তাহা নহে—সমাজের বাস্তব রূপটি তাহার মধ্য দিয়া ভাষা পাইয়াছিল।" ৩৩

উনিশ শতকের অধিকাংশ কবি বিধবাদের প্রতি গভীর সহানুভূতি প্রদর্শন করে কবিতা রচনা করেছিলেন। দৃষ্টান্তরূপে তাঁদের রচনার দু-চার ছত্র এখানে দেওয়া হল। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বিধবা রমণী' নামক কবিতায় বলেছেন—

'ভারতের পতিহীনা নারী বুঝি অইরে
না হলে এমন দশা নারী আর কইরে।
মলিন বসন খানি অঙ্গে আচ্ছাদন,
আহা দেখ অঙ্গে নাই অঙ্গের ভূষণ
রমণীর চির সাধ চিকুর বন্ধন,
হ্যাঁদে দেখ, সে মাথেও
বিধি বিড়ম্বন।"

ইত্যাদি।

নবীনচন্দ্র সেনের রচিত 'কে তুমি', 'বিধবা কামিনী' প্রভৃতি কবিতা আছে। তিনি আক্ষেপ করে বলেছেন—

'আর কত্তদিন আহা আর্য সুতগণ
ভুলিয়া থাকবে আহা মোহের ছলনে।'

(বিধবা কামিনী)

কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন-রচিত একাধিক কবিতায় বিধবাদের জীবনের জ্বালা ও যন্ত্রণা মূর্ত হয়ে উঠেছে। 'অপূর্ব নৈবেদ্য' কাব্যের একটি কবিতায় বাঙালি ঘরের বিধবা সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—

'এক মুষ্টি তুষানল, আন্ মুষ্টি আতপ তণ্ডুল
লইয়া সৃজিলা ধাতা বঙ্গগৃহে বিধবা অতুল।'

সেকালের অনেক প্রতিভাশালিনী নারী-কবিদের জীবনে বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছিল। মর্মস্পর্শী ভাষায় নিজেদের অনুভূতিকে কাব্যে প্রকাশ করে গেছেন গিরীন্দ্রমোহিনী

দাসী, কামিনী রায়, মানকুমারী বসু, প্রিয়ম্বদা দেবী প্রভৃতি বিখ্যাত কবিরা। মানকুমারী তাঁর 'প্রিয় প্রসঙ্গ' গ্রন্থে কাব্যিক-গদ্যে নিজের মনোবেদনাকে উজাড় করে দিয়েছেন।

পরবর্ত্তীকালে একাধিক ঔপন্যাসিক ও গল্পকার তাঁদের উপন্যাস ও গল্পে এই বিষয় অবলম্বন করে বিধবা রমণীর অন্তরের ব্যথা ও বেদনাকে রূপ দিয়েছেন। দরদী কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮) তাঁর বিবিধ উপন্যাসে ও গল্পে, বিধবা রমণীর বিচিত্র চিত্র ও চরিত্র তুলে ধরেছেন। 'পল্লীসমাজে'র রমা, এই জাতীয় একটি অবিস্মরণীয় চরিত্র। শরতোত্তর যুগের কথাশিল্পীদের গল্প ও উপন্যাসে বাল-বিধবার করুণ জীবনের চিত্র অনেক পাওয়া যায়। যেমন জ্যোতির্ময়ী দেবীর 'একাদশী' গল্পটির কথা বলা যেতে পারে। বাল-বিধবা শান্তশীলা বা শানুর জীবনের শোচনীয় পরিণাম, বাস্তবসত্যেরই প্রতিরূপ। সেকালে তিলে তিলে দগ্ধ হয়ে অনেক বালিকা মৃত্যু বরণ করেছে– সে তো শুধু গল্পকথা নয়, রূঢ় বাস্তব।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কৌলীন্য ও বহুবিবাহ প্রথা এবং বহুবিবাহ বিরোধী আন্দোলন

প্রাচীনকালে শুধুমাত্র ভারতে নয়, পৃথিবীর অন্যত্রও পুরুষ-জাতির মধ্যে বহুবিবাহের প্রচলন ছিল। বৈদিক যুগের সমাজে নারী জাতি যখন রীতিমতো সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত ছিল, তখনও এদেশে অনেক পুরুষ একাধিক বিবাহ (Polygamy) করতেন। তবে শাস্ত্রকাররা এ কথা প্রচার করতে দ্বিধা করেন নি যে, এক বিবাহই প্রশস্ত ও প্রশংসনীয়। রামচন্দ্রকে আমরা আদর্শ পুরুষ বলে গণ্য করি, তিনি সীতাকে বনে পাঠিয়ে, অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে গিয়ে, 'স্বর্ণসীতা' নির্মাণ করিয়ে সস্ত্রীক যজ্ঞ সম্পন্ন করেন; তথাপি পুনরায় দার পরিগ্রহ করেন নি।

বিবাহ সম্পর্কে স্মৃতিশাস্ত্র সমূহের বিধিবিধানগুলি অনুসন্ধান করলে দেখা যায় অধিকাংশ শাস্ত্রকার প্রধানত এক বিবাহের নির্দেশ দিয়েছেন। অবশ্য বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে তাঁরা পুনর্বিবাহের বিধানও দিয়েছেন। সেকালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের 'চতুরাশ্রম' পালন করতে হত। ব্রহ্মচর্যের পর, গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করতে হলে বিবাহ সংস্কার ছিল অপরিহার্য। এই বিষয়ে মনুর নির্দেশ—

গুরুণানুমতঃ স্নাত্বা সমাবৃত্তো যথাবিধি।
উদ্বহেত দ্বিজো ভার্য্যাং সবর্ণাং লক্ষণান্বিতাম্ ।। (মনু. ৩।৪)

অর্থাৎ দ্বিজ, গুরুর আজ্ঞানুসারে যথাবিধি স্নান ও সমাবর্তনের পর স্বজাতীয়া সুলক্ষণা ভার্যার পাণিগ্রহণ কববে। ইচ্ছামতো একাধিক বিবাহের বিধান শাস্ত্রকাররা দেন নি। এর থেকে বোঝা যায়, সমাজে যথেচ্ছাচার চলুক, এমন অভিপ্রায় তাঁদের ছিল না। পুরুষশাসিত সমাজ হলেও, সুস্থ সংযত জীবন যাপনের উপদেশই তাঁরা দিয়েছেন। তবে যদি কোনো ব্যক্তির অকালে স্ত্রী-বিয়োগ ঘটে, সে কীভাবে পুনরায় বিবাহ করবে তার উপদেশ দিয়েছেন এই ভাবে—

ভার্য্যায়ৈ পূর্ব্ব মারিণ্যৈ দত্ত্বাগ্নীনন্ত্যকর্ম্মাণি।
পুনর্দার ক্রিয়াং কুর্য্যাৎ পুনরাধানমেব চ ।।

(মনু. ৫।১৬৮)

অর্থাৎ পূর্বমৃতা স্ত্রীর যথাযথভাবে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করে, আবার দার গ্রহণ ও অগ্ন্যাধান করবে। এ ছাড়া বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে বিবাহিত স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে পুনর্বিবাহ করা চলত। যেমন স্ত্রী যদি সুরাপায়িনী, ব্যভিচারিণী, সর্বদা স্বামীর অভিপ্রায়ের বিপরীতগামিনী, চিররুগ্ণা, অতিশয় ক্রূর স্বভাবা ও অর্থনাশকারিণী হয়, তা হলে পুনর্বিবাহের অনুমোদন ছিল।

মদ্যাপাসাবুবৃত্তা চ প্রতিকূলা চ যা ভবেৎ।
ব্যধিতা বাধিবেত্তব্যা হিংস্রার্থঘ্নী চ সর্ব্বদা ॥ (মনু. ৯।৮০)

আরও কোনো কোনো ক্ষেত্রে যেমন— স্ত্রী যদি বন্ধ্যা, মৃতপুত্রা, কন্যামাত্র প্রসবিনী ও অপ্রিয়বাদিনী হতেন তা হলে, প্রথম বিবাহিতা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে আবার বিবাহ করা চলত। মনু বলেছেন—

বন্ধ্যাষ্টমেঽধিবেদ্যাব্দে দশমে তু মৃতপ্রজা।
একাদশে স্ত্রী জননী সদ্যস্ত্বপ্রিয়বাদিনী। (মনু. ৯।৮১)

জীমূতবাহন নামক স্মৃতিশাস্ত্রকার নারীদের প্রতি গভীর সহানুভূতি প্রদর্শন করে বিধান দিয়েছিলেন যে, যদি পতি অপর পত্নী গ্রহণ করেন তা হলে, পূর্বপত্নীকে 'আধিবেদনিক' নামক এক ধরণের স্ত্রীধনের ব্যবস্থা করে দিতে হবে, তবেই তিনি পুনরায় বিবাহ করতে পারবেন।

সেকালে অর্থাৎ বৈদিকযুগে কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে নারীরাও যে একাধিকবার বিবাহ করতে পারতেন, সে কথা আগে আলোচনা করা হয়েছে। স্বামী পরিত্যক্তা কোনো নারী অথবা বিধবা, যদি সে অতক্ষযোনি হত তা হলে বিবাহ করতে পারত। তখন তাকে বলা হত 'পুনর্ভূ'। বশিষ্ঠ নামক শাস্ত্রকার বলেছেন—

'যা চ ক্লীবং পতিতমুন্মত্তং বা ভর্ত্তারমুৎসৃজ্য অন্যং
পতিং বিন্দতে মৃতে বা সা পুনর্ভূর্ভবতি।'

অর্থাৎ ক্লীব, পতিত অথবা উন্মত্ত পতিকে ত্যাগ করে কিংবা পতির মৃত্যু ঘটলে যে স্ত্রীলোক অন্য ব্যক্তিকে বিবাহ করে, তাকে 'পুনর্ভূ' বলা হয়।[৩৪]

বৈচিত্র্যময় ভারতে পুরুষই শুধু একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করে নি, পুরাণ ও ইতিহসের নারীদের মধ্যে স্ত্রীলোকের একাধিক স্বামী গ্রহণের কয়েকটি মাত্র নিদর্শন আছে। তার মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হলেন পঞ্চপাণ্ডব-পত্নী দ্রৌপদী। ভারতে বহুভর্তৃকত্বের (Polyandry) একটি উজ্জ্বল নিদর্শন হয়ে আছে 'পঞ্চ প্রাতঃস্মরণীয়া কন্যা'র অন্যতমা এই দ্রৌপদী। 'পঞ্চকন্যা'দের মধ্যে অন্য চারজনও স্বামী ভিন্ন অন্যপুরুষের সংস্পর্শে এসেছিলেন তার স্পষ্ট উল্লেখ দেখা যায়। অহল্যা গৌতম-মুনির পত্নী হয়েও ইন্দ্রের সঙ্গ করেছিলেন। কুন্তী পাণ্ডুরাজার স্ত্রী হলেও, ধর্ম, পবন ও ইন্দ্রের বরে তিনটি পুত্র লাভ করেন এবং তাঁর সপত্নী মাদ্রী কুন্তীর পরামর্শে অশ্বিনীকুমারের স্মরণ নিয়ে নকুল ও সহদেবকে লাভ করেন। তারা ছিলেন বালির পত্নী, পরে তিনি সুগ্রীবের অঙ্কশায়িনী হন। আবার এই তারা যদি দেবগুরু বৃহস্পতির পত্নী হন, তা হলে তিনিও চন্দ্রের সংস্পর্শে এসে একটি পুত্রলাভ করেন। পরে ব্রহ্মা আবার তারাকে বৃহস্পতির হাতে প্রত্যর্পণ করেন। মন্দোদরী প্রথমে ছিলেন রাবণের পাটরানী, পরে হলেন বিভীষণ-পত্নী। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁর 'বহুবিবাহ' নামক দ্বিতীয় পুস্তকে আলোচনা প্রসঙ্গে মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত আরও দুটি বহুপতিবিবাহকারিণী নারীর উল্লেখ করেছেন, তাঁদের একজন হলেন জটিলা ও অন্যজন

ব্রাহ্মী। দুজনেই ছিলেন মুনি কন্যা। এঁরা দুজনে যথাক্রমে সাত ও দশপতি বিবাহ করেছিলেন। (মহাভারত, আদিপর্ব ১৯৬ অধ্যায়)।[৩৫] মহাভারতের যুগে নিঃসন্তান বিধবা নারীর সন্তান লাভের জন্য 'নিয়োগ প্রথা'ও প্রচলিত ছিল। শুধু পুরাণ, ইতিহাসে নয়, বাস্তব ক্ষেত্রেও ভারতের তিব্বত বা হিমালয়ের কোনো উপজাতির মধ্যে এখনও নারীর বহুপতি গ্রহণের রীতি প্রচলিত আছে। তথ্যটি সংগ্রহ করেছেন, এ একালেব সমাজতত্ত্বের গবেষকরা।[৩৬]

পুরুষদের বহুবিবাহপ্রথা প্রচলনের আনুমানিক কারণ

মনস্তাত্ত্বিকরা বলেন স্বভাবতই নারীদের মধ্যে আছে একনিষ্ঠ মনোভাব কিন্তু পুরুষের মনে আছে বহুর প্রতি আকর্ষণ। বিধি বিধান রচনা করে, মানুষকে সংযত করে তোলাই হল অধিকাংশ সভ্য সমাজের দস্তুর। এক সময়ে বহুপত্নীক পুরুষ, নিজেকে সমাজে উচ্চ-মর্যাদা সম্পন্ন ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি বলে মনে করতেন। তাই দেখা যায়, ভারতীয় বাদশাহ্, নবাব, রাজা ও তাঁদের দেখাদেখি অভিজাত পুরুষ, ধনী ব্যবসায়ী, জমিদার প্রভৃতি অনেকেই, বহুবিবাহ করতেন। দীর্ঘকাল ধরে এই রীতি চলেছিল। 'নারী মহল' বা 'হারেম' অর্থাৎ শুদ্ধান্তঃপুর রক্ষা করা ছিল তাঁদের মর্যাদার পরিচয়জ্ঞাপক চিহ্ন। সেখানে যাতে বাইরের লোকজন অবাধে প্রবেশ করতে না পারে, সেজন্য খুব কঠোর আইনকানুন থাকত।

.পরবর্তীকালে সাধারণ মানুষও বহু বিবাহ করতে উৎসুক হয়ে উঠল। কখনো তা বংশ-রক্ষার তাগিদে অথবা বংশবৃদ্ধির কারণে কিংবা অন্য নানা কারণে। তার মধ্যে একটি কারণ ছিল কৃষি-কর্মের প্রয়োজন। প্রাচীন ও মধ্যযুগে এদেশের অধিকাংশ মানুষ ছিল কৃষিজীবী। একজন মাত্র স্ত্রীর পক্ষে ঘর-গৃহস্থালীর সকল রকম কাজকর্ম সামাল দিয়ে স্বামীকে কৃষিকর্মে সাহায্য করা সম্ভব হত না। সেই কারণে যাদের বৃহৎ পরিবার পালনের সামর্থ্য থাকত, তারা অনেকেই একাধিক বিবাহ করতেন। যতদিন পর্যন্ত না আধুনিক 'হিন্দু বিবাহ বিল' পাস হয়েছে, ততদিন অল্পবিস্তর বহুবিবাহের রীতি অনুসৃত হয়েছে। এখনও মুসলিম সমাজে ইসলাম ধর্মের বিধান অনুযায়ী, একাধিক পত্নী গ্রহণ বৈধ ব্যাপার।

কৌলীন্য প্রথার বৈশিষ্ট্য

এদেশে 'কৌলীন্য প্রথা' প্রচলনের জন্যই বিশেষ করে বহুবিবাহের বিষময় ফল ফলেছিল। প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী সেন বংশীয় রাজা বিজয় সেনের পুত্র রাজা বল্লাল সেন (আনুমানিক ১১৫৮-৭৯ খ্রী.) ছিলেন এই 'কৌলীন্য প্রথা'র প্রবর্তক। ইনি একজন শাস্ত্রজ্ঞ ও পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি গুরু অনিরুদ্ধের কাছে বেদ স্মৃতি পুরাণ ইত্যাদি পাঠ করেন এবং নানা যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। একাধিক গ্রন্থও রচনা করেন কিন্তু বিশেষ করে "বঙ্গীয় কুলজী গ্রন্থে কৌলীন্য প্রথার উৎপত্তির সহিত বল্লাল সেনের নাম অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত"।[৩৭]

অনুমান করা যেতে পারে যে, পিতার মৃত্যুর পর তিনি গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ ক'রে উৎসাহভরে সমাজ সংস্কারের কাজে মন দিয়েছিলেন। শুভ উদ্দেশ্যেই হয়তো তিনি সমাজে

কৌলীন্য প্রথা প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন। লোকে নানা গুণের চর্চা ক'রে সংস্কৃতি-সম্পন্ন হয়ে উঠুক ও তাদের মানসিক উৎকর্ষ সাধিত হোক এবং তার দ্বারা দেশের ও দশের উন্নতি হবে— হয়তো এই ছিল তাঁর মনোগত অভিপ্রায়। তাই তিনি ঘোষণা করলেন যে, যে ব্যক্তি বিশেষ নয়টি গুণের অধিকারী হতে পারবেন, তাঁকে তিনি 'কুলীন' অর্থাৎ সমাজের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি বলে বিশেষ স্বীকৃতি দেবেন। এইভাবে সেই ব্যক্তি রাজানুগ্রহ লাভেও ধন্য হবেন। সেই বিশেষ নয়টি গুণ হল—

'আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থ দর্শনম্।
নিষ্ঠা শান্তি স্তপো দানং নবধাকুল লক্ষণম্ ।।'

অর্থাৎ আচার-আচরণ, বিনয় ইত্যাদি শিষ্টাচারসম্পন্ন, বিদ্যাঅর্জন, প্রতিষ্ঠা লাভ, তীর্থাদিদর্শন ও ভ্রমণ, নিষ্ঠাবান, শান্তিপ্রিয়, তপস্যা ও দয়া-দাক্ষিণ্য ইত্যাদি গুণের অধিকারী হতে হত তাঁকে। প্রথম দিকে ব্যক্তিগত গুণের উপর ভিত্তি করেই 'কুলীন' নির্বাচন করা হত। পরে দেখা গেল বংশানুক্রমিক ভাবে কুলীনের মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে। যে ভাবে প্রথমে বৃত্তি অনুযায়ী 'বর্ণ বিভাগ' করা হত অথচ পরে বংশানুক্রমিকে পরিণত হয়ে, সমাজের ক্ষতি করেছে, ঠিক সেইভাবে এই জন্মকৌলীন্যের রীতিও অনিষ্টকর হয়ে দেখা দিল। 'কোনো গুণ নাহি যার কপালে আগুন' এমন ব্যক্তি নিজেকে 'কুলীন' বলে আত্মশ্লাঘা অনুভব করেছে। তার ফলে এই রীতি বিবাহ-ব্যাপারে এক বিরাট সমস্যার সৃষ্টি করেছিল। যদিও পঞ্চদশ শতাব্দীতে দেবীবর ঘটক কুলীনদের দোষের বিচার করে কিছু তথাকথিত কুলীনকে, কৌলীন্যচ্যুত করলেন এবং অল্প দোষ যাদের, তাদের ছত্রিশটি সম্প্রদায় বা 'মেল'-এ ভাগ করলেন। কিন্তু সেই থেকেই বিবাহ-ব্যাপারে কঠোর নিয়মের সম্মুখীন হতে হল দেশীয় মানুষদের। প্রত্যেক কুলীনকে তাদের নিজ নিজ মেলের মধ্যে কন্যার বিবাহ দিতে হত। কুলীন পুত্র, অকুলীন কন্যাকে গ্রহণ করতে পারতেন, কিন্তু কুলীন কন্যার বিবাহ, কোনো অকুলীন পাত্রের সঙ্গে হতে পারত না, তাতে কন্যার পিতার কৌলীন্য ভঙ্গ হত। অথচ উপযুক্ত কুলীন পাত্রের অভাবে বহু কুলীন কন্যাকে অনূঢ়া থাকতে হত। কিংবা শুধুমাত্র 'আইবুড়ো' নাম খণ্ডানোর জন্য অপাত্রে, এমন-কি গঙ্গাযাত্রী মুমূর্ষু কুলীনের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হত। সমাজে 'এক ঘরে' হবার ভয়ে অনেকে এমন কাজ করতেন। সেকালে কিছু কুলীনের পেশা ছিল বিবাহ। এক-একজন কুলীন পঞ্চাশ, ষাট কিংবা তারও বেশি বিবাহ করতেন, কারণ তার ফলে বেশ-কিছু অর্থ-প্রাপ্তি ঘটত এবং গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব থাকত না। ঐতিহাসিকরা বিচিত্র তথ্য সংগ্রহ করে দেখিয়েছেন যে—

"এরূপ অনেক ঘটনা শোনা যায় যে মুমূর্ষু কুলীনের সঙ্গে দিদি, পিসি, ভাইঝি প্রভৃতি সম্পর্কের একই পরিবারস্থ ১০।১২টি কন্যার একসঙ্গে বিবাহ হইয়াছে এবং ১০ হইতে ৫০ বা তদূর্ধ্ব বয়সের এই-সকল স্ত্রী কয়েকদিনের মধ্যেই একসঙ্গে বিধবা হইয়াছে।" [৩৮]

কৌলীন্য প্রথা-পরোক্ষ ভাবে 'সতীদাহ' বৃদ্ধির কারণ

সেকালে অনেক পুরুষ নিজের স্ত্রীকে সম্পত্তি বিশেষ অথবা ভোগ-বিলাসের পণ্যরূপে গণ্য করতেন। স্বামীর মৃত্যুর পর যে-সব নারীদের জোর করে 'সতী' করে পুড়িয়ে মারা হত, অনুসন্ধান করে দেখা গেছে যে— "অনেক সন্দিগ্ধ বৃদ্ধ স্বামী তাদের স্ত্রীর কাছ থেকে 'সতী' হবার প্রতিশ্রুতি আদায় করত। মৃত্যুর পরেও স্ত্রীর ওপর দখলী স্বত্ব কায়েমী রাখতে অনেক বৃদ্ধ স্বামী তাদের যুবতী স্ত্রীকে সতী হবার নির্দেশ দিয়ে যেত, অথবা স্ত্রী যাতে সতী হয়, উত্তরাধিকারীদের সেদিকে লক্ষ্য রাখতে বলত।" [৩৯] এ ছাড়া অনেক কুলীনের বউ স্বেচ্ছায় 'সতী' হয়ে আত্মহত্যা করতেন কারণ পরের গলগ্রহ হয়ে জীবনব্যাপী জ্বলে-পুড়ে মরার চেয়ে আগুনে ঝাঁপ দেওয়াই শ্রেয় বলে তাঁরা মনে করতেন। কাজেই কৌলীন্য ও বহুবিবাহ প্রথা যে পরোক্ষভাবে সতীদাহ বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

কৌলীন্যপ্রথা, বহুবিবাহ ও পতিতাবৃত্তি

কৌলীন্য ও বহুবিবাহের মতো কুপ্রথা সমাজে ও পরিবারে যে কী পরিমাণে অনর্থের সৃষ্টি করেছিল তার আরও পরিচয় তুলে ধরা যায়। সম্ভ্রান্ত কুলীন ব্রাহ্মণ ঘরের মেয়ে ও বউরা শেষ পর্যন্ত পতিতাবৃত্তি অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছেন প্রাণের দায়ে, তার অজস্র পরিচয় জানায় যায়। কলিকাতা নিবাসী এক পতিতা নিজের নাম গোপন করে 'অমুকী' নাম দিয়ে 'বিদ্যাদর্শন' পত্রিকায় এক খোলা চিঠি প্রকাশ করেছিলেন— ১৭৬৪ শকে। এর থেকে সাক্ষাৎ প্রমাণ পাওয়া যায় যে, সমাজে তখন কী পরিমাণে নৈতিক ভাঙন দেখা দিয়েছিল। ইনি ছিলেন শান্তিপুরের এক কুলীন কন্যা। নিজের জীবনের করুণ কাহিনী তিনি অন্যাকে দিয়ে লিখিয়ে জনসমক্ষে প্রকাশ করান। পত্রিকার সম্পাদকের কাছে বিনীতভাবে তিনি নিবেদন করেছেন যে, "যদিও আমার বিদ্যা ও লিপি নৈপুণ্য নাই, কেননা আমি বঙ্গদেশের স্ত্রী, কিন্তু আমার অভিপ্রায় সকল কথিত পণ্ডিত মহাশয় দ্বারা লিপিবদ্ধ করিয়া প্রেরণ করিতেছি, অনুগ্রহপূর্বক প্রকাশ করিতে কৃপণ হইবেন না।" এরপর তিনি জানিয়েছেন যে, যখন তাঁর বয়স তিন বছরেরও কম, সেই সময় পিতার জ্যেষ্ঠতাতের তুল্য বয়স্ক এক পাত্রের সঙ্গে তাঁদের পাঁচ বোনের (দুটি মাসতুতো ও তাঁরা নিজেরা ছিলেন তিন বোন) বিবাহ হয়। তাঁর যখন ষোলো বছর বয়স তখন সেই লোকটির সঙ্গে পুনরায় সাক্ষাৎ ঘটে এবং তার কুৎসিত চেহারা ও আচরণে তাঁর মন চরম বিতৃষ্ণায় ভরে যায়। তারপরে তিনি চেষ্টা করেও সৎপথে থাকতে পারেন নি। খুব স্পষ্ট ভাষাতেই তিনি তা ব্যক্ত করেছেন— "যদিও আমার নিতান্ত চেষ্টা ছিল, সৎপথে রহিব, এবং কুল ধর্ম রক্ষা করিব কিন্তু অবশেষে জ্বালাতন হইয়া ব্যভিচারের পথকে অবলম্বন করিয়াছি, এবং স্বাধীন মনে কলিকাতায় আগমন পূর্বক মেছোবাজার বাসিনী হইয়াছি।" শুধু এই একজনের অধঃপতনের কাহিনী নয়, সবশেষে আমরা জানতে পারি যে, তাঁর কনিষ্ঠা ভগিনীসহ ও তার বাল্যকালের 'বিংশতি জন সঙ্গিনীর' এই একই দশা হয়েছিল। এইভাবে আমরা সেকালের ক্ষয়িষ্ণু সমাজের একটি সত্য পরিচয় জানতে পারি। [৪০]

বহুপত্নীক কুলীনরা বিবাহিত স্ত্রীদের ভরণ-পোষণের কোনো ভার নিতেন না। বহু কুলীন কন্যার নামে মাত্র বিবাহ হত অথচ তাঁরা জীবনে কোনো দিন ঘর-বসত করার সুযোগ পেতেন না। বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের 'ইন্দির ঠাকরুণের' মতো প্রকৃত এক কুলীন-কন্যা নিস্তারিণী দেবী, তাঁর 'সেকেলে কথা' নামক আত্মকথায় তার একটি বাস্তব ও নিখুঁত চিত্র দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, "কুলীন ঘরের সবাই মামার ঘরেই মানুষ। বাপের মুখ তখন প্রায় দেখা যাইত না। মামার বাড়ীই আমাদের বাড়ী।"[৪১] তিনি জানিয়েছেন, তাঁর অতিবৃদ্ধ পিতামহ ১০৮টি বিবাহ করেন ও পিতামহ মাত্র ৫৪টি। তখনকার দিনে কুলীন জামাইদের নিমন্ত্রণ করে আনতে হত না। তারা নিজেদের গরজেই শ্বশুরবাড়ি আসত। মাথায় পুটুলি, হাতে লাঠি, কাঁধে গামছা ফেলে ধুলা পায়ে এসে, নানা রকম পাওনা আদায় করত— পা ধোয়ানি, নমস্কারি, ভোজন দক্ষিণা ইত্যাদি। নিজেরাই হিসাব রাখতে পারত না, কতগুলি বিবাহ করেছে। তাই খেরো বাঁধানো খাতায় লেখা থাকত ক'টি বিবাহ, স্ত্রীদের পিতৃ পরিচয় ও ঠিকানা। পালাক্রমে এক-এক শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হত। এঁদের সম্পর্কে এক ঐতিহাসিক কৌতুকজনক তথ্য পরিবেশন করেছেন, "তখনকার দিনে গল্প শুনিতাম, কুলীন ব্রাহ্মণ স্ত্রীর পিত্রালয় কোনো গ্রামে গিয়া শ্বশুর বাড়ি চিনিতে পারিলেন না। কিন্তু খাতায় শ্বশুরের নাম লেখা ছিল, তাঁহার নাম করিয়া নদীর ঘাটে একটি মহিলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মা অমুকের বাড়ীটা কোন্ দিকে?' পরে জানিতে পারিলেন ঐ মহিলাই তাঁহার স্ত্রী। এই ঘটনা সত্য কিনা জানি না, কিন্তু অনুরূপ ঘটনা আমি নিজে বাল্যকালে প্রত্যক্ষ করিয়াছি।"[৪২]

সমাজের দুশ্চরিত্র ব্যক্তিরা অনেক সময় জোর করে কুলকন্যাদের সতীত্ব নাশ করত। সেই ভয়ে অনেক অনেক সুন্দরী কুলীন কন্যাদের— মা, বাবা ও আত্মীয়স্বজনরা বিষ খাইয়ে তাদের হত্যা করতেন। এমনি একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে নারী-বিদ্বেষী দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৪-৯৮ খ্রী.) পরিণত হলেন 'অবলা বান্ধব' দ্বারকানাথে। নিজেই তিনি তাঁর 'অবলাবান্ধব' পত্রিকায় ঘটনাটির বিবরণ দিয়েছিলেন— "এ দেশীয় কুলকন্যাগণ জীবনে যে বিষম দুর্গতি ভোগ করিয়া থাকেন, তাহা যাঁহাদিগের চক্ষু থাকিতে অন্ধ, তাঁহারা ইহা দেখিতে পান না। যদি একটি হৃদয় বিদারক ঘটনা আমাদিগের চক্ষু প্রস্ফুটিত না করিত, হয়তো আমরাও আজীবন অন্ধই থাকিতাম। একটি পরমা সুন্দরী যুবতী কুলীন কন্যাকে তাঁহার আত্মীয়েরা বিষ প্রয়োগ করিয়া বধ করেন। তখন আমাদিগের বয়ঃক্রম সপ্তদশ বর্ষ। লোকপরম্পরায় এই ঘটনা আমাদিগের শ্রুতিগোচর হইল। এইরূপে যাহার অপমৃত্যু ঘটিল, আমরা তাহাকে জানিতাম, সুতরাং আমাদিগের হৃদয়ে একটি দারুণ আঘাত লাগিল। আমাদিগের জনৈক সমবয়স্ক ব্যক্তির মুখে শুনিতে পাইলাম এরূপ ঘটনা বিরল নহে, প্রায় প্রতিবর্ষেই ইহা ঘটিয়া থাকে। অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া জানিলাম তাঁহার কথা সত্য, তৎপূর্বগত দশ বৎসরে একটি গ্রাম হইতে ৩২।৩৩টি স্ত্রীলোকের এইরূপে মৃত্যু হইয়াছে। মানুষের হৃদয় এককালে পাষাণ না হইলে, এ অবস্থায় দ্রব না হইয়া থাকিতে পারে না।"[৪৩]

কৌলীন্য ও বহুবিবাহ প্রথা নিবারণ আন্দোলন

এই হৃদয়হীন প্রথা দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত থাকলেও উনিশ শতকের মধ্যভাগে এই প্রথার বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রবল আন্দোলন গড়ে উঠল। আগে থেকে অনেকেই এই কুপ্রথার তীব্র নিন্দা করেছিলেন। সমসাময়িক কালের পত্রিকায় প্রকাশিত কিছু প্রবন্ধ ও কয়েকটি পুস্তিকায় তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

খ্রীস্টান মিশনারিরা এই প্রথার কঠোর সমালোচনা করেন— শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায়। রামমোহন রায় -প্রতিষ্ঠিত 'আত্মীয় সভা'র সদস্যরা বহুবিবাহের বিরুদ্ধে আলাপ-আলোচনা করেন। প্রগতিবাদী 'নব্য বঙ্গীয়রা'ও 'জ্ঞানান্বেষণ' ও 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' পত্রিকায় এই রীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। প্রথম দিকে এইভাবে জন- সভা ও পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে জনমত গড়ে উঠছিল।[৪৪]

প্রতিবাদ যখন সক্রিয় আন্দোলনের রূপ নিল, তখন সমাজ-সংস্কারকরা আইন করে বহুবিবাহ বন্ধ করে দিতে চাইলেন। তাঁদের প্রধান অভিযোগ ছিল বহুবিবাহ সমাজের নৈতিক আবহাওয়াকে দূষিত করে তুলেছে। বিদ্যাসাগর দেখেছিলেন যে, সামাজিক কুপ্রথাগুলির একটির সঙ্গে আর–একটির যোগ রয়েছে। একে একে সেগুলির উচ্ছেদ সাধন করা প্রয়োজন। এই সব প্রচলিত কুপ্রথার দ্বারা নারীরাই নিগৃহীত হয়েছিলেন বিশেষভাবে। 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' পুস্তিকায় শুরুতে তিনি বলেছেন, "স্ত্রীজাতি অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও সামাজিক নিয়মদোষে পুরুষ জাতির নিতান্ত অধীন। এই দুর্বলতা ও অধীনতা নিবন্ধন, তাঁহারা পুরুষ জাতির নিকট অবনত ও অপদস্থ হইয়া কালহরণ করিতেছেন। প্রভুতাপন্ন প্রবল পুরুষজাতি, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া, অত্যাচার ও অন্যায়াচরণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা নিতান্ত নিরুপায় হইয়া সেই সমস্ত সহ্য করিয়া জীবন যাত্রা সমাধান করেন।" জনসাধারণের অবগতির জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় ঐ গ্রন্থের 'দ্বিতীয় প্রস্তাব' প্রকাশ করেন। সেখানে তিনি খুব স্পষ্ট ভাষায় কুলীন কন্যাদের জীবনের সমস্যাটিকে তুলে ধরেছেন— "কুলীন ভগিনী এবং কুলীন ভাগিনেয়ীদের বড় দুর্গতি। তাহাদিগকে পিত্রালয়ে অথবা মাতুলালয়ে থাকিয়া, পাচিকা ও পরিচারিকা উভয়ের কর্ম নির্বাহ করিতে হয়। প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গ, রাত্রিতে নিদ্রাগমন, এ উভয়ের অন্তর্বর্তী দীর্ঘকাল, উৎকট পরিশ্রম সহকারে সংসারের সমস্ত কার্য নির্বাহ করিয়াও তাঁহারা সুশীলা ভ্রাতৃভার্য্যাদিগের নিকট প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারেন না। তাঁহারা সর্বদাই তাহাদের উপর খড়্গ হস্ত। তাঁহাদের অশ্রুপাতের বিশ্রাম নাই বলিলে বোধ হয়, অত্যুক্তি দোষে দূষিত হইতে হয় না। উত্তর সাধকের সংযোগ ঘটিলে, অনেকানেক বয়স্থা কুলীন মহিলা ও কুলীন দুহিতা, যন্ত্রণাময় পিত্রালয় ও মাতুলালয় পরিত্যাগ করিয়া, বারাঙ্গনাবৃত্তি অবলম্বন করেন।"

যে দরদীমন নিয়ে বিদ্যাসাগর এই কথাগুলি লিখেছেন, তাঁর এই বিবরণ সম্পূর্ণ বাস্তবানুগ। তিনি নিজে হুগলীজেলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে বহুবিবাহকারী কুলীনদের একটি তালিকা প্রস্তুত করেন।

এই তালিকাটি বিচার করলে দেখা যায়— "৫০ জন ব্যক্তি গড়পরতা ৫০ বৎসর বয়সের মধ্যেই ১৪৬৮টি বিবাহ করিয়াছিলেন।" [৪৫]

বিদ্যাসাগর নেতৃত্ব গ্রহণ করায় এই আন্দোলন বেশ জোরদার হয়ে উঠেছিল। তাঁর পুস্তিকা প্রচারের মধ্য দিয়ে তিনি দেখিয়েছিলেন যে, বহুবিবাহ অশাস্ত্রীয়। ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দের ১ ফেব্রুয়ারি বিদ্যাসাগর একটি বহুবিবাহরদকারী আবেদনপত্র শাসনকর্তাদের কাছে প্রেরণ করেন।

এই আন্দোলনের ক্ষেত্রে 'সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভা'র একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। তাঁরাও এ বিষয়ে আইন করবার জন্য সরকারকে অনুরোধ করেন। ক্রমে ক্রমে আন্দোলনটি ঘনীভূত হয়ে শুধু কলকাতায় নয়, সুদূর পূর্ব বাংলাতেও ছড়িয়ে পড়েছিল। সেখানে নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়। এই আন্দোলন প্রচারে রাসবিহারীর সহায় ছিল দুটি পত্রিকা 'ঢাকা প্রকাশ' ও 'হিন্দু হিতৈষিণী'। এই বিষয় সম্পর্কে ইনি কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন, এ ছাড়া নানাস্থানে বক্তৃতা দিতেন ও বহু ছড়া এবং গান রচনা করেছিলেন। অথচ আশ্চর্য এই যে এই রাসবিহারী ছিলেন ইংরেজী অনভিজ্ঞ একজন প্রাচীন সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ। তাঁর রচনাগুলির থেকে একটি লৌকিক গীতি উদাহরণস্বরূপ দেওয়া হল--

"কেম্বলকে মা মহারাণী কর রণে নিয়োজন।
(রাজা) বল্লালেরি চেলা দলে করিতে দমন।
কাজ নাই সিক সিফাইগণ, চাইনা গোলা বরিষণ,
(একটু) আইন অসি খরষাণ করগো অর্পণ
বিদ্যাসাগর সেনাপতি
(মোদের) রাসবিহারী হবে রথী,
মোরা কুলীন যুবতী সেনা হব যে এখন।" [৪৬]

বলাই বাহুল্য সে সময়ে এদেশে লেফেটেনান্ট গভর্নর ছিলেন— ক্যাম্বেল, তাই তিনি যেন মহারানী ভিক্টোরিয়াকে বহুবিবাহ রহিত আইন বিধিবদ্ধ করার জন্য অনুরোধ করেন, এই মর্মে গীতটি রচিত হয়েছিল।

এত আন্দোলন সত্ত্বেও কিন্তু আইন করে বহুবিবাহ রদ করা হয় নি। তার অন্যতম কারণ হিসাবে অনেকে বলেন, সিপাহী বিদ্রোহের (১৮৫৮) পরে ইংরেজরা, ভারতীয়দের সামাজিক ও ধর্মীয় কোনো ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে সাহস পায় নি। বিশেষ করে ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে রানী ভিক্টোরিয়া যে ঘোষণাপত্র বা 'কুইনস্ প্রক্লামেশন' প্রচার করেন তাতে স্পষ্ট ভাষায় লেখা ছিল সে কথা। সরকারি সমর্থন তেমনভাবে পাওয়া যায় নি বলেই হয়তো, বহুবিবাহ বিরোধী আইনটি সে সময়ে বলবৎ করা যায় নি।

উচ্চশিক্ষার প্রসারে জনসাধারণের রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটলে, স্বাভাবিক ভাবে ক্রমশ বহুবিবাহ করার উৎসাহ স্তিমিত হয়ে এল। অনেকে বলেন, অর্থনৈতিক কারণই প্রধান। আবার

অনেকের ধারণা পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষা গ্রহণের ফলে জনমানসের রুচি ও সংস্কৃতির পরিবর্তনই আসল কারণ। যে-কোনো কারণের দরুনই হোক-না-কেন, বিংশ শতাব্দীর প্রথমেই আমরা দেখতে পাই বহুবিবাহ হ্রাস পেয়েছে। পরে 'হিন্দু বিবাহ আইন' (১৯৫৫, ১৮ মে)-এর বলে, সকলে জানল যে এক পত্নী বর্তমান থাকতে, কোনো ব্যক্তি যদি অন্য স্ত্রী গ্রহণ করেন, তা হলে আইনের চোখে তা অসিদ্ধ এবং রীতিমতো অপরাধ বলে গণ্য হবে।

সাহিত্যে 'কৌলীন্য প্রথা' প্রসঙ্গ

বঙ্গসাহিত্যের ভাণ্ডারে অনুসন্ধান করলে 'কৌলীন্য প্রথা' রূপ কলঙ্ক-কাহিনীর নানা পরিচয় পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবি রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র তাঁর 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের নারীগণের পতিনিন্দায় বেশ একটি কৌতুক রসের জোগান দিয়েছেন এই কৌলীন্য প্রথা সম্পর্কে। সেটি হল—

'আর রামা বলে আমি কুলীনের মেয়ে।
যৌবন বহিয়া গেল বর চেয়ে চেয়ে।
যদি বা হইল বিয়া কতদিন বই।
বয়স বুঝিলে তার বড়দিদি হই।"

কুলীন জামাতাদের অত্যাচারের বিবরণ পাওয়া যায় রামনারায়ণ তর্করত্ন-রচিত 'কুলীন কুলসর্বস্ব' নাটকে (১৮৫৪ খ্রী.) এবং টেকচাঁদ ঠাকুর বা প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮ খ্রী.) নামক সামাজিক নকশায়। সমাজ-সংস্কারের মনোভাব নিয়ে বারাসাতের জমিদার কালীচন্দ্র চৌধুরী একটি প্রতিযোগিতা আহ্বান করেন। তাঁর শর্ত ছিল এমন নাটক লিখতে হবে যার মধ্যে কৌলীন্য প্রথার দোষ প্রকট হয়ে উঠবে। উদ্দেশ্যমূলক এই নাটক লিখে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক রাম নারায়ণ তর্করত্ন প্রতিযোগিতায় জয়ী হন এবং ৫০ টাকা পুরস্কার লাভ করেন। সেই কারণে এই নাটকে তিনি অকালকুষ্মাণ্ড যত কুলীন জামাতাদের হৃদয়হীন অনাচার দেখিয়ে রুচিশীল ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। বাস্তবধর্মী চরিত্রগুলি বেশ জীবন্ত হয়ে উঠেছে। যেমন ফুলকুমারী তার বঞ্চিত জীবনের বেদনার কথা ব্যক্ত করেছে বয়স্কা প্রতিবেশিনী যশোদার কাছে। উত্তরে যশোদা সহানুভূতি দেখিয়ে বলেছেন— "নাত্‌নি। আর বলিসনে, বুক ফেটে যায়। (সজল নয়নে) হাঁরে বল্লাল, তুই কাল হয়ে এসেছিলি ? কে তোকে কুলের ছিষ্টি কত্যে বলেছিল। কুল তো নয়, কুলের আঁটি— বড় কঠিন। যার কুল আছে, তার কি দয়া নেই ? ধর্ম নেই ? কম্ম নেই ?" ইত্যাদি। এই ভাবে কৃত্রিম কৌলীন্য প্রথার বিকটরূপকে এখানে ফুটিয়ে তুলেছিলেন তিনি। বহুবিবাহের ফলে সপত্নীদের মধ্যে যে ধরণের বাদ বিসম্বাদ লেগে থাকত তা নিয়ে রামনারায়ণ তাঁর একটি নাটক লেখেন, সেটির নাম 'নব নাটক' (১৮৬৬)। এই নাটকটির জন্যও তিনি ঠাকুরবাড়ি থেকে পুরস্কার লাভ করেন। গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে দুই শত টাকা পারিতোষিক প্রদান করেন। দীনবন্ধু মিত্রও তাঁর

একাধিক প্রহসন রচনা ক'রে কৌলীন্য প্রথা ও বহুবিবাহের কুফল প্রদর্শন করেছেন। 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' (১৮৬৬) প্রহসনে বিবাহ বাতিকগ্রস্ত বৃদ্ধকে নিয়ে কৌতুককর কাহিনী রচনা করেছেন এবং 'জামাইবারিক' (১৮৭২) প্রহসনের মধ্যে পদ্মলোচনের দুই পত্নী বগী ও বিন্দি অর্থাৎ বগলা ও বিন্দুবাসিনীর ঝগড়ার মধ্যে দিয়েও কৌতুক রস পরিবেশন করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্প ছাড়া কবিতার মধ্যেও নারীজীবনের করুণ ও বেদনাময় দিকটি চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। যেমন তাঁর 'পলাতকা' কাব্যের 'নিষ্কৃতি' নামক কবিতায় তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে কৌলীন্যের যূপকাষ্ঠে নিরীহ কন্যাকে বলি দিতে চাইছেন তার পিতা—

"মা কেঁদে কয়, 'মঞ্জুলী মোর ঐ তো কচি মেয়ে,
ওরি সঙ্গে বিয়ে দেবে ?—বয়সে ওর চেয়ে
পাঁচগুনো সে বড়ো;
তাকে দেখে বাছা আমার ভয়েই জড়সড়।
এমন বিয়ে ঘটতে দেবো নাকো।"

কন্যার পিতা এ কথার প্রতিবাদ করেছেন—

"বাপ বললে, "কান্না তোমার রাখো!
পঞ্চাননকে পাওয়া গেছে অনেক দিনের খোঁজে,
জান না কি মস্ত কুলীন ও যে।
সমাজে তো উঠতে হবে সেটা কি কেউ ভাব।
ওকে ছাড়লে পাত্র কোথায় পাব।"

উনিশ শতকে আরও অনেক সমাজ সচেতন কবি ও সাহিত্যিকরা কুলীন কন্যাদের ব্যর্থ ও বেদনাময় জীবনের সত্যচিত্র ফুটিয়ে তুলেছিলেন তাঁদের রচনায়। যেমন সেকালের এক বিশিষ্ট কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন লিখেছিলেন—

"লইয়া মাকাল-ফল লবণাক্ত জলধির নীর
সৃজিলা অপূর্ব দেহ হতভাগ্য কুলীন পত্নীর।"
("অপূর্ব নৈবেদ্য")

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বাল্যবিবাহ প্রথা ও বাল্যবিবাহবিরোধী আন্দোলন

স্মৃতিশাস্ত্রের নির্দেশ অনুযায়ী এদেশে দশবিধ 'সংস্কার' প্রচলিত ছিল এবং তার মধ্যে বিবাহ সংস্কারকে প্রায় অপরিহার্য বলে মনে করা হত। শাস্ত্রকাররা বাল্যবিবাহ শুধু যে সমর্থন করতেন তা-ই নয়, গৌরীদান ব্যাপারটিকে একটি বিশেষ পুণ্যকর্ম বলে ঘোষণা করেছিলেন। কন্যা আট বছর বয়সে পদার্পণ করলে তাকে 'গৌরী' নামে অভিহিত করা হয়— 'অষ্টম্ বর্ষে গৌরী ভবেৎ'। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যেত আট বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করার মতো ধৈর্য থাকত না অনেক কন্যার অভিভাবকের। নিতান্ত কচি বয়সের শিশু কন্যার সঙ্গে অল্পবয়সী বালকের বিবাহ সংঘটিত হত যত্রতত্র। কারণ স্মার্তপণ্ডিতদের নির্দেশকে, অবশ্য পালনীয় বলে মনে করতেন এদেশের মানুষ। এ ছাড়া অন্য কারণ হিসাবে বলা যায়, সেকালের মানুষের জীবনে তেমন কোনো জটিলতা বা সমস্যা ছিল না। তাই তাঁরা বৈচিত্র্যহীন জীবনে অল্পবয়সে ছেলেমেয়েব বিবাহ দিয়ে আনন্দোৎসবের অনুষ্ঠান করতে চাইতেন। এ ছাড়া সমসাময়িক যুগের ইতিহাস অনুসন্ধান করলে আরও গূঢ়তর কারণ পাওয়া যায়। তুর্কীদের আগমন ও নবাবী আমলে এদেশের মেয়েদেব জীবনে নিরাপত্তার অভাব দেশীয় মানুষের কাছে বিরাট একটি সমস্যা হয়ে উঠেছিল। এক ঐতিহাসিক বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন—

"গ্রীষ্ম প্রধান দেশ সমূহে শরীর শীঘ্রই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এজন্য এদেশে বালিকা বিবাহের এত আধিক্য। তদুপবি ভারতীয়েরা পুনঃ পুনঃ তুর্কী আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠে। তুর্কীরা ভারতীয়দের কন্যা লুণ্ঠন বা আহরণ করত (বাঙ্গলার পূর্ববঙ্গ গীতিকা এবং হিন্দীতে কবিতা সমূহ দ্রষ্টব্য)। গ্রামে গ্রামে তুরুক সওয়ার এজন্য ঘুরত। তখন ভারতীয় হিন্দুরা বাধ্য হয়েই স্ত্রীলোকদের গৃহমধ্যে অবরোধ করে রাখতে লাগল। বাল্য বিবাহ দিয়ে তাদের অধিকারী নিযুক্ত করতে থাকল, আর বিবাহিত স্ত্রীলোকের মুখে উল্কির চিহ্নছাপ দিয়ে কুশ্রী করে রাখতে লাগল।"[৪৭]

প্রধানত এই কারণে সেকালে আমাদের দেশে কন্যাকে বাগ্‌দত্তা করে রাখা হত এবং বাল্য বিবাহের প্রভূত প্রচলন দেখা যেত। নারীর জীবনে শুচিতা বা সতীত্ব রক্ষাই ছিল প্রধান ধর্ম। কিন্তু সেই ব্যাপারে বিঘ্ন দেখা যেত কীভাবে তার আলোচনা করে দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁর 'বৃহৎবঙ্গ' নামক গ্রন্থে বলেছেন— "মুসলমান রাজা এবং শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ 'সিন্ধুকী' (গুপ্তচর) লাগাইয়া ক্রমাগত সুন্দরী হিন্দু ললনাগণকে অপহরণ করিয়াছে।"[৪৮]

উনিশ শতকের সমাজ-সংস্কারকেরা যখন নারীজীবনের দুঃখ-দুর্দশা মোচন করার জন্য এগিয়ে এলেন, তখন তাঁরা দেখলেন অন্যান্য কুপ্রথাগুলির জন্য বাল্যবিবাহও বেশ-কিছুটা দায়ী। তখন

থেকে বাল্যবিবাহ নিবারণের জন্য আন্দোলন গড়ে উঠতে লাগল। রাজা রামমোহন রায়ের এ বিষয়ে স্পষ্ট কোনো অভিমত জানা না গেলেও তাঁর মনোভাব বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, তিনি বাল্যবিবাহ পছন্দ করতেন না। আসলে তিনি 'সতীদাহ' আন্দোলন ও অন্যান্য অনেকগুলি বিষয় নিয়ে এতই ব্যস্ত ছিলেন যে, এ ব্যাপারে মনোনিবেশ করার অবকাশ তাঁর ছিল না। বাল্যবিবাহ একটি কুপ্রথা—এ বিষয়ে জনমত গড়ে তুলতে সেকালের প্রগতিশীল সমাজ-সংস্কারকদের বেশ-কিছুটা বেগ পেতে হয়েছিল। বাল্যবিবাহের দরুন সমাজে পরিবারে ও ব্যক্তিগত জীবনে কত রকমের বিপদ ও সমস্যা ঘনিয়ে উঠত, তার হিসাব পাওয়া যায়, সমসাময়িক পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন রচনাগুলিতে উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই বাল্যবিবাহ বিরোধী আন্দোলন দানা বেঁধে উঠল। ঈশ্বর গুপ্ত -সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় বাল্যবিবাহ সম্পর্কিত বেশ- কয়েকটি রচনা মুদ্রিত হয়েছিল। ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দে 'সর্বশুভকরী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'বাল্য বিবাহের দোষ' নামে একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এখানে বাল্যবিবাহের জন্য সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক ও শারীরিক দিকে থেকে যা-কিছু অপকার ঘটে, সেই সমস্ত কথা নানা যুক্তি-তর্ক সহকারে বিচার ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁর 'বিদোৎসাহিনী' পত্রিকায় বাল্য বিবাহ বন্ধ করার প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যাখ্যা করে 'বাল্যবিবাহ' (১৮৫৬ খ্রী.) নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকায় লেখালিখি করে ও সভা সমিতিতে আলোচনা ও তর্কের মাধ্যমে, যতখানি সম্ভব জনসাধারণকে বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে অবহিত করবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তিনি বিধবা বিবাহ প্রচলন, বহুবিবাহ বন্ধ, স্ত্রীশিক্ষার প্রসার প্রভৃতি বিষয়ে যতখানি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, বাল্যবিবাহ নিবারণের ক্ষেত্রে ততখানি মনোযোগ দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। বিদ্যাসাগর সমাজ-সংস্কার বিষয়ক যে প্রতিজ্ঞাপত্রটি প্রস্তুত করেন ও স্বাক্ষর সংগ্রহের জন্য প্রকাশ করেন, সেখানে ২ ও ৫-সংখ্যক শর্তদুটি ছিল বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কিত। এই প্রতিজ্ঞাপত্রে লেখা ছিল—

> ২। একাদশ বর্ষ পূর্ণ না হইলে কন্যার বিবাহ দিব না।
> ৫। অষ্টাদশ বর্ষ পূর্ণ না হইলে পুত্রের বিবাহ দিব না।" [৪৯]

এই আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণে অগ্রণী হলেন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত যুবকবৃন্দ। ব্রাহ্মসমাজের ভূমিকাও ছিল প্রশংসনীয়। বাল্যবিবাহ নিবারণের উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে বেশ-কয়েকটি নূতন সংস্থা গড়ে উঠেছিল ঐ সময়ে। যেমন পূর্ববঙ্গের ঢাকা শহরে ছিল "বাল্য বিবাহ নিবারণী সভা"। এই সভার সভ্যরা নিয়ম করেছিলেন যে, কোনো পুরুষ ২১ বছর না হলে বিবাহ করবেন না এবং ১৪ বছরের নীচে কোনো বালিকার পাণি গ্রহণ করবেন না। কারণ তাতে উভয়েরই শরীর ও মনের ক্ষতি হয়। কেশবচন্দ্র সেন যে "ভারত সংস্কার সভা" বা 'ইন্ডিয়ান রিফর্ম অ্যাসোসিয়েশন' (১৮৭০ খ্রী.) গড়ে তুলেছিলেন, সেখানে এ বিষয়ে আন্দোলন করা হয়েছিল। তাঁরা বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বিবাহের বয়স নির্ধারণের চেষ্টা করেন। এজন্য তাঁরা অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে বিবাহ বিধি প্রণয়নের কথাও চিন্তা করেছিলেন। রক্ষণশীল হিন্দু সম্প্রদায়

নানা ভাবে বাল্যবিবাহ নিবারণ বিষয়ে বিরুদ্ধাচরণ করলেও, শেষ পর্যন্ত জনসাধারণকে বোঝানো গেল যে বাল্যবিবাহ একটি কুপ্রথা বিশেষ। তবুও একটি বহুল প্রচলিত দেশাচার হিসাবে অনেকেই যে বিনা দ্বিধায় অভ্যাস বশে বাল্য-বিবাহের বশবর্তী হতেন তার প্রত্যক্ষ নিদর্শন তুলে ধরা যেতে পারে। কন্যা সন্তানকে পাত্রস্থ করার জন্য তখনকার অভিভাবকবৃন্দ সদাই ব্যগ্র হয়ে থাকতেন, সেকালের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আত্মজীবনী পড়লে সেকথা জানা যায়। প্রমাণস্বরূপ উনিশ শতকের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, কত বয়সে বিবাহ করেছিলেন এবং বিবাহকালে তাঁদের জীবনসঙ্গিনীদের কত বয়স ছিল, তার একটি তুলনামূলক তালিকা নীচে দেওয়া হল—

নাম	বয়স	স্ত্রীর বয়স
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৪।১৫	৬
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	১৪	৮
রাজনারায়ণ বসু	১৭	১১
কালীপ্রসন্ন সিংহ	১৪	—
শিবনাথ শাস্ত্রী	১২।১৩	১০
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১১	৫
কিশোরীচাঁদ মিত্র	১৮	১১
রমেশচন্দ্র দত্ত	১৬	—
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৭।১৬	৭।৮
বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী	—	৬
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৯	৮।৯
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৯	১১
হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৯	১০।১২
জানকীনাথ ঘোষাল	২৭	১৩
কেশবচন্দ্র সেন	১৮	৯।৮
ডব্লিউ. সি. ব্যানার্জি	১৫	১০।১১ [৫০]

সহবাস সম্মতি আইন বা (Consent Act) ১৮৯৬ খ্রী.

ভারতে বাল্যবিবাহের কুফল সম্বন্ধে ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে একটি গ্রন্থ রচিত হয়, লেখক ছিলেন এক পার্শি ভদ্রলোক—বেহরামজী মেরবানজী মালাবারী (১৮৫৩–১৯১২)। হিন্দু সমাজে বাল্যবিবাহের প্রচলন থাকলেও কিন্তু বালক-বালিকাদের শরীর ও মনের যাতে কোনো ক্ষতি না হয়, তার উপযোগী কিছু প্রতিষেধক ব্যবস্থাও মেনে চলা হত। যেমন যৌবনাবস্থার পূর্বে কোনো বাল-বধূকে তার স্বামীগৃহে রাখা হত না কারণ তা ছিল শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম। বিবাহের পর তাকে পিত্রালয়ে রাখা হত। যথাসময়ে ‘দ্বিতীয় বিবাহ’ বা ‘পুনর্বিবাহ’ অনুষ্ঠানের পর তাকে শ্বশুরালয়ে

ঘর করার উদ্দেশ্যে নিয়ে আসা হত। এই সব নিয়ম নিষ্ঠা সহকারে সকলেই পালন করতেন। কিন্তু উনিশ শতকের শেষ দিকে একটি বীভৎস ঘটনাকে কেন্দ্র করে সমাজে খুব আলোড়ন দেখা গিয়েছিল। সেই ব্যাপারটি হল এই —১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দে ফুলমণি নামে নয় বা দশ বছরের একটি বাঙালি মেয়েকে তার পঁয়ত্রিশ বছরের স্বামী হরিমোহন মাইতির হাতে প্রাণ হারাতে হয়েছিল খুব মর্মান্তিক ভাবে। এই ঘটনার প্রতিবাদে সারা বঙ্গদেশ জুড়ে আন্দোলন শুরু হল। তীব্র নিন্দার ঝড় উঠল বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত প্রগতিশীল যুবকবৃন্দ চাইলেন 'সহবাস সম্মতি আইন' করা হোক। এই নিয়ে কলকাতার গড়ের মাঠে বিরাট এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১২৯৭ বঙ্গাব্দের ১৪ ফাল্গুন তারিখে। রক্ষণশীল দলের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও, সরকার-কর্তৃক "সহবাস সম্মতি আইন" গৃহীত হল ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দের ১৯ মার্চ তারিখে। এই 'সহবাস-সম্মতি আইন' আইনে বলা হয়, বারো বছরের কম বয়সের বালিকা বধূর সঙ্গে সহবাস করলে তার স্বামীর দণ্ড হবে। এইভাবে তখন বঙ্গীয় সমাজে বালবধূকে রক্ষা করার মতো যথোচিত ব্যবস্থা করা হল আইনসম্মতভাবে। বাল্যবিবাহ নিরোধক আইন বা সর্দা আইন হয় আরও পরে—১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে। বহু আলাপ-আলোচনার পর রায়সাহেব হরবিলাস সর্দা, আইন সভায় একটি বিল দাখিল করেন এবং তার ভিত্তিতে 'সর্দা অ্যাক্ট' তৈরি হয়। সবাই তখন জানল যে, ভারতে মেয়েদের চোদ্দ বছর এবং পুরুষদের আঠারো বছরের পূর্বে বিবাহ হবে না। এই আইন অমান্য করলে তা হবে দণ্ডনীয় অপরাধ।

বাল্য বিবাহের ব্যাপকতার কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে জনৈক পণ্ডিত ব্যক্তি বলেছেন, "কৌলীন্য প্রথা উচ্চতর হিন্দু সমাজে বাল্যবিবাহের জন্য কতকটা দায়ী হইলেও নিম্ন শ্রেণীর সমাজের মধ্যেও যে এই প্রথা অত্যন্ত ব্যাপক আকার লাভ করিয়াছিল, তাহার কারণ স্বতন্ত্র। সেই কারণ, কতকটা অর্থনৈতিক, কতকটা সামাজিক। কিন্তু ইহাদের মূলে একটি প্রধান কারণ, এদেশে তুর্কী আক্রমণ; ইহার ফলে একদিক দিয়া যেমন হিন্দুর পারিবারিক জীবনের নিরাপত্তার অভাব ঘটিয়াছিল—শিশুকন্যাকে বিবাহ দিয়া প্রত্যেক পরিবারই দায়মুক্ত হইতে চাহিয়াছে, তেমনই আর একদিক দিয়া ব্যাপক ধর্মান্তর গ্রহণের ফলে হিন্দু সমাজে বিবাহযোগ্যা কন্যার অভাববশতঃ কন্যা বিক্রয় প্রথার (marriage by purchase) উদ্ভব হইয়াছিল, মধ্য যুগের সমাজে উচ্চ এবং নিম্নশ্রেণীর মধ্যে বাল্য বিবাহ প্রথা উদ্ভবের মূল কারণ ইহাই বলিয়া মনে হয়।" ৫১

বাংলা সাহিত্যে বাল্যবিবাহ প্রসঙ্গ

বাল্যবিবাহের নিন্দাবাদ করে একাধিক নাটক ও প্রহসন লেখা হয়েছিল সেকালে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— 'বাল্যোদ্বিবাহ নাটক' (১৮৬০) শ্যামাচরণ শ্রীমানি -রচিত এবং অমৃতলাল বসু -প্রণীত 'সম্মতি সঙ্কট' (১৮৯৯) নামক প্রহসন।

রবীন্দ্রনাথ কৌতুক রস ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর 'মানসী' কাব্য গ্রন্থের অন্তর্গত 'নবদম্পতির প্রেমালাপ' নামক কবিতায়। সেখানে 'বর' ব্যাকুল হয়ে 'কনে'কে উদ্দেশ্য করে বলছে—

"জীবনে জীবন প্রথম মিলন,
সে সুখের কোথা তুলা নাই।
এস, সব ভুলে আজি আঁখি তুলে
শুধু দুঁহু দোঁহা মুখ চাই।" ইত্যাদি

কিন্তু 'কনে' সরোদনে বলছে—

"আইমার কাছে শুতে যাই।"

কখনও আবার বলে----

"পুষি মেনিটিরে
ফেলিয়া এসেছি ঘরে।"

বর আবেগ উচ্ছ্বাস ভরে যখন বলে—

"তোমা তরে, সখী, বলো করিব কী ?"

কনে তার উত্তরে বলে—

"আরো কুল পাড়ো গোটা ছয়।"

স্বামীর প্রেমালাপ এইভাবে শেষে অরণ্যে রোদনে পর্যবসিত হল। 'বধূ' কবিতাতে বালবধূর মনের বেদনাবিধুর চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন কবি সযত্নে। এ ছাড়াও কবি তাঁর 'মানসী' কাব্যের 'পরিত্যক্ত' নামক কবিতায় বাল্যবিবাহ প্রথাকে ব্যঙ্গ করে লিখেছিলেন—

"সানাই বাজিয়ে ঘরে নিয়ে আসি
আট বরষের বধূ,
শৈশবকুঁড়ি ছিঁড়িয়া বাহির
করি যৌবনমধু।"

কিন্তু ব্যঙ্গ কৌতুক অথবা করুণ চিত্র শুধু নয় রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে কয়েকটি চিন্তামূলক প্রবন্ধও লিখেছিলেন। যেমন তিনি বলেছিলেন—

"... এতদিন ভারতীয় সমাজের যে আধারের উপরে তার বিবাহ প্রথা প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেই আধারের বিকৃতি হওয়াতে বিবাহের মূলগত ভাব সকল ও তার ব্যবহার সকল কিছুর সঙ্গে ঠিক মতো খাপ খাচ্ছে না।" [৫২]

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'বেলাশেষের গান' কাব্যগ্রন্থে 'বঙ্গ বধূ'র বিষয়ে বলেছিলেন—

"বালিকা বয়সে মার কোল ছাড়ি,
পরবাসে বাঁধে যে জন গেহ,
পরখ যাহারে করে গো সবাই,
শাসন করে গো, করে না স্নেহ।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পণ প্রথা ও বঙ্গের নারী সমাজ

'পণ প্রথা' নিঃসন্দেহে একটি জঘন্য ও নিন্দনীয় রীতি। শুধু প্রাচীন বা মধ্যযুগে নয় সাম্প্রতিক কালেও এই ঘৃণ্য রীতিটি ভারতের প্রায় সর্বত্র বর্ণহিন্দু সমাজে বলবৎ আছে। সমাজদেহের এই দুরারোগ্য ব্যাধিকে নির্মূল করার কোনো পন্থা আজও খুঁজে পাওয়া যায় নি। অমর্যাদাকর এই রীতিটি নারীজীবনে চরম অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আইনের সাহায্যে এই কলঙ্কময় রীতিকে দূর করবার প্রচেষ্টা আজ প্রায় ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে বলা চলে। ১৯৬১ খ্রীস্টাব্দে প্রথম পণ প্রথা নিবারণী আইনটি লোকসভায় পাস করা হয় এবং এই প্রথাকে দণ্ডনীয় বলে ঘোষণা করা হয়। সেখানে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, কোনো ব্যক্তি পণ দিলে বা নিলে তার ৫০০০ টাকা জরিমানা বা ছয় মাসের কারাদণ্ড হতে পারে।[৫৩] কিন্তু পণপ্রথা নিরোধী এই আইন, যথেষ্ট কার্যকর হচ্ছে না দেখে, ১৯৮৪ খ্রীস্টাব্দে আইনটিকে সংশোধন করা হয়। তা সত্ত্বেও ছলে বলে কৌশলে আইনকে ফাঁকি দিয়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধি করে চলেছে যথাযথ ভাবে অসৎ ব্যক্তিরা। প্রায় প্রতিদিনের সংবাদপত্র খুললেই দেখা যাবে,একাধিক বধূহত্যার লোমহর্ষক খবর। বিস্তৃত অনুসন্ধানে দেখা যায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরা হল পণ প্রথার বলি। তথাকথিত ভদ্রশ্রেণীর শিক্ষিত ও অশিক্ষিত মানুষ কন্যাপক্ষের কাছ থেকে বর পণ অন্যায়ভাবে আদায় করছেন দেখে, নিম্নবর্ণের মানুষের মধ্যেও এই রীতিটি আজ সংক্রামিত হয়েছে। কোন্ জাতীয় হীন মনোভাবের বশবর্তী হয়ে সমাজের এক শ্রেণীর মানুষ এই জাতীয় আচরণ করে থাকে, তার চমৎকার বিশ্লেষণ করে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন যে, উন্নতমানের জীবন যাপন করার ইচ্ছা এদেশের মানুষের মনে প্রবল হয়ে উঠেছে, অথচ নিজেদের সামর্থ্যের অভাব। কাজেই কন্যার পিতার কাছ থেকে অযথা চাপ দিয়ে পণ আদায় করে, অনেকে অসাধু উপায়ে নিজেদের মনোগত আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে থাকেন। তিনি বলেছেন—

"একদিকে ভোগের আদর্শ উচ্চ হইয়া সংসারযাত্রা বহুব্যয়সাধ্য ও অপরদিকে কন্যা মাত্রকেই নির্দিষ্ট বয়সের মধ্যে বিবাহ দিতে বাধ্য হইলে পাত্রের আর্থিক মূল্য না বাড়িয়া গিয়া থাকিতে পারে না। অথচ এমন লজ্জাকর ও অপমানকর প্রথা আর নাই। জীবনের সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দোকানদারি দিয়া আরম্ভ করা, যাহারা আজ বাদে কাল আমার আত্মীয়শ্রেণীতে গণ্য হইবে আত্মীয়তার অধিকার স্থাপন করিয়া তাহাদের সঙ্গে নির্লজ্জভাবে নির্মমভাবে দরদাম করিতে থাকা— এমন দুঃসহ নীচতা হইতে আরম্ভ করিয়াছে, সে সমাজের কল্যাণ নাই, সে সমাজ

নিশ্চয়ই নষ্ট হইতে আরম্ভ করিয়াছে। যাঁহারা এই অমঙ্গল দূর করিতে চান তাঁহারা ইহার মূলে কুঠারাঘাত না করিয়া যদি ডাল ছাঁটিবার চেষ্টা করেন তবে লাভ কী।"[৫৪]

বহুদিন আগে রবীন্দ্রনাথ যে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছিলেন, আজও অনেকে এ বিষয়ে কর্ণপাত করেন না। মঙ্গলের পরিপন্থী এই কুপ্রথাকে জীবনের অঙ্গীভূত করে আমরা নিজেরাই নিজেদের সর্বনাশের পথে নিয়ে চলেছি। যতদিন না সামাজিক মানুষের মনে কল্যাণ ইচ্ছার জাগরণ ঘটে, ততদিন এই বিভীষিকাপূর্ণ অবস্থার হাত থেকে রেহাই নেই।

এই কুপ্রথাটি কেমন ভাবে এত দৃঢ় ভিত্তিতে এদেশে প্রতিষ্ঠিত হল, তার আলোচনা করতে হলে, আগে খতিয়ে দেখা চাই বিবাহরীতির সঙ্গে পণপ্রথার এই ঘনিষ্ঠ যোগ কবে থেকে দেখা গেল। মহাভারতে আছে, উদ্দালক ঋষির পুত্র শ্বেতকেতুই সর্বপ্রথম এদেশে বিবাহ রীতির প্রচলন করেন (মহাভারত, আদি ১২২। ৯-২০)। তার আগে নর-নারীর স্বেচ্ছা-বিহারের রীতি ছিল।

বৈদিকযুগে যুবক-যুবতীরা স্বেচ্ছাক্রমে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতেন এবং যৌবন বিবাহই প্রচলিত ছিল। স্বইচ্ছায় বিবাহ হলে, পণ-গ্রহণের প্রশ্ন ওঠে না। অথচ পণ প্রথার আদিম নজীর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে ঐ বৈদিক যুগেই। সেকালে কন্যাকে পতিগৃহে পাঠানোর সময়, পিতৃগৃহ থেকে বসন-ভূষণ ছাড়াও গবাদি পশু বা অস্থাবর কিছু সম্পত্তি দানের কথা জানা যায়। তা ছাড়া "অঙ্গহীনা কুশ্রী কন্যার বিবাহে বরকে অর্থ দিয়াই বিবাহে সম্মত করিতে হইত (ঋগ্বেদ ১০।২৭।১১)। সুন্দরী কন্যা সবাই চাহিত, তাহার উপর কন্যা যদি ভালো হয় তবে তো কথাই নাই (ঋগ্বেদ ১০।২৭।১২)। সুন্দরী না হইলে ভগ্নীকে টাকা দিয়া ভাইরা বিবাহ দিতেন (ঋগ্বেদ ১।১০৯।২)। কন্যার বিবাহের সঙ্গে 'অনুদেয়ী' কথাটি ঋগ্বেদে (১০।৮৫।৬) পাওয়া যায়। সায়ণ অর্থ করেন, মেয়ের মন প্রসন্ন রাখিবার জন্য তার সঙ্গে দীয়মানা বয়স্যা ("বধূ বিনোদায় অনুদীয়মানা বয়স্যা"); কেহ কেহ অর্থ করেন, কিছু পণ।"[৫৫] অবশ্য সেকালেও অনেক যুবক নিজেদের যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে; মনোমতো উপযুক্ত পত্নী সংগ্রহ করতেন। যেমন রামচন্দ্র হরধনু ভঙ্গ করে সীতাকে লাভ করেন কিংবা 'লক্ষ্যভেদ' করে অর্জুন দ্রৌপদীর বরণমালা পেয়েছিলেন।

পণ প্রথার প্রবর্তন বিষয়ে নানা ব্যাখ্যা শুনতে পাওয়া যায়। অনেকের মতে বিবাহ অনুষ্ঠানকে এদেশে একটি ধর্মানুষ্ঠান রূপেই দেখা হয়। কারণ নারায়ণ শিলা ও অগ্নি সাক্ষী রেখে, প্রজাসৃষ্টির কারণে অথবা উত্তর পুরুষের মধ্যে দিয়ে নিজেদের বংশধারাকে বজায় রাখার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে কন্যা সম্প্রদান একটি কল্যাণমূলক ধর্ম-যজ্ঞ বিশেষ। পূজা বা যজ্ঞশেষে যেমন যজ্ঞানুষ্ঠানকারীকে দক্ষিণাদানের রীতি আছে, তেমনি সালংকারা কন্যার গ্রহীতাকেও দক্ষিণাস্বরূপ কিছু মুদ্রা দানের রীতি ছিল। কালক্রমে ঐ রীতিই যৌতুক ও পণ গ্রহণের রীতিতে পর্যবসিত হয়েছে। আবার অনেকে বলেন, প্রিয়জন বা স্নেহভাজনকে প্রীতি উপহার দেবার রীতি, পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই অল্পবিস্তর প্রচলিত আছে। কন্যার বিবাহে পিতামাতা, ভাই ভগিনী, আত্মীয় বন্ধু

সকলেই প্রেম-প্রীতির চিহ্নস্বরূপ কিছু-না-কিছু বস্তু উপহার দিতেন। সেই উপহার দেবার রীতিটিই এদেশে পণ গ্রহণের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। আরও কেউ কেউ অনুমান করেন যে, আমাদের দেশে বিবিধ বিবাহের রীতির মধ্যে 'অসুর বিবাহ' প্রচলিত ছিল। সেখানে অনেক সময় টাকার বিনিময়ে কন্যাকে বিক্রয় করা হত। পরে নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি হল। তখন বিপরীত ঘটনা দেখা গেল— বর-পণ দিয়ে কন্যার বিবাহ দেওয়া শুরু হল। এই সব নানা ধরণের অনুমানের মধ্যে কোন্‌টি সত্য, কোন্‌টি মিথ্যা তা স্থির করা সম্ভবপর নয়। কিন্তু যে সমস্যাটি বিদ্যমান সেটি হল, কোন্ উপায়ে নারী-সমাজকে আজ পণ প্রথার অত্যাচার থেকে ও অবমাননার হাত থেকে উদ্ধার করা যাবে ? বিভিন্ন সময়ে ভারতের নানা স্থানে এই প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন দেখা দিয়েছে সাময়িকভাবে কিন্তু কোনো স্থায়ী সমাধানের উপায় আজও হয় নি। বরং ভয়াবহ রূপ নিয়েছে এযুগে । আগে টাকা, গহনা ও কিছু প্রয়োজনীয় তৈজসপত্রের মধ্যে সীমিত ছিল এই চাহিদা। কিন্তু বর্তমানে নানা ব্যয়সাধ্য বিলাসদ্রব্যের তালিকা ক্রমে বেড়েই চলেছে। সেই কারণে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতামাতার নির্যাতনের সীমা নেই। এই নির্মম প্রথার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার আশু কোনো সম্ভাবনা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। অহেতুক প্রলোভন জয় করতে পারলেই— এই রোগ-নিরাময় হওয়া সম্ভব।

পণ প্রথা প্রসঙ্গ ও বাংলা সাহিত্য

বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন 'বৌদ্ধ গান ও দোঁহা'তে আমরা কাহ্নপাদ–রচিত একটি পদে দেখতে পাই পণ গ্রহণের উপমা ব্যবহার করেছেন কবি, নিগূঢ় সাধনতত্ত্বকে বোধগম্য করার জন্য সেই উপমার মধ্যে তৎকালীন প্রচলিত সামাজিক এই বিশেষ রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। উত্তম যৌতুক লাভের আশায় হীনবর্ণের কন্যাকে বিবাহ করতেও দ্বিধা করছেন না কাহ্ন— এই হল কবির বক্তব্য। পদটি হল—

'ভব নিবাণে পড়হ মাদলা।
মন পাবন বেণি করণ্ডক শালা ।।
জঅ জঅ দুন্দুহি সাদ উছলি আঁ ।
কাহ্ন ডোম্বী বিবাহে চলি আ।।
ডোম্বী বিবাহী আ অহা রিউ জাম।
জউতুকে কিঅ আণতু ধাম।।

'সন্ধ্যা-ভাষা' বা 'আলো-আঁধারী' ভাষায় রচিত এই সব কবিতার অন্তর্নিহিত অর্থ তেমন সুবোধ্য না হলেও, উপমাটি বুঝতে আমাদের অসুবিধা হয় না। মোটামুটি ভাবে অর্থটি হল এই— ভব ও নির্বাণ হল পটহ ও মাদল, মন ও পবন দুই করণ্ডক শালা। জয় জয় দুন্দুভি শব্দ উচ্ছলিত করে কাহ্ন চলল ডোম্বীকে বিবাহ করতে। 'অনুত্তর ধাম' অর্থাৎ নীচুজাতের ডোম্বীকে বিবাহ করে জাতকুল-মান খোয়ালেও, উত্তম যৌতুক লাভ করে ক্ষতিপূরণ করা গেছে। ড. নীহার

রঞ্জন রায় এ সম্পর্কে বলেছেন— "তখনকার দিনে বংলাদেশে বিবাহ ব্যাপারে বরপক্ষ যৌতুক লাভ করিত এবং যৌতুকেব লোভে নীচ-কুল হইতে কন্যা গ্রহণেও খুব আপত্তি ছিল না, অন্যান্য সংবাদের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতটিও এই গীতে বিদ্যমান।" [৫৬]

মধ্যযুগেও পণ প্রথার বহুল প্রচলন ছিল, তার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য ও অন্যান্য আখ্যায়িকামূলক কাব্যে।

আধুনিক যুগের কাব্যে ও কথাসাহিত্যেও অনেকে পণ প্রথার মারাত্মক পরিণতির চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন কবি ও সাহিত্যিকরা। উনিশ শতকের শেষ দিকে নানা পত্রপত্রিকার মাধ্যমে এই সামাজিক কুপ্রথাকে দূরীভূত করার নানান চেষ্টা চলেছিল। যেমন 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকার মাধ্যমে কন্যা-পণ নিবারণ কল্পে জনসাধারণের উদ্দেশ্যে নিয়মিত প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।[৫৭] অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে তুলনায় সুবর্ণ বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে কন্যাপণের আধিক্য দেখা যায়। সে সময় 'সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভা'র মাধ্যমে একদিকে বহুবিবাহ বিরোধী আন্দোলন ও অন্যদিকে পণ প্রথা নিবারণী আন্দোলন শুরু হয়েছিল। বহু নাটক ও প্রহসন রচনা করে পণ প্রথার তীব্র প্রতিবাদ করা হয়েছিল এই সময়ে। যেমন রসরাজ অমৃতলাল বসু –রচিত 'চোরের উপর বাটপাড়ি' প্রহসনের মধ্যে একটি গান আছে—

"বড় বেজায় দর বাড়ালে বরের বিশ্ববিদ্যালয়/বাঙ্গালায় কন্যাদায় যত গৃহস্থ লোকেরা মারা যায়।/ পা হাত এনেট্রেনস্ পাস, চায় গো রূপার থালা গেলাস,/ বিঃ এ. সোনার ঘড়া-গাড়ু, এম. এ.সর্বস্ব চায়।"/ এই জাতীয় আরও অনেক নাটক–প্রহসনের কথা বলা যায়। হরিশচন্দ্র মিত্রের লেখা 'ঘর থাক্তে বাবুই ভেজে' (১৮৬৩) ও ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় -রচিত 'কনের মা কাঁদে আর টাকার পুঁটলি বাঁধে (১৮৬৩) এই দুটি প্রহসনে দেখানো হয়েছে, কেমন করে অনেক কন্যার পিতামাতা টাকার লোভে অপাত্রে কন্যাদান করেন। শিশির কুমার ঘোষ কন্যাপণের বিষয় নিয়ে লিখেছিলেন 'নয় শো রূপেয়া' (১৮৭৪) নাটক। রামকৃষ্ণ রায় -রচিত একটি প্রহসন 'লোভেন্দ্র গবেন্দ্র'তে (১৮৯০) বিয়ের বাজার বিষয়ক একটি গানে বলা হয়েছে—

'এক এক ছেলে দশ হাজারে
বেচবো বসে বে'র বাজারে
মেয়ের বাবার দফা রফা
ভিটেয় ঘুঘু চরিয়ে দেবো।' [৫৮]
ইত্যাদি

এই একই বিষয় নিয়ে আরও অনেক নাটক ও প্রহসন লেখা হয়েছিল— 'কন্যা দায়' (১৮৯৩) যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়; 'চপলা চিত্ত-চাপল্য' (১৮৫৭) যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়; 'এই কি সেই' (১৮৭৯) গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়; 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' (১৮৬৬) রাধাবিনোদ হালদার; 'বোকা কড়ি চোকামাল' (১৮৭৯) হীরালাল ঘোষ; 'পাশ করা ছেলে'

(১৮৭৯) দুর্গাচরণ রায়; 'পাশ করা জামাই' (১৮৮০) রাধাবিনোদ হালদার; 'বিবাহ বিভ্রাট' (১৮৮৪) রসরাজ অমৃতলাল বসু; 'বলিদান' (১৯০৫) নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথের রচিত 'দেনাপাওনা' ছোটোগল্পের নিরুপমার মতো, কত নিরীহ অসহায় বালিকা, তরুণী ও যুবতী এদেশে পণ প্রথাব যূপকাষ্ঠে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে এবং আজও দিয়ে চলেছে— তার কোনো সীমা-সংখ্যা নেই। স্বভাব কবি গোবিন্দ দাস পণ প্রথার বিরুদ্ধে যে কবিতা লিখেছিলেন, সেখানে মেয়ের জবানীতে বলেছেন—

'বাবা থাকুক আমার বিয়ে
আমি চাই না এম.এ.বি-এ.
কিনতে যা হয় টাকা দিয়ে
ছাগ গরুর মতো যাদের
ছেলের হাটে গিয়ে।

ইত্যাদি।

এক সময় এদেশে স্নেহলতা মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুকে (১৯১৪ খ্রী.) কেন্দ্র করে বরপণের বিরুদ্ধে বিরাট আলোড়ন ও আন্দোলন দেখা গিয়েছিল। কারণ তার মৃত্যুটিকে নিছক আত্মহত্যা না বলে, বলা উচিত নারী জাতির অমর্যাদা ও অবমাননার বিরুদ্ধে আত্মোৎসর্গ বা বিদ্রোহ। ঘটনাটির বর্ণনা দিয়েছেন জনৈক ঐতিহাসিক— "স্নেহলতা নামে একটি বালিকা তাহার বিবাহের বরপণ যোগাইবার জন্য পিতা বসতবাটি বিক্রয় অথবা বন্ধক দিবার ব্যবস্থা করিতেছেন— এই সংবাদ শুনিয়া নিজের গাত্র-বস্ত্র কেরোসিন তেলে ভিজাইয়া তাহাতে অগ্নিপ্রদান করেন। তাহার এই আত্মহত্যায় বরপণের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন হয় এবং স্থানে স্থানে অবিবাহিত যুবকেরা বিবাহে পণ গ্রহণ করিবে না এইরূপ শপথ গ্রহণ করে। কিন্তু কিছুদিন পরে এ সমস্তই অসার প্রতিপন্ন হয় এবং ববপণের কুপ্রথা পূর্ববৎ চলিতে থাকে।" [৫৯]

স্নেহলতার এই মর্মান্তিক মৃত্যুকে লক্ষ্য করে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২) লিখেছিলেন তাঁর বিখ্যাত 'মৃত্যু স্বয়ম্বর' কবিতাটি। এখানে তিনি বলেছেন বাঙ্গালী সমাজে 'বরপক্ষের জুলুম' হল আসলে 'সমাজ মান্য গুণ্ডামি' ও 'কসাই হাটের কাণ্ড'। কবি আক্ষেপ করে একথাও বলেছেন এদেশে 'কুলটাদের মূল্য আছে, কুলবালার মূল্য নাই।' সেই জন্য বাঙালী মেয়ের পিতা, কন্যার বিবাহ দিতে গিয়ে কপর্দকহীন হয়ে যান। কারণ

'কন্যা ঘরের আবর্জনা
পয়সা দিয়ে ফেলতে হয়।'

আইনত পণপ্রথা বন্ধ হলেও, কার্যত এ সমস্যার কোনো সুরাহা হয় নি আজও। প্রকৃতই যদি এই সমস্যার পূর্ণ সমাধান আমরা করতে চাই তা হলে, সামাজিক মানুষের মানসিক সংস্কারের মধ্য দিয়েই আসবে একদিন সেই সমাধান। সেই সুদিনের প্রতীক্ষা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

পশ্চিমবঙ্গে বধূহত্যার সংখ্যা দিন দিন কী ভয়াবহ রকমে বেড়ে চলেছে, সাময়িক পত্রিকার পৃষ্ঠা থেকে তার একটি হিসাব নিকাশ এখানে তুলে ধরা হল—

পণের জন্যে বধূ হত্যা :

সাল	কলকাতা	জেলা	হিন্দু	মুসলমান	মোট
১৯৮৪	২	১১	১২	১৩	৩৮
১৯৮৫	৯	৪১	৪৩	৫০	১৪৩
অন্যান্য কারণে :					
১৯৮৪	৫৩	৭২	১১১	১৪	২৫০
১৯৮৫	১০৯	২১৪	২৮৭	৩৬	৬৪৬
১৯৮৬	২৩	৪৩	৫৮	৮	১৩২

(জানুয়ারি থেকে ১৫ মার্চ পর্যন্ত)

(মৈত্রেয়ী চ্যাটার্জী-রচিত "পশ্চিমবঙ্গে বধূহত্যা" প্রবন্ধ থেকে সারণীটি গৃহীত, আনন্দবাজার পত্রিকা ১৫ এপ্রিল ১৯৮৬। ১ বৈশাখ ১৩৯৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৫৭।)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সেকালের 'যৌথ-পরিবার' ও অবরোধ প্রথা

অনেককাল ধরে এদেশে গ্রাম ও শহর অঞ্চলে সর্বত্রই একান্নবর্তী পরিবার দেখা যেত। তার প্রধান কারণ হল—কৃষিভিত্তিক জীবনযাত্রা প্রণালীতে যৌথ পরিবার গড়ে ওঠাই স্বাভাবিক ও সুবিধাজনক। তা ছাড়া তখনও পর্যন্ত নরনারীর মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বোধ গড়ে ওঠার মতো পরিবেশ ছিল না। গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনে গৃহের সর্বত্র ছিল গৃহকর্তার শাসন এবং অন্দর মহলে গৃহকর্ত্রীর শাসন মেনে চলতে সকলে অভ্যস্ত ছিল। সেই কারণে তখনকার একান্নবর্তী পরিবারগুলি ছিল সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির আকর। কিন্তু আধুনিক যুগের সূচনায় সেই গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনে ভাঙন দেখা দিল। পাশ্চাত্য জাতির আগমনের ফলে, এদেশে কল-কারখানা ও ব্যাবসা-বাণিজ্যের সূত্রপাত হল। তখন থেকে নানা নূতন ধরণের বৃত্তি ও পেশার সন্ধান পেয়ে অনেকে গ্রামাঞ্চল ছেড়ে দিয়ে, শহরাঞ্চলের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেল। নূতনত্বের মোহ ও পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষার প্রচারে তাদের মনে নূতন অনুভূতি ও প্রবৃত্তি জেগে উঠল। বিশেষ করে ঐ সময় থেকে কলকাতাকে কেন্দ্র করে এদেশে যে নূতন হাওয়া বইতে শুরু করল তার ফলে যৌথ পরিবারের সেই দৃঢ় বাঁধন খসে পড়ল। চাকরিজীবী মানুষের জীবনে এল পরিবর্তন। একজন উপার্জনশীল ব্যক্তির স্কন্ধে আরোহণ করে, দশজন নিষ্কর্মা ব্যক্তির পক্ষে অন্নধ্বংস করা খুব একটা সুখের ব্যাপার বলে মনে হল না। গণ্ডিবদ্ধ জীবনে মানুষের মনে সংকীর্ণতা দেখা দিল। শহরের পরিবেশে মানুষ বিলাসব্যসনপ্রিয় ও আত্মসুখী হয়ে উঠল। গৃহকর্তার পক্ষে সংসারের প্রতিটি মানুষের জন্য সমান ভাবে অন্নবস্ত্রের সংস্থান করা আর সম্ভব হয়ে উঠল না। গ্রাম্য জীবনের মানমর্যাদার সঙ্গে শহুরে জীবনের একটা বড়ো রকমের পার্থক্য গড়ে উঠতে লাগল। জীবনযাত্রার মান বজায় রাখতে গিয়ে অভাব বোধ দেখা দিল কোনো কোনো পরিবারে। এই ধরণের নানা কারণে একান্নবর্তী পরিবারভুক্ত মানুষগুলির মধ্যে দেখা দিল মনোমালিন্য, রেষারেষি ও বাদ-বিসম্বাদ। অনেক ক্ষেত্রে বাড়ির কর্তা উদার ও নিরপেক্ষ দৃষ্টির পরিচয় দিতে পারতেন না। তাঁর এই অক্ষমতার সুযোগ নিয়ে অশান্তি ও ঝগড়া বিবাদ চরমে গিয়ে পৌঁছত। অনেক সময় যৌথ পরিবারের অনেক উপার্জনশীল ব্যক্তিও, ব্যক্তিগতউন্নতি ও সুখ-সুবিধা পাবার আশা নেই দেখে, যথাসাধ্য উপার্জনের চেষ্টা থেকে বিরত হতেন। তাঁদের এই নিরুৎসাহ মনোভাব ব্যক্তিগত কর্মক্ষমতা নাশের কারণ হয়ে দেখা দিত। একাধিক কারণে উনিশ শতকের প্রথম থেকেই যৌথ পরিবারে ঘুণ ধরে গিয়েছিল। তার নিখুঁত বাস্তব চিত্র এঁকেছিলেন তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'স্বর্ণলতা'র (১৮৭৪ খ্রী.) মধ্যে।

আরও একটি কারণে আধুনিক যুগে একান্নবর্তী পরিবারের ঐক্য বিঘ্নিত হয়েছিল, সেটি হল নরনারীর ব্যক্তিত্ব বোধের জাগরণ। প্রখর ব্যক্তিচেতনার জন্য অনেকেই সেযুগে নিজেদের ভালো-লাগা, মন্দ লাগাকে বিসর্জন দিয়ে, গড্ডলিকা প্রবাহে ভেসে যেতে পারলেন না। বিশেষ করে যৌথ পরিবারের মেয়েদের ক্ষেত্রে দেখা যেত যে, তাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা- অনিচ্ছার কোনোই মূল্য ছিল না। 'দশের ইচ্ছা বোঝাই করা' জীবনটা অতি সাবধানে তাঁরা টেনে নিয়ে বেড়াতেন। ব্যতিক্রম ঘটলে কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হয়ে অনেকের নিন্দাভাজন হতে হত। অবশ্য সব-কিছুরই একটি ভালো দিক ও মন্দ দিক আছে। এই যৌথ পারিবারিক রীতিতেও কয়েকটি ভালো দিক ছিল। এক মহিলার লেখনীতে তার পরিচয় ফুটে উঠেছে—"তখনকার দিনে একান্নবর্তী পরিবার ঘরে ঘরে দেখা যেত। সেটাই ছিল সংসার ধর্মের প্রচলিত ধরণ ও ধারা। স্বার্থ ত্যাগের যে-সব দৃষ্টান্ত তখন কর্তা-গিন্নী থেকে বৌ-ঝিদের মাঝে দেখতে পাওয়া যেত এবং পদে পদে এই স্বার্থ ত্যাগের যে প্রেরণা; যে শিক্ষা তখন পরিবারস্থ সকলকে এক করে, একমুখী করে রাখত, এখন ঠিক সে রকম আর দেখতে পাওয়া যায় না। যুগের হাওয়া বদলে গেছে।" ৬০ লেখিকার এই মূল্যায়নকে মিথ্যা বলা যায় না। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে প্রতিমা দেবী তখনকার দিনের একান্নবর্তী পরিবারের খাওয়া- দাওয়ার ও চালচলনের জীবন্ত চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর লেখা 'স্মৃতিচিত্র' গ্রন্থে। তিনি বলেছেন, " .... তার পর একে একে আসন পাতা হত, প্রথমে ছেলেদের খাওয়া, তারপর পুরুষদের, শেষে আসত মেয়েদের পালা। বাড়িব গিন্নী কখন লুকিয়ে সকলের শেষে ঠাকুরের প্রসাদ মুখে দিতেন কেউ তার খোঁজ রাখত না। তাঁর সঙ্গে বসত তিন-চারটে পোষা বেড়াল, তাদের মুখে অন্ন না দিয়ে তিনি কি খেতে পারেন ? তারাই শেষ অভুক্ত সংসারে।" ৬১ এই ছিল সেকালে আদর্শ গৃহিণীর জীবন।

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে সুধীরঞ্জন দাশ তাঁর পারিবারিক জীবনের যে পরিচয় দিয়েছেন সেখানেও এই জাতীয় নিস্পৃহ নির্লিপ্ত স্বার্থবোধহীন নারীদেব কথাই বলেছেন। তিনি লিখেছেন— "তখনকার দিনে মেয়েদের লেখাপড়ার তেমন রেওয়াজ ছিল না। মা কোনো মতে বাংলা ছাপা বই একটু একটু পড়তে পাবতেন এবং খুব সামান্যই বাংলা লিখতে পারতেন নানা রকম বানান ভুল ক'রে। কিন্তু সেকালের মেয়েদের মনেব মধ্যে শ্বশুর বাড়ির মানুষদের আপন করে নেওয়া এবং তাদের সুখী করা যে মেয়েদের একটা অবশ্য কর্তব্য এই বোধটি তাঁদের মা জ্যেঠি খুড়ির ব্যবহার দেখে এবং নানা ব্রতাদির কথা শুনে তাঁদের মনে বদ্ধমূল হয়ে থাকত। অনেক লেখাপড়ার চেয়ে এই শিক্ষাটুকুর দাম ছিল ঢের বেশি। সেকালের মেয়েরা শ্বশুরবাড়ি গিয়ে বৃদ্ধশ্বশুর ও অন্যান্যদের সেবা করাটাকে তাঁদের কর্তব্য বলে জেনেই বেশ হাসিমুখেই তা করতেন এবং তাঁদের সেবা শুশ্রূষা করে মনে একটা প্রসন্নতাও লাভ করতেন। এইরকম ভাবে চললে যে স্বামীও খুশি হবেন সে কথাও যে মেয়েদের মনে থাকত না তা-ও নয়।" ৬২

দিনকালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনোভাব ও মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটে। তাই একালে একান্নবর্তী পরিবার লুপ্ত হয়ে গেছে, সেইসঙ্গে পরিবারের পাঁচজনের সেবায় জীবন

উৎসর্গ করে নারীজীবনকে সার্থক করে তুলবার আদর্শ ও নীতিরও পরিবর্তন ঘটেছে। নূতন যুগের নূতন জীবনাদর্শে নারীজীবনকে সার্থক করে তোলার জন্য দেখা দিয়েছে ভিন্নতর আদর্শ ও শিক্ষা।

বঙ্গীয় নারীসমাজে অবরোধ প্রথা

পর্দা প্রথা এদেশে নতুন কিছু নয়। হয়তো বৈদিকযুগের নারীদের ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে চলাফেরার ব্যাপারে তেমন কোনো বিধিনিষেধ ছিল না। কিন্তু বৌদ্ধ যুগ থেকে শুরু করে আধুনিক যুগের সূচনা পর্যন্ত অবরোধ প্রথার ব্যতিক্রম দেখা যায় নি। এমন-কি একালেও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের গ্রামাঞ্চলে পর্দা প্রথার প্রচলন কিছু পরিমাণে রয়ে গেছে। নারীদের আভিজাত্যের একটি বিশেষ অঙ্গ ছিল এই পর্দা প্রথা। সম্ভ্রান্ত নারীরা যে অন্তঃপুরচারিণী ছিলেন তার পরিচয় পাওয়া যায় কালিদাসের 'শকুন্তলা' নাটকে (পঞ্চম অঙ্ক), ভাসের 'অবিমারক' (২।৮) নাটকে কিংবা বাৎস্যায়ন-রচিত 'কামশাস্ত্রে' (৮৩ অধ্যায়) অথবা কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে'। পাণিনির গ্রন্থেও (৩।২।৩৬) অন্তঃপুর বা অবরোধ প্রথার কথা আছে। তিনি প্রকৃত অসূর্যম্পশ্যা নারীর কথা বলেছেন, যিনি সত্যই জীবনে কোনো দিন সূর্যের মুখ দেখেন নি।[৬৩]

কবি নজরুল তাঁর 'সাম্যবাদী' কবিতায় আক্ষেপ করে বলেছিলেন---

"নর যদি রাখে নারীরে বন্দী, তবে এর পর যুগে
আপনার রচা ঐ কারাগারে পুরুষ মরিবে ভুগে।
যুগের ধর্ম এই—
পীড়ন করিলে সে পীড়ন এসে পীড়া দেবে তোমাকেই।"

কবির কথাই সত্য প্রমাণিত হয়েছে। কারণ অন্তঃপুরের বেড়াজাল ভেঙে বেরিয়ে আসতে বেগ পেতে হয়েছে এদেশের নারীদের এবং তারই ফলে তাদের এবং দেশের উন্নতি ব্যাহত হয়েছে নানা ভাবে।

এদেশের নারীদের জীবনে কঠোর পর্দা প্রথা দেখা গেছে মধ্যযুগ থেকে। তার কারণ নবাবী আমলে "বিলাস ব্যসন ও ইন্দ্রিয়ের সুখ ভোগই নবাব ও তাহাদের অনুচরদের একমাত্র কাম্য ছিল— নারী ও সুরাই ছিল তাহাদের নিয়ত সঙ্গী।" [৬৪]

এরপর ইংরেজ আগমনের ফলেও এদেশের নারীদের নিরাপত্তাবোধ বিঘ্নিত হয়েছে। তার আরও কারণ ছিল। যখন নানা কারণে দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংকট দেখা দিয়েছে, তখন দেশীয় মানুষের নৈতিক চরিত্রের পতন ঘটেছে দ্রুত গতিতে। নবাব এবং ধনী ব্যক্তিরা যেমন এক সময় নারী ও সুরা সম্বল করে জীবনযাপন করতেন পরবর্তী কালে কলকাতার এক শ্রেণীর অধিবাসীদের মধ্যেও সেই জাতীয় প্রবণতা দেখা দিল। তার কারণ হিসেবে দেখা যায় "দু'শো বছর আগে কলকাতার বড়ো মানুষেরা রক্ষিতা রাখতেন, তাই নিয়ে বড়াই করতেন, প্রতিযোগিতা করতেন। এইজন্য কত গ্রাম্য স্ত্রীলোক কলকাতায় এসে জমায়েত হত,

অথবা আড়কাঠিরা তাদের প্রলোভনে ভুলিয়ে কলকাতায় এনে তুলত, তারপর রূপগুণ ও সংগীতাদি কলাবিদ্যার অধিকার অনুসারে এদের কেউ কেউ ধনীর পোষ্যে পরিণত হত, কেউ বা সংকীর্ণ সুড়ঙ্গ পথে অদৃশ্য হয়ে যেত।"[৬৫] তাই মনে হয় নারীধর্ম ও শালীনতা এবং শোভনতা বজায় রাখার দরুনই হয়তো এক সময় এদেশের মেয়েদের পর্দা ও অবগুণ্ঠন প্রথা প্রচলিত হয়েছিল। কিন্তু সেই অবরোধকে অতিক্রম করে পুনরায় বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করার ক্ষমতা কোনো নারীর হাতে ছিল না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাড়ির হালচাল বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন— "দুই মহলে বাড়ি তখন ভাগ করা। পুরুষরা থাকে বাইরে, মেয়েরা ভিতরকোঠায়। নবাবি কায়দা তখনও চলে আসছে।" [৬৬] এখানে তিনি মেয়েদের চলা-ফেরা কীভাবে সীমিত ছিল তার কৌতুককর বর্ণনা দিয়েছেন— "মেয়েদের বাইরে যাওয়া-আসা ছিল দরজাবন্ধ পাল্কির হাঁপ-ধরানো অন্ধকারে, গাড়ি চড়তে ছিল ভারী লজ্জা। রোদ-বৃষ্টিতে মাথায় ছাতা উঠত না। কোনো মেয়ের গায়ে সেমিজ পায়ে জুতো দেখলে সেটাকে বলত মেম-সাহেবি; তার মানে, লজ্জা- শরমেব মাথা খাওয়া। কোনো মেয়ে যদি হঠাৎ পড়ত পর-পুরুষের সামনে, ফস্ করে তার ঘোমটা নামত নাকের ডগা পেরিয়ে, জিভ কেটে চট্ করে দাঁড়াত সে পিঠ ফিরিয়ে। ঘরে যেমন তাদের দরজা বন্ধ, তেমনি বাইরে বেরোবার পাল্কিতেও; বড়ো মানুষের ঝি-বউদের পাল্কির উপরে আরও একটা ঢাকা চাপা থাকত মোটা ঘটাটোপের। দেখতে হত যেন চলতি গোরস্থান। পাশে পাশে চলত পিতলে-বাঁধানো লাঠি হাতে দারোয়ানজি। ওদের কাজ ছিল দেউড়িতে বসে বাড়ি আগ্‌লানো, দাড়ি চোম্‌ড়ানো, ব্যাঙ্কে টাকা আর কুটুমবাড়িতে মেয়েদের পৌঁছিয়ে দেওয়া, আর পার্বণের দিনে গিন্নিকে বন্ধ পাল্কি-সুদ্ধ গঙ্গায় ডুবিয়ে আনা।" [৬৭]

সেকালের মেয়েদের ছিল একান্ত গৃহগত প্রাণ। স্কুল-কলেজে যাবার তাগিদটুকুও ছিল না। নিতান্তই পর্দানশীন ছিলেন তাঁরা। অথচ নবযুগের হাওয়া যখন বইল তখন অত্যন্ত দুঃসাহসে ভর করে কয়েকজন মাত্র নারী ও পুরুষকে ভাঙতে হয়েছিল এই দুর্ভেদ্য নিষেধের দেয়াল। সত্যিকারেব সাহস দেখিয়েছিলেন তখন ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা। প্রতিমাদেবী তাঁর 'স্মৃতিচিত্রে' লিখেছেন—" তখনকার দিনেও ও বাড়ির মেয়েরা ঘোড়ায় চড়েছেন, স্টেজে নেবেছেন, বক্তৃতা দিয়েছেন, গ্র্যাজুয়েট হয়েছেন। সমাজ আতঙ্কিত চিত্তে তাকিয়ে থাকত তাঁদের দিকে একটা উদ্ভট কিছু দেখবার জন্য। তাঁদের চালচলন সমাজের চোখে তাক লাগিয়ে দিত। শেষে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা না করতে পেয়ে সাধারণ লোকে বলত 'ওঁরা যে ব্রহ্মজ্ঞানী।' অর্থাৎ ব্রাহ্মসমাজের লোকেদের পক্ষে সবই সম্ভব।" [৬৮]

নারী-প্রগতির জন্য সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর যে দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন তার বর্ণনা দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ— "অন্দরমহলের পর্দা রইল না। আজ এ কথা নতুন ঠেকবে না, কিন্তু তখন এত নতুন ছিল যে মেপে দেখলে তার থই পাওয়া যায় না। তারও অনেক কাল আগে, আমি যখন শিশু, মেজদাদা সিভিলিয়ান হয়ে দেশে ফিরেছেন। বোম্বাইয়ে প্রথম তাঁর কাজে

যোগ দিতে যাবার সময় বাইরের লোকদের অবাক করে দিয়ে তাদের চোখের সামনে দিয়ে বউঠাকরুনকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। বাড়ির বউকে পরিবারের মধ্যে না রেখে দূর বিদেশে নিয়ে যাওয়া এই তো ছিল যথেষ্ট, তার উপরে যাবার পথে ঢাকাঢাকি নেই—এ যে হল বিষম বেদস্তুর। আপন লোকদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল।" ৬৯

এইভাবে সেদিন (নভেম্বর, ১৮৬৪ খ্রী.) ভারতের প্রথম সিভিলিয়ান সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর চোদ্দ বছরের পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীকে নিয়ে গেলেন নিজের কর্মস্থল বোম্বাই শহরে। একাধিকবার এই জাতীয় ঝুঁকি নিয়েছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ, দেশে নারী-প্রগতিকে ত্বরান্বিত করার জন্য। একবার এক অন্তরঙ্গ বন্ধুর সঙ্গে স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনীর আলাপ-পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে কী পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হয়েছিল তার কৌতুককর বর্ণনা পাওয়া যায় জ্ঞানদানন্দিনীর 'পুরাতনী' গ্রন্থে—

"বিয়ের আগে ছেলেরা বাইরেই থাকত, বিয়ে হলে সকলেরই একখানা আলাদা ঘর হত, সেখানে তারা শুতে আসত। ওঁর এক বন্ধু ছিলেন মনোমোহন ঘোষ। ওঁর ইচ্ছে যে তিনি আমাকে দেখেন কিন্তু আমার তো বাইরে যাবার জো নেই, অন্য পুরুষেরও বাড়ীর ভিতরে আসবার নিয়ম নেই। তাই ওঁরা দুজনে পরামর্শ করে একদিন বেশি রাত্রে সমান তালে পা ফেলে ভিতরে এলেন। তারপরে উনি মনোমোহনকে মশারির মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে নিজে শুয়ে পড়লেন। আমরা দুজনেই মশারির মধ্যে জড়সড় হয়ে বসে রইলুম; আমি ঘোমটা দিয়ে বিছানার একপাশে আর তিনি ভোম্বল দাসের মতো আর এক পাশে। লজ্জায় কারো মুখে কথা নেই। আবার কিছুক্ষণ পরে তেমনি সমানতালে পা ফেলে উনি তাঁকে বাইরে পার করে দিয়ে এলেন।"[৭০]

অনুরূপ আর-একটি ঘটনার বর্ণনা আমরা পাই— রাজনারায়ণ বসু-রচিত 'আত্মচরিত' গ্রন্থে। এখানে সেই প্রিয়বন্ধুর সহিত সহধর্মিণীর আলাপ-পরিচয় করানোর আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে। বর্ণনাটি হল এই— "ঈ-বাবু একদিন এক কাণ্ড করিলেন। তাঁহার (ঈ-বাবুর স্ত্রী) সহিত আমার আলাপ করাইয়া দিবার সাধ হওয়াতে তিনি পার্শ্বের ঘর হইতে তাঁহাকে বাহির করিবার জন্য তাঁহার হাত ধরিয়া টানিতে আরম্ভ করিলেন। তিনিও কোনমতে আসিবেন না। পরে আমি ঘর হইতে অনেক বলাতে আলাপ করানো কার্য হইতে বিরত হইলেন।"[৭১]

ঠাকুর বাড়ির মেয়ে-বউরাই প্রথম সাহস করে 'হিন্দুয়ানী'র নামে কঠোর নীতি-নিয়মের বাধা ডিঙোতে পেরেছিলেন। যে ভাবে বীরাঙ্গনার মতো জ্ঞানদানন্দিনী গভর্নর জেনারেল লর্ড লরেন্সের পার্টিতে (২৭ ডিসেম্বর, ১৮৬৬) গিয়ে যোগ দেন— তা কোনো সাধারণ মেয়ের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তিনি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপযুক্ত সহধর্মিণীই ছিলেন, সন্দেহ নেই। এই ঘটনা সম্পর্কে 'সোম প্রকাশ' পত্রিকায় (৯।৭, ১৭ পৌষ, পৃ. ১০৮) খবর প্রকাশিত হয়— "গত বৃহস্পতিবার গভর্ণর জেনেরেলের বাটীতে রাত্রিকালে যে মজলিস্ হয়, তাহাতে বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী আমাদিগের জাতীয় বস্ত্র পরিধান করিয়া উপস্থিত ছিলেন।

ইতিপূর্বে কোন হিন্দু রমণী রাজ প্রতিনিধির বাটীতে গমন করেন নাই।"[৭২] এই বিষয়টি নিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস' গ্রন্থে বলেছেন— "আমি প্রথমবার বোম্বাই থেকে বাড়ী এসে আমার স্ত্রীকে গভর্ণমেন্ট হাউসে নিয়ে গিয়েছিলুম। সে কি মহাব্যাপার। শত শত ইংরাজ মহিলার মাঝখানে আমার স্ত্রী সেখানে একটিমাত্র বঙ্গবালা— তখন প্রসন্নকুমার ঠাকুর জীবিত ছিলেন। তিনি ত ঘরের বৌকে প্রকাশ্যস্থলে দেখে রাগে লজ্জায় সেখান থেকে দৌড়ে পালিয়ে গেলেন।" সত্যেন্দ্রনাথ মনে মনে নারীজাতির প্রগতি সম্বন্ধে খুব উঁচু ধারণা পোষণ করতেন। তিনি নিজে বলেছেন—"আমাদের অন্তঃপুরে যে কয়েদখানার মত নবাবী বন্দোবস্ত ছিল তা আমার আদবে ভাল লাগত না। আমার মনে হত এই পর্দা প্রথা আমাদের জাতির নিজস্ব নয়— মুসলমান রীতির অনুকরণ। অনুকরণ এবং মুসলমান অত্যাচার হতে আত্মরক্ষা এই দুই কারণ হতে তার উৎপত্তি হতে পারে। আমাদের প্রাচীন হিন্দু আচার অন্যতর। এই অবরোধ প্রথা আমার অনিষ্টকর কুপ্রথা বলে মনে হত।"[৭৩]

মহর্ষির অপরপুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রথমদিকে ইনি নারী-প্রগতি-বিরোধী মনোভাব পোষণ করতেন; পরবর্তীকালে তাঁর সেই মনোভাবের আমূল পরিবর্তন ঘটে। তিনি তখন এত বেশি সংস্কারমুক্ত হয়ে উঠলেন যে, স্ত্রী কাদম্বরীদেবীকে অশ্বারোহণে সঙ্গে নিয়ে নিয়মিতভাবে গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে যেতেন।

সনাতনীপ্রথা ও প্রাচীন সংস্কারের নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করে, জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ির মেয়েরাই প্রথম স্ত্রী স্বাধীনতা ও প্রগতির পথ দেখালেন। যদিও এ ক্ষেত্রে ব্রাহ্মসমাজের আরও কয়েকটি পরিবারের ও খ্রীস্টান মেয়েদের কথা মনে রাখতে হবে।

যখন ঠাকুব বাড়িতে পুরোদস্তুর পর্দা প্রথা প্রচলিত ছিল তখনকার দিনে অন্তঃপুরচারিণীদেব থিয়েটার দেখানোর একটি মজার ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায়—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'ঘরোয়া' গ্রন্থে। থিয়েটার হলে গিয়ে বাড়ির মেয়েদের নাটকের অভিনয় দেখার কোনো উপায় ছিল না। অথচ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'অশ্রুমতী' নাটকের অভিনয় দেখে লোকেরা সব 'ধন্য ধন্য' করতে লাগল। কী করা যায় ? অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন— "বাবা মশায় বললেন, পুরো বেঙ্গল থিয়েটার এক রাতের জন্য ভাড়া নেওয়া হোক, কেবল আমাদের বাড়ির লোকজন থাকবে সেদিন। অ্যাকটাররা ছাড়া বাইরের লোক আর কেউ থাকবে না।

সেই প্রথম মেয়েরা ছাড়া পেলে পাবলিক স্টেজে থিয়েটার দেখতে।"[৭৪]

ব্রাহ্মসমাজের একটি বিশেষ সম্প্রদায়, যাঁরা 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' বলে পরিচিত ছিলেন— পর্দাপ্রথারহিত আন্দোলনে, তাঁদের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। ১৮২৮ খ্রীস্টাব্দের ২০ আগস্ট সর্বপ্রথম কলকাতায় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা হয়। পরে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের চেষ্টায় ও নেতৃত্বে—স্ত্রীশিক্ষা ও নারীকল্যাণমূলক নানা আন্দোলন দেখা গেল। ব্রাহ্মসমাজের তরুণ সম্প্রদায়—ডাক্তার অন্নদাচরণ খাস্তগীর, দুর্গামোহন দাস, রজনীনাথ রায় প্রমুখ অনেকেই

স্ত্রী-স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন। এ বিষয়ে রাজনারায়ণ বসু তাঁর 'আত্মচরিতে' লিখেছেন—"১৮৭২ সালে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সভ্য স্ত্রী-স্বাধীনতার বিষমপক্ষ কতকগুলি ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে যে পর্দার ভিতরে স্ত্রীলাকেরা বসিতেন, সেই পর্দার বাহিরে আপনাদিগের বাটীর স্ত্রীলোকদিগকে বসাইবার অধিকার জন্য সমাজ মন্দিরের অধ্যক্ষদিগের নিকট আবেদন করেন; কিন্তু অধ্যক্ষেরা সম্মত না হওয়াতে উক্ত সমাজের সঙ্গে সম্বন্ধ রহিত করিয়া বাহির হইয়া পড়েন।"[৭৫]

উনিশ শতকে অবরোধ প্রথা কত দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল একটি ভিন্ন ধরণের ঘটনার মাধ্যমে তার স্বরূপটি প্রকাশ পেয়েছিল। ঘটনাটি হল এই, ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে প্রিন্স অব ওয়েল্‌স্ (পরবর্তীকালে ইনি হন সপ্তম এডোয়ার্ড) ভারতে আসেন। তাঁর আগমন উপলক্ষে চারিদিকে বেশ একটা সাজ সাজ রব পড়ে গিয়েছিল। রাজা ও জমিদার শ্রেণীর লোকেরা বহুমূল্য দ্রব্য উপহার দেন ও তাঁর সংবর্ধনার আয়োজন করেন। এক সময় তিনি এদেশের অন্তঃপুরচারিণীদের সঙ্গে পরিচিত হবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ভবানীপুরের এক বিশিষ্ট ভদ্রলোক জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় এই সময় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাঁকে নিজের গৃহে নিমন্ত্রণ করেন এবং অন্তঃপুরচারিণীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। এই আগ্রহের অন্তরালে হয়তো রাজানুগ্রহলাভের তীব্র বাসনা ছিল। কিন্তু ঘটনাটি নিয়ে বঙ্গীয় সমাজে যে ভীষণ রকম উত্তেজনা ও আলোড়ন দেখা দিয়েছিল যা অভূতপূর্ব এবং সে-সব ঘটনার কথা জানলে বিস্মিত হতে হয়। এই ব্যাপারে অধিকাংশ ব্যক্তির অভিযোগ ছিল যে রাজপুত্রই হোন, আর যেই হোন, পাশ্চাত্যদেশীয় পরপুরুষকে পবিত্র অন্তঃপুরে ঢুকতে দিয়ে তিনি অন্দরমহলের পবিত্রতা নষ্ট করেছেন। এইভাবে সেদিন জগদানন্দের বিরুদ্ধে নিন্দা ও অভিযোগের ঝড় বয়ে গিয়েছিল। ঘটনাটি কতদূর পর্যন্ত গড়িয়েছিল তার আরও কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়, যেমন জগদানন্দকে অপদস্থ করার জন্য "গজদানন্দ ও যুবরাজ" নামে একটি নাটকের অভিনয় হয়েছিল 'গ্রেট ন্যাশনাল' থিয়েটারে ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দের ১৯ ফেব্রুয়ারিতে। পরিণামে থিয়েটারের পরিচালক উপেন্দ্রনাথ দাস ও ম্যানেজার অমৃতলাল বসুর বিনাশ্রমের কারাদণ্ড হয়। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো কবিও 'বাজীমাৎ' নামে একটি ব্যঙ্গ কবিতা লেখেন জগদানন্দকে লক্ষ্য করে। দুই দলের বিরোধ মেটাবার জন্য আইনের প্রয়োগ করতে হয়। জানা যায় যে, "লর্ড নর্থব্রুক একটি আইন (Dramatic Performances Control Bill, 1876, March) করে ব্রিটিশ শাসনের প্রতি মানুষের বিরূপতা জন্মাতে পারে এমন সমস্ত নাটকের অভিনয় নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন।"[৭৬]

বঙ্গীয় নারী সমাজ বলতে শুধু বিপুল সংখ্যক হিন্দু নারীকেই বোঝায় না, এঁদের সঙ্গে আছেন বাঙালি মুসলমান, খ্রীস্টান ও বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত মানুষেরা। বিশেষ করে উনিশ শতকে মুসলিম নারীদের মধ্যে এ সময়ে যে উৎকট ধরণের অবরোধ প্রথা প্রচলিত ছিল, তার কিছু পরিচয় জানা যায়। আপাত দৃষ্টিতে দেখলে মনে হতে পারে যে, উনিশ শতকের হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত নারীদের চেয়ে বোধহয় মুসলিম মেয়েরা অতিরিক্ত কিছু অধিকার ভোগ করতেন—

কারণ, তাদের মধ্যে পণ প্রথা ছিল না, বিধবা বিবাহ প্রচলিত ছিল, স্বামীকে ত্যাগ করে আবার বিবাহ করার অধিকার ছিল এবং পিতার সম্পত্তিতে কন্যার অধিকার ছিল ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু মুসলিম মেয়েদের মধ্যে যে 'বোরখা' রীতি বা অবরোধ প্রথা প্রচলিত ছিল, তার প্রচণ্ডতা এবং সেইসঙ্গে অশিক্ষা ও কুসংস্কার তাদের জীবনকে বিষময় করে তুলেছিল। এই সব নানা কারণে অধিকাংশ মুসলিম মেয়েদের পশুরও অধম হয়ে জীবন যাপন করতে হয়েছে। উনিশ শতকের এক বিশিষ্ট মুসলিম মহিলা সাহিত্যিক বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন তাঁর রচিত 'অবরোধবাসিনী' নামক গ্রন্থে "কতকগুলি ঐতিহাসিক ও চাক্ষুষ সত্য ঘটনার" যে পরিচয় দিয়েছেন, তা পড়লে কখনো হাসি পায়, আবার কোনো ঘটনা এতই করুণ যে দুঃখের অবধি থাকে না। একটিমাত্র মর্মান্তিক ঘটনার উল্লেখ করছি উদাহরণস্বরূপ— "আমার দূর-সম্পর্কীয়া এক মামী-শাশুড়ী ভাগলপুর হইতে পাটনা যাইতেছিলেন, সঙ্গে মাত্র একজন পরিচারিকা ছিল। কিউল ষ্টেশনে ট্রেন বদল করিতে হয়। মামানী সাহেবা অপর ট্রেনে উঠিবার সময় তাঁহার প্রকাণ্ড বোরকায় জড়াইয়া ট্রেন ও প্লাটফরমের মাঝখানে পড়িয়া গেলেন। ষ্টেশনে সে সময় মামানীর চাকরাণী ছাড়া অপর কোন স্ত্রীলোক ছিল না। কুলিরা তাড়াতাড়ি তাঁহাকে ধরিয়া তুলিতে অগ্রসর হওয়ায় চাকরাণী দোহাই দিয়া নিষেধ করিল—"খবরদার ! কেহ বিবি সাহেবার গায়ে হাত দিও না।" সে একা অনেক টানাটানি করিয়া কিছুতেই তাঁহাকে তুলিতে পারিল না। প্রায় আধ ঘণ্টা পর্যন্ত অপেক্ষা করার পর ট্রেন ছাড়িয়া দিল।

ট্রেনের সংঘর্ষে মামানী সাহেবা পিষিয়া ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেলেন, কোথায় তাঁহার 'বোরকা'— আর কোথায় তিনি !' স্টেশন ভরা লোক সবিস্ময়ে দাঁড়াইয়া এই লোমহর্ষণ ব্যাপার দেখিল,— কেহ তাঁহার সাহায্য করিতে অনুমতি পাইল না। পরে তাঁহার চূর্ণপ্রায় দেহ একটা গুদামে রাখা হইল; তাঁহার চাকরাণী প্রাণপণে বিনাইয়া কাঁদিল আর তাঁহাকে বাতাস করিতে থাকিল। এই অবস্থায় এগার ঘণ্টা অতিবাহিত হইবার পর তিনি দেহত্যাগ করিলেন। কী ভীষণ মৃত্যু!"[৭৭]

এই জাতীয় শোচনীয় পরিস্থিতির হাত থেকে রক্ষা পেতে ও মুক্তি অর্জন করতে বঙ্গরমণীদের অনেক বেগ পেতে হয়েছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

নারীর দায়াধিকার ও স্ত্রীধন

কোনো দেশের সমাজে ও পরিবারে নারীর অধিকার ও প্রতিষ্ঠা কতখানি, তার যথাযথ বিচারের যে-সব নিরিখ আছে, তার মধ্যে একটি হল সেই দেশে প্রচলিত দায়াধিকার বা উত্তরাধিকারের নীতি-নিয়ম। উত্তরাধিকার আইনে সম্পত্তির বিলিব্যবস্থার সঙ্গে নারীদের ঠিক কোন্ ধরণের, কতটা যোগ বর্তমান, তারই উপর ভিত্তি করে তাদের অধিকারের গুরুত্বের একটি পরিমাপ করা যায়। যদিও আমাদের দেশে সর্বত্র ও সর্বকালে উত্তরাধিকারের নীতি বা নিয়ম এক রকম ছিল না। তার কারণ বিশাল ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বহু ধর্ম-শাস্ত্রকারের আবির্ভাব ঘটেছিল কালে কালে। তাঁদের মধ্যে প্রধানত দুই শ্রেণীর মানুষ দেখতে পাওয়া যায়। এক শ্রেণীর শাস্ত্রকার ছিলেন অত্যন্ত উদার মতাবলম্বী; বিশেষ করে নারীজাতি সম্বন্ধে তাঁদের মনে ছিল একটি সম্ভ্রমের ভাব ও গভীর সহানুভূতি। কিন্তু আর-এক শ্রেণীর রক্ষণশীল শাস্ত্রকারের মনে ছিল নারী জাতি সম্পর্কে অকরুণ ও অনুদার দৃষ্টিভঙ্গি। সবার মতামত নিয়ে তুলনামূলক বিস্তৃত আলোচনা করার অবকাশ বা প্রয়োজন এখানে নেই। সুপরিচিত স্মৃতিকার মনু দায়াধিকার সম্পর্কে অনেক আলোচনা করেছেন। পিতার সম্পত্তিতে অবিবাহিত মেয়েদের অধিকার সম্বন্ধে তিনি বলেছেন যে—ছেলেরা পিতার সম্পত্তির যে ভাগ পাবে, অবিবাহিতা ভগিনীকে দিতে হবে তার এক-চতুর্থাংশ (মনু. ৯।১১৮)। তবে বঙ্গদেশে যে শাস্ত্রকারের দায়াধিকার প্রচলিত ছিল তিনি হলেন জীমূতবাহন (একাদশ শতাব্দী)। এদেশে জীমূতবাহনের অনুশাসন মেনে চলা হত অথচ ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে প্রচলিত ছিল বিজ্ঞানেশ্বরের মিতাক্ষরা। দুই শাস্ত্রকারের বিচারের ভিত্তি ও পদ্ধতি ছিল দুই রকমের—"মিতাক্ষরা রক্তের সম্বন্ধ দিয়াই দায়াধিকারের ক্রম ব্যবস্থা করিয়াছেন। দায়ভাগে পিণ্ডাধিকার দিয়াই বিচার। অর্থাৎ মিতাক্ষরার মতে রক্ত সম্বন্ধে যেই যত ঘনিষ্ঠ তাহারই তত বেশি দায়াধিকার। আর দায়ভাগে জীমূতবাহন দেখিয়েছেন শ্রাদ্ধে এবং পিণ্ডে কাহার দাবি বেশি।"[৭৮]

উত্তরাধিকার বিষয়ে জীমূতবাহনের নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন এদেশে বহুকাল ধরে অনুসৃত হয়েছে। বর্তমান কালে অবশ্য নতুন আইনের বলে প্রচীন প্রথা ও রীতির আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। ১৯৫৬ খ্রীস্টাব্দে যে নূতন হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের প্রবর্তন ঘটেছে, তাতে পিতার সম্পত্তিতে পুত্র ও কন্যার সমঅধিকার স্বীকৃত হয়েছে। এই জাতীয় অধিকার-বৈষম্যের অবসান ঘটায় নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে, সন্দেহ নেই। কারণ পূর্বের নিয়ম অনুযায়ী একমাত্র 'স্ত্রীধন'

ভিন্ন অন্য কোনো সম্পত্তিতে নারী জাতির অধিকার থাকলেও, তা ছিল শুধুমাত্র ভোগ-দখলের অধিকার।-- দান বা বিক্রয়ের অধিকার ছিল না। উত্তরাধিকার বিষয়ে মেয়েদের অধিকার না থাকার জন্য সমাজে ও পরিবারে ছেলেদের যে সমাদর ছিল, মেয়েদের তা ছিল না। কন্যা সন্তান এই কারণের জন্যও অবহেলার বস্তু বলে গণ্য হত অনেক সময়।

সেকালে স্ত্রীধন ভিন্ন অন্য সম্পত্তিতে নারীর দান বা বিক্রয়ের স্বত্ব না থাকায় নিঃসম্বল নারীদের জীবনের শোচনীয় পরিণতি দেখা যেত অনেক সময়। কারণ আর্থিক স্বয়ম্ভরতা না থাকলে, স্বনির্ভরতাও থাকে না। যেমন কোনো নারীর স্বামী বা অভিভাবকের কোনো কারণে অকালমৃত্যু ঘটলে, তার জ্ঞাতিরা অনেক সময় তার গ্রাসাচ্ছাদনের দায়িত্ব গ্রহণ করতেন না। প্রাণের দায়ে তিনি তখন নিরুপায় হয়ে কোনো হীন বৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য হতেন; অভিজাত ঘরের কন্যা বা বধূ বলেও তাঁর অভিমান বা নিষেধ তিনি মানতে অপারগ হতেন। এই জাতীয় একাধিক দৃষ্টান্ত স্বচক্ষে দেখেছিলেন আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী মহাশয়। তিনি লিখেছেন— "বাল্যকালে কাশীতে দেখিয়াছি বহু বহু অভিজাতা নারী জ্ঞাতিদের ও পিতৃকুলের লোকের দ্বারা বৃত্তি বঞ্চিত হইয়া কাশীতে দাসী বা পাচিকার বৃত্তি গ্রহণ করিয়া জীবন কাটাইয়াছেন। কেহ কেহ ভিক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। দুরবস্থায় পড়িয়া অনেকে পতিতা হইতেও বাধ্য হইয়াছেন।"[৭৯]

এই অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ভোগের ব্যাপারে উচ্চ ও নিম্নবর্ণের নারীদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। জাতিভেদের কঠোরতা থাকায় নিম্নবর্ণের মেয়েদের জীবনযাপন প্রণালীর সঙ্গে উচ্চবর্ণের নারীদের জীবনযাত্রাব দুস্তব ব্যবধান গড়ে উঠেছিল। অভিজাত ঘরের মেয়েদের স্বনির্ভর হবার কোনো উপায় ছিল না। কারণ হল তাদের নিজেদের অর্থোপার্জন করার কোনো স্বাধীনতা ছিল না। বাল্যবিবাহের ফলে তারা শৈশবে পিতৃগৃহ থেকে শ্বশুরালয়ে নির্বাসিত হত। শ্বশুরকুলের যৌথ পরিবারে, অন্দরমহলের চৌহদ্দির মধ্যে সাংসারিক কাজকর্ম, সন্তান পালন, পরিবারভুক্ত লোকদের আদর-আপ্যায়ন ও সেবাযত্ন করেই কাটাতে হত সারাটি জীবন। কাজেই বিবাহের আগে পিতা এবং বিবাহের পরে প্রথমে স্বামী ও পরবর্তী জীবনে পুত্রেরা তাঁদের ভরণপোষণের দায়িত্ব বহন করে চলতেন। এর অন্যথা হলেই— হত সর্বনাশ। এইভাবে সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েরা দীর্ঘদিন ধরে পরজীবী হয়েই জীবন যাপন করেছেন। এ বিষয়ে তাঁদেব মনে কোনো অভাববোধ বা দৈন্য ছিল না। বরং গৃহিণী পদে আরোহণ করে অনেকেই বেশ দোর্দণ্ডপ্রতাপশালিনী হয়ে উঠতেন। 'পরের ধনে পোদ্দারী' করছেন, একথা ভুলেও তাঁদের মনে পড়ত না। কারণ স্বামী-স্ত্রীর একাত্মতা বোধটি প্রবল থাকায়, মনে কোনো গ্লানি না রেখে স্বাভাবিক ভাবে মনে প্রসন্ন ভাব বজায় রেখে সুখে দুঃখে তাঁরা সংসারযাত্রা নির্বাহ করতেন অনায়াসে। তাঁরা জানতেন সংসারের বাইরের জগতে গৃহকর্তাব অধিকার এবং অন্দরমহলে গৃহকর্ত্রীর অধিকার। দৈবাৎ কোনো কারণে এর অন্যথা ঘটলে নারী ও শিশুদের ভাগ্যবিপর্যয় ঘটত এবং তাদের নানাবিধ দুঃখের সীমা-পরিসীমা থাকত না। এবিষয়ে সেকালের পুরুষ বা মহিলাদের লেখা আত্মজীবনী

থেকে ভূরিভূরি উদাহরণ তুলে দেওয়া যেতে পারে। সাধারণভাবে দেখা যেত অসহায় বিধবা বা স্বামী-পরিত্যক্তা নারীর ভরণপোষণের ভার নিতেন পরিবারভুক্ত অন্যান্য আত্মীয়স্বজনরা, তার কারণ একান্নবর্তী পরিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। তবুও অর্থাভাবে নানা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হত তাঁদের। কারণ ভদ্রঘরের মেয়েদের জীবিকা-অর্জনের ক্ষেত্রটি ছিল বড়োই সংকীর্ণ। চরকায় সুতা কেটে সামান্য কিছু উপার্জন করা ভিন্ন অন্য কোনো পন্থা তাঁদের জানা ছিল না। অথচ তুলনামূলক আলোচনা করলে দেখা যাবে, ভদ্রেতর শ্রেণীর মেয়েদের জীবনে এই জাতীয় কোনো সমস্যা ছিল না। অভাবের তাড়নায় নিম্নবর্ণের নারীরা চিরকালই গায়ে গতরে খেটে অর্থ উপার্জনে ও জীবিকা নির্বাহে অভ্যস্ত ছিল। তাদের মধ্যে বাল্য-বিবাহ থাকলেও পর্দাপ্রথা ছিল না। মঙ্গলকাব্যগুলিতে অনুসন্ধান করলে নিম্নশ্রেণীর নারীদেব স্ব-নির্ভরতার নানা চিত্র চোখে পড়বে। উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে ষোড়শ শতাব্দীর প্রতিভাশালী বাস্তবনিষ্ঠ কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য থেকে। কালকেতুব্যাধের উপাখ্যানে দেখা যায় ব্যাধের গৃহে বংশানুক্রমিক ভাবে মেয়ে-পুরুষে মিলে অর্থ উপার্জন করত। শিকার করে যে-সব জন্তুজানোয়ার মেরে পুরুষেরা ঘরে আনত, মেয়েরা হাটে বসে ঐ-সব মাংস বিক্রি করত—কালকেতুর মা নিদয়া, শাশুড়ী হীরাবতী ও পত্নী ফুল্লরা সকলেই তাই করেছে। সেখানে আছে—"হীরা নিদয়ার কাছে/মাংসের পশরা বেচে/ ফুল্লরা তাহার সন্নিধানে।"[৮০]

অথচ তারই পাশাপাশি অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে ভদ্রগৃহস্থ ঘরের মেয়ে-বউ ও তাদের সন্তান সন্ততিরা খাদ্যাভাবে মারা পড়লেও, অর্থোপার্জনের কোনো রকম চেষ্টা করতেন না। কারণ তাঁদের পক্ষে এটি ছিল নিষিদ্ধ কর্ম। সৎ উপায়ে অর্থ উপার্জন করলেও তাঁদের মর্যাদা হানি ঘটত এবং সকলের নিকট নিন্দাভাজন হতে হত। কোনো কিম্বদন্তীমূলক কাহিনী নয়, স্বয়ং বিদ্যাসাগরের আত্মজীবনী থেকে এই জাতীয় একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত এখানে তুলে ধরা হল: তাঁর পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ ছিলেন একজন অসাধারণ তেজস্বী পুরুষ, তাঁর পিতামহী দুর্গাদেবীও ছিলেন তাঁর যোগ্য সহধর্মিণী। একবার রামজয় কিছুকালের জন্য গৃহত্যাগী হলেন, ঐ সময় দুর্গাদেবী তাঁর চারটি কন্যা ও দুই পুত্রকে নিয়ে বড়োই বিপদে পড়লেন। উপায়ান্তর না দেখে তিনি পিত্রালয়ে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। তাঁর এই অসহায় অবস্থা দেখে ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূ তাঁদের সঙ্গে নানা ধরণের দুর্ব্যবহার করতে লাগলেন। তাঁদের প্রতি এই অবহেলা দেখে দুর্গাদেবীর পিতা উমাপতি সিদ্ধান্ত মহাশয় কন্যা ও তার সন্তানদের লাঞ্ছনা-গঞ্জনার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য নিজের বাড়ির নিকটবর্তী স্থানে একটি কুটির নির্মাণ করে দিলেন। সেখানেই কোনোক্রমে দুর্গাদেবী তাঁর সন্তানদের নিয়ে দিন কাটাতে লাগলেন। কিছুদিন পরে যখন তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র ঠাকুরদাস (বিদ্যাসাগরের পিতা) কর্মক্ষম হয়ে উঠলেন, তখন তাঁদের দুঃখকষ্টের কিছুটা লাঘব হল। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁর পিতামহী দুর্গা ঠাকুরাণীর দুঃখপূর্ণ জীবনের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন— "ঐ সময়ে টেকুয়া ও চরখায় সুতা কাটিয়া সেই সুতা বেচিয়া অনেক নিঃসহায়

নিরুপায় স্ত্রীলোক আপনাদের দিনগুজরান করিতেন। দুর্গাদেবী সেই বৃত্তি অবলম্বন করিলেন। তিনি একাকিনী হইলে, অবলম্বিত বৃত্তি দ্বারা অবলীলাক্রমে, দিনপাত করিতে পারিতেন কিন্তু তাদৃশ স্বল্প আয় দ্বারা নিজের, দুই পুত্রের ও চারিকন্যার ভরণপোষণ সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নহে। তাঁহার পিতা সময়ে সময়ে যথাসম্ভব সাহায্য করিতেন; তথাপি তাঁহাদের আহারাদি সর্ববিষয়ে, ক্লেশের পরিসীমা ছিল না।" ৮১

এই জাতীয় ঘটনার বর্ণনা প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় এদেশে বহুপ্রচলিত একটি প্রবাদ বাক্য— 'বাপ রাজা তো রাজার ঝি ভাই রাজা তো আমার কি ?'। কিন্তু সব ভাইরা কখনোই এমন নিষ্ঠুর ও নির্মম ছিলেন না, তারও আবার বহু নির্দশন দেখা যায়। এর থেকে যে বিষয়টি জানা যায় তা হল এই যে শত প্রয়োজন থাকলেও ভদ্র ঘরের মেয়েরা কর্মক্ষম হয়েও, কখনো অর্থোপার্জনের চেষ্টা করতেন না, কেননা তা ছিল সেকালে লোকাচার ও দেশাচার-বিরুদ্ধ কাজ।

স্ত্রীধন

'স্ত্রীধন' শব্দটি একটি পরিভাষা বিশেষ। উত্তরাধিকার ব্যাপারে নারীজাতির যথাযথ অধিকার স্বীকৃত না হলেও, স্ত্রীধনের ক্ষেত্রে ছিল তাদের অখণ্ড অধিকার। শুধু মাত্র ভোগ-দখল নয়, এ ব্যাপারে তারা দান বা বিক্রয়ের পূর্ণ অধিকার ভোগ করত। এখন কথা হল এই 'স্ত্রীধন' বলতে কোন্‌গুলিকে বোঝানো হত ? 'স্ত্রীধন' শব্দের বিশেষ অর্থ বোঝাতে গিয়ে শাস্ত্রকাররা বলেছেন, বিবাহকালে বর ও বধূ একত্রে 'আশীর্বাদী' হিসাবে যে-সব টাকা-পয়সা, অলংকার ও অন্যান্য বস্তুলাভ করে, সেই সব বস্তুকে বোঝায়। মনু ছয় প্রকার স্ত্রীধনের কথা বলেছেন—

"অধ্যগ্ন্য ধ্যাবাহনিকং দত্তঞ্চ প্রীতিকর্ম্মণি।
ভ্রাতৃমাতৃপিতৃপ্রাপ্তং ষড়্‌বিধং স্ত্রীধনং স্মৃতম্‌।।"

(মনু. ৯।১৯৪)

অর্থাৎ এই ছয় রকমের ধন হল অধ্যগ্নি (বিয়ের সময় অগ্নির সামনে পিতৃকুল থেকে প্রাপ্তধন), অধ্যাবাহনিক (পিতার গৃহ থেকে পতিগৃহে আসার সময় যে ধন নিয়ে আসা হয়েছে), প্রীতিদত্ত (পতি প্রীতিবশত যা দিয়েছেন), এ ছাড়া ভ্রাতৃদত্ত, মাতৃদত্ত ও পিতৃদত্ত অর্থাৎ বিভিন্ন সময় ভালোবেসে ভাই, মা, বাবা যা উপহার দিয়েছেন— তা-ই হল স্ত্রীধন। মায়ের যৌতুকধন প্রাপ্য ছিল কুমারী কন্যার। এই স্ত্রীধনের গুরুত্ব সম্বন্ধে এমন কথাও জানা যায় যে, "স্ত্রীধনে নারীরই অধিকার। স্বামী তাহা হইতে কিছু লইতে বাধ্য হইলেও তাহা পরিশোধ করিতে বাধ্য। তবে আপৎকালে বা স্বামী অসমর্থ হইলে স্বতন্ত্র কথা।" ৮২

সেকালে নারীদের দায়াধিকার ও স্ত্রীধন সম্বন্ধে মোটামুটি এইসব তথ্যই জানা যায়। সমাজ বিষয়ক যাবতীয় রীতিনীতির পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, উনিশ শতকের সমাজ-সংস্কার আন্দোলনে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল নারীকল্যাণমূলক বিষয়গুলিকে। সেকালে চিন্তাশীল

ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা বুঝেছিলেন যে, স্বাভাবিক মানবাধিকারে বঞ্চিত নারী জাতির উন্নতি ব্যতিরেকে, জাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সম্ভব নয়। ক্রমশ মধ্যবিত্ত ও শিক্ষিত উদারমনোভাবাপন্ন মানুষেরাও এগিয়ে এলেন মনীষী ব্যক্তিদের ঐসব কাজে সাহায্য করতে। অচিরেই তার সুফল দেখা গেল।

নির্দেশিকা

প্রথম পরিচ্ছেদ

১। 'ভারতপথিক রামমোহন রায়' (প্রবন্ধ), রবীন্দ্র-রচনাবলী একাদশ খণ্ড (জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ) পৃ.৪০১

২। 'ধর্ম' গ্রন্থের 'ততঃ কিম্' (প্রবন্ধ), রবীন্দ্র-রচনাবলী দ্বাদশ খণ্ড (জন্মশত-বার্ষিকী সংস্করণ) পৃ. ৮১

৩। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা। ৯ম খণ্ড (জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ) পৃ.-৪৭৯।

৪। বঙ্কিম রচনাবলী। ২য় খণ্ড। পৃ. ৩৯৯। (সাহিত্য সংসদ)

৫। গোরাচাঁদ মিত্র, 'সতীদাহ' (১ম প্রকাশ, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৬

৬। ঋগ্বেদ সংহিতা (হরফ প্রকাশনী) ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৬৩

৭। কুমুদনাথ মল্লিক, 'সতীদাহ' (১৩২০ বঙ্গাব্দ) পৃ. ১০১

৮। তদেব

৯। স্বপন বসু, 'সতী' (১৯৭৮ খ্রী. ১ম সংস্করণ) পৃ. ৬৬

১০। গোরাচাঁদ মিত্র, 'সতীদাহ' পৃ. ৩১

১১। তদেব, পৃ. ৬৮

১২। সুশীলকুমার গুপ্ত, 'উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গলার নবজাগরণ' (২য় সংস্করণ ১৯৭৭), পৃ: ১৯৪-৯৫

১৩। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য, 'বাংলার লোকসাহিত্য' পৃ. ৩২৬

১৪। মাখনলাল রায়চৌধুরী শাস্ত্রী 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' (২য় খণ্ড), পৃ. ৩৪৭। পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

১৫। স্বপন বসু, 'সতী', পৃ. ১২৯

১৬। গোরাচাঁদ মিত্র, 'সতীদাহ', পৃ. ১৫৮

১৭। গোরাচাঁদ মিত্র, 'সতীদাহ', পৃ. ২১৪

১৮। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধায়, 'মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত' (৫ম সংস্করণ) পৃ. ১৯৭; অগ্রহায়ণ ১৩৯৭ সংস্করণ, পৃ. ১৪

১৯। তদেব, পৃ. ১৪

২০। রবীন্দ্র-রচনাবলী একাদশ খণ্ড (জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ), পৃ. ৩৬০

২১। গোবাচাঁদ মিত্র, 'সতীদাহ', পৃ. ৩১

২২। স্বপন বসু, 'সতী'- পৃ. ৬৯ (মূল কবিতাটি এই গ্রন্থেব 'পরিশিষ্ট' অংশের ১৬৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

২৩। রবীন্দ্র-রচনাবলী একাদশ খণ্ড (জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ) 'চারিত্র পূজা' বিদ্যাসাগর চরিত (প্রবন্ধ), পৃ. ৩৪৯

২৪। সাহিত্য সাধক চরিতমালা (১৮ নং গ্রন্থ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ) পৃ. ১২৭; অপিচ দ্রষ্টব্য, বিনয় ঘোষ, 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালি সমাজ', শ্রাবণ ১৩৭১, পৃ. ২৩৯

২৫। বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ। ২য় খণ্ড। (সাক্ষরতা প্রকাশন), পৃ. ১২৭

২৬। তদেব, 'বাল্য বিবাহের দোষ' পৃ. ৮

২৭। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায, 'বিদ্যাসাগর' (জীবনীগ্রন্থ) (১৩৭৬ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৪৮

২৮। রবীন্দ্র-রচনাবলী। একাদশ খণ্ড। পৃ. ৩৪১

২৯। সংসদ বাঙ্গালী চরিতাভিধান। পৃ. ১৯৭

৩০। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বিদ্যাসাগর' পৃ. ২৫৮

৩১। ড. অজয়েন্দ্রনাথ সরকার, 'উনিশ শতকের সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা বিতর্ক রচনা'। (১৯৮২) পৃ. ৬৮

৩২। সুশীলকুমার গুপ্ত, 'উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ' (২য় সংস্করণ, ১৯৭৭), পৃ. ২০৬

৩৩। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য, 'বাংলা সামাজিক নাটকের বিবর্তন' (১ম সংস্করণ ১৯৬৪), পৃ. ৯৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

৩৪। বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ। ২য় খণ্ড। ৩য় সংস্করণ (১৯৭৪) (সাক্ষরতা প্রকাশন) পৃ. ৬২

৩৫। তদেব, পৃ. ৩৫৯

৩৬। পরিমলভূষণ কর, 'সমাজতত্ত্ব', পৃ. ১৮১

৩৭। রমেশচন্দ্র মজুমদার, 'বাংলা দেশের ইতিহাস' ১ম খণ্ড (১ম সংস্করণ ১৩৫২ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৮২

৩৮। তদেব, ৩য় খণ্ড (আধুনিক যুগ) ২য় সংস্করণ। পৃ. ৩৪৭

৩৯। স্বপন বসু, 'সতী' (১ম সংস্করণ), পৃ. ৮৯

৪০। বিনয় ঘোষ, 'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র। ৩য় খণ্ড। পৃ. ৫৭১-৭২

৪১। নিস্তারিণী দেবী, সেকেলে কথা, 'আত্মকথা' ২য় খণ্ড। ১ম সংস্করণ ১৯৮২, পৃ. ৪

৪২। রমেশচন্দ্র মজুমদার, 'বাংলাদেশের ইতিহাস'- ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৪৮

৪৩। 'দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়', সাহিত্য সাধক চরিতমালা-গ্রন্থসংখ্যা ৮০ (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ), পৃ. ৯

৪৪। ড. অজযেন্দ্রনাথ সরকার, 'উনিশ শতকের সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা বিতর্ক রচনা', (১ম প্রকাশ ১৯৮২), পৃ. ৭২

৪৫। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য, 'বাংলা সামাজিক নাটকের বিবর্তন', পৃ. ৬৫

৪৬। বিনয় ঘোষ, 'বিদ্যাসাগর', পৃ. ২৫৮

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

৪৭। ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, 'বাঙ্গলার ইতিহাস' (২য় সংস্করণ ১৩৮৩), পৃ. ১৭৪

৪৮। দীনেশচন্দ্র সেন, 'বৃহৎবঙ্গ', পৃ. ৬৫৩

৪৯। 'বিদ্যাসাগর', চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংস্করণ, ১৩৭৬), পৃ. ২৮৭

৫০। আনন্দবাজার পত্রিকা (শারদীয়া সংখ্যা) ১৩৯২ বঙ্গাব্দে 'কিশোরী ভজনা অথবা বাবুদের প্রণয় প্রকরণ'- 'শ্রীপান্থ' রচিত প্রবন্ধ থেকে তালিকাটি গৃহীত হয়েছে।

৫১। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য, 'বাংলা সামাজিক নাটকের বিবর্তন' (১ম সংস্করণ - ১৯৬৪) পৃ. ১৫১

৫২। রবীন্দ্র-রচনাবলী। ত্রয়োদশ খণ্ড (জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ) 'সমাজ' প্রবন্ধ গ্রন্থ। পৃ. ১৬

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

৫৩। আন্তর্জাতিক নারীবর্ষে (১৯৭৫ খ্রী) পশ্চিমবঙ্গে সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকা 'আইনে মেয়েদের কি কি অধিকার জানেন কি ?' — দ্রষ্টব্য, পৃ. ৩

৫৪। রবীন্দ্র-রচনাবলী (ত্রয়োদশ খণ্ড, 'স্বদেশ ও সমাজ') (জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ) পৃ. ৪৩

৫৫। ক্ষিতিমোহন সেন, 'প্রাচীন ভারতে নারী', পৃ. ৪০

৫৬। নীহাররঞ্জন রায়, 'প্রাচীন বাংলার দৈনন্দিন জীবন' (বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ), পৃ. ১৪

৫৭। বিনয় ঘোষ-সম্পাদিত 'সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র', ৪র্থ খণ্ড (১ম সংস্করণ) পৃ. ২০৬-২০৭

৫৮। রমেশচন্দ্র মজুমদার, 'বাংলাদেশের ইতিহাস', আধুনিক যুগ ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩০১

৫৯। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য, 'বাংলা সামাজিক নাটকের বিবর্তন', পৃ. ৬৫

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

৬০। সাহানা দেবী, 'স্মৃতির খেয়া', (প্রথম প্রকাশ ১৯৭৮), পৃ. ৬৪

৬১। প্রতিমা দেবী, 'স্মৃতিচিত্র', ১ম সংস্করণ, ১৩৫১, পৃ. ১৩

৬২। সুধীরঞ্জন দাস, 'যা দেখেছি যা পেয়েছি', পৃ. ১০২

৬৩। *The Social Status of Women* by Indra, pp. 70–73.

৬৪। রমেশচন্দ্র মজুমদার, 'বাংলা দেশের ইতিহাস', আধুনিক যুগ। ২য় সংস্করণ, পৃ. ১১২

৬৫। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'দুই নারী ও তিন নায়িকা', পৃ. ১০২

৬৬। রবীন্দ্র-রচনাবলী দশম খণ্ড (জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ।)। 'ছেলেবেলা', পৃ. ১৫০

৬৭। তদেব, পৃ. ১৩১

৬৮। প্রতিমা দেবী, 'স্মৃতিচিত্র', পৃ.১৮-২১

৬৯। রবীন্দ্র রচনাবলী দশম খণ্ড, পৃ. ১৫০-৫১

৭০। 'পুরাতনী' জ্ঞানদানন্দিনী দেবী রচিত ও ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী কর্তৃক লিখিত (১ম সংস্করণ ১৯৫৬), পৃ. ২৪-২৫

৭১। রাজনারায়ণ বসু, 'সেকাল ও একাল' পৃ. ৮৪

৭২। প্রশান্তকুমার পাল, 'রবিজীবনী' ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৪

৭৩। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'আমার বাল্যকথা', (৩য় সংস্করণ, ১৯৮৩), পৃ. ১২

৭৪। অবনীন্দ্র রচনাবলী। ১ম খণ্ড (প্রথম প্রকাশ ১৯৭৩) 'ঘরোয়া', পৃ. ১২৭

৭৫। রাজনারায়ণ বসু, 'আত্মচরিত', পৃ. ১১০ [আত্মকথা-১ম খন্ড, অনন্য প্রকাশন ১৯৮১]

৭৬। পদ্মিনী সেনগুপ্ত, 'তরু দত্ত', (ভারতীয় সাহিত্যকার পুস্তকমালা সাহিত্য একাডেমী) পৃ. ৬৯

৭৭। 'রোকেয়া রচনাবলী' আবদুল কাদির সম্পাদিত (বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১ম সংস্করণ ১৯৭৩), পৃ. ৪৮২

সপ্তম পরিচ্ছেদ

৭৮। ক্ষিতিমোহন সেন, 'প্রাচীন ভারতে নারী', পৃ. ৯৮

৭৯। তদেব, পৃ. ৯৮

৮০। কবিকঙ্কণ চণ্ডী (নূতন সংস্করণ ১৯৫২), পৃ. ১৭২ (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত)

৮১। বিদ্যাসাগর চরিত, বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ। ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৯০

৮২। ক্ষিতিমোহন সেন, 'প্রাচীন ভারতে নারী', পৃ. ১১৪



চতুর্থ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

বঙ্গে স্ত্রী শিক্ষার প্রবর্তন ও প্রসার

প্রাচীন ও মধ্যযুগে এদেশে বালিকাদের প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে প্রেরণ ক'রে ব্যাপক হারে স্ত্রীশিক্ষা দানের রীতি প্রচলিত ছিল না। অথচ তখনকার দিনের অনেক বিদুষী নারীর কথা শোনা যায়। তাঁরা প্রায় সকলেই নিজেদের চেষ্টায় বাড়িতে বসে জ্ঞান অর্জন করতেন। এ বিষয়ে তাঁদের সহায় ছিলেন জ্ঞানী ও গুণী পিতা, ভ্রাতা, স্বামী প্রভৃতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজন।

সুশিক্ষাই মানুষের হৃদয় ও মনের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করে। বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি গড়ে তুলতে হলে, নরনারী নির্বিশেষে সমাজের প্রতিটি মানুষকে যথার্থ শিক্ষার অধিকার দিতে হবে। অবশ্য 'শিক্ষা' কথাটিকে যদি আমরা প্রচলিত অর্থে গ্রহণ না করে যথার্থ অর্থে গ্রহণ করি, তা হলে এর সংজ্ঞাটি দাঁড়ায় এইরকম—"শিক্ষা বলিতে কতকগুলি শব্দ শেখা নহে, আমাদের বৃত্তিগুলির শক্তিসমূহের বিকাশকেই শিক্ষা বলা যাইতে পারে। শিক্ষা বলিতে ব্যক্তিকে এমনভাবে গঠন করা, যাহাতে তাহার ইচ্ছা সদ্বিষয়ে ধাবিত হয় এবং সফল হয়।"[১]

সেকালে বঙ্গীয় নারীসমাজ বিশেষভাবে শিক্ষিত না হলেও, অন্ততপক্ষে 'অশিক্ষিত' ছিলেন না। যদিও দীর্ঘকাল ধরে তাঁরা পুঁথিগত বিদ্যা অর্জনের অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিলেন, তবুও বিশেষ এক ধরণের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধারাকে তাঁরা বহন করে চলেছিলেন, বংশ-পরম্পরায়। মনোগত শিক্ষা ও শিষ্টাচারের দিক থেকে তাঁরা ছিলেন 'স্ব-শিক্ষিত' অবশ্য ভদ্র ও শিক্ষিত ঘরের মেয়েদের মধ্যে পুঁথিগত শিক্ষার অভাবও ছিল না। গ্রামেই তখন অধিকাংশ মানুষ বসবাস করতেন। সেকালের স্ত্রী শিক্ষা সম্পর্কে প্রসন্নময়ী দেবী তাঁর 'পূর্বকথা' নামক গ্রন্থে বলেছেন—"আমাদের গ্রামের অধিকাংশ রমণী তৎকালে লেখাপড়া জানিতেন। ছাপার পুস্তক পাঠ ও নাম স্বাক্ষর করিতে না পারিতেন, এমন নারী সেকালে অল্পই ছিলেন ; তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ রীতিমতো লেখাপড়া জানিতেন কেহ বা কাজ চালাইতে পারিতেন, এই যা প্রভেদ।"[২]

এক সময় বৈষ্ণবীরা অন্তঃপুরিকাদের শিক্ষার ভার নিতেন। যেমন— 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনস্মৃতি'তে আছে "একজন 'ভবিষ্যুক্ত' তিলককাটা বৈষ্ণবী আসিতেন, তিনি অন্দরে মেয়েদের লেখাপড়া শেখাইতেন।"[৩]

পরবর্তীকালে অবশ্য ঠাকুর বাড়ির পর্দাপ্রথার কড়াকড়ি কিছুটা শিথিল হল। তখন আর

'বৈষ্ণব ঠাকুরাণী' নয়— মিস্ গোমিস্ প্রভৃতি খ্রীস্টান মেমসাহেব এসে মেয়েদের পড়াশুনো করাতেন। আরও পরে প্রৌঢ় পণ্ডিত অযোধ্যানাথ পাকড়াশি, অন্তঃপুরের মেয়েদের পড়ানোর ভার নিয়েছিলেন। শেষে বেথুন স্কুল ও কলেজে ঠাকুর বাড়ির মেয়েরা পড়তে লাগলেন। কেশবচন্দ্র সেনের গৃহেও মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর জন্য মিশনারি নিযুক্ত করা হয়েছিল।

পল্লীগ্রামের সাধারণ মেয়েরা কেমনভাবে লেখাপড়ার চর্চা করতেন, শিবনাথ শাস্ত্রীর মাতা গোলকমণির কথায় তা জানতে পারা যায়। শিবনাথের পিতা হরানন্দ নিজ পত্নীকে বাড়িতে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন তার বিবরণ পাওয়া যায়—"তখন পল্লীগ্রামে স্ত্রী শিক্ষার তেমন প্রচলন ছিল না। হরানন্দ কিন্তু পত্নীকে বাড়ীতে কিছু কিছু লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। গোলকমণি অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ এবং গুণবতী মহিলা ছিলেন। শৈশবে শিবনাথ বাড়ীতে তাঁহার নিকট পড়িতেন। পুত্রের চরিত্র গঠনে মাতার প্রভাব কল্যাণকর হইয়াছিল।" [৪]

১৮৪৯ খ্রীস্টাব্দের 'ক্যালকাটা রিভিউ'তে একটি বিবরণ প্রকাশিত হয়— 'সেখানে থেকে একটি শিক্ষিত মহিলার কথা জানতে পারা যায়। একটি যুবতী বউ, তার মার খুব অসুস্থতার খবর পেয়ে পাল্কি করে মাকে দেখতে যাবার সময়, ছ'দিনের দীর্ঘ পথের ক্লান্তি দূর করতে ও সময় কাটাতে পাল্কিতে নিজের সঙ্গে বেশ ক'টি বই নেয়।" [৫]

যদিও এই জাতীয় উদাহরণ খুব বেশি দেখা যেত না। কারণ প্রকাশ্যে লেখাপডার চর্চার অবকাশ নারীদের ছিল না। এটি ছিল লোকাচার ও দেশাচার-বিরুদ্ধ কাজ। কিন্তু মেয়েরা লেখাপড়া শেখার জন্য কত যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা মনে মনে পোষণ করতেন, তার চমৎকার আবেগোচ্ছল চিত্র খুঁজে পাওয়া যায় রাসসুন্দরীর লেখা 'আমার জীবন' গ্রন্থে। একটি বিশেষ ধর্মগ্রন্থ 'চৈতন্য ভাগবত' পড়বার আগ্রহ থেকেই শেষ পর্যন্ত অনেক কষ্ট স্বীকার করে তিনি পড়াশুনা শিখলেন। আক্ষেপ করে তিনি বলেছেন, "আমার অদৃষ্টক্রমে তখন মেয়েছেলে লেখাপড়া শিখিত না। তখনকার লোক বলিত, বুঝি কলিকাল উপস্থিত হইয়াছে দেখিতে পাই। এখন বুঝি মেয়েছেলেতে পুরুষের কাজ করিবেক।" কিন্তু এত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ সত্ত্বেও তিনি বলেছেন—"যদি একখানি লেখা কাগজ দেখিতাম, তাহাও লোকের সম্মুখে তাকাইয়া দেখিতাম না। পাছে কেহ বলে যে, লেখাপড়া শিখিবার জন্যই দেখিতেছে কিন্তু আমি মনের সহিত সর্বদা পরমেশ্বরের নিকট এই বলিয়া প্রার্থনা করিতাম, হে পরমেশ্বর। তুমি আমাকে লেখাপড়া শিখাও, আমি লেখাপড়া শিখিয়া পুঁথি পড়িব।" [৬]

আরও একজন সেকালিনী কেশবচন্দ্র সেনের মাতা সারদাসুন্দরী দেবীও তাঁর 'আত্মকথা'য় সখেদে বলেছেন, "এখন যেমন মেয়েরা স্বচ্ছন্দে লেখাপড়া করিতে পারে এবং কত ভাল বিষয় শিক্ষা পায়, আমাদের এ সকল কিছুই ছিল না।" [৭]

সেকালের সম্ভ্রান্ত ঘরের শিক্ষিত মেয়েদের সম্বন্ধে 'সম্বাদ ভাস্কর'-সম্পাদক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ মন্তব্য করেছিলেন—"কলিকাতা নগরে মান্য লোকদিগের বালিকারা প্রায় সকলেই

বিদ্যাভ্যাস করেন, ৺প্রাপ্ত রাজা সুখময় রায় বাহাদুরের পুত্র ৺প্রাপ্ত রাজা শিবচন্দ্র রায় বাহাদুরের কন্যা ৺প্রাপ্তা হরসুন্দরী দাসী সংস্কৃত, বাঙ্গালা, হিন্দী এই তিন ভাষায় এমত সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন পণ্ডিতেরাও তাঁহাকে ভয় করিতেন। ...শ্রীযুতবাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ কন্যা (সুরসুন্দরী দেবী) বর্তমান থাকিলে মুক্তা শ্রেণীর ন্যায় তাঁহার অক্ষর শ্রেণী ও নানাপ্রকার রচনা দেখাইয়া সাধারণকে সন্তুষ্ট করিতে পারিতাম...।' শ্রীযুতবাবু আশুতোষ দেব (সাতু বাবু) মহাশয়ের কন্যা গৌড়ীয় ভাষা, উর্দ্দুভাষা, ব্রজভাষায় সুশিক্ষিতা হইয়াছেন এবং দেবনাগরাক্ষর লিখন পঠন বিষয়ে পণ্ডিতেরাও তাহার ধন্যবাদ করেন....।"

(৩১মে, ১৮৪৯)[৮]

উনিশ শতকে নবজাগরণের ঢেউ এসে লাগল এদেশে। জনসাধারণের শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটল। পূববর্তী যুগের পাঠশালা, টোল, মক্তবের শিক্ষাধারার পরিবর্তে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে দেশীয় ও পাশ্চাত্য শিক্ষাধারার প্রবর্তন ঘটল। তার কিছুদিনের মধ্যেই প্রগতিপন্থী ব্যক্তিরা স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভব করলেন। দীনবন্ধু মিত্র কাব্যাকারে তাঁর মনের আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন—

"অবলা সরলাদল, বিদ্যাবুদ্ধিহীনা।
অন্ধকারে ব্যাপ্ত মন, জ্ঞানারুণ বিনা।।"

তার ফলে—

"বিবেক নহেক সূক্ষ্ম, স্থান স্বল্প মনে।
অসীম পরম অর্থ, ভাবিবে কেমনে।।
বন্ধনের কথা মাত্র, কথা উপলক্ষ।
ইহলোকে সুখ ভিন্ন, নাহি অন্য লক্ষ্য।"[৯]

স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের প্রথম যুগে রক্ষণশীল দলের অনেকেই ব্যক্তিগত ও সমবেত প্রচেষ্টায়, সমাজে স্ত্রীশিক্ষা বিরোধী মনোভাবকে অপসারণের চেষ্টা করেন। রক্ষণশীল দলের নেতা রাজা রাধাকান্ত দেব, রাজা বৈদ্যনাথ রায়, উত্তরপাড়ার ভূস্বামী জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, মতিলাল শীল প্রভৃতি অনেকেই ছিলেন স্ত্রীশিক্ষায় উৎসাহী। এ ব্যাপারে বিদ্যাসাগর মহাশয়, জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বীটন, রামগোপাল ঘোষ, রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের কর্মোদ্যোগের কথা বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। কয়েকজন উদারপন্থী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতও এইসঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন, তাঁরা হলেন গৌরমোহন বিদ্যালংকার, মদনমোহন তর্কালংকার, তারাশংকর তর্করত্ন প্রভৃতি। ইয়ংবেঙ্গলস্ বা নব্যবঙ্গ গোষ্ঠীর প্রায় সকলেই ছিলেন স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী। ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের নরনারীরা আন্তরিকভাবে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের কাজে অগ্রসর হয়েছিলেন। সেইজন্য শেষ পর্যন্ত নারী শিক্ষা এদেশে অতি অল্প সময়ের মধ্যে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তর অতিক্রম করে, উচ্চ শিক্ষার পর্যায়ে পৌঁছতে পেরেছিল।

বঙ্গে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের কাজে খ্রীস্টান মিশনারিগণ

আধুনিক যুগের সুচনায় এদেশে নারীশিক্ষা বিস্তারের কাজে প্রথম এগিয়ে এসেছিলেন খ্রীস্টান মিশনারিরা। তাঁরাই যে এ বিষয়ে অগ্রণী ছিলেন, তাতে দ্বিমত নেই। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে একাধিক খ্রীস্টীয় প্রতিষ্ঠান স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের কাজ করেন। যেমন চার্চ মিশনারি সোসাইটি, লেডিস্ সোসাইটি, লন্ডন মিশনারি সোসাইটি প্রভৃতি। মনীষী রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তাঁর রচিত 'হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত' নামক গ্রন্থে লিখেছেন— "এতদ্দেশীয় বালিকাদের শিক্ষার জন্য ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে মিসনরি রেবরেন্ড মে সাহেব চুঁচুড়াতে একটি মিসনরি স্কুল সংস্থাপন করেন। এতদ্দেশীয় ইংরাজী স্কুলের মধ্যে এই স্কুলটি সর্বপ্রথম সংস্থাপিত হয়।" কলিকাতার মিশনারিরা প্রথম ১৮১৯ খ্রীস্টাব্দে 'ক্যালকাটা ফিমেল জুভিনাইল সোসাইটি' (Calcutta Female Juvenile Society) নামে একটি সংস্থা গঠন করেন ও তার সাহায্যে দেশীয় বালিকাদের শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করেছিলেন। চুঁচুড়ায় লন্ডন মিশনারি সোসাইটির মিস্টার মে যে প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয় গড়ে তোলেন সম্ভবত এই বিদ্যালয়টি ছিল, এদেশেব বালিকাদের শিক্ষাদানের জন্য প্রথম বিদ্যালয়। তবে রেভারেন্ড মে সাহেবের অকালমৃত্যুর ফলে ঐ বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যায়।

শ্রীরামপুরে ১৮২১ খ্রীস্টাব্দে উইলিয়াম কেরী ও তাঁর দুই সহকারী জেশুয়া মার্শম্যান ও উইলিয়াম ওয়ার্ড, স্থানীয় বালিকাদের জন্য বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেবার জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

দেশীয় শিক্ষিকার যথেষ্ট অভাব ছিল। লন্ডনের 'The British and Foreign School Society'-র তরফ থেকে ১৮২১ খ্রীস্টাব্দে মিস অ্যান্ কুক্ (ইনি পরে বিবাহ করে মিসেস উইলিসন হন) কলকাতায় আসেন এবং এদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের কাজে নানাভাবে সাহায্য করেন। এইভাবে খ্রীস্টান সম্প্রদায়, পরিচালিত চার্চ মিশনারি সোসাইটি, লেডিস সোসাইটি, লন্ডন মিশনারি সোসাইটির উদ্যোগে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের কাজ ভালোভাবেই অগ্রসর হয়ে চলেছিল। কলকাতার নিকটবর্তী চারটি এলাকায়—গৌরীবাড়ি, নন্দনবাগান, জানবাজার ও চিৎপুর অঞ্চলে বিদ্যালয় গড়ে উঠল। প্রথম দিকে কয়েক জন নেতৃস্থানীয় রক্ষণশীল হিন্দু মহোদয়, মিশনারিদের এই কাজে নানাভাবে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলেন। তাঁরা হলেন রাজা রাধাকান্ত দেব, রাজা বৈদ্যনাথ রায়, রাজা শিবকৃষ্ণ, নীলমণি দাস, কৃষ্ণসখা ঘোষ, কাশীনাথ ঘোষাল প্রভৃতি। কিন্তু যখনই তাঁরা জানতে পারলেন যে, বাঙালি মেয়েদের ধর্মান্তরিত করার স্বার্থেই এই সব মিশনারিরা বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন, তৎক্ষণাৎ তাঁদের মন বিরূপ হয়ে উঠল। মিশনারিদের কাজের তাঁরা কঠোর সমালোচনা করতে লাগলেন। এর পরেই দেখা গেল যে, স্ত্রীশিক্ষার সপক্ষে ও বিপক্ষে তুমুল আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। কারণ "... এই সকল বিদ্যালয়ে খৃষ্ট তত্ত্ব অধ্যয়ন, পাঠ্য তালিকার একটি অঙ্গ ছিল। ইহার উদ্দেশ্য ছিল, অল্প বয়স্ক ছাত্রীদের কোমল হৃদয়ে খৃষ্ট

ধর্মের কথা গাঁথিয়া দেওয়া, যাহাতে তাহারা পাঠ সমাপনান্তে নিজ নিজ গৃহে ইহার ভাব প্রচার করিতে পারে।" [১০]

এখানে খ্রীষ্ট ধর্ম সম্পর্কিত গ্রন্থ ও বাইবেল শুধু যে নিয়মিত ভাবে পড়ানো হত তাই নয়, পরীক্ষা গ্রহণেরও রীতিমতো ব্যবস্থা ছিল। সেন্ট্রাল ফিমেল স্কুল ভিন্ন, আরও তিনটি স্কুল গড়ে উঠেছিল— মির্জাপুর স্কুল, সারকুলার রোড স্কুল ও হাওড়া স্কুল। চারটি স্কুলের মিলিত ছাত্রী সংখ্যা ছিল পাঁচ শত। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত বালিকাদেরই এই সব স্কুলে পড়ার অধিকার ছিল। কার্যক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যেত যে, ভদ্রেতর শ্রেণীর মেয়েরাই এই সব বিদ্যালয়ে পড়তে আসত। যেমন ঝাড়ুদার, মেথর বা বারাঙ্গনাদের মেয়েরা। পাঠ্যতালিকায় থাকত বাংলা পঠন ও লিখন, ইতিহাস, ভূগোল ও গণিতের সাধারণ জ্ঞান এবং কিছু সেলাই-বোনা শেখানো হত সেইসঙ্গে। ছাত্রীসংখ্যা অনুপাতে, শিক্ষিকাদের মাইনে দেওয়া হত মিশনের তরফ থেকে। ছাত্রীদের পরীক্ষা নেবার পর, কৃতী ছাত্রীদের টাকা বা সিকি এবং শাড়ি ইত্যাদি পুরস্কার হিসাবে দেওয়া হত। সেই কারণে শিক্ষা গ্রহণের প্রকৃত আগ্রহ না থাকলেও, ঐ সব বস্তু প্রাপ্তির আশায়, শুধুমাত্র প্রলোভনের বশবর্তী হয়ে নিম্নশ্রেণীর মেয়েরা দলে দলে এই সব বিদ্যালয়ে যোগ দিত।

কলকাতার বাইরে বেশ-কয়েকটি স্কুল গড়ে উঠল ধীরে ধীরে। কৃষ্ণনগর কেন্দ্রে ছয়টি এবং শ্রীরামপুর, হুগলী, বীরভূম, ঢাকা, চট্টগ্রাম, যশোহর প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে বালিকা বিদ্যালয় গড়ে উঠল।

ক্রমে আর্থিক সংকট ও অন্যান্য কারণে স্কুলগুলি একে একে বন্ধ হয়ে যেতে লাগল। কয়েকটি কারণের মধ্যে প্রধান দু-একটি কারণ হল, সেন্ট্রাল ফিমেল স্কুলের কিছু হিন্দু মেয়েকে, খ্রীস্ট ধর্মে দীক্ষিত করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা উচ্চবর্ণের হিন্দুদের সহানুভূতি হারালেন। এ ছাড়া মিশনারিরা মনে প্রাণে চেয়েছিলেন যে, সম্ভ্রান্ত ঘরের হিন্দু মেয়েরা এই সব বিদ্যালয়ে আসুক। কিন্তু হীন বর্ণের ও নিম্ন সমাজের মেয়েদের সঙ্গে, ভদ্র শ্রেণীর মেয়েদের ওঠাবসা ও মেলামেশা সেকালে প্রায় নিষিদ্ধ ছিল। ক্রমশ মিশনারিরা অনুভব করলেন যে, তাঁদের ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্য তেমনভাবে সফল হচ্ছে না। কাজেই ধীরে ধীরে বিদ্যালয় স্থাপন ও শিক্ষা প্রসারের কাজ স্তিমিত হয়ে এল। সেজন্য "মিশনের কার্য ক্রমে নানা কারণে সংকুচিত হইয়া যায়। শিক্ষা প্রসার প্রচেষ্টাও বন্ধ করিয়া দিতে মিশন বাধ্য হইলেন।"[১১] তবে উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হলেও, মিশনারিরাই যে এদেশে নারী শিক্ষার প্রথম পথপ্রদর্শক— একথা কোনো ক্রমেই অস্বীকার করা যায় না।

স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্তনে রক্ষণশীল দলের ভূমিকা

রক্ষণশীল সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তি স্ত্রীশিক্ষা বিরোধী মনোভাব পোষণ করলেও, অনেকে আবার ছিলেন স্ত্রীশিক্ষানুরাগী। যেমন এই দলের নেতা রাজা রাধাকান্ত দেব (১৭৮৩-১৮৬৭) ছিলেন একান্ত ভাবে নারীশিক্ষার সমর্থক। কিন্তু ঘরের মেয়েরা প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে গিয়ে পড়াশোনা করুক, এই রীতিটি তিনি মনে মনে সমর্থন করতেন না। রাধাকান্তের অনুরোধেই, তাঁর এক

সভাপণ্ডিত গৌরমোহন বিদ্যালংকর মহাশয় 'স্ত্রী শিক্ষা বিধায়ক' (১৮২২ খ্রী.) নামক পুস্তিকা রচনা করেন। মেয়েরা যে শিক্ষা গ্রহণে সম্পূর্ণ সক্ষম, সেই কথা সমর্থন করে এই গ্রন্থে বলা হয়েছে—"যদি বল স্ত্রীলোকের বুদ্ধি অল্প এ কারণ তাহাদের বিদ্যা হয় না, অতএব পিতা মাতাও তাহাদের বিদ্যার জন্যে উদ্যোগ করেন না, একথা অতি অনুপযুক্ত। যে হেতুক নীতিশাস্ত্রে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীর বুদ্ধি চতুর্গুণ ও ব্যবসায় ছয়গুণ কহিয়াছেন। এবং এদেশের স্ত্রীলোকদের পড়াশুনার বিষয়ে বুদ্ধি পরীক্ষা সংপ্রতি কেহই করেন নাই। এবং শাস্ত্র বিদ্যা ও জ্ঞান ও শিল্প বিদ্যাশিক্ষা করাইলে যদি তাঁহারা বুঝিতে ও গ্রহণ করিতে না পারেন তবে তাঁহাদিগকে নির্বোধ কহা উচিত হয়। এদেশের লোকেরা বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানের উপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায় দেন না বরং তাঁহাদের মধ্যে যদি কেহ বিদ্যা শিখিতে আরম্ভ করেন তবে তাঁহাকে মিথ্যা জনরব মাত্র সিদ্ধ নানা অশাস্ত্রীয় প্রতিবন্ধক দেখাইয়া ও ব্যবহারদুষ্ট বলিয়া মানা করান হয়।"[১২]

মহারাজা সুখময় রায়ের পুত্র রাজা বৈদ্যনাথ রায় স্ত্রীশিক্ষা প্রচারকল্পে, লেডিস সোসাইটি ফর নেটিভ ফিমেল এডুকেশনকে ২০,০০০ টাকা দান করেন। ঐ টাকায় 'সেন্ট্রাল স্কুল' (১৮২৬ খ্রী.) প্রতিষ্ঠা কবা হয়।

এই সময়কার রক্ষণশীল দলভুক্ত আরও অনেক ব্যক্তি নানাভাবে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে উৎসাহ প্রদর্শন করেছিলেন।

স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে 'ইয়ংবেঙ্গলস্' বা নব্যবঙ্গীয় যুব সমাজ

হিন্দু কলেজের প্রভাবশালী তরুণ, যুক্তিবাদী ও প্রগতিপন্থী অধ্যাপক ডিরোজিওর ছাত্ররা 'ইয়ং বেঙ্গলস্' বা 'নব্যবঙ্গীয়' নামে পরিচিত। এঁরা প্রায় সকলেই ছিলেন স্ত্রীশিক্ষার সমর্থক। তাঁদের মধ্যে আবার বিশেষভাবে যাঁদের নাম করতে হয়, তাঁরা হলেন— রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবচন্দ্র দেব প্রভৃতি। শুধুমাত্র বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেই এঁরা ক্ষান্ত ছিলেন না। নারীকল্যাণমূলক যাবতীয় কাজে তাঁরা আত্মনিয়োগ করেন। ডিরোজিও -প্রতিষ্ঠিত 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন'-এ (১৮২৮ খ্রী. স্থাপিত) নিয়মিত ভাবে স্ত্রীশিক্ষা প্রচার ও প্রসার বিষয়ে আলাপ-আলোচনা চলত। ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে হিন্দু কলেজের প্রাক্তন কয়েকজন ছাত্র একটি বালিকা বিদ্যালয় গড়ে তুলতে চাইলেন। তার ফলে ১৮৪৭ খ্রীস্টাব্দে প্যারীচরণ সরকার, কালীকৃষ্ণ মিত্র, নবীনকৃষ্ণ মিত্র প্রভৃতি বারাসাতে একটি অবৈতনিক বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। বাঙালিদের উদ্যোগে, এই প্রথম বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হল। কিন্তু জনসাধারণ এঁদের অপরাধী বলে সাব্যস্ত করেন ও সমাজচ্যুত করেন।

নব্য বঙ্গীয়দের দ্বারা পরিচালিত 'বেঙ্গল স্পেকটেটর' ও 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকা দুটিতে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক প্রচার থাকত। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়-রচিত *The Native Female Education* (১৮৪১ খ্রী.) গ্রন্থটি স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে যথেষ্ট সহায়তা করেছিল।

নব্য বঙ্গীয়দের চেষ্টাতেই ডেভিড হেয়ারের মৃত্যুতে, তাঁর স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে ১৮৪৪ খ্রীস্টাব্দে "হেয়ার প্রাইজ ফন্ড" নামে একটি ভাণ্ডার গড়ে তোলা হয়। তার শর্ত অনুযায়ী প্রতি বছর স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধীয় উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ-লেখককে পুরস্কৃত করা হত। পরবর্তীকালে এই অর্থের সাহায্যে, স্ত্রীপাঠ্য পুস্তক প্রকাশেরও ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার দুজনে মিলে ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাস থেকে 'মাসিক পত্র' নামে উৎকৃষ্ট একটি স্ত্রীপাঠ্য মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। কিশোরীচাঁদ মিত্রের উদ্যোগে ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দে 'সমাজোন্নতি বিধায়িনী সভা' গড়ে ওঠে। এঁরা নারীকল্যাণমূলক অনেক কাজ করেছিলেন।

এইভাবে আমরা দেখতে পাই নব্যবঙ্গগোষ্ঠী সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে নারী জাতির উন্নতি বিধানে ও বিস্তারে বদ্ধপরিকর ছিলেন।

স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

নারীজাতির প্রতি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অপরিসীম মমত্ববোধের তুলনা নেই। তাঁর মতো স্থিতধী মানব ও সমাজ-সংস্কারক সম্বন্ধে বলা হয়েছে "যদি কোন পুরুষকে স্ত্রীজাতির যথার্থ হিতৈষী ও স্ত্রী জাতির উন্নয়নকারী বলে পরিচয় অকুণ্ঠ মনে দেওয়া যায়, তবে ভারতবর্ষে বিদ্যাসাগর তার মধ্যে অগ্রগণ্য। তাঁর পূর্বে রামমোহন এবং তাঁর পরে রবীন্দ্রনাথ এরূপই নমস্য।"[১৩]

প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁর অন্যান্য নারীকল্যাণমূলক সমাজ- সংস্কারের সঙ্গে স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের কাজ অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে আজীবন করে গিয়েছেন। পুরুষ-শাসিত সমাজে স্ত্রীলোকদের যে জাতীয় উৎপীড়ন, অত্যাচার ও অবিচার সহ্য করতে হত, বিদ্যাসাগর জানতেন, সেই দুর্গতির হাত থেকে তাদের যথার্থভাবে মুক্ত করার একমাত্র পথ হল, শিক্ষার আলোকে স্ত্রীজাতির মনোলোক উদ্ভাসিত করে তোলা। শিক্ষা গ্রহণের অধিকার দান ক'রে তিনি নারী জাতিকে আত্মমর্যাদায় ভূষিত ও আত্মবিশ্বাসে আস্থাশীল করে তুলতে চেয়েছিলেন। নারীমুক্তির জন্য তিনি যে-সমস্ত কাজ করেছিলেন, তার জন্য একাধিকবার তাঁর জীবন বিপন্ন হয়েছিল। অথচ হাসিমুখে তিনি সব সহ্য করেছিলেন।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়—১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ইংরেজ সরকার এদেশে বালিকাদের শিক্ষাদানের কোনো দায়িত্ব গ্রহণ করেন নি। খ্রীস্টান মিশনারি সম্প্রদায় ও অন্যান্য কিছু ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় নারীশিক্ষার কাজ কিছু পরিমাণে অগ্রসর হতে পেরেছিল। ১৮৪৯ খ্রীস্টাব্দে বেথুন সাহেব যে বালিকা বিদ্যালয় গড়ে তুললেন, সেখানে বিদ্যাসাগর মহাশয়, অবৈতনিক সম্পাদকরূপে যোগদান করেন। বেথুন সাহেব সেদিন, যোগ্যতম ব্যক্তিকেই তাঁর সহকারীরূপে খুঁজে নিয়েছিলেন। বেথুনের মৃত্যুর পর ঐ বিদ্যালয় সরকারি বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। এর তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন সেকালের ছোটোলাট সিসিল বীডন।

যেহেতু, এদেশের রক্ষণশীল ব্যক্তিরা অনেকেই স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন না, পাছে তাঁরা মনঃক্ষুণ্ণ হন সেই কারণে, ইংরেজ সরকার বহু দিন পর্যন্ত স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে কোনো উৎসাহ দেখান নি। ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দে প্রথম বিলাতের কর্তৃপক্ষ, এদেশের স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারে উৎসাহ দেখান ও দায়িত্ব গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দেন। বালিকাদের মধ্যে অশিক্ষার সমস্যাকে দূরীভূত করার পরিকল্পনাকে কার্যে পরিণত করার বিষয়ে তৎকালীন ছোটোলাট হ্যালিডে সাহেব ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে আলোচনা করেন। কাজটি যে অত্যন্ত কঠিন, তা বিদ্যাসাগর জানতেন। ভদ্রশ্রেণীর বা বর্ণ হিন্দুর ঘরের মেয়েরা যে, সহজে প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে এসে পড়াশুনা করতে চাইবে না— এ কথা তাঁর অজানা ছিল না। কিন্তু উপযুক্ত প্রচারকার্যের দ্বারা জনমত গঠন করা যায়, এ বিশ্বাসও তাঁর ছিল। কাজেই অমানুষিক পরিশ্রম করে তিনি ১৮৫৭-র নভেম্বর থেকে ১৮৫৮-র মে মাসের মধ্যে, বঙ্গদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পঁয়ত্রিশটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এজন্য তাঁর প্রতি মাসে ব্যয় হত প্রায় ৮৪৫ টাকা। ছাত্রী সংখ্যা ছিল প্রায় ১০০০ জন। তার মধ্যে হুগলী জেলার বিভিন্ন গ্রামে ২০টি, বর্ধমানে ১১টি, মেদিনীপুর অঞ্চলে ৩টি এবং নদীয়াতে ১টি বিদ্যালয় গড়ে ওঠে।

১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে সরকারি প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল যে, বালিকা বিদ্যালয়গুলির জন্য তাঁরা নিয়মিত ভাবে আর্থিক সাহায্য দেবেন। সেজন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় দ্রুতগতিতে স্ত্রী- শিক্ষা প্রচারের কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। স্থানীয় অধিবাসীরা বিদ্যালয়গৃহ নির্মাণের দায়িত্ব নিলেই, বিদ্যাসাগর মহাশয় সেখানে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে লাগলেন। কারণ তাঁর ধারণা ছিল, বাদবাকি খরচ সব সরকার বহন করবেন। অথচ স্বল্পকাল পরেই বিরূপ অবস্থার উদ্ভব হল। ১৮৫৮-র ৩০ জুন তারিখে দেখা গেল, সরকার বালিকা বিদ্যালয়গুলির জন্য প্রতিশ্রুত অর্থ দিতে অস্বীকার করলেন। সবচেয়ে বড়ো সমস্যা হল, শিক্ষকদের বেতন বাবদ ৩,৪৩৯,৫ টাকা বাকি পড়ে গেল। তখন ঈশ্বরচন্দ্র মহাশয় এই বিষয়টি জানিয়ে ডিরেকটার অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশনকে একটি পত্র লিখলেন। তার উত্তরে সরকার পক্ষ থেকে একটি চিঠি দিয়ে তাঁকে জানিয়ে দেওয়া হল (১৮৫৮, ২২ ডিসেম্বর) যে, ঐ বাকি টাকা তাঁরা শোধ করে দেবেন ঠিকই, কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁরা নিয়মিত ভাবে বালিকা বিদ্যালয়গুলিকে কোনো আর্থিক সাহায্য দিতে পারবেন না। ব্যাপারটা হল এই যে, সিপাহী বিদ্রোহের আগে সরকার, নারীশিক্ষার খাতে কিছু অর্থ ব্যয় করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কিন্তু বিদ্রোহের পর তাঁরা আর সেই দায়িত্ব গ্রহণ করতে রাজী হলেন না। সরকারি নীতির আকস্মিক পরিবর্তনের ফলে, বিদ্যাসাগর মহাশয় খুবই বিপন্নবোধ করতে লাগলেন। ব্যক্তিগত ভাবে তিনি অনেক বিদ্যালয় পরিচালনার আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। সিপাহী বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে, ইংরেজ সরকারের আর্থিক অনটন দেখা দিল। এইভাবে প্রতিশ্রুতি দিয়েও তা রক্ষা না করায়, বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সরকারের মতবিরোধ দেখা দিল। তিনি অবসর নিলেন।

উপায়ান্তর না দেখে বিদ্যাসাগর মহাশয় ঐ-সব বালিকা বিদ্যালয়গুলি পরিচালনার জন্য একটি 'নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠা ভাণ্ডার' স্থাপন করলেন। সেখানে পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও আরও অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি নিয়মিতভাবে চাঁদা দিতে লাগলেন। এইভাবে তিনি স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের কাজে জনসাধারণের সহানুভূতি ও সাহায্য লাভে সমর্থ হলেন।

ভারতে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের ইতিহাসে মিস্ মেরি কার্পেন্টারের নাম স্মরণীয় হয়ে আছে। পাশ্চাত্য দেশীয় এই শিক্ষাব্রতী মহিলা, বারচারেক এই দেশে এসেছিলেন। তাঁর আগমনে বিদ্যাসাগর মহাশয় ও কেশবচন্দ্র সেন অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন। ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দে প্রথম যখন তিনি এদেশে এলেন দেশীয় নারীদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্য নিয়ে, তখন শিবনাথ শাস্ত্রী একটি প্রশস্তিমূলক কবিতায় তাঁর সম্পর্কে লিখেছিলেন—

"অভাগিনী বঙ্গবালা অজ্ঞান আঁধারে
কারাগারে নিরুপায় জীবন হারায়।।
শুনে কি স্নেহের ভরে সাগরের পারে
আসিয়াছ বঙ্গসখি ! উদ্ধারিতে তায় ?

. . .

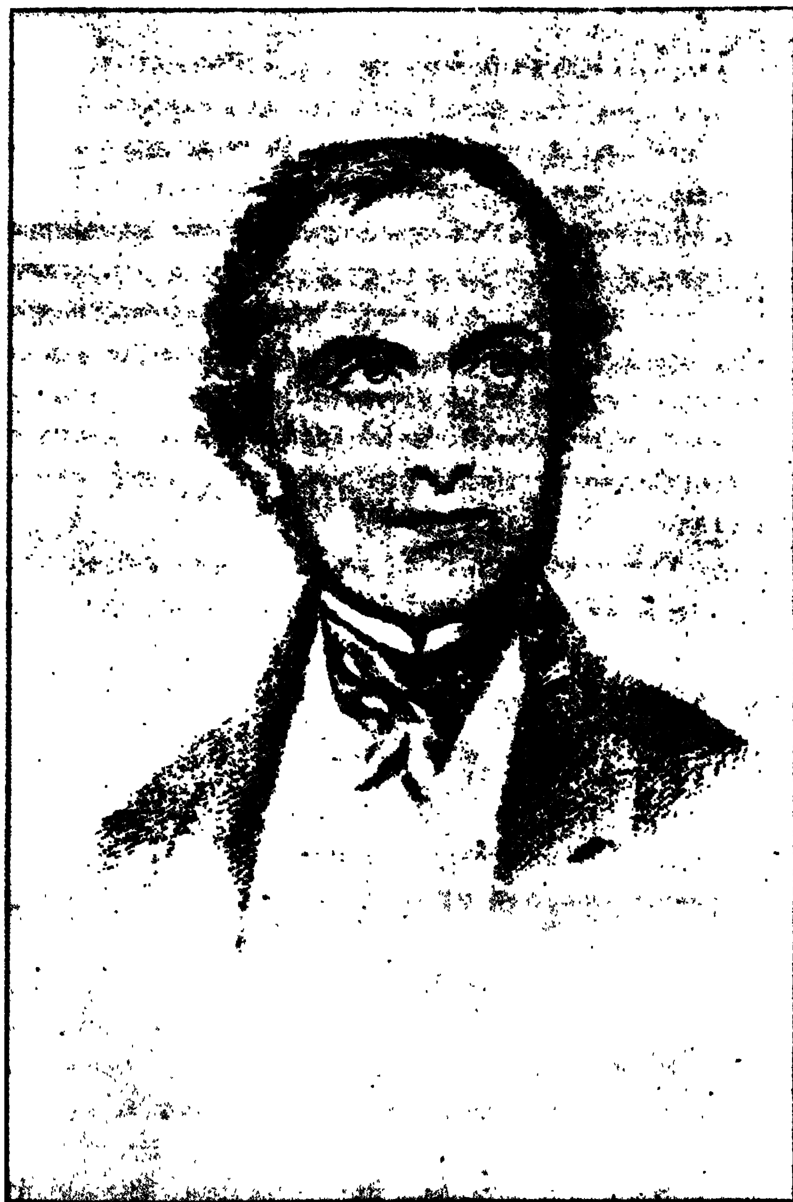
আপন হৃদয়ে বঙ্গ রাখিবে তোমায়
'দিদি' বলে ডাকিবেক বঙ্গবালা গণ।" ১৪

এর পবে ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দে মিস্ এক্রয়েডও স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। মিস্ কার্পেন্টার বালিকাদের শিক্ষা সমস্যা দূরীকবণের জন্য বিদ্যাসাগরের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হলেন। সে সময় উপযুক্ত হিন্দু শিক্ষয়িত্রীর অভাবে, শিক্ষা প্রসারের কাজ ব্যাহত হচ্ছিল। এই কারণে বেথুন স্কুলের সঙ্গে তিনি একটি 'নর্মাল স্কুল' বা 'শিক্ষিকা-শিক্ষণ কেন্দ্র' গড়ে তুললেন। এইভাবে মিস্ কার্পেন্টার স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে এক নবযুগের সূচনা করেন। যদিও নানা কারণে মাত্র তিন বছব পরে ঐ নর্মাল স্কুলটি তুলে দিতে হয়।

বালিকা বিদ্যালয়গুলির সমস্যা সম্পর্কে অবহিত হবার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়, মেরি কার্পেন্টার ও অন্যান্য বিদ্যানুরাগী ব্যক্তিরা মাঝে মাঝে বালিকা বিদ্যালয়গুলি পরিদর্শনে যেতেন। এইভাবে উত্তরপাড়া অঞ্চলের একটি বিদ্যালয় পরিদর্শন করে ফেরার পথে, তাঁদের গাড়িটি উল্‌টে যায়। এই দুর্ঘটনাই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করেছিল। আঘাত পেয়ে তাঁর স্বাস্থ্য অত্যন্ত ভেঙে পড়েছিল। অবশেষে ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে তিনি পরলোক গমন করেন। নারীকল্যাণমূলক কাজের জন্যই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অমূল্যজীবন নিঃশেষ হয়ে গেল। এদেশের নারী সমাজ তাঁর কাছে সেজন্য চিরঋণী হয়ে আছে।

স্ত্রীশিক্ষা প্রসার কল্পে বেথুন সাহেব ও আরও কয়েকজন

সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েদের লেখাপড়া শেখার উপযোগী বিদ্যালয়ের অভাব অনুভব করতেন



বেথুন সাহেব

অনেকেই। তাঁরা মনে মনে এমন শিক্ষায়তন চাইতেন—যেখানে ধর্ম নিরপেক্ষ ভাবে, যথার্থ শিক্ষাদানই হবে প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য। পুরুষদের মতো—নারীদেরও যথারীতি বিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রয়োজন আছে, এ সত্যটি উপলব্ধি করলেন আধুনিক যুগের শিক্ষিতজনেরা। বহু আলাপ-আলোচনা ও আন্দোলনের পর, এই অভাব মোচন করতে এগিয়ে এলেন কয়েকজন উদারচেতা দেশী ও বিদেশী মানুষ। এই প্রসঙ্গে প্রথম যে বিদেশী মনীষীর কথা মনে পড়ে তিনি একজন মহান ইংরেজ ভদ্রলোক জন এলিয়ট ডিঙ্কওয়াটার বীটন (১৮০১-৫১)।

বেথুন সাহেব ছিলেন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সেরা ছাত্র। ভারতের গভর্নর জেনারেলের শাসন পরিষদের সচিবরূপে তিনি প্রথম ভারতে আসেন ১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দে। কিন্তু ঐ কাজ তাঁর ভালো না লাগায়, কাজে ইস্তফা দিলেন। এর পর তিনি কাউন্সিল অব এডুকেশনের সভাপতির পদ গ্রহণ করেন এবং এদেশে শিক্ষা বিস্তারের কাজে মন দিলেন। এই কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য রামগোপাল ঘোষের উৎসাহে তিনি স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে অগ্রসর হলেন। বেথুন ছিলেন নানা ভাষায় পারদর্শী এবং সেইসঙ্গে তাঁর কবিখ্যাতিও ছিল। তিনি ছিলেন অকৃতদার। অতিশয় মাতৃভক্ত পুত্র ছিলেন তিনি। শোনা যায় "মাতৃভক্তিই তাঁহার স্ত্রী জাতির প্রতি শ্রদ্ধা ও ভারতীয় নারীগণের উন্নতি সাধনের ইচ্ছা সমুৎপন্ন করিয়াছিল।"[১৫]

এদেশের স্ত্রীশিক্ষার ইতিহাসে ১৮৪৯ খ্রীস্টাব্দের ৭মে দিনটি বিশেষ স্মরণীয় হয়ে আছে। কারণ, ঐদিন কলিকাতায় যে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হল, সেখানে সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েদের জন্য প্রথম ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হল। প্রথম দিকে সকলে ঐ বিদ্যালয়কে 'নেটিভ ফিমেল স্কুল' বা 'Hindu Female School' বলত। পরবর্তীকালে এটি বেথুন স্কুল নামে পরিচিত হয়েছে। এখানে কলেজ বিভাগের সূত্রপাত হয় ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দে। এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর দেশীয় জনমানসের উপর, স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একটি দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব দেখা গেল।

বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় তাঁর সুকিয়া স্ট্রীটের বৈঠকখানা বাড়িটি বিনা ভাড়ায় ব্যবহার করতে দিলেন এবং ঐসঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহ পাঁচ হাজার টাকা মুল্যের গ্রন্থসমূহ দান করলেন। স্থায়ী বিদ্যালয় ভবন নির্মাণের জন্য তিনি বেথুন সাহেবকে জমি দান করেন।

১৮৫০ খ্রীস্টাব্দের ৬ নভেম্বর খুব আড়ম্বর সহকারে এই বিদ্যালয় ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়। এই উৎসবে পৌরোহিত্য করেন তৎকালীন বঙ্গের ডেপুটি গভর্নর সার জন হান্টার লিট্‌লার। রাজনারায়ণ বসু তার 'আত্মচরিতে' এই অনুষ্ঠানের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—"যেদিন উহা সংস্থাপন হয় সেদিন ফ্রিমেসনেরা পতাকা উড়াইয়া ও বাদ্যোদ্যম করিয়া মহাসমারোহে কলিকাতার রাস্তা দিয়া গমন করিয়া উহার মূল প্রস্তর নিখাত করেন। দ্বারে পূর্ণকুম্ভ ও অশোক স্থাপিত হইয়াছিল। স্ত্রীশিক্ষা দ্বারা ভারতবর্ষীয় স্ত্রীলোক- দিগের সকল শোক ও দুঃখ অপনীত হইবে তাহার সাঙ্কেতিক চিহ্ন স্বরূপ উক্ত অশোক বৃক্ষরোপিত হইয়াছিল। ঐ

সময়ে বাটী হইতে যে সকল গাড়ীতে বালিকাদিগকে স্কুলে লইয়া যাওয়া হইত সে সকল গাড়ীর গায়ের উপরে মহানির্বাণ তন্ত্রোদ্ধৃত—"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ" এই বাক্য অঙ্কিত ছিল।"[১৬]

অত্যন্ত আক্ষেপ ও দুঃখের বিষয় হল এই যে, বিদ্যালয় ভবনের কাজ শেষ হবার পূর্বেই ১৮৫১ খ্রীস্টাব্দের ১২ আগস্ট বেথুন সাহেবের মৃত্যু ঘটে। তাঁর 'উইল' বা চরম ইচ্ছাপত্রে দেখা গেল যে, তিনি নিজের যাবতীয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি মিলিয়ে প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা বিদ্যালয়কে দান করে গেছেন।

বেথুন সাহেবের মৃত্যুর পর, সরকার এই স্কুলের সমস্ত ব্যয়ভার বহনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পূর্বেই বিদ্যাসাগর মহাশয় এই বিদ্যালয়ের অবৈতনিক সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছিলেন। এখানে ছাত্রীদের বিনামূল্যে বই দেওয়া হত। বিনা বেতনে তারা এখানে পড়াশুনা করত। প্রতি মাসে যে আটশত টাকা ব্যয় হত বেথুন নিজেই সেই ব্যয়ভার বহন করতেন। এখানে বালিকাদের বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হত।

স্ত্রীশিক্ষা ও মদনমোহন তর্কালংকার

স্ত্রীশিক্ষায় উৎসাহী মদনমোহন তর্কালংকার মহাশয় সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা করতেন। তিনি নানাভাবে এই বিদ্যালয়ের জন্য বেথুন সাহেবকে সাহায্য করেন। প্রথম দিনে যখন বিদ্যালয়ে ছাত্রী সংগ্রহের কাজ চলেছিল তখন তিনি নিজের দুই কন্যা— ভুবনমালা ও কুন্দমালাকে এখানে প্রেরণ করেন। বালিকাদের পাঠের উপযোগী পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। কিছুকাল তিনি ঐ বিদ্যালয়ে অবৈতনিক ভাবে শিক্ষকতা করেছিলেন। স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করার জন্য তিনি নানা পত্র-পত্রিকায় স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক একাধিক প্রবন্ধ রচনা করেন।

বিদ্যালয় পরিচালনার কাজে অনেকে যেমন বাধার সৃষ্টি করেন, তেমনি আবার অনেকেই নানাভাবে এই কাজে সহায়তাও করেছিলেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন হলেও তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা সৌদামিনীকে বেথুন স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলেন।

বেথুন বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়, এদেশে স্ত্রীশিক্ষা ও নারীমুক্তি আন্দোলনের আদর্শ স্থান হয়ে উঠেছিল। যোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয় এ সম্পর্কে বলেছেন, "ভারতবর্ষে পরবর্তীকালে নারী জাগরণের যে সূচনা হয়, শিক্ষায়, সাহিত্য চর্চায় কৃতিত্ব প্রদর্শন এবং ক্রমে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রেও অপরিসীম সাহস ও বুদ্ধি প্রকাশ পায়— এ সকলেরই মূল অনেকটা ঐ বিদ্যালয়টির মধ্যে আমরা লক্ষ্য করি।"[১৭]

স্ত্রীশিক্ষা প্রসার ও প্রচারে ব্রাহ্মসমাজ

নারী প্রগতি ও স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলনে ব্রাহ্মসমাজের বেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল—এ কথা

অনস্বীকার্য। সাধারণ বর্ণ হিন্দু ঘরের মেয়েরা অনেক সময় বাড়িতে বসে লেখাপড়া শিখতেন ও ধর্মগ্রন্থ পাঠের ক্ষমতা অর্জন করতেন। কারণ খ্রীস্টান সম্প্রদায় কর্তৃক পরিচালিত স্কুলে তাঁরা নিম্নবর্ণের বালিকাদের সঙ্গে পড়তে চাইতেন না। অনেক সম্পন্ন গৃহস্থ তাঁদের মেয়েদের প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে না পাঠিয়ে, গৃহে শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করতেন শিক্ষাদানের জন্য। অথচ বিদ্যালয়ের বিধিবদ্ধ শিক্ষা গ্রহণের যে প্রয়োজন আছে, একথা ধীরে ধীরে অনেকেই উপলব্ধি করতে লাগলেন। এ বিষয়ে ব্রাহ্মসম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিবাই ছিলেন অগ্রণী।

রাজা রামমোহন রায় তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেছিলেন নারীকল্যাণমূলক কাজে। মনে প্রাণে তিনি অনুভব করেছিলেন যে, শিক্ষা ভিন্ন নারী জাতির মুক্তি ও প্রগতি সম্ভব নয়। অবশ্য স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপাবে রামমোহন সক্রিয়ভাবে তেমন কিছু করতে পারেন নি। কারণ সতীদাহ প্রথা বন্ধ করার জন্য তাঁকে সর্বদাই ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল। অবশ্য পরবর্তীকালে ছোটো বড়ো প্রায় সকল ব্রাহ্ম-নেতাই স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলনকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছিলেন এবং নানাভাবে তাকে সফল করে তুলেছিলেন।

ব্রাহ্মসমাজের বিশিষ্ট নারীশিক্ষা সমর্থকদের সম্বন্ধে নলিনী দাশ বলেছেন— 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজের কন্যা, পুত্রবধূ, পৌত্রী, পৌত্রবধূ, দৌহিত্রী সকলেরই সুশিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের 'ভারত আশ্রম' নামে পারিবারিক প্রতিষ্ঠানেও বহু ব্রাহ্ম মহিলা শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু প্রগতিশীল ব্রাহ্ম নেতারা এতে সন্তুষ্ট না হয়ে মেয়েদের জন্য বিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। এ বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন ব্রজকিশোর বসুর ভাগিনেয় ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষ, দুর্গামোহন দাস ও তাঁর ভ্রাতা (দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের পিতা) ভুবনমোহন দাশ এবং দেশপ্রেমিক সমাজসেবী শিক্ষাব্রতী ও নারীমুক্তি আন্দোলনেব বিশিষ্ট নেতা দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়।"[১৮] এই সব নেতারা মিলে সমাজ-সংস্কার আন্দোলনে ব্রতী হলেন এবং সেইসঙ্গে গড়ে উঠল বেশ কয়েকটি সংস্থা। কলকাতা ও অন্যান্য অঞ্চলে এই জাতীয় কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের নাম করা যেতে পারে যেমন— সমাজোন্নয়ন বিধায়িনী সুহৃদ সমিতি (১৮৫৪), সর্বশুভকরী সভা (১৮৫০), ব্রাহ্ম বন্ধু সভা (১৮৬২), বামাবোধিনী সভা (১৮৬৩), উত্তরপাড়া হিতকরী সভা (১৮৬৪), বরিশাল মহিলা উন্নয়ন সমিতি (১৮৭১), বিক্রমপুর সম্মিলনী (১৮৭৯), ফরিদপুর সুহৃদ সংঘ (১৮৮০) প্রভৃতি।

প্রথম দিকে ব্রাহ্মসমাজেও মেয়েদের গতিবিধি খুব সীমাবদ্ধ ছিল। সেই কঠোর নিয়ম-কানুন প্রথম নিজ সমাজের মেয়েদের দিয়ে লঙ্ঘন করাতে সাহস করেছিলেন কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-৮৪)। ১৮৬২ খ্রীস্টাব্দে এক সাধারণ প্রার্থনা সভায় তিনি সস্ত্রীক উপস্থিত হয়েছিলেন। এর ফলে সেদিন ব্রাহ্মসমাজে প্রচণ্ড আলোড়ন হয়েছিল। তাঁর পারিবারিক জীবনেও দেখা দিয়েছিল নানা সমস্যা। তাঁকে নানাভাবে নানা দিক থেকে অনেক লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা সহ্য করতে হয়েছিল।

এরপর ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দে মিস্ মেরি কার্পেন্টারের সংবর্ধনা সভায় অনেক ব্রাহ্ম যুবক সস্ত্রীক উপস্থিত হয়েছিলেন।

পূর্বেই বলা হয়েছে আর-একজন ব্যক্তি এই জাতীয় দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন, তিনি হলেন ভারতের প্রথম সিভিলিয়ান সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪২-১৯২৩)।

১৮৭১ খ্রীস্টাব্দে ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনা সভায়, প্রগতিপন্থী নারীরা আড়ালে না বসে, তাঁদের নিজ নিজ স্বামীর পাশে গিয়ে আসন গ্রহণ করেন। সেকালে তাঁদের সেই নির্লজ্জ (!) আচরণের কঠোর সমালোচনা হয়েছিল। ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে বরিশালের গিরীন্দ্রচন্দ্র মজুমদারের স্ত্রী মনোরমা মজুমদার নিজে প্রার্থনা সভা পরিচালনা করেছিলেন। ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দে বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের পঞ্চম অধিবেশনে ছয়জন মহিলা ডেলিগেটের মধ্যে দু'জন ছিলেন বঙ্গের ব্রাহ্মমহিলা। তাঁরা হলেন প্রখ্যাত লেখিকা স্বর্ণকুমারী দেবী ও কৃতবিদ্য চিকিৎসক কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়। এই জাতীয় আরও অনেক উদাহরণ দেখানো যেতে পারে। এ সবই সম্ভবপর হয়েছিল স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের ফলে।

সেকালের প্রথা অনুসারে অনেক ব্রাহ্ম যুবকও বাল্য বিবাহ করতেন। কিন্তু পরবর্তী জীবনে তাঁরাও নানা ভাবে প্রগতিশীল মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। যেমন ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষ (১৮৪৪-৯৬) ইউরোপ থেকে প্রত্যাবর্তন করে, তাঁর বালিকা স্ত্রীকে যথাযথভাবে সুশিক্ষিত ক'রে তোলার জন্য লরেটো স্কুলে প্রেরণ করেন, প্রচলিত রীতিকে লঙ্ঘন করে। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর জ্ঞানদানন্দিনী দেবীকে নিজের কর্মস্থলে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং পরে ইয়োরোপেও নিয়ে যান তাঁকে দীর্ঘকালের জন্য।

নারীমুক্তির মন্ত্র প্রচারের জন্য এক সময়ে কেশবচন্দ্র, তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুদের নিয়ে নগর সংকীর্তনে গাইতেন—

"নর নারী সাধারণের সমান অধিকার,
যার আছে ভক্তি, পাবে মুক্তি, নাহি জাত বিচার।"

অন্তঃপুরচারিণী নারীরা যাতে ঘরে বসে শিক্ষা লাভের সুযোগ পায়, সেজন্য 'অন্তঃপুর স্ত্রী-শিক্ষা'র প্রবর্তন করেন কেশবচন্দ্র সেন। এ ক্ষেত্রে ব্রাহ্মরাই ছিলেন ব্যবস্থাপক। এই শিক্ষা ব্যবস্থা কেমন ছিল তার বিবরণ আমরা পাই—"১৮৬২ সনের মাঝামাঝি কলিকাতার 'ব্রাহ্ম বন্ধুসভা' স্থাপিত হয়। ব্রাহ্ম যুবকগণই ইহার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। এই সভার আনুকূল্যে এবং ইহারই অধীনে 'অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা' নামক একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। নাম হইতেই ইহার উদ্দেশ্য কতকটা হৃদয়ঙ্গম হইবে। কেশবচন্দ্র সেন ছিলেন এই আয়োজনের পুরোভাগে। তখন স্ত্রী শিক্ষার নিমিত্ত বিদ্যালয় ছিল নিতান্তই অপ্রচুর। দুই তিন বৎসরের বেশি শিক্ষা লাভ করাও বালিকাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। 'অন্তঃপুর স্ত্রী শিক্ষা' যে প্রণালী অবলম্বন করেন তাহাতে নারীগণ বিবাহের পূর্বে এবং পরে গৃহে বসিয়া বিদ্যাচর্চা করিবার সুযোগ পাইলেন।" [১৯]

ঘরে বসে জ্ঞানচর্চা ও সাহিত্য সাধনার সুবিধার জন্য 'বামাবোধিনী পত্রিকা' প্রকাশিত হয় ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে। উমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪০-১৯০৭) এই পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। এটি ছিল মাসিক পত্রিকা। এখানে সাগ্রহে মহিলাদের রচনা প্রকাশ করা হত। এই পত্রিকার মাধ্যমে মহিলাদের প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হত মাঝে মধ্যে।

দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় যখন ফরিদপুরে শিক্ষকতা করতেন, তখন তিনি 'অবলা বান্ধব' (১৮৬৯) নামক একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। স্ত্রী জাতির অধিকার সম্পর্কে সকলকে সচেতন করে তোলাই ছিল এই পত্রিকার লক্ষ্য।

কলিকাতার নিকটবর্তী বরাহনগর অঞ্চলে 'সেবাব্রতী' শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় নারীমঙ্গল কর্মের একজন প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। অন্তঃপুরচারিণী মহিলাদের জ্ঞানার্জনের সুবিধার জন্য তিনি 'ফিমেল সার্কুলেটিং লাইব্রেরী' নামে একটি পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি একটি বালিকা বিদ্যালয়ও স্থাপন করেন। পরে সেটি 'বরাহনগর বিধবাশ্রমে' (১৮৬৮) পরিণত হয়। তিনি নিজে এই প্রতিষ্ঠানটি চল্লিশ বছর ধরে নিষ্ঠা সহকারে পরিচালনা করেন। তাঁর দুই কন্যা বনলতা ও উষালতা 'অন্তঃপুর' (১৮৯৮) নামক মাসিক পত্রিকাটি সম্পাদনা ও পরিচালনা করতেন।

নারী প্রগতির ঢেউ শুধু কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেই নয়, পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গেও তা ছড়িয়ে পড়েছিল। উনিশ শতকের শেষ দিকে শিক্ষিত ও স্বপ্রতিষ্ঠ নারীরাই এই জাগৃতি আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। পূর্বে শিক্ষা বিস্তারের আয়োজন না করলে তা কখনোই সম্ভবপর হত না। বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের নাম করা যেতে পারে— 'Barisal Female Improvement Association' (১৮৭১), শ্রীহট্ট সম্মিলনী (১৮৪৭), বিক্রমপুর সম্মিলনী (১৮৭৯), ফরিদপুর সুহৃদ সংঘ (১৮৮০-৮১), মৈমনসিংহ সম্মিলনী ইত্যাদি। এইসঙ্গে নাম করা যেতে পারে কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে গঠিত 'নববিধান সভা' -পরিচালিত 'আর্যনারী সমাজ'-এর এবং বঙ্গ মহিলা সমাজের (১৮৭৯)। নারীকল্যাণকামী কর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন বহু জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি, যেমন—গিরিশচন্দ্র মজুমদার, বিপিনচন্দ্র পাল, সুন্দরীমোহন দাশ, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, দুর্গামোহন দাস, শিবনাথ শাস্ত্রী, কৃষ্ণকুমার মিত্র, আনন্দমোহন বসু, চণ্ডীচরণ সেন, হেমেন্দ্রনাথ দত্ত, হরিনারায়ণ সেন প্রভৃতি অনেকে। সেকালের অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন যাঁরা স্বেচ্ছায় নানাভাবে নারীশিক্ষা ও প্রগতির সহায়তা করতে এগিয়ে এসেছিলেন। বিশেষ করে যাঁদের নাম করতে হয়—তাঁরা হলেন—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, জগদীশচন্দ্র বসু, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ড. নীলরতন সরকার, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র প্রভৃতি। সকলের নাম উচ্চারণ না করেও এ কথা অক্লেশে ঘোষণা করা যায় যে— বহু নির্ভীক ব্রাহ্ম নারীর পিতা, ভ্রাতা, স্বামী ও পুত্ররা নানাভাবে উৎসাহ দিয়ে, শিক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে সাহায্য করে তাঁদের জীবনকে সফল করে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত এদেশে প্রধানত ব্রাহ্ম মেয়েরাই শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অগ্রগামী ছিলেন।

স্কুল ও কলেজের উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য তাঁরাই আগ্রহ প্রকাশ করতেন। প্রগতিপন্থী মনোভাবের পরিচয় তাঁদের মধ্যেই দেখা যেত। তাই বঙ্গের স্ত্রীশিক্ষা ও নারী জাগরণের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মসমাজের একটি মুখ্য ভূমিকা ছিল, এ কথা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করতে হবে।

স্মরণীয় দুই বিদুষী নারী

কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় (বসু) ও চন্দ্রমুখী বসু

বেথুন সাহেব ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যুগ্ম প্রচেষ্টায় যে বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হল— সেখানে প্রথম ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে বালিকাদের প্রবেশিকা পরীক্ষা দেবার অনুমতি দেওয়া হল। তখন থেকে এদেশে নারীর উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের পথ প্রশস্ত হল। ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে এখান থেকে প্রথম দুই নারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক হলেন— কাদম্বিনী বসু ও চন্দ্রমুখী বসু। শুধু বঙ্গদেশে নয়, সমগ্র ভারত, এমন-কি এশিয়া মহাদেশ ও বিশাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেরও এঁরা হলেন প্রথম গ্র্যাজুয়েট— এ তো কম গৌরবের কথা নয় ! কী ভাবে তাঁরা অনলস চেষ্টায়, সাহসের সঙ্গে অজস্র বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে, উচ্চ শিক্ষার পথে অগ্রসর হয়েছিলেন তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল।

কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় (বসু) (১৮৬১-১৯২৩)

বঙ্গের স্ত্রীশিক্ষার ইতিহাসে কাদম্বিনী বসুর নাম বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছে। ইনি ছিলেন ব্রজকিশোর বসুর কন্যা। ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে বেথুন কলেজ থেকে বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে। এই বছরেই বিখ্যাত সমাজ-সংস্কারক ও স্ত্রীশিক্ষার সমর্থক বিপত্নীক দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সহিত তাঁর বিবাহ হয়। তার জন্য তাঁর পড়াশুনার উৎসাহ কিছুমাত্র প্রশমিত হল না। কলিকাতা মেডিকেল কলেজে ইনি পাঁচ বছব চিকিৎসাবিজ্ঞান অধ্যয়ন শেষ করেন এবং ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দে এ বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য ইংলন্ডে যান। সেখানে এল.আর.সি.পি. (এডিনবরা), এল.আর.সি.এস. (গ্লাসগো) এবং ডি.এফ.পি.এস. (ডাবলিন) উপাধি লাভ করে দেশে ফিরে আসেন। কলকাতার লেডি ডাফরিন হাসপাতালে কিছু দিন কাজ করবার পর স্বাধীনভাবে তিনি বেশ-কিছুকাল চিকিৎসাকর্মে নিযুক্ত থাকেন। নানাগুণে গুণান্বিতা ছিলেন কাদম্বিনী। সংসারের সকল রকম কাজে তাঁর বেশ দক্ষতা ছিল। একাধিক সন্তানকে তিনি যথাযথ ভাবে লালন পালন করে, আদর্শ মা হিসাবে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। সূচীশিল্পে আশ্চর্য রকমের নৈপুণ্য ছিল। চমৎকার সূক্ষ্মলেস বুনতে পারতেন। আবার সুন্দর বক্তৃতাও দিতেন তিনি। জাতীয়তাবোধে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে, আজীবন তিনি নানা সমাজসেবামূলক কাজে নিযুক্ত ছিলেন।

তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে ভার্জিনিয়া মিত্র ও বিধুমুখী বসু কলিকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে এম. বি. ডিগ্রি লাভ করেন।



কাদম্বিনী বসু



চন্দ্রমুখী বসু

চন্দ্রমুখী বসু (১৮৬০-১৯৪৪)

ইনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মহিলা এম.এ (১৮৮৪ খ্রী.)। দেরাদুন প্রবাসী এক খ্রীস্টান পরিবারে এঁর জন্ম হয়। পিতার নাম ভুবনমোহন বসু। চন্দ্রমুখী তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন, বেথুন কলেজের অধ্যাপনার মধ্য দিয়ে। ১৮৮৬তে ইনি ঐ কলেজে অধ্যক্ষার পদ লাভ করেন। শারীরিক অসুস্থতার দরুন ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন ও দেরাদুনে প্রত্যাবর্তন করেন। সেখানে পণ্ডিত কেশ্বরানন্দ মমগায়েনেব সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। অবশিষ্ট জীবন তাঁরা দেবাদুনেই অতিবাহিত করেন।

কাদম্বিনী ও চন্দ্রমুখীর সাফল্যে সেকালে বিদ্যাসাগর প্রমুখ নারীহিতৈষী সকল ব্যক্তিই অত্যন্ত আনন্দিত হন। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এক সময় "বাঙ্গালীর মেয়ে" নামে একটি ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করেছিলেন। খুব হালকা সুরে সেখানে তিনি বলেছিলেন---

"ওই যায় ওই যায় বাঙালীর মেয়ে
খেয়ে যায, নিয়ে যায়, আর যায় চেয়ে।"

ইত্যাদি

অথচ তিনিই আবার কাদম্বিনী ও চন্দ্রমুখীর শিক্ষাগত যোগ্যতা দেখে মুগ্ধ ও উচ্ছ্বসিত হয়ে লিখলেন অন্য কবিতা—তাঁদের অভিনন্দন জানিয়ে—

"হরিণ নয়না শুন কাদম্বিনী বালা,
শুন ওগো চন্দ্রমুখী কৌমুদীর মালা,
যে ধিক্কারে লিখিয়াছি 'বাঙ্গালীর মেয়ে'
তারি মতো সুখ আজি তোমা দোঁহা পেয়ে।
বেঁচে থাক, সুখে থাক, চির সুখে আর
কে বলেরে বাঙ্গালীর জীবন অসার।
কি আশা জাগালি হৃদে কে আর নিবারে ?
ভাসিল আনন্দ ভেলা কালের জুয়ারে।
ধন্য বঙ্গনারী ধন্য সাবাসি তুহারে।" [২০]

'অবলাবান্ধব' দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৪-৯৮) ভারতীয় নারীদের উৎসাহিত করার জন্য সংগীত রচনা কবেছিলেন--

"না জাগিলে সব ভারত-ললনা
এ ভারত আর জাগে না, জাগে না।
অতএব জাগ, জাগ গো ভগিনি,
হও 'বীরজায়া, বীর প্রসবিনী'।
শুনাও সন্তানে, শুনাও তখনি,

বীরগুণ গাথাঁ, বিক্রম কাহিনী,
স্তন্য দুগ্ধ যবে পিয়াও জননি।
বীরগর্বে তার, নাচুক ধমনী,
তোরা না করিলে এ মহাসাধনা,
এ ভারত আর জাগে না, জাগে না।"[২১]

১৮৮৩-১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে যে-সব বঙ্গমহিলারা স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন এখানে তাঁদের নামের একটি তালিকা দেওয়া হল:

বঙ্গ মহিলা স্নাতক (B.A) ১৮৮৩-১৮৯৯

ক্রমিক সংখ্যা	বৎসর	নাম	প্রতিষ্ঠান	মন্তব্য
১।	১৮৮৩	কাদম্বিনী বসু	বেথুন ফিমেল স্কুল	—
২।	১৮৮৬	কামিনী রায়	বেথুন ফিমেল স্কুল	সংস্কৃতে দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স সহ
৩।	১৮৮৬	প্রিয়তমা দত্ত	বেথুন ফিমেল স্কুল	—
৪।	১৮৮৭	কুমুদিনী খাস্তগীর	বেথুন কলেজ	সংস্কৃতে দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স সহ
৫।	১৮৮৯	সুপ্রভা গুপ্ত	বেথুন কলেজ	—
৬।	১৮৯০	লীলা সিং	বেথুন কলেজ	ইংরেজীতে দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স সহ
৭।	১৮৯০	সরলা ঘোষাল	বেথুন কলেজ	ইংরেজীতে দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স সহ
৮।	১৮৯০	শরৎ চক্রবর্তী	বেথুন কলেজ	ইংরেজীতে দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স সহ
৯।	১৮৯১	জীবনবালা দত্ত	বেথুন কলেজ	—
১০।	১৮৯২	ইন্দিরা ঠাকুর	প্রাইভেট	ইংরেজীতে দ্বিতীয় ও ফরাসিতে প্রথম শ্রেণীর অনার্স
১১।	১৮৯২	প্রিয়ম্বদা বাগচী	বেথুন কলেজ	—
১২।	১৮৯৩	এলেন চন্দ্র	বেথুন কলেজ	—
১৩।	১৮৯৩	শশীবালা বন্দ্যোপাধ্যায়	বেথুন কলেজ	—
১৪।	১৮৯৩	সুরবালা ঘোষ	বেথুন কলেজ	—
১৫।	১৮৯৪	সরলাবালা রক্ষিত	বেথুন কলেজ	সংস্কৃতে দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স সহ

১৬।	১৮৯৬	প্রেমকুসুম সেন	বেথুন কলেজ	---
১৭।	১৮৯৭	Ida Constance DCruz	প্রাইভেট	
১৮।	১৮৯৭	সরলা সেন	বেথুন কলেজ	ইংরেজীতে দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স সহ
১৯।	১৮৯৮	Francesea De Souza	বেথুন কলেজ	----
২০।	১৮৯৮	শিশিরকুমারী বাগচী	বেথুন কলেজ	--
২১।	১৮৯৯	স্নেহলতা মজুমদার	বেথুন কলেজ	গণিতে দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স সহ

স্নাতকোত্তর (M.A) ১৮৮৪-১৮৯৯

ক্রমিক সংখ্যা	নাম	বিষয়	বৎসর	প্রতিষ্ঠান	মন্তব্য
১।	চন্দ্রমুখী বসু	ইংরেজী	১৮৮৪	ফ্রি চার্চ [illegible] স্কুল থেকে বি.এ.	দ্বিতীয় বিভাগ (অনার্স [illegible]
২।	নির্মলাবালা সোম	ইংরেজি	১৮৯১	প্রাইভেট ১৮৯৪ খ্রী. ইনি	দ্বিতীয় বিভাগে, দর্শনশাস্ত্রে এম.এ.দেন
৩।	ফ্লোরেন্স হল্যান্ড	ল্যাটিন	১৮৯২	প্রাইভেট	প্রথম বিভাগে অনার্স সহ
৪।	হেমপ্রভা বসু	উদ্ভিদবিদ্যা	১৮৯৭	শিক্ষয়িত্রী	তৃতীয় বিভাগ
৫।	মার্গারেট গুপ্ত	মানসিক ও নৈতিক বিজ্ঞান	১৮৯৯	Doventon College	তৃতীয় বিভাগ

(এই তালিকাটি 'বেথুন কলেজ শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ' থেকে নেওয়া হয়েছে।)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

স্ত্রী শিক্ষার প্রসার—দ্বিতীয় পর্যায়

নারী সমাজে শিক্ষার আলোক বিতরণ ও মুক্তি আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল তাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ ও আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলা। নারী শিক্ষা বিস্তারের কাজ ও প্রগতিবাদী আন্দোলন এগিয়ে চলেছিল। যদিও কিছু কিছু মানুষ এর বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন, তা সত্ত্বেও সাধারণভাবে স্ত্রীশিক্ষাবিরোধী মনোভাব ধীরে ধীরে অপসারিত হতে লাগল। তার জন্য তিনটি প্রধান স্কুল ও কলেজ—বেথুন, লরেটো হাউস ও ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউট ছাড়াও উনিশ শতকের শেষ দিকে দেখা যায় আরও অনেকগুলি নারী শিক্ষায়তন গড়ে উঠেছে। তার মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠানটি হল ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত 'ইডেন স্কুল' (১৮৯৮)।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নেতা পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর উদ্যোগে ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দের ৬ মে 'ব্রাহ্ম-বালিকা বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করা হয় কলকাতায়।

'মহারাণী পাঠশালা' নামক বিদ্যালয়টি ছিল একটি বিশেষ ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। হিন্দু ঘরের আদর্শ গৃহিণী হতে গেলে যে-সমস্ত গুণাবলীর অধিকারিণী হওয়ার প্রয়োজন হত সেকালে, লেখাপড়া শেখানোর সঙ্গে তা সমুদয় শেখানো হত এখানে। শিক্ষাদানের মাধ্যম ছিল, বাংলা ও সংস্কৃত ভাষা। নানা পূজাপদ্ধতি ও পাতিব্রত্যের আদর্শও এখানে শেখানো হত। এ ছাড়া সেলাই, বোনা, ছবি আঁকা, রান্না ও আনুষঙ্গিক অনেক কিছুই ছিল পাঠ্যতালিকাভুক্ত। এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাত্রী ছিলেন এক সন্ন্যাসিনী—মাতাজী মহারাণী তপস্বিনী। তাঁর পূর্বনাম ছিল গঙ্গাবাঈ। ইনি ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ-এর আত্মীয়া ছিলেন বলে শোনা যায়। সার্কুলার রোডে মহারাণী স্বর্ণময়ীর গৃহে এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের ১৯ এপ্রিল। প্রথম দিকে মাত্র তিরিশ জন ছাত্রী নিয়ে এই অবৈতনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সূত্রপাত ঘটে। পরে মাতাজীর মৃত্যুকালে কলকাতায় বিভিন্ন স্থানে এর ষোলোটি শাখা গড়ে ওঠে। এর থেকেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, এই বিদ্যালয়ের বিশেষ ধরণের শিক্ষা প্রণালীর প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল এবং জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছিল।

রক্ষণশীল হিন্দু নারী সমাজে শিক্ষা প্রসারের কাজে স্বামী বিবেকানন্দের সুযোগ্য শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতার অবদান বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। সনাতন হিন্দু আদর্শ প্রবর্তন করাই ছিল তাঁর শিক্ষাদানের প্রধান উদ্দেশ্য। স্বামীজী দেশ ও জাতিকে উন্নত করে তোলার জন্য যে বহুমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন, উপযুক্ত বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে তাদের সুশিক্ষিত করে

তোলা ছিল তার মধ্যে অন্যতম। ভগিনী নিবেদিতা ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে ভারতে আগমন করেন। প্রথম দিকে তিনি ভারতের উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন। ঐ সময় থেকে তিনি এদেশে স্ত্রীশিক্ষা দানের একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা গড়ে তোলেন। সেই অনুযায়ী তিনি ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের ১২ নভেম্বর কালী পূজার দিনে, বাগবাজার অঞ্চলে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। শ্রীশ্রী সারদা মা স্বয়ং ঐ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে সকলকে আশীর্বাদ করেন। একা নিবেদিতা বিদ্যালয়টি পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। আজও ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি নিবেদিতার নামাঙ্কিত হয়ে সগৌরবে বিরাজ করছে।

গত শতাব্দীর শেষ দিকে বেশ-কিছু বালিকা বিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায়, তা ছিল যৎসামান্য। এখানে তার একটি সংক্ষিপ্ত হিসাব দেওয়া যেতে পারে। স্ত্রী-শিক্ষা সম্পর্কিত তথ্য থেকে জানা যায়—

১৮৮১-১৮৮২

কলেজ	—	১
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	—	৮১
প্রাথমিক বিদ্যালয়	—	২৬০০
শিক্ষিকা-শিক্ষণ কলেজ	—	১৫২২

প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের পূর্বে এদেশে স্ত্রীশিক্ষা ব্যাপক ভাবে সমাদৃত হয় নি। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর প্রতিষ্ঠা লাভের সঙ্গে যে তাদের শিক্ষালাভের বিষয়টি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল সে কথা অস্বীকার করা যায় না। শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে নারীদের মধ্যে একদিকে যেমন আত্মবিশ্বাস ও আত্মসম্ভ্রমবোধের জাগরণ ঘটতে লাগল—অন্যদিকে আর্থিক স্বনির্ভরতার দিকেও তাঁরা অগ্রসর হলেন। আমরা দেখতে পাই মনোমোহিনী ব্যানার্জী যিনি বিবাহ করে হয়েছিলেন মিসেস্ হুইলার, তিনি 'বেঙ্গল সাবরডিনেট্ এডুকেশন সার্ভিসে' প্রথম বিদ্যালয় পরিদর্শিকা হন ১৮৭৯ সালে। অনেকেই শিক্ষকতা করতে এগিয়ে এসেছিলেন—রাধারানী লাহিড়ী, চন্দ্রমুখী বসু, কামিনী রায়, কুমুদিনী খাস্তগীর, সরলাদেবী চৌধুরানী প্রভৃতি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে ও বিপক্ষে সামাজিক আলোড়ন

উনিশ শতকে স্ত্রীশিক্ষাব বিষয়টি নিয়ে সমাজে এক বিরাট আলোড়ন উপস্থিত হয়। নারী শিক্ষার সমর্থনে এবং অসমর্থনে, সমসাময়িক যুগের পত্র-পত্রিকায় ও সংবাদপত্রে অসংখ্য আলাপ-আলোচনা প্রকাশিত হয় এবং ব্যক্তিগত ভাবেও অনেকে প্রবন্ধ-নিবন্ধ এবং কাব্য, প্রহসন, নাটক প্রভৃতি লিখেছিলেন। এই জাতীয় রচনার সঠিক হিসাব রাখা কঠিন। তবে উভয় শ্রেণীর রচনার কিছু কিছু নিদর্শন তুলে ধরা যায়।

বালিকাদেব শিক্ষিত করে তোলা হচ্ছে দেখে অনেকেব মনে অকারণ ভীতি ও আশঙ্কাব ভাব জেগে উঠেছিল। এর কারণ হল বিরোধী পক্ষের ব্যক্তিরা নানা পত্রিকা ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে স্ত্রীশিক্ষাবিরোধী তীব্র শ্লেষ ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ও আশঙ্কার কথা প্রচার করে চলেছিলেন, যাতে সাধারণ লোকেব মনে এ-বিষয়ে ভীতির সঞ্চার হয়। এর জন্য স্ত্রীশিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের বহুবিধ অবাঞ্ছিত ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

বিরোধী পক্ষের প্রধান ছিলেন—"সমাচার চন্দ্রিকা'র 'বুড়া-সম্পাদক', বা 'হিন্দু ইন্টেলিজেন্সর'-এর সম্পাদক 'হাফ-ওল্ড-বাঙ্গাল' কাশীপ্রসাদ ঘোষ এবং 'নিত্য ধর্মানুরঞ্জিকা'র নন্দকুমার কবিরত্ন। এঁরা ছিলেন এ কালের নামকরা স্ত্রীশিক্ষা বিরোধী দল।" [২৩]

বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠার পর রক্ষণশীল দলের মুখপত্র 'সমাচার-চন্দ্রিকা' যে রুচিবিগর্হিত মন্তব্য প্রকাশ করেন তার সামান্য উদাহরণ—"বালিকাগণকে বিদ্যালয়ে পাঠাইলে ব্যভিচার সংঘটনের শঙ্কা আছে, কেননা বালিকাগণ কামাতুর পুরুষের দৃষ্টিপথে পড়িলে অসৎ পুরুষেরা তাহারদিগকে বলাৎকার করিবে, অল্প বয়স্ক বলিয়া ছাড়িবে না, কারণ খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ।" ইত্যাদি।

যুগসন্ধিকালের কবি ঈশ্বর গুপ্ত মহাশয় প্রকৃতপক্ষে কিন্তু নারীশিক্ষাবিরোধী ছিলেন না—তবে সুরসিক কবি ও সাংবাদিক হিসাবে তিনি সমসাময়িক যুগের কুসংস্কারাচ্ছন্ন রক্ষণশীল মানুষের মনোভাবের পরিচয় দিয়ে লিখেছিলেন --

"আগে মেয়েগুলো ছিল ভাল ব্রতধর্ম কর্তো সবে।
একা বেথুন এসে শেষ করেছে আর কি তাদের তেমন পাবে?
যত ছুঁড়ি গুলো তুড়ি মেরে কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে,
তখন এ. বি. শিখে বিবি সেজে বিলাতী বোল কবেই কবে।"

যাঁরা তখন লজ্জাশীলা অন্তঃপুরচারিণী বঙ্গললনাদের ভবিষ্যৎ ও অস্বাভাবিক পরিণতির কথা চিন্তা করে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে উঠেছিলেন— তাঁদের আশঙ্কার কথা [illegible] কবি

"লক্ষ্মীমেয়ে ছিল যারা।

তারাই এখন চড়বে ঘোড়া, চড়বে ঘোড়া;
ঠাট ঠমকে চালাক চতুর সভ্য হবে থোড়া থোড়া।
এরা পর্দা তুলে ঘোমটা খুলে সেজে গুজে সভায় যাবে
ড্যাম হিন্দুয়ানী বলে বিন্দু বিন্দু ব্র্যান্ডি খাবে।।
আর কিছুদিন থাকলে বেঁচে সবাই দেখতে পাবেই পাবে
এরা আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে।"[২৪]

অন্যদিকে স্ত্রীশিক্ষায় উৎসাহী ব্যক্তিরা শুধুমাত্র বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেই ক্ষান্ত হলেন না; বালিকাদের পাঠোপযোগী স্বতন্ত্র ধরণের পাঠ্যপুস্তক রচনাতেও মনোযোগ দিলেন। 'স্কুলবুক সোসাইটি'র পক্ষ থেকে এই জাতীয় কয়েকটি বই প্রকাশ করা হয়, সেখানে দেখা যায় মহিলারাও এই কাজে যোগ দিলেন। যেমন 'বালাবোধ (ঢাকা, ১৮৭৪), কামিনী সুন্দরী দেবীর 'বালা বোধিকা' (১৮৬৮), প্রতুল কুমারী দাসীর 'বালিকা বোধ' (১৮৭৬) ইত্যাদি।[২৫]

স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজন আছে— এ-বিষয়ে জনমত গঠনের জন্য গৌরমোহন বিদ্যালংকার লিখলেন 'স্ত্রী শিক্ষা বিধায়ক' (১৮২২)। তার কারণ— "কলিকাতা স্কুল সোসাইটি- প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে হিন্দু বালিকারা প্রেরিত হলে উক্ত সোসাইটি, প্রাচীন ভারতে স্ত্রীশিক্ষা যে সুপ্রচলিত ছিল, তা প্রমাণ করবার জন্য গৌরমোহনকে এই পুস্তিকা লিখতে অনুরোধ করেন।"[২৬]

গ্রন্থটির প্রথম অংশে দুই নারীর কথোপকথনের ভঙ্গিতে আলোচ্য বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে—

"উ। এতো দুষ্কর্ম্ম নয়। কত লোক কত করে পার পায়। ওগো আমরা যখন ঘরের কাজ করিয়া অবসর পাব তখন এক জায়গায় চুপ করিয়া দুই চারি আখর শিখিব। যে খেলে সে কানা কড়িতেও খেলিতে পারে।

প্র। ঘরের পাইট ঝাইট কুটনা বাটনা রাঁধা বাড়া দেওয়া থোয়া করিতেই দিন যায়, তবে কখন শিখিব।

উ। ওলো যে রাঁধে সে কি চুল বাঁধে না। অতএব উহারি মধ্যে 'মাড়নের গরুর ঘাস খাওয়ার' মত একটু ২ শিখিলেই রক্ষা নাই।

প্র। ভাল দিদি, আমরা পড়িয়া শুনিয়া টাকা করিব এমন আশা তো করি না, কেবল জ্ঞান হইলে আমাদের বাড়ীর মেয়াছেলের দিগকে ঘরে বসিয়া শিখাইব তবে তাহাদেরও বিদ্যা হবে।"[২৭] ইত্যাদি

'বিদ্যাদর্শন' নামক পত্রিকায় (১৭৬৪ শকাব্দ, আষাঢ় সংখ্যা) 'হিন্দু স্ত্রীদিগের বিদ্যা শিক্ষা' নামক একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

স্ত্রীশিক্ষার একজন প্রধান সমর্থক মদনমোহন তর্কালংকার 'স্ত্রী শিক্ষা' নামে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন 'সর্বশুভকরী' পত্রিকায় (১৭৭২ শকের আশ্বিন মাসে)। এখানে আশ্চর্য ধরণের স্বাধীন ও আধুনিক চিন্তাধারার প্রতিফলন দেখা যায়। তিনি স্ত্রীলোকের আর্থিক ও স্বনির্ভরতার কথাও বলেছেন - "অন্তঃপুরে বসিয়া নানাবিধ শিল্পকার্য ও কারুকর্ম নির্মাণ করিয়া তদ্দ্বারা অনায়াসে অভিলষিত অর্থের অধিগম হইতে পারিবে।" ইত্যাদি।

স্ত্রীলোকদের পঠন-পাঠন উপযোগী পাঠক্রম কী রকম হওয়া উচিত— এ নিয়ে সেকালের চিন্তাবিদরা অনেকেই আলাপ-আলোচনা করেছিলেন। তারাশংকর তর্করত্ন-রচিত 'ভারতবর্ষীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষা' নামক পুস্তিকাটি এই জাতীয় একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এখানে চার খণ্ডে বিভক্ত গ্রন্থটিতে যুক্তি তর্ক সহকারে লেখক অনেক কথাই আলোচনা করেছেন। তাঁর একটি বড়ো অভিযোগ হল শিক্ষার ক্ষেত্রে পুত্র ও কন্যার মধ্যে প্রভেদ করা হয় কেন ? প্রথম খণ্ডের এক স্থানে তিনি বলেছেন— "পুত্রের বয়ঃক্রম পাঁচ বৎসর হইলে তাহাকে যত্ন পূর্বক পিতামাতা বিদ্যা শিক্ষায় নিযুক্ত করেন কিন্তু দুর্ভাগা বালিকারা কেহ বা গৃহকর্মে মনোভিনিবেশ কেহ বা ক্রীড়াতে কালযাপন করে।"

অজ্ঞাতনামা কোনো এক প্রবন্ধকার 'সুলভ পত্রিকা'তে (১২৬১ বঙ্গাব্দ, অগ্রহায়ণ ও পৌষ সংখ্যা) স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। যাঁরা স্ত্রীশিক্ষা বিরোধী মনোভাব পোষণ করেন, তাঁদের তিনি কঠোর সমালোচনা করেছেন। যুক্তিসহ তিনি দেখিয়েছিলেন যে, মেয়েদের শিক্ষিত করে তোলা, সম্পূর্ণ শাস্ত্রসম্মত কাজ।

দ্বারকানাথ-রচিত "স্ত্রী শিক্ষা বিধান' নামক গ্রন্থটি আর-একটি স্ত্রীশিক্ষা সমর্থক গ্রন্থ। ইনি জনসাধারণের একটি অর্থহীন ভ্রান্তধারণার তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। অনেক লোকের ধারণা আছে যে, কন্যা সন্তানের দ্বারা "বংশের নাম রক্ষা হয় না।" কিন্তু লেখক দেখিয়েছেন যে গার্গী, খনা, লীলাবতী প্রভৃতি প্রাচীন কালের বিদুষী নারীদের পিতা বা স্বামীর মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে, তাঁদের জন্য। বিশেষ করে লেখকের অভিমত হল, মাতা যদি বিদ্যাবতী হন, তা হলে তাঁর সন্তানদের মন ও চরিত্রের উপর তার শুভ প্রভাব পড়বে।

তিনি আরও বলেছেন যে, বালিকাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রয়োজন নেই— এ ধারণাও অমূলক। মেয়েদের ক্ষেত্রেও যথারীতি বিদ্যালয়ের শিক্ষা এবং সেইসঙ্গে উপযুক্ত শিক্ষিকা নিয়োগের প্রয়োজন আছে। উপযুক্ত শিক্ষিকার অভাবে, তিনি কোনো বয়স্কা বা বৃদ্ধা মহিলার তত্ত্বাবধানে চরিত্রবান পুরুষ শিক্ষক নিয়োগের কথাও বলেছেন।

স্ত্রীশিক্ষা সমর্থনে রামসুন্দর রায় লিখেছিলেন 'স্ত্রী ধর্ম বিধায়ক' (১৮৫৯) নামক পুস্তক।

কালীপ্রসন্ন ঘোষ তাঁর 'নারী জাতি বিষয়ক প্রস্তাব' (১৯২৬ সম্বৎ) গ্রন্থে বলেছেন, শিক্ষা নারী- "হৃদয়ের উৎকর্ষ সম্পাদন এবং শোভা পরিবর্ধনের জন্য" এবং তাঁদের ধর্মশিক্ষা দানেরও প্রয়োজন আছে। আবেগবহুল ভাষায় তিনি আরও অনেক কথা এখানে বলেছেন।

'অবলাবান্ধব' নামক স্ত্রীলোকদের পাঠোপযোগী একটি গ্রন্থে শরৎচন্দ্র ধর স্ত্রীশিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

আর্যমিশন ইনস্টিটিউশন থেকে 'স্ত্রী স্বাধীনতা ও স্ত্রী শিক্ষা' (১৮[illegible]) নামক [illegible] প্রকাশিত হয়।

শুধুমাত্র প্রবন্ধ বা গ্রন্থ রচনা করে নয়—বক্তৃতার মাধ্যমেও অনেকে স্ত্রীশিক্ষা প্রচারে ও প্রসারে সাহায্য করেছেন। সবচেয়ে আনন্দের বিষয় হল, উনিশ শতকের শেষার্ধে, শিক্ষিত মহিলারা স্বয়ং এই আলাপ-আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। যেমন কৈলাসবাসিনী দেবী লিখলেন 'হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা' (১৭৮৫ শক)। এখানে লেখিকা হয়তো নতুন কথা তেমন কিছু বলেন নি, কিন্তু নিজে নারী হয়ে, নিজেদের শিক্ষা সমস্যার কথা উত্থাপন করেছেন— এটি কম গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়।

তাঁর রচিত আর-একটি গ্রন্থ— 'হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস ও তাহার সমুন্নতি' (১৭৮৭ শকাব্দ)। মেয়েরা লেখা পড়া শিখলে কোন্ কোন্ দিক থেকে লাভবতী হতে পারবে, সে কথা আলোচনা করেছেন। তবে গৃহধর্ম পালনই যে নারীর অবশ্য কর্তব্য, এ উপদেশ দিতে তিনি ভোলেন নি। বেশ-একটু ব্যঙ্গচ্ছলেই বলেছেন— "কিন্তু বিদ্যাভিলাষিণী কামিনীগণের মতে কেবল তাঁহারা পুস্তক পাঠ করিবেন ও কার্পেট বুনিবেন। কিন্তু সেরূপ ইচ্ছাকেও নিতান্ত নিন্দা করা যায় না, যদি তাহা প্রকৃতরূপে সম্পাদিত হয়।... কিন্তু সেরূপ হওয়া তাঁহাদিগের অভিপ্রেত নহে, কেবল কোন মতে গোলমাল করিয়া সময় নষ্ট করাই তাঁহাদিগের অভিসন্ধি, নচেৎ তাঁহারা এরূপ ভাবের ভাবিনী কেন হইবেন।" ২৮

'ভারতী' পত্রিকায় জ্ঞানদানন্দিনী দেবী "স্ত্রী শিক্ষা" (১২৮৮ সাল) নামে একটি প্রবন্ধে, স্ত্রীশিক্ষার প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা করেন।

১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় প্রকাশিত মহিলাদের রচনাবলীর সংকলন প্রকাশিত হয় 'বামা রচনাবলী' নামে। এখানে বেশ কয়েকজন লেখিকার শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধ পাওয়া যায়। যেমন শৈলজাকুমারী দেবী, শ্রীমতী রমাসুন্দরী, শ্রীমতী মধুমতী মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির রচনা উল্লেখযোগ্য।

সাবিত্রী লাইব্রেরির পঞ্চম অধিবেশনে শ্যামাসুন্দরী দেবীর লেখা "প্রাচীন ও আধুনিক স্ত্রী শিক্ষার প্রভেদ" (১২৯০ বঙ্গাব্দ) নামক প্রবন্ধ পঠিত হয়। ইনি তৎকালীন প্রচলিত স্ত্রী- শিক্ষার কটু সমালোচনা করেছেন। উপসংহারে (পৃ. ২৩৯) বলেছেন— "এই শিক্ষা যখন দেশীয় সুরীতি গ্রহণ করিয়া সাধিত হইবে, তখনই ভারত ললনার প্রকৃত সুশিক্ষা সম্পন্ন হইতেছে বলা যাইবে।"

যৎসামান্য এই উদাহরণগুলি উল্লেখ করে এইমাত্র বলা যায় যে, উনিশ শতকের শেষ দিকে জনসাধারণ স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন হয়ে উঠেছিল।

নির্দেশিকা

প্রথম পরিচ্ছেদ

১। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা—নবম খণ্ড (জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ), পৃ. ৪৮১

২। প্রসন্নময়ী দেবী, 'পূর্বকথা'—(সুবর্ণরেখা সংস্করণ, ১৯৮২), পৃ. ৮১

৩। বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি', পৃ. ৬১

৪। 'শিবনাথ শাস্ত্রী', সাহিত্য সাধক চরিতমালা, ৭৫ নং, (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ), পৃ. ৬

৫। স্বপন বসু, 'বাংলার নবচেতনার ইতিহাস', (১ম সংস্করণ), পৃ. ১৬৭

৬। রাসসুন্দরী দেবী, 'আমার জীবন', পৃষ্ঠা- ৭, পৃ. ২৩ ['আত্মকথা' ১ম খণ্ড (অনন্য প্রকাশন)]

৭। সারদা সুন্দরী দেবী, 'আত্মকথা', পৃ. ৭ [আত্মকথা ১ম খন্ড (অনন্য প্রকাশন)]

৮। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, 'বঙ্গ সাহিত্যে নারী', (বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ), পৃ. ১

৯। দীনবন্ধু মিত্র, "মাঘমাসের প্রাতঃস্নান" কবিতা, দীনবন্ধু রচনা সংগ্রহ (পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি) পৃ. ৫৩৩

১০। যোগেশচন্দ্র বাগল, 'বাংলার স্ত্রী শিক্ষা', (বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ), পৃ. ১৫

১১। তদেব, পৃ. ২৭

১২। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়- সম্পাদিত, 'পুরাতন বাংলা গদ্য গ্রন্থ সংকলন', ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৭

১৩। "ভূমিকা", বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ। দ্বিতীয় খণ্ড। (পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি) পৃ. ঊনত্রিশ

১৪। শিবনাথ রচনা সংগ্রহ। ১ম খণ্ড। (বাল্য রচনা), পৃ. ৪৫-৪৬

১৫। শিবনাথ শাস্ত্রী, 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ (তৃতীয় সংস্করণ), পৃ. ১৬৯

১৬। রাজনারায়ণ বসু, 'আত্মচরিত', ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২

১৭। যোগেশচন্দ্র বাগল, 'বাংলার স্ত্রী শিক্ষা', (বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ), পৃ. ৪৯

১৮। নলিনী দাশ, "কাদম্বিনী বসু" (প্রবন্ধ) 'বেথুন কলেজ শতবার্ষিকী-স্মারক গ্রন্থ', পৃ. ২

১৯। যোগেশচন্দ্র বাগল, 'স্ত্রী শিক্ষার কথা', ১ম প্রকাশ ১৯৬৭, পৃ. ৩-৪

২০। রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত, 'বাংলা দেশের ইতিহাস', ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৩৬

২১। 'দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়', সাহিত্য সাধক চরিতমালা ৩০ নং গ্রন্থ, (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ), পৃ. ৩০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

২২। C. P. Banerjee, *Education in India--(Past: Present Future)* Vol. I Part IV, Chapter 5, p. 79.

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

২৩। স্বপন বসু, 'বাংলার নবচেতনার ইতিহাস', পৃ. ২৭৫

২৪। "বাঙ্গালীর মেয়ে" কবিতা। ঈশ্বর গুপ্তের গ্রন্থাবলী (বসুমতী সাহিত্য মন্দির), পৃ. ৩৬৭

২৫। নিখিল সরকার, "দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ", 'আদিযুগের পাঠ্যপুস্তক' (প্রবন্ধ), পৃ. ১৭১

২৬। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—সম্পাদিত 'পুরাতন বাংলা গদ্য সংকলন', ১৯৮১ 'ভূমিকা', পৃ. চৌদ্দ।

২৭। 'স্ত্রী শিক্ষা বিধায়ক গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার', 'পুরাতন বাংলা গদ্য গ্রন্থ সংকলন', ২য় খণ্ড, পৃ. ১০১।

২৮। কৈলাস বাসিনী দেবী, 'হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস ও তাহার সমুন্নতি' ১৭৮৭ শকাব্দ, পৃ. ২৭-২৮।



পঞ্চম অধ্যায়

সাহিত্য সৃজনে বঙ্গনারী

শুধু বাংলা সাহিত্যে নয়, পৃথিবীর নানা দেশে বিভিন্ন ভাষায় রচিত যে বিশাল সাহিত্য ভাণ্ডার আছে, সেখানে অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, পুরুষ লেখকদের তুলনায় লেখিকারা সংখ্যায় নেহাত নগণ্য। আবার যদি আমরা সাহিত্যানুরাগী পাঠক-পাঠিকার সংখ্যা গণনা করি, তা হলে বিপরীত চিত্রই দেখতে পাব— সাহিত্যানুরাগী পাঠিকারাই সংখ্যায় অধিক। এ কথা অস্বীকার করা যাবে না যে, সৃষ্টিশীল সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পুরুষরা যেভাবে আত্মনিয়োগ করেন, নারী জাতি তা পারেন না। কেন পারেন না তার প্রকৃত কারণটি অজ্ঞাত হলেও, এর জন্য একান্তভাবে কাউকে যদি দায়ী করতেই হয়, তা হলে বিধাতাকেই দোষারোপ করতে হয়। তিনিই নারীমনে এমন একটি সহজাত প্রবণতা ও প্রবৃত্তি দিয়েছেন, যার বশবর্তী হয়ে তাঁরা সুখ-শান্তিপূর্ণ ঘর-সংসার গড়ে তোলার স্বপ্নে মশগুল হয়ে থাকেন। কেউ কেউ হয়তো ব্যতিক্রম। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায়, কৈশোর বা প্রথম যৌবনে যে-সব মেয়েরা সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের নব-নব-উন্মেষশালিনী বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন, তাঁরাই অনায়াসে সময় ও সুযোগ মতো 'স্বখাত সলিলে' ডুবে মরতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন না। এমন-কি এজন্যে তাঁদের কারো বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ, অনুযোগ বা অনুশোচনা করতেও শোনা যায় না। বরং সাংসারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকেই তাঁরা জীবনের পরম প্রাপ্তি বলে মনে করেন। এ ব্যাপারে অসংখ্য উদাহরণ তুলে ধরা যায় ইচ্ছা করলে। কিন্তু বিখ্যাত একটি নিদর্শনই এখানে উল্লেখ করছি। উনিশ শতকের প্রখ্যাত কবি কামিনী রায় যিনি শুধু কবিমাত্রই ছিলেন না, ছিলেন যথার্থ একজন সমাজ সচেতন উচ্চশিক্ষিতা নারী। সংস্কৃতে অনার্স সহ বি.এ. পাস করে বেথুন বিদ্যালয়ে ইনি কিছু দিন শিক্ষকতাও করেছিলেন। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'আলো ও ছায়া' (১৮৮৯ খ্রী.) প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পাঠক সমাজে সাড়া পড়ে গিয়েছিল। 'নির্মাল্য' কাব্যগ্রন্থ (১৮৯১) প্রকাশের পর তাঁর বিবাহ হল, কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে। সংসার জীবনে প্রবেশের পর সেই কামিনী রায় আর কাব্যচর্চার অবকাশ পেলেন না। এ বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন, বিবাহিত জীবনের কর্তব্যগুলি অর্থাৎ স্বামী সেবা, গৃহকর্ম, সন্তান পালন ইত্যাদি 'আমার জীবন্ত কবিতা'।[১] কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত একে একে স্বামী ও সন্তানদের হারিয়ে তিনি যখন শোকসাগরে নিমজ্জিত হলেন, পুনরায় তাঁর মনের কোণে হারিয়ে-যাওয়া সেই কাব্যের উৎসটি উৎসারিত হল প্রবল শোকোচ্ছ্বাস নিয়ে।

সংসার ও সমাজে নারীর ভূমিকাকে কবি রবীন্দ্রনাথ স্বতন্ত্র একটি মহিমায় ভূষিত করে

দেখেছিলেন এবং দেখাতে চেয়েছিলেন। তাঁর দৃষ্টিতে—

"নারী তুমি ধন্য—
আছে ঘর, আছে ঘরকন্না।
তারি মধ্যে রেখেছ একটুখানি ফাঁক।
সেথা হতে পশে কানে বাহিরের দুর্বলের ডাক।
নিয়ে এসো শুশ্রূষার ডালি,
স্নেহ দাও ঢালি।
যে জীবলক্ষ্মীর মনে পালনের শক্তি বহমান,
নারী তুমি নিত্য শোন তাহারি আহ্বান।
সৃষ্টি বিধাতার
নিয়েছ কর্মের ভার,
তুমি নারী
তাঁহারি আপন সহকারী।
* * * * *
বিশ্বের পালনী শক্তি নিজ বীর্যে বহ চুপে চুপে
মাধুরীর রূপে।
ভ্রষ্ট যেই, ভগ্ন যেই, বিরূপ বিকৃত,
তারি লাগি সুন্দরের হাতের অমৃত।" [২]

নারী-রচিত সাহিত্যের পরিমাণ স্বল্প হলেও, গুণগত বিচারে তা তুচ্ছ বা নগণ্য নয়। জগৎ ও জীবনকে পুরুষরা যে দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন, নারীরা দেখেন তাকে ভিন্ন দিক থেকে। নারী জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ হুবহু পুরুষের অনুরূপ নয়। এমন-কি যে ভাষা ও ভঙ্গিতে তাঁরা মনোভাব প্রকাশ করেন তার মধ্যেও স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় ফুটে ওঠে। সুতরাং নারী ও পুরুষের রচিত সাহিত্য একে অপরের পরিপূরক। মেয়েরা 'মেয়ে' হয়েও যেখানে 'মানুষ' এবং সেই জাতীয় মনোভাবের প্রতিফলন ঘটে যেখানে, সেই সাহিত্যই পরিপূর্ণ সাহিত্যিক মর্যাদা লাভে ধন্য হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্তনের পর নারীদের মানস জীবনে একটা বড়ো রকমের পরিবর্তন ঘটে গেল, তাঁরা আয়ত্ত করলেন মনোভাব প্রকাশক্ষম ভাষাকে। সেই কারণে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের অব্যবহিত পরেই তাঁরা সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণা অনুভব করলেন। যদিও এ সময় দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গনারী' কবিতায় আক্ষেপের সুরে বলেছিলেন—

"কি পাপে পাঠালে বিধি করে বঙ্গনারী,
প্রকৃতিরঞ্জিত ছবি জন-মনোহারী।

জলে স্থলে শূন্যে একা, সুরূপ লাবণ্য মাখা,
এ দেশে এমন আছে দেখিতে না পারি।"

ইত্যাদি।

কিন্তু উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেই বেশ কয়েকজন বঙ্গনারী সাহিত্যসেবায় ব্রতী হলেন। উনিশ শতকের শেষ দিকে প্রতিভাময়ী বহু সাহিত্যিক মিলে একযোগে সাহিত্য রচনা করে বঙ্গ-সাহিত্যকাননকে মুখরিত করে তুলেছিলেন এক সময়। যদিও এই শতাব্দীর প্রথম যথার্থ শক্তিময়ী ও প্রতিভাশালিনী লেখিকা বলতে আমরা বুঝি স্বর্ণকুমারী দেবীকে। তিনি একাধারে কবিতা, গান, নাটক, প্রহসন, উপন্যাস, ছোটোগল্প ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন এবং যোগ্যতার সঙ্গে সাহিত্য পত্রিকা পরিচালনা করেছেন, এমন-কি পাঠ্য পুস্তক রচনাতেও প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

প্রথম পর্যায়ে যে-সব মহিলা কবিদের আবির্ভাব ঘটেছিল, মুদ্রাযন্ত্রের কল্যাণে আমরা সাময়িক পত্রিকার পৃষ্ঠায় এবং স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে বেশ-কয়েকজন মহিলা সাহিত্যিকের রচিত সাহিত্যফসলের সন্ধান পাই। একালের পাঠকবর্গের কাছে প্রথম যুগের লেখিকাদের রচনা হয়তো অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হবে, কিন্তু সেকালে তাঁদের প্রতিকূল সামাজিক ও পারিবারিক পরিবেশের কথা মনে রাখলে এই সব রচনাকে কখনোই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা সম্ভব হবে না। বরং তাঁদের এই আত্মপ্রকাশের প্রয়াসকে অত্যন্ত প্রশংসনীয় ও দুঃসাহসিক কাজ বলে মনে হবে। এ কালের লেখিকাদের সম্পর্কে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেছেন— "একে যথোচিত শিক্ষার অভাব, তাহার উপর সামাজিক ও পারিবারিক প্রতিকূলতা— ইহা স্মরণ করিলে স্বল্প শিক্ষিতা এই-সকল কুলবালার প্রথমোদ্যম নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর মনে হইবে না।" [৩] যথাযথ শিক্ষা গ্রহণ বা সাহিত্যানুশীলনের সুযোগ না থাকলেও, তাঁরা সাহিত্য সাধনায় অগ্রসর হতে দ্বিধা করেন নি। হয়তো বিষয়বস্তু নির্বাচনে তেমন যোগ্যতার বা মৌলিকতার পরিচয় দিতে পারেন নি, ভাষা ব্যবহারের সৌকর্য কিংবা আঙ্গিকের পারিপাট্য হয়তো তেমন চোখে পড়বে না, কিন্তু উচ্চ সাহিত্যগুণসম্পন্ন না হলেও, এই রচনাগুলির ঐতিহাসিক মূল্য কেউ অস্বীকার করবে না। একথাও মনে রাখতে হবে যে, এঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই বাংলা সাহিত্যে পরবর্তী কালের প্রতিভাশালিনী লেখিকাদের আবির্ভাব ঘটেছিল। সেকালের অধিকাংশ মানুষ স্ত্রীলোকের সাহিত্যচর্চাকে সন্দেহের চোখে দেখতেন এবং এই জাতীয় প্রয়াসকে ধৃষ্টতার নামান্তর বলে মনে করতেন। সামান্য সহানুভূতি বা সহযোগিতার অভাবে কত লেখিকার সযত্ন কাব্যপ্রয়াস অথবা সাহিত্য-চর্চা বিফলে গেছে। তাঁদের রচনাগুলি অবহেলায় ও অনাদৃত ভাবে লোকচক্ষুর অন্তরালে পড়ে থেকে একদিন কীটের খাদ্যরূপে নির্মূল হয়ে গেছে। এত প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও তাঁরা সাহিত্যানুশীলন করে গেছেন এবং তার ফলে অচিরকালের মধ্যে নারী-রচিত সাহিত্যে পরিণতির চিহ্ন পরিস্ফুট হয়েছে। স্বর্ণকুমারী ছাড়াও এ সময়কার আরও উল্লেখযোগ্য লেখিকার নাম করা যায়— গিরীন্দ্রমোহিনী দত্ত, মানকুমারী বসু, প্রসন্নময়ী দেবী, প্রিয়ম্বদা দেবী, অনুরূপা দেবী, নিরুপমা দেবী, শৈলবালা ঘোষজায়া, তরু দত্ত, সরোজিনী নাইডু, ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী প্রভৃতি।

প্রথম দিকে মহিলারা সাহিত্যজগতে কী ভাবে ভীরু পদক্ষেপে স্বীয় পরিচয় গোপন করে আনাগোনা শুরু করেছিলেন তার বর্ণনা দিয়েছেন ঐতিহাসিক যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় তাঁর 'বঙ্গের মহিলা কবি' নামক গ্রন্থের ভূমিকা অংশে। তিনি লিখেছেন—"ঊনবিংশ শতাব্দীতে কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত - সম্পাদিত 'প্রভাকর' পত্রে মহিলা কবিদের লিখিত গদ্য ও পদ্য, প্রবন্ধ ইত্যাদি প্রকাশিত হইত। . . . 'প্রভাকরে'র পর 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় মহিলা কবিগণের কবিতা নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হইত। 'বামাবোধিনী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন স্বর্গত দেশসেবক, সমাজ সংস্কারক এবং কলিকাতা সিটি কলেজের অধ্যক্ষ মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত। তিনি নারী জাতির অশেষ কল্যাণকামী ছিলেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে 'হেয়ার প্রাইজ ফন্ডে'র ব্যয়ে 'বামাবোধিনী সভা'-কর্তৃক সুবিখ্যাত প্যারীচাঁদ মিত্র ও শিবচন্দ্র দেবের সাহায্যে 'বামা রচনাবলী' সংকলিত হয়। উহাতে 'অবলাবান্ধব', 'বঙ্গবন্ধু', 'বামাবোধিনী' পত্রিকা প্রভৃতির লেখিকাদের উৎকৃষ্ট গদ্য ও পদ্য রচনা সমূহ প্রকাশিত হয়।" [৪]

বঙ্কিমচন্দ্র-সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকাতেও কোনো কোনো মহিলার রচনা প্রকাশিত হয়েছিল এবং স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র তার সমালোচনাও লিখেছিলেন। যেমন অন্নদাসুন্দরী দাসী-রচিত 'অবলা বিলাপ' নামক কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন "যে স্ত্রীলোক অন্নদা সুন্দরীর ন্যায় কবিতা রচনা করিতে না পারেন, তিনি যেন লেখেন না।" [৫]

লজ্জা, ভয়, দ্বিধা থাকার দরুন প্রথম যুগের অনেক লেখিকাই স্বনামে রচনা বা গ্রন্থ প্রকাশ করতেন না। সেই কারণে এই সময়কার অনেক 'অনামিকা'র গ্রন্থ পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে বিশেষ অনুসন্ধানের ফলে কোনো কোনো গ্রন্থ রচয়িত্রীর পরিচয় উদ্ধার করা গেলেও, অধিকাংশেরই হদিশ মেলে নি। কী ভাবে তাঁরা স্বনাম গোপন করতেন তার উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে— "বারাসতস্থ কোন ভদ্রকুলবালা; বর্দ্ধমানস্থ কোন ভদ্রকুলবালা, দত্তপুকুরস্থ কোন ভদ্রকুলবালা, জগদ্দলবাসিনী. . . চট্টোপাধ্যায়, দোয়ার উত্তরপল্লী নিবাসিনী কোন মহিলা, ঢাকাস্থ কোন রমণী" ইত্যাদি।[৬] সেকালের লেখিকারা অনেকে গদ্য ও পদ্য উভয় শ্রেণীর রচনাতেই কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। আবার অনেকে কবিতা রচনা দিয়ে সাহিত্য- চর্চা শুরু করে গদ্য রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন কিংবা কেউ আবার গদ্য লেখা ছেড়ে দিয়ে কাব্যই লিখেছেন। এই জাতীয় অনেক গ্রন্থ পাওয়া গেছে, যেগুলির প্রকৃত রচয়িত্রীর কোনো সন্ধান মেলে না। এই সময়ে প্রথম আত্মপ্রকাশের আতিশয্যে অজস্র লেখিকার আবির্ভাব আমাদের বিস্মিত করে। উনিশ শতকের শেষার্ধের লেখিকাবর্গের সঙ্গে যদি আমরা বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের লেখিকা সমূহের তুলনা করি, তা হলে দেখতে পাব যে পরবর্তীকালে তাঁদের সংখ্যা শোচনীয়ভাবে হ্রাস পেয়েছে। অথচ গত শতাব্দীর শেষ দিকে নিত্যনূতন লেখিকাদের আত্মপ্রকাশ করতে দেখে প্রমথ চৌধুরী ('বীরবল') একটি সকৌতুক মন্তব্য করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন— "ইংরেজি রাজনীতির ভাষায় যাকে বলে peaceful penitration সেই পদ্ধতি অনুসরণ করে স্ত্রীজাতি আমাদের সাহিত্যরাজ্যে ধীর ধীরে এতটা দখল করে নিচ্ছেন যে, আমার সময়ে সময়ে আশঙ্কা হয় যে, এ

রাজ্য হয়তো ক্রমে নারী রাজ্য হয়ে উঠবে।"[৭] বলাই বাহুল্য তাঁর এই আশঙ্কা সত্যে পরিণত হয় নি। আসল কারণ কী বলতে পারি না, তবে আমার ব্যক্তিগত অনুমান হল এই যে, গত শতাব্দীতে অন্তঃপুরিকাদের আত্মপ্রকাশের মাত্র একটি পথই উন্মুক্ত ছিল— তা হল নিভৃতে বসে সাহিত্যচর্চা। কিন্তু নারী সমাজে উচ্চ শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা আর পর্দানসীন থাকলেন না এবং তাঁদের কর্মক্ষেত্রও নানা দিকে প্রসারিত হল। নারী প্রগতি ভিন্নরূপ গ্রহণ করল ও ভিন্ন ভিন্ন পথে অগ্রসর হতে লাগল। নারীরা আত্মপ্রতিষ্ঠার শত-সহস্র সুযোগ লাভ করলেন। তখন একমাত্র অন্তর্মুখী ও লিপিকুশলা নারীরাই সাহিত্যচর্চায় লিপ্ত হলেন, অন্যেরা স্ব স্ব অভীপ্সিত পথে চলতে লাগলেন।

সাধারণভাবে বিচার করলে দেখা যায় মহিলারা বুদ্ধিপ্রধান সাহিত্য রচনা করতে পছন্দ করেন না, আবেগধর্মী সাহিত্য সৃষ্টিতেই তাঁরা অধিকতর আগ্রহী। এই কারণেই হয়তো পাঠক সমাজের একাংশ, লেখিকা মাত্রকেই অত্যন্ত অনুকম্পার দৃষ্টিতে দেখে থাকেন। আর হয়তো এই কারণেই দেখা যায় বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক ভিন্ন, স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পাঠ্যতালিকায় মহিলা-রচিত কোনো গ্রন্থ স্থান পায় না। নারী-রচিত সাহিত্য হয়তো পাঠের অযোগ্য বলেই বিবেচিত হয়। বিজ্ঞ ও বিদগ্ধ লেখক প্রমথ চৌধুরী এ সম্পর্কে কী জাতীয় মত পোষণ করতেন, এই প্রসঙ্গে তার কিছু পরিচয় তুলে ধরা যাক। একবার আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন— "বায়োলজির মতে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মানুষের মধ্যেই পুরুষ ও নারী উভয় সত্তই বর্তমান। কিন্তু তবুও কতক ক্ষেত্রে নারী একান্তই নারী আর পুরুষ একান্তই পুরুষ। সেই বিশেষত্বকে শিল্প সৃষ্টির মধ্যে প্রকাশ করতে পারলে স্বকীয়তার দাম আছে। যেমন ধরো, পুরুষ ষ্টেজের উপরে যতই কেন না নিখুঁত রূপে মেয়ে সাজুক, তার চেহারায় হোক, তার কণ্ঠস্বরে হোক, অন্ততঃ তার চাল-চলনে হাবেভাবে কোনও এক ফাঁকে ধরা পড়ে যায়, সে আসলে মেয়ে নয়, নিখুঁত ভাবে মেয়ে সেজেছে মাত্র। মেয়ের বেলাতেও এই একই সত্য খাটে।" তিনি এমন কথাও বলেছিলেন যে, "মেয়েরা কেন এমন লেখা লিখবেন না, যে লেখায় লেখকের নাম দেওয়া না থাকলেও কারুর বুঝে নিতে ভুল হবে না এ লেখা মেয়ের। পুরুষের পক্ষে সম্ভব নয়, ঠিক এমন লেখবার।"[৮]

উনিশ শতকের লেখিকাদের মোটামুটি সংখ্যার হিসাব নিলে দেখা যায় প্রায় দুই শতাধিক ছিলেন তাঁরা, তবে প্রধান ও অপ্রধান সব মিলে এই সংখ্যা।

ক. কাব্যসাহিত্যে বঙ্গনারী

বাংলা কাব্যসাহিত্যের আধুনিক যুগের সূচনা পর্বে একাধিক পুরুষ কবি, নারীর মহিমা কীর্তন করে কাব্য রচনা করেছিলেন। যেমন কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮২৭-৮৭) তিনখানি আখ্যান কাব্য নারী নামাঙ্কিত : 'পদ্মিনী উপাখ্যান', 'কর্মদেবী' ও 'শূরসুন্দরী' মধুসূদনের

(১৮২৪-৭৩) 'মেঘনাদবধ কাব্যে' দেখা যায় একাধিক ব্যক্তিত্বময়ী নারীকে চিত্রাঙ্গদা, প্রমীলা, সীতা প্রভৃতি এবং তাঁর 'বীরাঙ্গনা কাব্যে' আছে নারীর ক্ষাত্রপ্রেমের পরিচয়। বিহারীলাল চক্রবর্তীর (১৮৩৫-৯৪) 'বঙ্গ সুন্দরী' কাব্য; সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের (১৮৩৮-৭৮) 'মহিলাকাব্য' এবং অক্ষয়কুমার বড়াল (১৮৬০-১৯১৯) অথবা দেবেন্দ্রনাথ সেনের (১৮৫৮-১৯২০) মতো কবিদের কথা মনে রেখে বলা যায় যে, যেন নারীবন্দনাই পরোক্ষ ভাবে সম্ভব করে তুলেছিল— প্রত্যক্ষভাবে সাহিত্যের ক্ষেত্রে নারীর আবির্ভাবকে। কবিরাই এক হিসাবে সত্যদ্রষ্টা এবং ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা, বাংলা কাব্যজগতের এই ঘটনা তার একটি উজ্জ্বল নিদর্শন। অথচ শোনা যায় গ্রীক দার্শনিক প্লেটো নাকি তাঁর 'আদর্শ রিপাবলিক' থেকে কবিদের বিতাড়িত করতে চেয়েছিলেন। কতখানি ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে তিনি এমন গর্হিত কর্ম করতে চেয়েছিলেন, সেকথা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়।

নারী জাগরণের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই যে সমস্ত মহিলা সাহিত্যিক দেখা দিলেন, তাঁদের রচনাগুলিকে উন্নতমানের সাহিত্য বলে কেন যে গণ্য করা যায় না, সে সম্বন্ধে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। জীবন সম্পর্কে তাঁদের অভিজ্ঞতার পরিধিও ছিল খুবই সীমাবদ্ধ। কয়েকটি মাত্র বিষয় অবলম্বন করে তাঁরা লিখতেন গার্হস্থ্য জীবন, প্রকৃতি ও ঈশ্বর— প্রধানত এই কটি ছিল তাঁদের কাব্যচর্চার বিষয়। এই সব মহিলা কবিদের সীমিত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচিত কবিতা সম্পর্কে শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় মহাশয় মন্তব্য করেছেন— "পারিবারিক জীবনের বেদনাময় আঘাত, প্রিয়জন-বিরহ পুত্র-কন্যার প্রতি আশঙ্কা-ব্যাকুল নিবিড়-সংসক্তিপূর্ণ স্নেহ-মমতা, ভাগ্য ও ভগবানের প্রতি অশ্রুবিহ্বল, দীর্ঘশ্বাস অনুযোগ, জীবন-রহস্যের দুর্জ্ঞেয়তার জন্য মৃদু খেদ ও ক্ষোভ—বিরল ব্যতিক্রম সত্ত্বেও তাঁহাদের কবিতার সাধারণ ভাব ও বিষয়। তাঁহাদের সমস্ত কবিতায় একটা শান্ত, বিষণ্ন আত্মনিবেদনের সুর শোনা যায়। তাঁহাদের কবিতা তুলসী তলায় জ্বালা সন্ধ্যাদীপের স্তিমিত আলোকের ন্যায়, যিনি মানব বুদ্ধির অগোচর সংসারের সুখদুঃখের বিধাতা, ঈশ্বর উদ্দেশ্যে নিবেদিত ভাবারতির স্নিগ্ধ শান্ত অর্ঘ্য রচনা।"[১০] তবে আবার এ কথাও ঠিক, সীমিত অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে সাহিত্য রচনা করলেও এবং ভাব বা বিষয়বস্তুর মধ্যে ব্যাপকতা ও বিশালতার পরিচয় না থাকলেও, এই সব কবিদের রচনায় মনের স্বাভাবিক স্ফূর্তি বা প্রাণবন্ত ভাবের অভাব ছিল না। সবার উপরে রচনাগুলিতে নারীমনের সৌকুমার্যের সৌরভ ছড়িয়ে আছে। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত বলেছেন—

"...তাঁহাদের প্রাণের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবে কবিতার যে উৎস উৎসারিত হইয়াছে তাহার বৈচিত্র্য আমাদিগকে মুগ্ধ করে এবং তাঁহাদের চিন্তার স্বাধীনতায় বিস্মিত হই— ইংরেজীতে বলা চলে lively energy. অর্থাৎ সজীব ও সক্রিয় উৎসাহ।" [১১]

উনিশ শতকের মহিলা কবিরা কাব্যের প্রায় প্রতিটি শাখাতেই বিচরণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। যেমন আখ্যায়িকামূলক, গাথাকবিতা এবং নানাবিধ খণ্ড কবিতা, ও গান রচনা করেছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী। মহাকাব্য লিখেছিলেন মানকুমারী দত্ত। সনেট কবিতা রচনায় বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন -- কামিনী রায়, প্রিয়ম্বদা দেবী, সরোজকুমারী দেবী ও নিরুপমা দেবী।

এ ছাড়া প্রেমমূলক, প্রকৃতি বিষয়ক, গার্হস্থ্য জীবন সম্পর্কিত, বিষাদময়, তত্ত্বমূলক প্রভৃতি বিচিত্র ধরণের গীতি কবিতা রচনা করেছিলেন এঁরা সকলেই।

এখানে উনিশ শতকের মহিলা কবিদের সম্বন্ধে দুটি পর্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ভুক্ত কবিদের রচনাগুলির ঐতিহাসিক মূল্য ব্যতীত, কাব্যমূল্য তেমন নেই। এঁদের রচনাগুলি দুষ্প্রাপ্য। অনেকের কাব্যগ্রন্থের নাম ছাড়া, অবয়ব খুঁজে পাওয়া যায় না; অনেক কবি নাম গোপন করেছিলেন বলে, তাঁদের প্রকৃত পরিচয় আজও অজানাই থেকে গেছে।

প্রথম পর্যায়ের কয়েকজন কবি ও তাঁদের কাব্য

১। কৃষ্ণকামিনী দাসী — 'চিত্ত বিলাসিনী' কাব্য (১৮৫৬ খ্রী.)
২। হরকুমারী দেবী (কালীঘাট) 'বিদ্যাদলনী কাব্য' (১৮৬১ খ্রী.)
৩। রাখালমণি গুপ্ত -- 'কবিতামালা' (১৮৬৫ খ্রী.)
৪। কৈলাসবাসিনী দেবী – 'বিশ্বের শোভা' (১৮৬৯ খ্রী.)
৫। কৃষ্ণময়ী দাসী— 'পদ্যমালা' (১৮৭০ খ্রী.)
৬। অজ্ঞাত নাম্নী— 'কুসুম মালিকা' (১৮৭১ খ্রী.)
৭। অন্নদাসুন্দরী দাসী— 'অবলা বিলাপ' (১৮৭২ খ্রী.)
৮। ইন্দুমতী দাসী - 'দুঃখ মালা' (১৮৭৪ খ্রী.)
৯। বসন্তকুমারী দাসী (বরিশাল)--- 'কবিতা মঞ্জরী' (১৮৭৫ খ্রী.)
১০। ফৈজুন্নিসা চৌধুরী—- 'রূপজালাল' (রূপককাব্য) (১৮৭৬ খ্রী.)
১১। বিরাজমোহিনী দাসী 'কবিতাহার' (১৮৭৭ খ্রী.)
১২। নবীন কালীদেবী 'শ্মশান ভ্রমণ' (রূপককাব্য) (১৮৭৯ খ্রীঃ) ; 'মন্দোদরীর রণসজ্জা' (১৮৮০ খ্রীঃ); 'সরমা সমাধি' বা; 'ষট্ চক্র ভেদ' (১৮৮৬ খ্রী.)
১৩। কামিনীসুন্দরী দেবী— 'কল্পনা কুসুম' (১৮৮১ খ্রী.)
১৪। ষোড়শীবালা দাসী— 'পুষ্পপুঞ্জ' (১২৯১ বঙ্গাব্দ)
১৫। ক্ষেত্রমণি দেবী-- 'পতিহারা' (১২৯৬ বঙ্গাব্দ) 'বিলাপমালা'
১৬। ব্রজমোহিনী দাসী—- 'কবিতামালা' (১২৯৭ বঙ্গাব্দ)

গ্রন্থাকারে প্রকাশিত স্বতন্ত্র কাব্য ছাড়াও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় আরও অনেক মহিলা কবির রচনা পাওয়া গেছে। তাঁদের মধ্যে 'ঠাকুরাণী দাসী' এই ছদ্মনামে একজন সম্ভ্রান্ত-বংশীয়া বিধবা 'সংবাদ-প্রভাকরে' ১৮৫৮ থেকে ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত অনেক কবিতা লিখে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন যোগমায়া দেবী (ইনি ছিলেন মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সহধর্মিণী), রাধারাণী লাহিড়ী, ক্ষীরোদা মিত্র, রমাসুন্দরী ঘোষ, লক্ষ্মীমণি, স্বর্ণপ্রভা বসু, মধুমতী গঙ্গোপাধ্যায়, উপেন্দ্রমোহিনী, বিন্ধ্যবাসিনী দেবী, কামিনী দেবী, জয়কালী গুপ্ত, স্বর্ণলতা দেবী,

আ-মো-বসু. 'রঘুমণি দেবী প্রভৃতি।[১২] মহিলা লেখিকাদের সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হতে দেখে, অনেক পুরুষ লেখক মহিলা- ছদ্মনামের অন্তরালে আত্মগোপন করে রচনা প্রকাশ করতে লাগলেন। উদ্দেশ্য হয়তো এই ছিল যে, সহজে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে খ্যাতি লাভ করা। যেমন কলিকাতার পাথুরিয়াঘাটা অঞ্চলের বাসিন্দা নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'ভুবনমোহিনী দেবী' এই.ছদ্মনামের অন্তরালে 'স্বপ্নদর্শনে অভিজ্ঞান' (১৮৭৮ খ্রী.) নামক কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন। ইনি ছিলেন মহিলা কবি ক্ষেত্রমণি দেবীর (১৮৩৮-১৯২১) স্বামী।[১৩]

প্রথম যুগের মহিলা কবিদের মধ্যে কয়েকজনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও তাঁদের রচনার কিছু কিছু নিদর্শন দেওয়া হল। এর মধ্যে থেকে আমরা ধারণা করতে পারি, কোন্ জাতীয় ভাষায়, কেমন ভাবে তাঁরা নিজেদের মনোভাব ব্যক্ত করতেন কবিতার মাধ্যমে।

কৃষ্ণকামিনী দাসী ও 'চিত্তবিলাসিনী কাব্য' (১৮৫৬)

বঙ্গমহিলা সাহিত্যিকদের মধ্যে যাঁর সাহিত্যিক প্রয়াস প্রথম মুদ্রিত হয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবার দুর্লভ সৌভাগ্য অর্জন করে, তিনি হলেন কৃষ্ণকামিনী দাসী এবং সেই কাব্য-গ্রন্থের নাম 'চিত্ত বিলাসিনী'। বইটির পৃষ্ঠাসংখ্যা বাহাত্তর। এই কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের পর রক্ষণশীল দলভুক্ত ব্যক্তিরা নানা ধরণের কটু মন্তব্য করলেও, যাঁরা প্রকৃত নারীহিতৈষী তাঁরা আন্তরিক ভাবে খুশি এবং প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিলেন। তার প্রমাণস্বরূপ 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত কবি ঈশ্বর গুপ্তের উচ্ছ্বাসপূর্ণ আলোচনার কিছু অংশ এখানে উদ্ধার করা যায়। তিনি লিখেছিলেন "আমরা পরমানন্দ সাগর সলিলে নিমগ্ন হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে, 'চিত্তবিলাসিনী' নামক অভিনব গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়া পাঠান্তর চিত্তানন্দে আনন্দিত হইয়াছি। অঙ্গনাগণের বিদ্যানুশীলন বিষয়ে যে সুপ্রণালী এদেশে প্রচলিত হইতেছে, তাহার ফল স্বরূপ এই গ্রন্থ,...অবলাগণ বিদ্যানুশীলন-পূর্বক অবনীমণ্ডলে প্রতিষ্ঠিতা হয়েন ইহাই আমাদিগের প্রার্থনা।"[১৪]

প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ হলেও কবির সুগভীর আত্মবিশ্বাসের আভাস এবং সেইসঙ্গে সহজ সরল ভাব, ভাষা ও প্রকাশ ভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। বিষয়বস্তু নির্বাচনে তাঁর বাস্তবনিষ্ঠ মনোভাব প্রকট হয়ে উঠেছে। স্থানে স্থানে গদ্য ও পদ্য উভয়ের ব্যবহারই দেখা যায়। 'ভূমিকা অংশে কৃষ্ণ কামিনী কেন এই গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করলেন তার সম্পর্কে কিছু কৈফিয়ত দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন— "বাঙ্গালা ভাষায় যে সকল গ্রন্থ রচিত হইতে পারে তাহার মধ্যে ছন্দোবন্ধে যে সকল গ্রন্থ প্রচারিত হয় তাহা গদ্য অপেক্ষা পরিশ্রমের লাঘব ও অনায়াসে সুরস হয় এই বিবেচনা করিয়া আমি চিত্ত বিলাসিনী নামে একখানি অভিনব গ্রন্থ অধিকাংশই নানাবিধ ছন্দে বিরচিত করিয়া মধ্যে ২ কএক পংক্তি করিয়া গদ্যও সন্নিবেসিত করিয়াছি" ...

"অদ্যাপি অস্মদ্দেশীয় মহিলাগণের কোন পুস্তকই প্রচারিত হয় নাই; সুতরাং প্রথমতঃ এ বিষয়ে হস্তার্পণ করা কেবল লোকের হাস্যাস্পদ হওয়া মাত্র, কিন্তু আমার অন্তঃকরণে যথেষ্ট

সাহস জন্মিতেছে, যে সামাজিক মহাশয়েরা আপাততঃ স্ত্রীলোকের রচনা শুনিলেই বোধ হয় যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইবেন সন্দেহ নাই, আর আমার পুস্তক রচনা করিবার এই এক প্রধান উদ্দেশ্য যে উৎকৃষ্ট হউক বা অপকৃষ্ট হউক একটা দৃষ্টান্ত পাইলে স্ত্রীলোক মাত্রেই বিদ্যানুশীলনে অনুবাগী হইবে তাহা হইলেই এদেশের গৌরবের আর পরিসীমা থাকিবেক না, পরিশেষে কৃতজ্ঞতাব সহিত স্বীকার করিতেছি, যে এই ক্ষুদ্র পুস্তক রচনার সময় আমার প্রাণবল্লভ যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন এবং তিনি এবিষয়ে মনোযোগী না হইলে কেবল আমা হইতে ইহা সম্পন্ন হইবার কোন প্রকার সম্ভাবনা ছিল না।"

একালের যাঁরা মহিলা সাহিত্যিক তাঁরা হয় স্বামী, না–হয় পিতা কিংবা ভ্রাতা এই জাতীয় কোনো-না-কোনো পুরুষের নিকট উৎসাহ ও প্রেরণা লাভ করে সাহিত্যচর্চায় প্রবৃত্ত হয়েছেন তার পরিচয় আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখতে পাই। কৃষ্ণকামিনী তাঁর কাব্যের মুখবন্ধ করেছেন পয়ার ছন্দে বচিত সৃষ্টি কর্তা "ব্রহ্ম বন্দনা" দিয়ে। এর পর 'আত্ম পরিচয়' নামক কবিতায় নিজের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরেছেন—

"জাহ্নবী দক্ষিণ অংশে হুগলী জিলায়।
সুখরিয়া নামে গ্রাম আছয়ে তথায়।।
সেই স্থানে বৃহৎ এক গোষ্ঠীর বসত।
কায়স্থ উপাধি মিত্র মুস্তৌফীতে খ্যাত।" ইত্যাদি। (পৃ. ৪)

স্বামীর পরিচয় দিয়েছেন এবং সেইসঙ্গে তাঁর সম্পর্কে কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করেছেন —

"কনিষ্ঠের বংশধর নাম শ্রীশশিভূষণ।
অধিনীর প্রাণের বল্লভ সেই জন।।
তাঁর আনুকূল্যে আমি করেছি মনন।
"চিত্তবিলাসিনী" গ্রন্থ করিতে রচন।।" (পৃ. ৪)

বিচিত্র মনোভাবের পরিচযজ্ঞাপক কবিতা আছে। তার মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় যে, তিনি পরাধীনতার গ্লানি বিন্দুমাত্রও অনুভব করেন নি। তাঁর "দেশে রাজা থাকিলে অনেক মঙ্গল" কবিতায় দেখি ইংরেজ রাজত্বের সুফল সম্পর্কে অনেক কথা বলেছেন। ইংরেজ আমলে এদেশে স্টীমার, টেলিগ্রাফ, রেলগাড়ির প্রচলন হয়েছে দেখে তিনি অত্যন্ত উৎফুল্ল হয়েছেন। "যমের ক্রন্দন" নামে সরস একটি কবিতায় দীর্ঘ ললিত ছন্দে তিনি বলেছেন—

"করেছে আশ্চর্য কল, বলমাত্র ধোঁয়াজল,
পবন বেগেতে ধায় হায় হায় রে।
একি হেরি অসম্ভব, একদিনে যাবে সব,
মাসাধিক পথ তায় হায় হায় হায় রে।" (পৃ. ৭)

"বিরহিনীর উল্লাস" নামক কবিতায় দেখি দূরপ্রবাসী স্বামীর কুশল সংবাদ জানার পথ সুগম

হয়েছে দেখে উল্লসিত হয়ে বিরহিনী বলেছেন—

"এখন দুবেলা পাব, মন সাধ পুরাইব,
হবে না বিচ্ছেদ জ্বালা আর।" (পৃ. ৯)

সেকালের কিছু সমাজ চিত্র ও রীতিনীতিব পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর কোনো কোনো কবিতায়। যেমন "লম্পট ব্যক্তির পত্নী সহচরী সমীপে বিলাপ" কবিতায় আমরা দেখি এক নারী তার সখীর কাছে নিজের মনোবেদনার কথা বলছে—

"যেন পিঞ্জরের পাখি শুন ২ ওলো সখী,
চিরদুঃখে দুঃখী-চিরদিন ।
দারুণ লম্পট পতি, পর মহিলায় রতি
পরবাসে বঞ্চেন যামিনী।
আমি হায় বিরহিনী গৃহে থাকি একাকিনী,
বালিসে আলিস রেখে মরি।
করে সদা হায় হায়, শয্যা কণ্টকের প্রায়,
জাগরণে কাটাই শর্বরী।" (পৃ. ২৩)

"দয়া ছাড়া ধর্ম নাই" নামে ১৪-১৭ পৃষ্ঠা ব্যাপী একটি রূপকধর্মী দীর্ঘ কবিতা আছে। এখানে 'ধর্ম'কে পুরুষ ও 'দয়া'কে নারীরূপে কল্পনা করা হয়েছে। সমগ্র কবিতাটি কথোপকথনেব আকারে রচিত।

উদাহরণ—

"পুরুষের উক্তি :

ঘোর রজনীতে তুমি কাহার কামিনী।
কিসের লাগিয়ে ভ্রমিতেছ একাকিনী
বয়সে নবীন অতিরূপ মনোহর।
আছ রঙ্গে নাহি সঙ্গে সঙ্গিনী অপর ॥
কি নাম কাহার কন্যা বল রসবতি।
অপ্সরী কিন্নরী কিম্বা হবে দেবজাতি।

কামিনীর উক্তি :

আমি হে রমণী, আছি একাকিনী,
কুলের কামিনী তায়।
তুমি হে এখানে, কিসের কারণে,
বল ওহে যুবরায় ॥
এ কি তব রীত, হেরি বিপরীত,

নাহি চিতে কিছু ভয়।
রমণীর পাশে, এলে অনায়াসে,
কিরূপেতে মহাশয়।
আলাপ করিতে, বাসনা মনেতে,
নাহি ভাব তাহে লাজ।
আমি নারীজেতে, তোমার সহিতে,
পরিচয়ে কিবা কাজ।" ইত্যাদি (পৃ. ১৪-১৫)

কোনো কোনো কবিতায় কবির উপদেশ দেবার প্রবণতাটি প্রবল হয়ে উঠেছে। যেমন বাল-বিধবাকে দুঃখ ভুলে থাকার প্রতিষেধকরূপে বই হাতে নিয়ে থাকতে পরামর্শ দিয়েছেন--

'কদাপি কখন মন হলে উচাটন।
পুস্তক কাব্য হস্তে করি নিবারণ।' (পৃ. ৪৬)

আরও নানা শ্রেণীর নারীকে তিনি নানা সৎ উপদেশ বিতরণ করেছেন। যেমন কুলীন কন্যাদের দুঃখ-পীড়িত জীবনে তারা যেন পথভ্রষ্ট না হয়, তার উপদেশ দিয়েছেন -

'কুলের কামিনী হয়ে, কুলে জলাঞ্জলি দিয়ে,
কুলটা কুৎসিত নাম ধরো না, ধরো না।
পরপ্রীতি কূপে, দেখ যেন কোনরূপে
ভ্রমান্ধ হইয়ে ডুব দিও না লো, দিও না।
পতিসঙ্গ পরিহরি, উপপতি সঙ্গ করি,
কলঙ্কের ভার শিরে নিও না, নিও না।" (পৃ. ৫৮)

হরকুমারী দেবী ও 'বিদ্যাদলনীকাব্য' (১৮৬২)

এই কবির বিস্তৃত পরিচয় জানা যায় না, শুধু এইটুকু জানা যায় যে, তিনি কালীঘাট অঞ্চলে বসবাস করতেন। হেঁয়ালী করে তিনি তাঁর কাব্যে আত্মপরিচয় দিয়েছেন—

"পঞ্চমীতে যে দ্রব্য না করে ভক্ষণ।
তার আদ্যবর্ণ অগ্রে করিয়া গ্রহণ।
কর্কট মিথুন রাশে হয় যেই নাম।
রচয়িত্রী সেই দেবী কালীঘাট ধাম।"

এই কাব্যে বিভিন্ন বিষয় ও আকৃতিসম্পন্ন উনত্রিশটি কবিতা আছে। 'অথ সরস্বতী বন্দনা' দিয়ে কাব্যের আরম্ভ এবং শেষ হয়েছে 'অথ ধর্ম মাহাত্ম্য' দিয়ে। প্রধানত লঘু ত্রিপদী ও পয়ার ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে। বাস্তব বোধের পরিচয় সর্বত্রই পরিস্ফুট। বিদ্যার্জনের গুরুত্ব সম্পর্কে

কবি বলেছেন—

"শুন ২ সর্বজন, শ্রমে ত্রুটি কদাচন
করিও না যদি সুখ রবে।
পরিশ্রম বিনা আর, উপার্জন হয়া ভার
উপার্জনে ধন হয় তবে।

বিদ্যাধন যে জন রেখেছে দেহাগারে।
দুষ্কব তস্কর তার কি করিতে পারে।"

— হরকুমারী-রচিত কবিতায় বাস্তব বর্ণনা থাকলেও, কবিত্বগুণের পরিচয় বিশেষ নেই। যেমন "অথ দ্বিজ বনিতার উক্তি" নামক কবিতায় কবি দেখাতে চেয়েছেন যে, সন্তানের প্রতি দরদ বোধ পিতা অপেক্ষা মাতারই অধিক। তার বর্ণনা দিয়েছেন কবি এই ভাষায়—

'জননীর দুঃখ যত, পিতাতে কি জানে তত,
পিতা শুধু পিতামাত্র হন।

. . .

শিশু যদি বাহ্যে করে, পিতা যদি তাহে হেরে,
মুখের ভঙ্গিমা করে কয়।
উঁহু ২ গন্ধে মরি, মুক্ত কর শীঘ্র করি,
বিষ্ঠা গন্ধে তিষ্ঠান না যায়।"

এই জাতীয় বর্ণনায় মার্জিত রুচিবোধের পরিচয় পাওয়া যায় না, কবিত্ব তো দূরের কথা। 'বসন্তবর্ণনা' কবিতায় কিছু কল্পনাশক্তির পরিচয় আছে।

রাখালমণি গুপ্ত ও 'কবিতামালা' (১৮৬৫)

বাহাত্তর পৃষ্ঠা -সংবলিত এই কাব্যগ্রন্থে যদিও কবি নিজের নাম গোপন করে লিখেছিলেন "কোন সদ্বংশীয় কুলবধূ প্রণীত"— এবং 'বিজ্ঞাপন' অংশে কলিকাতার হিন্দু স্কুলের শিক্ষক দ্বারকানাথ রায় বলেছেন— "এই গ্রন্থকর্ত্রী কলিকাতাস্থ কোন সদ্বংশীয় কুলবধূ। নাম প্রচার করা ইহার অভিপ্রেত নহে; এজন্য এই গ্রন্থে ইহার নাম দেওয়া গেল না।" কিন্তু গবেষকরা তাঁর যথাযথ পরিচয় নির্ধারণ করতে সমর্থ হয়েছেন। বিজ্ঞাপনে কবিকে স্বভাবকবি, গুণবতী, ধর্মশীলা ইত্যাদি নানা বিশেষণে ভূষিত করা হয়েছে। সর্বসমেত ষোলোটি কবিতা এই গ্রন্থে স্থান লাভ করেছে। শুরু হয়েছে— "বাক্‌দেবীর প্রতি নিবেদন" দিয়ে এবং সবশেষে আছে— "বিদ্যামাহাত্ম্য" নামক কবিতা।

কবির গভীর স্বদেশানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায় "ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থা" নামক

কবিতামালা



অর্থাৎ

নানাবিধ জ্ঞানগর্ভ কবিতাসমূহ।

কলিকাতাস্থ

কোন সদ্বংশীয় কুলবধূপ্রণীত।

কলিকাতা সুচারুযন্ত্র।

বাহির মৃজাপুর, গড়পার ডাবাঘোবা পাড়া, ১৩ সংখ্যা
ভবনে শ্রীলালচাঁদ বিশ্বাস এণ্ড কোং দ্বারা মুদ্রিত।

জ্যৈষ্ঠ ১২৭২।

'অনামা' রচিত গ্রন্থের প্রচ্ছদপট

কবিতায়। কবি আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন—

"হা হা মাত পুণ্যভূমি জননী আমার।
দেখিয়ে তোমার দশা করি হাহাকার।
বর্তমান ভাব তব করিতে বর্ণন।
ব্যাকুলিত হয় মন ঝরে দুনয়ন।" (পৃ. ৫১)

সেকালে পাশ্চাত্যভাবাপন্ন নব্য যুবক সম্পর্কে তিনি বলেছেন—

"বর্তমানে তোমার নূতন যত ছেলে।
চলিতেছে তারা সবে ইংরেজের চেলে।।
জাতিভাষা শিখিবারে না করে যতন।
ইংরেজি ভাষায় করে কথোপকথন।

. . .

হারাইয়ে স্বাধীনতা অনাথের প্রায়।
তোমার সন্তানগণ কাঁদিয়ে বেড়ায়।।" (পৃ. ৫২)

কবিতাটি শেষ করেছেন তিনি এই কথা বলে—

"আর কি পূর্বের মত পাবে তুমি মান।"

কবির দেশজননীর প্রতি আন্তরিক ও নিবিড় ভালোবাসার পরিচয় চমৎকার ভাবে পরিস্ফুট হয়েছে।

কবি রাখালমণি গুপ্ত যে সুরসিকা ছিলেন তার পরিচয় আছে তাঁর "রূপচাঁদের রূপবর্ণনা" নামক ব্যঙ্গ কবিতায়। অর্থের মহিমা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন—

"টাকা সর্ব্বমূলাধার, টাকা সর্ব্বমূলাধার।
তোমা বিনা এ সংসার, ভাল নাহি লাগে কার;
তব পদে বার বার, করি নমস্কার।" (পৃ. ৫০)

"স্বপ্ন" নামে দুটি রূপক কবিতা আছে। দ্বিতীয় কবিতা আরম্ভের পূর্বে গদ্যে একটি নাতিদীর্ঘ ভূমিকা দিয়েছেন। নারীদের দুরবস্থার কথা তিনি যে বেশ ভালোভাবেই চিন্তা করতেন তার পরিচয় এখানে পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন— "অবলাগণ যেই অন্তঃপুর-কারাগারে চিরবন্দিনীর ন্যায় বদ্ধ থাকিয়া কখন পরিচারিকার কর্ম্মে, কখন পাচিকার কর্ম্মে, কখন বা গৃহিণীর কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া কাল যাপন করে। এইরূপ তাহারা ঘোরতর অজ্ঞানাবস্থায় থাকিয়া জ্ঞানের কার্য্য যে কিরূপে নির্ব্বাহ করিবে, তাহা একবার ভ্রমেও বিবেচনা করেন না।" ভাবলে বিস্ময় জাগে যে, সেকালের নারী হয়ে তিনি এমন প্রগতিবাদী চিন্তার অধিকারিণী হলেন কেমন করে। আশ্চর্য রকম সংস্কারমুক্ত দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন তিনি। নারীরা যে জগৎ সংসারে অপরিহার্য, এ কথা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করতে তিনি ভোলেন নি—

"যদি এ নারীর সৃষ্টি না হইতে ভবে।

বিধাতার এই সৃষ্টি চলিত কি তবে ॥
সংসারেতে নারী হয় সুখের আধার।
নারী বিনা গৃহে সুখ কবে হয় কার॥" (পৃ. ৫৩)

তবুও চারিদিকে নারী নিন্দাই শুনতে হয়। কবি তার কোনো হেতু খুঁজে পান না—

"কোন্ অপরাধে ভাই দূষী হয় নারী।
কিছুই কারণ তার বুঝিতে না পারি।" (পৃ. ৬৪)

কাব্যগ্রন্থেটির শেষ কবিতা—"বিদ্যা-মাহাত্ম্য"—এখানে তিনি নারী জাতিকে বিদ্যার্জন করতে উৎসাহিত করেছেন—

'অধীনীর নিবেদন শুন বন্ধুগণ।
বিদ্যা শিখিবারে কর বিশেষ যতন ॥
লভিতে অমূল্য রত্ন হও যত্নবান।
কোন ধন আর নহে বিদ্যার সমান॥
স্বদেশেতে পূজা রাজা সর্বশাস্ত্রে কয়।
বিদ্যা বলে বিদ্বানের সর্বত্রেতে জয়॥ (পৃ. ৬৯)

ফৈজুন্নিসা চৌধুরী ও 'রূপজালাল' (রূপক কাব্য) (১৮৭৬ খ্রী.)

আধুনিক বাংলা কাব্যের ধারায় ফৈজুন্নিসাই হলেন প্রথম বাঙালি মুসলিম মহিলা কবি। মধ্যযুগের এক মুসলিম মহিলা কবির কথা শোনা যায়— "মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্যে চট্টগ্রাম নিবাসী রহিমুন্নিসা একমাত্র মুসলিম মহিলা কবি।"[১৫]

ফৈজুন্নিসা 'রূপজালাল' ছাড়া 'সঙ্গীতসার' 'সঙ্গীত লহরী' ইত্যাদি রূপক জাতীয় আরও গ্রন্থ রচনা করেন (দ্রষ্টব্য সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ২য় খণ্ড, ৭ম সংস্করণ, পৃ. ১৭৪)।

ফৈজুন্নিসার জন্ম হয় ১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দে নোয়াখালি অঞ্চলে পশ্চিম গাঁ নামক স্থানে। আরবি, ফার্সি ও সংস্কৃত ভাষায় ইনি অভিজ্ঞ ছিলেন। ইনি জমিদারি পরিচালনা ও আরও নানা জনহিতকর কাজ করেছিলেন। মহারানী ভিক্টোরিয়া এঁকে "নবাব" উপাধি প্রদান করেন। বিখ্যাত 'রূপজালাল' নামক প্রণয়মূলক আখ্যায়িকা কাব্যটি গদ্যে-পদ্যে রচিত। ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে এই কাব্য ঢাকা শহর থেকে প্রকাশিত হয়।

মধ্যযুগে যেমন নায়ক-নায়িকার নাম দিয়ে প্রেমমাহাত্ম্যমূলক আখ্যায়িকা কাব্য রচিত হত (যথা— ইউসুফ-জোলেখা, লায়লা-মজনু, বিদ্যা-সুন্দর ইত্যাদি), এখানেও সেই একই রীতি অনুসৃত হয়েছে। নায়িকা রূপবানু ও নায়ক জালালকে কেন্দ্র করে এই কাব্য লেখা হয়েছে। কাব্যের প্রতিপাদ্য বিষয় হল—বহু দুঃখকষ্টের বাধা অতিক্রম করে, কেমন ভাবে নায়ক তার

আকাঙ্ক্ষিত নারীকে লাভ কবল। রূপকথাধর্মী আদর্শ প্রেম-লোকের চিত্র অঙ্কন করার চেষ্টা কবেছেন এখানে লেখিকা।

শোনা যায় নিজেব দুঃখপূর্ণ জীবনেব কিছু প্রভাব এখানে রয়েছে। তাঁব বিবাহিত জীবন সুখের হয় নি। তিনি সপত্নী জ্বালায় জর্জরিত হয়েছিলেন এবং স্বামী প্রেমে বঞ্চিত হয়েছিলেন। নিজের জীবনেব দুঃখ ভুলবার জন্য তিনি এখানে মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেমেব কাব্য রচনা কবতে চেয়েছিলেন। 'গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য' অংশে লেখিকা বলেছেন—

"এই খেদে মন সদা উচাটন,
ভাবি কিসে হব শান্ত।
রচিনু পয়ার, কবিতে নিবার,
এ বলিনু আদি অন্ত ।।
শ্রীমতী ফয়জুনে পুস্তক রচনে
বলি অন্যেব কাহিনী।"

প্রকৃতপক্ষে কিন্তু 'অন্যের কাহিনী' তিনি বলেন নি, বলেছেন নিজেবই বিড়ম্বিত জীবনের কাহিনীকে কল্পনার বঙে রঙিন কবে বিপবীত রীতিতে। তাই দেখি এখানে নায়ক জালাল তার দুই পত্নী রূপবানু ও হববানুকে নিয়ে গড়ে তুলেছে সুখের সংসার। বুঝে নিতে অসুবিধা হয না যে, কল্পিত চরিত্র রূপবানু, আসলে ফৈযজুন নিজে এবং জালাল হচ্ছেন তাঁর স্বামী গাজী। রানীর মুখের কয়েকটি কথা যেন লেখিকা তাঁব স্বামীকে উদ্দেশ্য করেই বলেছেন—

"আহা প্রভো নিদয় কেন, দুঃখ পরে দুঃখ হেন?
মহাপাপ হেন কি করেছি।"

তবে সার্থক রূপক কাব্য বচনা করতে পারেন নি ফৈজুন্নিসা। প্রতীকধর্মী চরিত্রগুলি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে নি। এক সমালোচক এই রচনাটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন— "ফয়জুন মুসলমানী পুঁথি সাহিত্যের আদলে "রূপজালালে'র কাহিনী বিন্যাস করেছেন। ফলে কাহিনীর মধ্যে সমাবেশ ঘটেছে বহু অবাস্তব অপ্রাসঙ্গিক ও অলৌকিক উপাখ্যানের চরিত্র—যেগুলির সঙ্গে মূল আখ্যান ও চরিত্রগুলির কোনো সম্বন্ধ সূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না।"[১৬]

অবশ্য যে কালে এবং যে পরিবেশে যাঁর দ্বারা এই কাব্য রচিত হয় সে-সব কথা মনে রাখলে বলতেই হবে— তখনকার দিনের এক পর্দানসীন মুসলিম সাহিত্যিকার পক্ষে এই জাতীয় একটি রূপককাব্য রচনা করা অত্যন্ত প্রশংসনীয় কাজ সন্দেহ নেই।

বিরাজ মোহিনী দাসী ও 'কবিতাহার' (১৮৭৭ খ্রী.)

এই মহিলা কবির জীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। তাঁর রচিত 'কবিতাহার' গ্রন্থটি ১২৮৩ বঙ্গাব্দে কলিকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে বিষাদপূর্ণ ভাব-সংবলিত

তেইশটি কবিতা এখানে স্থান পেয়েছে। যেমন "বঙ্গীয় বিধবাগণের ক্লেশ বর্ণনা", "তিমিরাচ্ছন্ন রজনী", "বঙ্গ মহিলার দুঃখ বর্ণন" ইত্যাদি। অবশ্য কয়েকটি কবিতায় স্বাদেশিকতা বোধের পরিচয়ও রয়েছে যেমন -- "ভারতের প্রতি"। কাব্যগ্রন্থটি কবি তাঁর পুত্রকে 'স্নেহোপহার' স্বরূপ দিয়েছেন।

নবীনকালী দেবী ও তাঁর কাব্য— 'শ্মশান ভ্রমণ' (১৮৭৯) ও 'মন্দোদরীর রণসজ্জা' (১৮৮০)

নবীনকালী দেবীর জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না, শুধুমাত্র এইটুকু তথ্য পাওয়া যায় যে, তিনি ভবানীপুর অঞ্চলের অধিবাসিনী ছিলেন। তিনি বেশ কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন এবং গদ্য ও পদ্য উভয় শ্রেণীর রচনাতেই কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন।

'শ্মশান ভ্রমণ' কাব্যটি তত্ত্বধর্মী রূপক রচনা, পৃষ্ঠাসংখ্যা বাইশ। শ্মশানে উপস্থিত হয়ে কবির মনে বিবিধ ভাবের উদয় হয়েছে— তাই নিয়ে আবেগবিহ্বল ভাষায় তিনি পর্যায়ক্রমে লিখেছেন— 'প্রথম দর্শন'; 'ভ্রমণ'; 'শবদৃষ্টে'; 'অগ্নিপ্রজ্বলিত' ও 'এ কি সেই নারী'—এই জাতীয় অধ্যায়গুলি। প্রথম শ্মশান দর্শন করে কবির মনে হয়েছে—

> "কি দীন দরিদ্র কিবা রাজা বাদশায়
> ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কিবা নবসাক তায়।
> কুলীন বংশজ আদি নর নারী হায়,
> এক ভাবে শবদাহ সতী গণিকায়।" (পৃ. ৫-৬)

সংসার অনিত্য-- এই অনুভূতি খুব সহজেই মনের মধ্যে জেগে উঠেছে ---

> "নলিনীর দলগত যেমন রে নীর
> টলমল করে সদা তেমতি শরীর।
> অনিত্যের ভাব যদি বুঝে থাক ধীর
> মিছে মায়ামদে মন করো না অস্থির।" (পৃ. ৬-৭)

নারীর বৈধব্য যন্ত্রণা দেখে কবির মনে হয়েছে, পূর্বের সতীদাহ প্রথাই ছিল ভালো—

> "দেশাচারে যে সময়ে পতিহীনাগণ,
> করিত পতির সনে চিতা-আরোহণ।
> নারীপক্ষে ছিল ভাল, না হইত চিরকাল,
> দুর্বিষহ শোকভার করিতে বহন।
> জ্বলিত না অন্তরেতে শোক হুতাশন ॥" (পৃ. ১৭)

'মন্দোদরীর রণসজ্জা' কিছুটা নতুন ধরণের কাব্য। যদিও তাঁর মনের উপর কবি মধুসূদন দত্ত –রচিত 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র প্রভাব পড়েছিল তা বোঝা যায়। মধুসূদনের কাব্যের যেখানে

শেষ, নবীনকালীর কাব্যের আরম্ভ সেখান থেকেই। পুত্র ও স্বামীকে হারিয়ে মন্দোদরী বড়োই কাতর হয়ে পড়েছেন। নানাভাবে তিনি বিলাপ করেছেন মেঘনাদ ও রাবণের জন্য। সেকালের পতিপুত্রহীনা নারীর বিলাপ মিশে আছে মন্দোদরীর শোকোচ্ছ্বাসের সঙ্গে। মন্দোদরী বলেছেন—

"বিধবার বল কেবা করে সমাদর,
আপনি বিধাতা বাম যাহার উপর,
পতিহীনা যেইজন ভূষণে কি প্রয়োজন,
নিবারণ হয়েছে যার জীবন আলোক
জ্বলিছে হৃদয় মাঝে পতিপুত্র শোক।" (পৃ. ২৭)

উনিশ শতকের দ্বিতীয় পর্যায়ের শেষদিকে মহিলা কবিদের রচনায় পরিণতির চিহ্ন পরিস্ফুট হল।

উনিশ শতকের দ্বিতীয় পর্যায়ে এত অধিক সংখ্যক মহিলা কবির আবির্ভাব ঘটে যে, তাঁদের সম্পর্কে সঠিক হিসাব দেওয়া দুরূহ। অনেকের সম্পূর্ণ পরিচয়, জন্ম ও মৃত্যু সময় জানা যায় না; কিন্তু তাঁদের রচিত কাব্যগ্রন্থ অথবা খণ্ড রচনা পাওয়া যায় সমসাময়িক পত্র- পত্রিকায়। তার থেকে নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ঐ-সব লেখিকারা গত শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ একবার সকৌতুকে বলেছিলেন ('জীবনস্মৃতি') : "তখন [তাঁর কৈশোর জীবনে] দৈবাৎ যে দুই-একজন মাত্র স্ত্রীলোক কবিতা লিখিতেন তাঁহাদিগকে বিধাতার আশ্চর্য সৃষ্টি বলিয়া সকলে গণ্য করিত। এখন [তাঁর প্রৌঢ় বয়সে] যদি শুনি, কোনো স্ত্রীলোক কবিতা লেখেন না, তবে সেইটেই এমন অসম্ভব বোধ হয় যে, সহজে বিশ্বাস করিতে পারি না।" সেকালে যাঁরা সুপরিচিত কবি ছিলেন, সেই সব মহিলাদের একটি কালানুক্রমিক তালিকা এবং কয়েকজনের খুব সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেওয়া হল।

উনিশ শতকের দ্বিতীয় পর্যায়ের মহিলা কবি

১।	জগন্মোহিনী দেবী	(১৮৪৭-৯৮)
২।	মোক্ষদাদায়িনী মুখোপাধ্যায়	(আ. ১৮৪৮-১৯০০)
৩।	স্বর্ণকুমারী দেবী	(১৮৫৫-১৯৩২)
৪।	তরু দত্ত	(১৮৫৬-৭৭)
৫।	প্রসন্নময়ী দেবী	(১৮৫৭-১৯৩৯)
৬।	গিরীন্দ্রমোহিনী দত্ত	(১৮৫৮-১৯২৪)
৭।	মানকুমারী বসু	(১৮৬৩-১৯৪৩)
৯।	(রাজকুমারী) অনঙ্গমোহিনী দেবী	(১৮৬৪-১৯১৮)
১০।	(মহারানী) সুনীতি দেবী	(১৮৬৪-১৯৩২)

১১।	নীরদমোহিনী বসু	(১৮৬৪-১৯৫৪)
১২।	সুরবালা ঘোষ	(১৮৬৭-১৯৩৩)
১৩।	সুশীলা সুন্দরী সেন	(? -১৯২৮)
১৪।	ফুলকুমারী গুপ্ত	(১৮৬৯-১৯৩১)
১৫।	অম্বুজাসুন্দীর দাশগুপ্তা	(১৮৭০-১৯৪৬)
১৬।	হিরণ্ময়ী দেবী	(১৮৭০-১৯২৫)
১৭।	প্রিয়ম্বদা দেবী	(১৮৭১-১৯৩৫)
১৮।	প্রমীলা নাগ (বসু)	(১৮৭১-৯৬)
১৯।	সরলাবালা দাসী	(আ. ১৮৭২-৯৬)
২০।	সরলাদেবী চৌধুরানী	(১৮৭২-১৯৪৫)
২১।	বিনয়কুমারী ধর	(১৮৭২- ?)
২২।	অন্নদাসুন্দরী ঘোষ	(১৮৭৩-১৯৫০)
২৩।	সুরমাসুন্দরী ঘোষ	(১৮৭৪-১৯৪৩)
২৪।	লজ্জাবতী বসু	(১৮৭৪-১৯৪২)
২৫।	নীলনলিনী বসু	(১৮৭৪-১৯০৩)
২৬।	(মহারানী) সুচারু দেবী)	(১৮৭৪ - ?)
২৭।	হেমলতা ঠাকুর	(১৮৭৪-১৯৬৭)
২৮।	সরলাবালা সরকার	(১৮৭৫-১৯৫৮)
২৯।	সরোজকুমারী দেবী	(১৮৭৫-১৯২৬)
৩০।	নগেন্দ্রবালা মুস্তাফী (সরস্বতী)	(১৮৭৮-১৯০৬)
৩১।	মৃণালিনী সেন	(১৮৭৯-১৯৭২)
৩২।	সরোজিনী নাইডু	(১৮৭৯-১৯৪৯)
৩৩।	বনলতা দেবী	(১৮৮০-১৯০০)
৩৪।	কুসুমকুমারী দাশ	(১৮৮২-১৯৪৮)
৩৫।	নলিনীবালা বসু (ঘোষ)	(১৮৮৩-৯৯)
৩৬।	পঙ্কজিনী বসু	(১৮৮৪-১৯০২)
৩৭।	সরযূবালা সেন	(১৮৮৯-১৯৪৯)
৩৮।	প্রফুল্লময়ী দেবী	(১৮৯১-?)
৩৯।	(রানী) নিরুপমা দেবী	(১৮৯৫- ?)

৪০।	লীলা দেবী	(১৮৯৬-১৯৪৩)
৪১।	কুসুমসুমারী রায় চৌধুরী	(১২৮৯ বঙ্গাব্দ-১৯১৫ খ্রী)
৪২।	(রানী) জ্যোতিষ্মতী দেবী	(? - ?)
৪৩।	জ্ঞানেন্দ্রমোহিনী দত্ত	(? - ?)
৪৪।	তরঙ্গিণী দাসী	(? -১৩১৯ বঙ্গাব্দ)
৪৫।	ধরেন্দ্রবালা সিংহ	(? - ?)
৪৬।	প্রভাবতী রায়	(? - ?)
৪৭।	বিভাবতী সেন	(? - ?)

কয়েকজন কবির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

১। জগন্মোহিনী দেবী (১৮৪৭-১৯৫৮)

ইনি ছিলেন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের সহধর্মিণী। জগন্মোহিনীর পিতার নাম চন্দ্রমোহন মজুমদার ও মাতা [illegible]কালী দেবী। অত্যন্ত পতিব্রতা রমণী ছিলেন জগন্মোহিনী। তাঁর রচিত অধিকাংশ কবিতাই ভগবদ্‌বিষয়ক। চমৎকার সংগীত রচনা করতেন ইনি। তাঁর রচিত একশত চোদ্দটি সংগীত নিয়ে প্রকাশিত হয় 'জগৎসার' (১৯১১) নামক গ্রন্থ। সংগীতগুলির মধ্যে তাঁর ভক্তিভাব ও ঈশ্বরানুরাগ প্রকাশ পেয়েছে। তিনি ব্রহ্মমন্দিরে যে-সব উপদেশ দেন সেগুলিও 'প্রার্থনা কুসুমাঞ্জলি' (১৯২৩) শিরোনামে প্রকাশিত হয়।

২। মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায় (আ. ১৮৪৮-১৯০০)

কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এক সময় বিখ্যাত একটি ব্যঙ্গ কবিতা লিখেছিলেন 'বাঙ্গালীর মেয়ে'। বাঙালি মেয়েদের পক্ষ থেকে তার উপযুক্ত উত্তর দিয়ে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন মোক্ষদা দেবী "বাঙ্গালী বাবু" নামক দীর্ঘ এক ব্যঙ্গ কবিতা (parody) লিখে। সেকালের বাঙালি বাবুর চিত্র ও চরিত্র চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন এই কবিতায়। কয়েক ছত্র উদাহরণ—

"হায় হায় অই যায় বাঙ্গালীর বাবু।
দশটা হতে চার্‌টাবধি দাস্যবৃত্তি করা
সারাদিন বইতে হয় দাসত্ব পশরা।
উকীল, ডেপুটী কেহ, ওভারসিয়ার,
বড় কর্ম বড় মান, অহঙ্কার কত।
ধরারে দেখেন বাবু সরাখানা মত।
সারাদিন খেটে খেটে, রক্ত উঠে মুখে
পেগের বড়াই হয় ঘরে এসে সুখে।" ইত্যাদি

মোক্ষদার পিতা ছিলেন হাইকোর্টের অ্যাটর্নি গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর ভ্রাতা ছিলেন কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ডবলিউ. সি. ব্যানার্জি)। শিক্ষিত পরিবারের কন্যা ছিলেন, সুতরাং ছেলেবেলা থেকে ভালোভাবেই তিনি পড়াশুনা শুরু করেন। বউবাজারে এক ধনী ও সংস্কৃতিবান পরিবারে শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। মোক্ষদা দেবীর কাব্যগ্রন্থ 'বনপ্রসূন' (১৮৮২)। এ ছাড়া তিনি 'সফল স্বপ্ন' (১৮৮৪) নামে একটি ইতিবৃত্তমূলক উপন্যাস এবং একটি জীবনী গ্রন্থ রচনা করেন।

৩। স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২)

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম উল্লেখযোগ্য প্রতিভাশালিনী লেখিকা ছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী। তাঁর ছিল বহুমুখী প্রতিভা। সাহিত্যের সকল শাখাই তাঁর দানে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। ইনি ছিলেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সারদা দেবীর চতুর্থ কন্যা। তেরো বছর বয়সে এঁর বিবাহ হয় সম্ভ্রান্ত বংশীয় জানকীনাথ ঘোষালের সঙ্গে। আজীবন স্বর্ণকুমারী নিষ্ঠা সহকারে সাহিত্যসাধনা করে গেছেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত রচনা 'বাল্যসখী' নামে একটি দীর্ঘ কবিতা, 'ভারতী' পত্রিকায় ছাপা হয়। 'গাথা' (১৮৮০) নামক কাব্যগ্রন্থে তাঁর রচিত চারটি গাথা জাতীয় রচনা—সাশ্রু সম্প্রদান, সাধের ভাসান, খড়্গ পরিণয় ও অভাগিনী স্থান পেয়েছে। সমসাময়িক যুগের কোনো কোনো কবির কিছু প্রভাব অনুভব করা গেলেও, এখানে স্বর্ণকুমারীর প্রকাশভঙ্গিটি অকৃত্রিম ও নিজস্ব। বিচিত্র ভাব ও ভাবনা অবলম্বনে তিনি অজস্র খণ্ড কবিতা লিখেছিলেন। 'কবিতা ও গান' (১৮৯৫) তাঁর এই জাতীয় কবিতা ও গানের সংকলন। নানা পর্যায়ের কবিতাগুচ্ছ এখানে আছে: 'প্রভাত সঙ্গীত', 'মধ্যাহ্ন সঙ্গীত', 'সন্ধ্যা সঙ্গীত', 'নিশীথ সঙ্গীত' প্রভৃতি। এখানে কিন্তু তাঁর রচিত সমস্ত খণ্ড কবিতা ও গান স্থান পায় নি। লেখিকার জীবদ্দশাতেই তাঁর গ্রন্থাবলী (বসুমতী সংস্করণ) প্রকাশিত হয়, তখন সেখানে উল্লেখ করা হয় যে, 'ভারতী' পত্রিকায় তাঁর অনেক বিক্ষিপ্ত রচনা ছড়িয়ে আছে। স্বর্ণকুমারীকে সাহিত্য সাধনার জন্য সম্মান প্রদর্শন করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সর্বপ্রথম তাঁকে 'জগত্তারিণী' সুবর্ণ পদক (১৯২৭) প্রদান করেন। চমৎকার প্রেমের কবিতা লিখে গেছেন স্বর্ণকুমারী। তাঁর 'কবিতা ও গান' থেকে যামিনী নামক কবিতার কয়েকটি ছত্র উদাহরণ- স্বরূপ দেওয়া হল----

"এমন যামিনী, মধুর চাঁদিনী
সে শুধু গো যদি আসিত।
পরাণে এমন আকুল পিয়াসা;
যদি সে শুধু গো ভালবাসিত।
এ মধু বসন্ত; এত শোভা হাসি,
এ নব যৌবন, এত রূপরাশি।
সকল উঠিত পলকে বিকাশি
সে শুধু গো যদি চাহিত।" ইত্যাদি



স্বর্ণকুমারী দেবী



তরু দত্ত

৪। তরু দত্ত (১৮৫৬-১৮৭৭)

তরু দত্ত ছিলেন এক আশ্চর্য বঙ্গললনা যিনি কিশোরী বয়সে দক্ষতার সঙ্গে বিদেশী ভাষায় সাহিত্যচর্চা করে সকলকে বিস্মিত করেছিলেন। ইংরেজী ও ফরাসি ভাষায় সাহিত্য রচনা করলেও, মনে প্রাণে তিনি ছিলেন বাঙালি।

কলকাতার রামবাগান অঞ্চলের বিখ্যাত দত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন তরু দত্ত। পিতা গোবিন্দচন্দ্র ও মাতা ক্ষেত্রমণি উভয়েই সাহিত্যচর্চা করতেন। তরুর জ্যেষ্ঠা ভগিনী অরু দত্তও ছিলেন লেখিকা। অল্প বয়সে পিতামাতার সঙ্গে দুইবোন ইউরোপে যান। সেখানে এঁরা যত্ন সহকারে ইংরেজী ও ফরাসি ভাষা শিক্ষা করনে। পুনরায় তাঁরা কলকাতায় ফিরে আসেন। তখন সংস্কৃত ভাষা শিখতে শুরু করেন। দুরন্ত যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়ে তরু ও অরু দুই বোনই মারা যান অল্পদিনের ব্যবধানে অত্যন্ত অকালে।

তরু দত্তের ইংরেজী কবিতা প্রকাশিত হত *Bengal Magazine* নামে একটি বিখ্যাত ইংরেজী পত্রিকায়। তঁর রচিত কাব্যগ্রন্থ *A Sheaf Gleaned in French Field* (১৮৭৬) ও *Ancient Ballads and Legends of Hindusthan* (১৮৮২)। এ ছাড়া ফরাসি ভাষায় লেখা বিখ্যাত উপন্যাস *Le Journal de Mademoiselle 'd' Arvors* (১৮৭৯) তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়।

৫। প্রসন্নময়ী দেবী (১৮৫৭-১৯৩৯)

পাবনা জেলার হরিপুর গ্রামের বিখ্যাত চৌধুরী বংশে প্রসন্নময়ী জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম দুর্গাদাস চৌধুরী। তাঁদের বংশে কন্যারা রীতিমতো বিদ্যাভ্যাস করতেন। দশ বছর বয়সে প্রসন্নময়ীর বিবাহ হয় গুণাইগাছা গ্রামে এক বিশিষ্ট পরিবারের কৃষ্ণকুমার বাগচীর সঙ্গে। দুর্ভাগ্যবশত বিবাহের মাত্র দুবছর পরেই তাঁর স্বামী উন্মাদরোগে আক্রান্ত হন। প্রসন্নময়ী আজীবন পিতৃগৃহেই অতিবাহিত করেন। বাংলা ছাড়া তিনি ইংরেজী ও সংস্কৃত ভাষা ভালোভাবে আয়ত্ত করেন। সাহিত্য সাধনা ছিল তাঁর জীবনের এক বড়ো অবলম্বন। কবি প্রিয়ম্বদা ছিলেন তাঁর একমাত্র সন্তান।

মাত্র বারো বছর বয়সে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'আধ আধ ভাষিণী' (১৮৭০)। নানা পত্র-পত্রিকায় তাঁর রচনা প্রকাশিত হত। আরও দুটি উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ 'বনলতা' (১৮৮০) ও 'নীহারিকা' (১ম ও ২য় ভাগ ১৮৮৪; ১৮৯৬)। প্রসন্নময়ীর একটি বিখ্যাত গদ্যগ্রন্থ 'পূর্বকথা', এখানে সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের অনেক তথ্য পরিবেশিত হয়েছে।

৬। গিরীন্দ্রমোহিনী দত্ত (১৮৫৮-১৯২৪)

সেকালে এক বিশিষ্ট কবি ছিলেন গিরীন্দ্রমোহিনী। গার্হস্থ্য জীবনকে কেন্দ্র করেই তিনি তাঁর কাব্যের জগৎ গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর কবিতায় এক দিকে বাস্তব বর্ণনা অন্য দিকে চিত্রাঙ্কণী প্রতিভা আমাদের মুগ্ধ করে। উদাহরণ—

'ফুটফুটে জোছনায় ধবধবে আঙিনায় একখানি মাদুর পাতিয়ে;
ছেলেটি শুয়াযে কাছে জননী শুইয়া আছে গৃহকাজে অবসর পেয়ে।
সাদা সাদা মুখ তুলি জুঁই শেফালিকাগুলি উঠানের চৌদিকে ফুটিয়ে:
প্রাচীবেতে সুশোভিতা রাধিকা ঝুমুকোলতা দুলিতেছে চন্দ্রকরে নেয়ে।"
("গার্হস্থ্য চিত্র"—'অশ্রুকণা')

কলকাতায় ভবানীপুরে মাতুলালয়ে গিরিন্দ্রমোহিনীর জন্ম হয়। পিতার নাম হারাণচন্দ্র মিত্র। মজিলপুরে তাঁর শৈশবকাল কেটেছিল। ছেলেবেলাতে শিক্ষার প্রতি ছিল তাঁর গভীর নিষ্ঠা। বাড়ির নিকটবর্তী একটি বালিকা বিদ্যালয়ে তিনি পড়াশুনা করতেন। সেই সময় থেকেই তাঁর কাব্যপ্রতিভার স্ফুরণ ঘটে। দশ বছর বয়সে বউবাজার নিবাসী অভিজাত ঘরের সন্তান নরেশচন্দ্র দত্তের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়।

গিরীন্দ্রমোহিনীর প্রথম রচনা প্রকাশের ঘটনাটি খুব কৌতুকপ্রদ। বিবাহের পর তিনি স্বামীকে গদ্যে পদ্যে যে-সব পত্র লিখেছিলেন, তাঁকে না জানিয়ে নরেশচন্দ্র সেই পত্রগুলি 'জনৈক হিন্দু মহিলার পত্রাবলী' (১৮৭২) এই নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। পরে তাঁর কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় 'কবিতাহার' (১৮৭৩) ও 'ভারতকুসুম' (১৮৮২)। এরপর স্বামীর আকস্মিক মৃত্যুতে (১৮৮৪) গিরীন্দ্রমোহিনী গভীর শোকসাগরে নিমজ্জিত হলেন। তাঁর মনে অকৃত্রিম শোকোচ্ছ্বাস উৎসারিত হয়েছে 'অশ্রুকণা' (১৮৮৭) নামক কাব্যগ্রন্থে। এটি তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা সন্দেহ নেই। কবি তাঁর আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন অকপট ভাষায়—

"এ দীর্ঘ জীবন পথে
একেলা কি হবে যেতে ?
পথে কি হবে না দেখা সঙ্গে কভু তার।
কে বলে দেবে গো মোরে
পাব কত দিন পরে ?
নিকটে কি আছে দূরে, কোথা সে আমার।"

তাঁর অন্যান্য আরও গ্রন্থ প্রকাশিত হয়— 'আভাষ' (১৮৯০); 'সন্ন্যাসিনী বা মীরাবাঈ' (ঐতিহাসিক নাট্যকাব্য ১৮৯২); 'শিখা' (১৮৯৬); 'অর্ঘ্য' (১৯০২); 'স্বদেশিনী' (১৯০৬); 'সিন্ধুগাথা' (১৯০৭)। বসুমতী—সংস্করণ 'গ্রন্থাবলী'ও (১৯২৭) প্রকাশিত হয়েছিল।

কাব্য রচনা ভিন্ন অন্যান্য অনেক গুণের অধিকারিণী ছিলেন গিরীন্দ্রমোহিনী। যেমন— সূচী শিল্প ও চিত্র রচনায় তিনি দক্ষ ছিলেন। ইনি 'জাহ্নবী' নামক সাময়িক পত্রিকাটি যোগ্যতার সঙ্গে তিন বছর (১৩১৪-১৬ বঙ্গাব্দ) পরিচালনা করেন। স্বর্ণকুমারী দেবীর সঙ্গে সখ্যতা সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন; উভয়ে 'মিলন' পাতিয়েছিলেন। তাঁর কাব্যপ্রতিভা সম্পর্কে যোগেন্দ্র– নাথ গুপ্ত মহাশয় বলেছেন— "গিরীন্দ্র মোহিনীর প্রকৃতিটি সত্য সত্যই কবিজনোচিত ছিল। গর্ব নাই, দ্বেষ নাই.

আড়ম্বর নাই। শান্ত মৃদু কথাবার্তায়, মিষ্ট মধুর বচনে অবরোধবাসিনী কবি নিতান্তই যেন 'প্রকৃতি পালিতা' ছিলেন।"[১৭]

৭। মানকুমারী বসু (১৮৬৩-১৯৪৩)

কবি মানকুমারী ছেলেবেলায় অত্যন্ত অভিমানিনী ছিলেন বলে তাঁর এইরকম নামকরণ করা হয়। যশোহর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রামে মাইকেল মধুসূদন দত্তের বংশে তাঁর জন্ম। তিনি ছিলেন সম্পর্কে মধুসূদনের ভ্রাতুষ্পুত্রী। পিতা আনন্দমোহন দত্ত চৌধুরী ও মাতা শান্তমণির চারটি পুত্রকন্যার মধ্যে মানকুমারী ছিলেন সর্বকনিষ্ঠা। বাড়িতে লেখাপড়ার আবহাওয়া ছিল, সেই কারণে ছেলেবেলা থেকে যত্নসহকারে মানকুমারীর লেখাপড়া আরম্ভ হয়। সাত বছর বয়স থেকে তিনি আজগুবি সব পদ্য লেখা শুরু করেন। দশ বছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয় ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দে সাগরদাঁড়ির নিকটবর্তী বিদ্যানন্দকাটী গ্রামের সংস্কৃতি-সম্পন্ন এক পরিবারের সন্তান বিবুধশঙ্কর বসুর সঙ্গে। বসু পরিবারের মেয়েদের মধ্যেও লেখাপড়ার চলন ছিল। মানকুমারী স্বামীকে খুশি করার জন্য রোজ একটি করে নতুন কবিতা রচনা করে উপহার দিতেন। মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে তিনি 'পুরন্দরের প্রতি ইন্দুবালা' নামে একটি বীররসাত্মক দীর্ঘ কবিতা অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচনা করেন। লেখাটি 'সংবাদ-প্রভাকরে' প্রকাশিত হয়েছিল। স্বামীর উৎসাহে তিনি ইংরেজী শিখতে শুরু করেন। বিবুধশঙ্কর যখন সবেমাত্র সুচিকিৎসকরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে শুরু করেছেন, তখন অকস্মাৎ তাঁর মৃত্যু ঘটে কর্মস্থল সাতক্ষীরায়। মানকুমারীর মাত্র উনিশ বছর বয়সে বৈধব্য ঘটল। শোকাভিভূত হয়ে তিনি 'প্রিয়প্রসঙ্গ' (১৮৮৪) নামে গদ্যে-পদ্যে মিশ্রিত আশ্চর্য এক শোকগাথা রচনা করেন। আরও আঘাত পেয়েছিলেন তিনি একমাত্র কন্যা সন্তানকে হারিয়ে। পরবর্তী জীবনে তিনি সাহিত্যসেবা ও সমাজকল্যাণমূলক কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন।

মানকুমারী গীতিকবিতাই রচনা করেছেন বেশি। তাছাড়া খণ্ড কাব্য, মহাকাব্য, উপন্যাস, প্রবন্ধ নানা ধরণের রচনা আছে তাঁর। বিষাদের সুরটিই প্রধান হয়ে বেজেছে তাঁর কাব্যে। যেমন—

'মানব জীবন ছাই বড় বিষাদের—
দুটো কথা না কহিতে,
দুটিবার না চাহিতে,
অমনি পোহায়ে যায় যামিনী সাধের,
মানব জীবন ছাই বড় বিষাদের।'

("সাধ", 'কাব্য কুসুমাঞ্জলি')

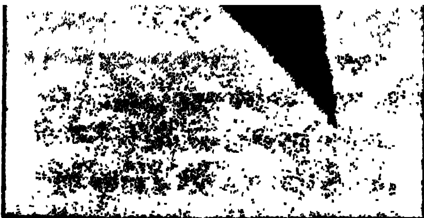
তিনি ব্যক্তিগত জীবনের সুখদুঃখ ছাড়াও ভগবদ্ প্রেম, দেশপ্রেম ও সমাজ বিষয়ক অনেক কবিতা লিখেছেন। মানকুমারীর শ্রেষ্ঠ কাব্য 'কাব্য কুসুমাঞ্জলি' (১৮৯৩)। এছাড়া 'কনকাঞ্জলি'



গিরীন্দ্রমোহিনী দত্ত



মানকুমারী বসু



(১৮৯৬); 'বীরকুমার বধকাব্য' (মহাকাব্য ১৯০৪) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য রচনা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সর্বপ্রথম 'ভুবনমোহিনী' স্বর্ণপদক (১৯৩৯) ও 'জগত্তারিণী' স্বর্ণপদক (১৯৪১) দান করে সম্মান প্রদর্শন করেন।

৮। কামিনী রায় (১৮৬৪-১৯৩৩)

বিদুষী কবি কামিনী রায়ের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'আলো ও ছায়া' (১৮৮৯) বাংলা সাহিত্য জগতে আলোড়ন তুলেছিল। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো প্রতিষ্ঠাবান প্রবীণ কবি এই কাব্য পাঠ করে মুগ্ধ হয়ে লিখেছিলেন—"...পড়িতে পড়িতে গ্রন্থকারকে মনে মনে কতই সাধুবাদ প্রদান করিয়াছি। আর বলিতে কি স্থল বিশেষে হিংসারও উদ্রেক হইয়াছে।"[১৮]



কামিনী রায়

কামিনী জন্মগ্রহণ করেন পূর্ববঙ্গের বাখরগঞ্জ জেলার বাসণ্ডা গ্রামে। তাঁর পিতা ছিলেন গ্রন্থকার চণ্ডীচরণ সেন। পিতার কর্তৃত্বাধীনে তাঁর প্রথম শিক্ষাজীবনের সূত্রপাত ঘটে। পরে কলকাতার বেথুন স্কুল ও কলেজে তাঁর শিক্ষা সমাপ্ত হয়। সংস্কৃতে অনার্সসহ বি.এ. পরীক্ষায় তিনি সসম্মানে উত্তীর্ণ হন এবং বেথুন বিদ্যালয়ে শিক্ষকতাও করেন কিছুকাল। তাঁর বিবাহ হয় (১৮৯৪) স্ট্যাটুটরি সিভিলিয়ান কেদারনাথ রায়ের সঙ্গে। বিবাহের পূর্বে কেদারনাথ ছিলেন তাঁর কাব্যের গুণমুগ্ধ পাঠক। সুখ ও সৌভাগ্যপূর্ণ দীর্ঘ বিবাহিত জীবন যাপনের সুযোগ পান নি কামিনী রায়। দুর্ঘটনায় স্বামীর আকস্মিক মৃত্যু (১৯০৮) ঘটে। তার পরে একাধিক সন্তানের

বিয়োগ যন্ত্রণা তাঁকে ভোগ করতে হয়। সেই কারণে তিনি পুনরায় সাহিত্যরচনা করে এবং সমাজসেবা ও ধর্মাচরণের মধ্যে দিয়ে শান্তিলাভ করতে চেয়েছিলেন। তাঁর সেই বিখ্যাত উক্তি সকলের কাছেই পরিচিত -

'পরেব কারণে স্বার্থ দিয়া বলি
এ জীবন মন সকলি দাও,
তার মতো সুখ কোথাও কি আছে ?
আপনার কথা ভুলিয়া যাও।'

("সুখ"—'আলো ও ছায়া')

আট বছর বয়স থেকে কামিনী কাব্যচর্চা শুরু করেন। তাঁর রচিত অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ— 'নির্মাল্য' (১৮৯১); 'পৌরাণিকী' (১৮৯৭) 'গুঞ্জন' (শিশুদের উপযোগী কবিতা ১৯০৫); 'মাল্য ও নির্মাল্য' (১৯১৩); 'অশোক-সঙ্গীত' (সনেট গুচ্ছ ১৯১৪); 'দীপ ও ধূপ' (১৯২৯); 'জীবনপথে' (সনেট ১৯৩০) প্রভৃতি। 'জগত্তারিণী' সুবর্ণ পদক দান করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করেন।

৯। (রাজকুমারী) অনঙ্গমোহিনী দেবী (১৮৬৪-১৯১৮)

ইনি ছিলেন ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্রমাণিক্য বাহাদুরের প্রথমা কন্যা। ছেলেবেলা থেকেই ইনি কাব্য রচনায় ব্রতী হন। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থ— 'কণিকা' (১৩১১ বঙ্গাব্দ), 'শোকগাথা' (১৩১৩) ও 'প্রীতি' (১৩১৭)।

পরলোকগত স্বামীকে উদ্দেশ করে ইনি লিখেছিলেন- -

'আমার কবিতা নয় কল্পনার খেলা।
মধু সিক্ত নহে বাণী,
দুঃখদিগ্ধ প্রাণ খানি;
শুষ্ক চক্ষে পথ চেয়ে কেটে যায় বেলা।' — 'শোকগাথা'

'শোকগাথা' কবির স্বামীর স্মৃতিতে রচিত কবিতার সমষ্টি। তাঁহার কাব্যগ্রন্থ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাহাকে পথে লেখেন : 'আপনার এই কবিতাগুলির মধ্যে কবিত্বের একটি স্বাভাবিক সৌরভ অনুভব করি। ইহাদের সৌন্দর্য্য বড় সরল এবং সুকুমার—অথচ কলানৈপুণ্যও আপনার পক্ষে স্বভাবসিদ্ধ এই নৈপুণ্য আপনার শেষ কাব্যগ্রন্থটিতে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।"
(রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা', ১৩৬৮)

১ । (মহারাণী) সুনীতি দেবী (১৮৬৪-১৯৩২)

ইনি ছিলেন কেশবচন্দ্র সেন ও জগন্মোহিনী দেবীর কন্যা। সুনীতির বিবাহ হয় কোচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের সঙ্গে (১৮৭৮)। স্বামী ও একাধিক পুত্রকন্যার মৃত্যু

তাঁর মনকে বেদনাভাবাক্রান্ত করে তোলে। তিনি মানসিক দুঃখ ও ক্লেশ নিবারণের জন্য বিশেষ করে কাব্যচর্চা ও জনহিতকর কাজে মনোনিবেশ করেন। বাংলা ও ইংরেজীতে অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন ইনি। তাঁর প্রধান রচনাগুলি হল 'অমৃত বিন্দু' (১ম-২য় খণ্ড। ১৩২৫।১৩৩২ বঙ্গাব্দ), 'কথকতার গান' (১৩২৮) ও 'সতী' (গীতিনাট্য)।

১১। নীরদমোহিনী বসু (১৮৬৪-১৯৫৪)

বর্ধমানে নীরদমোহিনী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র। স্বামী গিরীশচন্দ্র বসু ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ। 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় তাঁর রচিত অনেক কবিতা প্রকাশিত হয়। নীরদমোহিনী-রচিত কাব্যগ্রন্থগুলি হল— 'প্রবাহ', 'পারিজাত ও ছায়া'।

১২। সুরবালা ঘোষ (১৮৬৭-১৯৩৩)

সুরবালা ছিলেন বিখ্যাত 'ইয়ং বেঙ্গল' কিশোরীচাঁদ মিত্রের দৌহিত্রী। তাঁর পিতার নাম নীলমণি দে ও মাতা কুমুদিনী। মাত্র এগারো বছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয় অতুলচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে।

শৈশবেই তাঁর মধ্যে সাহিত্যানুরাগ প্রকাশ পায়। তাঁর রচিত কবিতাগুলি 'মধুরা' নামে প্রকাশ করেন (১৩৩৯ বঙ্গাব্দে) তাঁর সাহিত্যিক পুত্র মন্মথনাথ ঘোষ।

১৩। সুশীলাসুন্দরী সেন (? -১৯২৮)

সুশীলাসুন্দরীর জন্ম যশোহর জেলার কালিয়াগ্রামে। তাঁর বিবাহ হয় বিক্রমপুরের মূলচর গ্রামনিবাসী হরিহর সেনের সঙ্গে। বিবাহিত জীবন ছিল স্বল্পস্থায়ী। প্রথমে তিনি স্বামীকে হারালেন, পরে একমাত্র কন্যা চারুবালার মৃত্যু হয়। নিজের শোকদীর্ণ মনোভাবকে খণ্ড খণ্ড কবিতার মধ্যে ব্যক্ত করছেন সুশীলাসুন্দরী। কিছু ভগবদ্‌ প্রেমের কবিতাও লিখেছেন। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থ 'অশ্রুমালিকা' (১৩২২ বঙ্গাব্দ)।

১৪। ফুলকুমারী গুপ্তা (১৮৬৯-১৯৩১)

হুগলী জেলার গুপ্তিপাড়ায় ফুলকুমারী জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম শ্যামাচরণ সেন। স্বামী ছিলেন শ্রীশচন্দ্র গুপ্ত। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থ— 'অবসর' ও 'সৃষ্টি রহস্য'।

১৫। অম্বুজাসুন্দরী দাশগুপ্তা (১৮৭০-১৯৪৬)

সমসাময়িক যুগের পাঠকদের কাছে অম্বুজাসুন্দরী কবিরূপে যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করেছিলেন। তিনি কান্তকবি রজনীকান্তের বংশে জন্ম গ্রহণ করেন পাবনা জেলার ভাঙাবাড়ি গ্রামে। তাঁর পিতার নাম গোবিন্দনাথ সেন। বালিকা বয়সে তাঁর বিবাহ হয় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট কৈলাসগোবিন্দ দাশগুপ্তের সঙ্গে।

কৈশোরেই ইনি কাব্যচর্চা শুরু করেন, তাঁর মধ্যে ছিল গভীর ঈশ্বরভক্তি, তাঁর রচনাতেও সে পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে। অম্বুজাসুন্দরী-রচিত কাব্যসমূহ— 'কাব্য লহরী' (১৮৯২),

'অশ্রুমালা' (১৮৯৪), 'খোকা' (১৯০৩), 'ভাব ও ভক্তি' (১৩১৩ বঙ্গাব্দ), 'প্রেম ও পুণ্য' (১৯১০) ইত্যাদি। তাঁর 'বঙ্গকুলনারী' কবিতায় তিনি বলেছেন—

"বড় ভালবাসি আমি বঙ্গকুলনারী,
ধীরতা নম্রতা মাখা, ঘোমটায় মুখ ঢাকা
রয়েছে উনন-ধারে চিরকাল ধরি,
বড় ভালবাসি আমি বঙ্গকুলনারী।
নয়নে কজ্জল দাগ, অধরে তাম্বুল রাগ,
ললাটে সিন্দূর-বিন্দু লক্ষ্মীর আসন,
সহাস্য সুন্দর মুখ, সুন্দর সরল বুক
উজ্জ্বল তারার মত আনত আনন।" ইত্যাদি

১৬। হিরণ্ময়ী দেবী (১৮৭০-১৯২৫)

স্বর্ণকুমারী দেবী ও জানকীনাথ ঘোষালের জ্যেষ্ঠা কন্যা ছিলেন হিরণ্ময়ী। লেখাপড়া ও সাহিত্যচর্চার প্রতি ছিল তাঁর গভীর নিষ্ঠা। তাঁর প্রথম রচনা 'সখা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় বারো বছর বয়সে। পনেরো বছরে হিরণ্ময়ীর বিবাহ হয়। 'ভারতী' পত্রিকায় তিনি নিয়মিত ভাবে গদ্য ও পদ্য লিখতেন। কিন্তু স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে তাঁর রচনাগুলি প্রকাশিত হয়নি। সমাজ সেবার কাজেও যথেষ্ট উৎসাহ ছিল তাঁর।

১৭। প্রিয়ম্বদা দেবী (১৮৭১-১৯৩৫)

ইনি ছিলেন কবি প্রসন্নময়ী ও কৃষ্ণকুমার বাগচীর একমাত্র সন্তান। উত্তরাধিকার সূত্রে ইনি মায়ের সংস্পর্শে থেকে কাব্যপ্রতিভার অধিকারিণী হন। তাঁর শিক্ষা শুরু হয় কৃষ্ণনগর বালিকা বিদ্যালয়ে। পরে কলকাতায় বেথুন বিদ্যালয় ও কলেজে তিনি বিদ্যা শিক্ষা করেন। প্রিয়ম্বদা কৃতিত্বের সঙ্গে বি.এ. পাস (১৮৯২) করেন। তাঁর বিবাহ হয় নদীয়া জেলার দেবগ্রামের বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের তারাদাসের সঙ্গে। ইনি ছিলেন মধ্য প্রদেশের ব্যবহারজীবী। কিন্তু তাঁর বিবাহিত জীবন সুখের হয় নি। আকস্মিক ভাবে স্বামীর মৃত্যু ঘটে বিবাহের অল্প কয়েক বছরের মধ্যে। একমাত্র শিশুপুত্র তারাকুমারও তাঁকে ছেড়ে চলে যায়। এই শোকবিধুর জীবনে তাঁর একমাত্র সান্ত্বনা ছিল কাব্য রচনা ও জনসেবামূলক কাজকর্ম।

গীতি কবিতা ও সনেট রচনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্তা। 'রেণু' কাব্যটি (১৯০০) তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। রবীন্দ্রনাথও তাঁর কবিতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনের ভাব ও ভাবনা নিয়ে তিনি কবিতা রচনা করেছেন। বিশেষ করে দুঃখ বা বিষাদপূর্ণ ভাবকেই তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন। যেমন—

'কত না যামিনী তোমারি লাগিয়া
চোখে ঘুম নাই মোর

শূন্য শয়নে একাকী জাগিয়া
ঝরে নয়নের লোর
দয়িত সুদূর, ছাড়ি পরবাস
এস এ বুকের কাছে
সহজে যেমন অতনু বাতাস
জীবন জড়ায়ে আছে।'

("সুদূর" অংশু)

কবি হিসেবে প্রিয়ম্বদার বৈশিষ্ট্য হল— গভীর ভাবকে তিনি প্রকাশ করেছেন সৌন্দর্য-মণ্ডিত ভাষায়। তাঁর সম্পর্কে জনৈক সমালোচক বলেছেন—"প্রত্যেকটি কবিতার মধ্যে কবির হৃদয়ের অন্তর্নিহিত ভাবটি শিশিরসিক্ত পুষ্পের ন্যায় বেদনার অশ্রুবিন্দু লইয়া করুণ ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।" [১৯]

প্রিয়ম্বদা-রচিত অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ— 'তারা' (১৯০৭), 'পত্রলেখা' (১৯১১), 'অংশু' (১৯২৭), 'চম্পা ও পাটল' (১৯৩৯)।

১৮। প্রমীলা নাগ (বসু) (১৮৭১-১৮৯৬)

গীতিকবিরূপে একদা প্রমীলার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। 'ভারতবাসী' সংবাদপত্রে তাঁর প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় বারো বছর বয়সে। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থ দুখানি হল—'প্রমীলা' (১৮৯০) ও 'তটিনী' (১৮৯২)।.

ঢাকা বিক্রমপুরের বিজয়চন্দ্র বসু ও লালমণি বসুর কন্যা ছিলেন প্রমীলা। মাতুলালয় কৃষ্ণনগরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বিবাহ হয় বারদির ডাক্তার গঙ্গাকান্ত নাগের সঙ্গে। অপরিণত বয়সে মাত্র পঁচিশ বছরে তাঁর মৃত্যু হয় যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়ে। কবির সকল কবিতাতেই বেদনা ও হাহাকার ধ্বনিত হয়েছে।

১৯। সরলাবালা দাসী (আ. ১৮৭২-১৯৩৯)

সরলাবালার পিতা ছিলেন উপেন্দ্রনাথ দত্ত। স্বামী ছিলেন আলিপুরের উকিল হেমেন্দ্রনাথ মিত্র। সরলাবালা-রচিত 'মিরণ' (১৩১৮ বঙ্গাব্দ) কাব্যখানি একটি শোককাব্য। মৃত কন্যার স্মৃতিকে কবি ধরে রাখার চেষ্টা করেছেন একশতটি কবিতার মধ্যে দিয়ে। এখানে ব্যক্তিগত শোক, বৈরাগ্য, নৈরাশ্য ও ভগবদ্‌ভক্তি পাশাপাশি ভাষারূপ নিয়ে ফুটে উঠেছে। কন্যার উদ্দেশে কবি বলেছেন—

"কার ভুলে এসেছিল, কি বিধানে চলে গেল,
সে বুঝি গো এ দেশের নয় ?"

২০। সরলা দেবীচৌধুরাণী (১৮৭২-১৯৩৯)

সরলাদেবীকে সংগীতজ্ঞা, সমাজসেবিকা, স্বদেশপ্রেমিকা, সাহিত্যিক, শিক্ষাব্রতী প্রভৃতি নানা

ভূমিকায় দেখতে পাওয়া যায়। ইনি ছিলেন স্বর্ণকুমারী ও জানকীনাথের কনিষ্ঠা কন্যা। সরলা যখন বিদ্যালয়ের ছাত্রী, তখন থেকেই 'সখা' ও 'বালক' পত্রিকায় কিছু কিছু গদ্য রচনা প্রকাশিত হত। ভগিনী হিরণ্ময়ীর সঙ্গে যৌথভাবে ইনি কিছুকাল 'ভারতী' পত্রিকা পরিচালনা করেন। পরিণত বয়সে পাঞ্জাবের রামভুজ দত্ত চৌধুরীর সঙ্গে এঁর বিবাহ হয়। একাধারে গান, কবিতা, প্রবন্ধ রচনা করেন। তাঁর রচিত স্বদেশপ্রেমমূলক গানের মধ্যে বিখ্যাত হল—'অতীত গৌরব বাহিনী মম বাণী'—এই গানটি। 'শতগান' (১৯৫০) নামে স্বরলিপি সহ একটি গ্রন্থ তিনি প্রকাশ করেন। তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'জীবনের ঝরাপাতা' আর-একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

২১। বিনয়কুমারী ধর (১৮৭২-?)

বিনয়কুমারী ধর ছেলেবেলা থেকেই কাব্যচর্চা শুরু করেন। প্রেম ও প্রকৃতি ছিল তাঁর কাব্যের প্রধান অবলম্বন। 'সাহিত্য', 'দাসী', 'ভারতী', 'প্রদীপ' এই সব পত্রিকায় তাঁর রচনা প্রকাশিত হত। গ্রন্থাকারে দুটি কাব্য প্রকাশিত হয় 'নবমুকুল' (১৮৮৮) ও 'নির্ঝর' (১৮৯১)। তাঁর পিতার নাম কাশীচন্দ্র বসু। ডাক্তার ভারতচন্দ্র ধরের সঙ্গে বিনয়কুমারীর বিবাহ হয়।

২২। অন্নদাসুন্দরী ঘোষ (১৮৭৩-১৯৫০)

পূর্ববঙ্গের বাখরগঞ্জ জেলার রামচন্দ্রপুর গ্রামে অন্নদাসুন্দরীর জন্ম হয়। পিতামাতা ছিলেন মোহনচন্দ্র গুহ ও শ্যামাসুন্দরী। ছেলেবেলায় দাদাদের সঙ্গে পাঠশালায় গিয়ে পড়াশুনা করতেন। বারো বছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয় ক্ষেত্রনাথ ঘোষের সঙ্গে। স্বামীর সঙ্গে নানাদেশ ভ্রমণের সুযোগ হয় এবং একটু বেশি বয়সেই তিনি সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'কবিতাবলী'তে (১৩৪৭ বঙ্গাব্দ) ১১৪টি কবিতা স্থান পেয়েছে। সেখানে সামাজিক পারিবারিক, ব্যক্তিগত, স্বদেশ প্রেম ইত্যাদি নানা বিষয়ক কবিতা আছে। 'নানা কথা' (১৩৪৭ বঙ্গাব্দ) নামে তাঁর একটি প্রবন্ধ গ্রন্থও আছে।

২৩। সুরমাসুন্দরী ঘোষ (১৮৭৩-১৯৪৩)

পূর্ববঙ্গে ঢাকা জেলার বিক্রমপুর মালখাঁনগর গ্রামে উমেশচন্দ্র বসুর কন্যা সুরমাসুন্দরী জন্মগ্রহণ করেন। গ্রামের বিদ্যালয় থেকে উচ্চ প্রাইমারি পরীক্ষায় বৃত্তিসহ উত্তীর্ণ হন এবং ঢাকার ইডেন বালিকা বিদ্যালয়ে তাঁর শিক্ষা অগ্রসর হতে থাকে। তেরো বছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয় বিক্রমপুর বজ্রযোগিনী গ্রামের নিশিকান্ত ঘোষের সঙ্গে। তাঁর স্বামী ছিলেন ময়মনসিংহের উকিল।

ছেলেবেলা থেকে তিনি ছিলেন কাব্যানুরাগিণী এবং তাঁর প্রকৃত কাব্যচর্চার সূত্রপাত ঘটে বিবাহের পর। স্ত্রীকে উৎসাহ দেবার জন্য তাঁর স্বামী নিজের রচিত 'অশ্রু' কাব্যগ্রন্থে সুরমা-রচিত কয়েকটি কবিতা সংযোজন করে প্রকাশ করেন। সুরমা-রচিত কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অনুভব করা যায়। 'প্রদীপ', 'উৎসাহ', 'প্রভাত' ইত্যাদি পত্রিকায় তাঁর কবিতা ছাপা হত। তিনি দুখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন— 'সঙ্গিনী' (১৯০১) ও 'রঙ্গিনী' (১৯০২)।

২৪। লজ্জাবতী বসু (১৮৭৪-১৯৪২)

মনীষী রাজনারায়ণ বসুর কনিষ্ঠা কন্যা ছিলেন লজ্জাবতী। ইনি চিরকুমারী ছিলেন এবং কবিরূপে পাঠকসমাজে সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর কবিতা বামাবোধিনী, প্রদীপ, প্রবাসী, সাহিত্য, নব্যভারত প্রভৃতি পত্রিকায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হত। অথচ কোনো স্বতন্ত্র কাব্যগ্রন্থ তিনি প্রকাশ করেন নি। লজ্জাবতীর অনেক কবিতায় নিঃসঙ্গতা ও বেদনার সুর ধ্বনিত হয়েছে। যেমন 'ক্ষণিকে' কবিতার কয়েকটি ছত্র স্মরণ করা যায়—

"ক্ষণতরে বসন্তের দেখা,
মরুময় জীবনের তীরে
সুখের সে মলয় আভাষ
স্বপন ও ক্ষণিকেব তরে।
জীবনের মধুব সকল
ক্ষণিকেব সঙ্গীত কেবল
নিশীথেব স্বপ্নচ্ছায়া সম
মুহূর্তেব ভ্রান্তি আর ছল।"

২৫। নীলনলিনী বসু (১৮৭৪-১৯০৩)

এই মহিলা কবির জীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তাঁর পিতা ছিলেন যোগেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী। কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ কবেন 'বালুকণা' নামে (১৯০৩)।

২৬। (মহারাণী) সুচারু দেবী (১৮৭৪-?)

সুচারু ছিলেন কেশবচন্দ্র সেনের তৃতীয়া কন্যা। শিক্ষা, সংগীত, সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতি নানাদিকে তাঁর আগ্রহ ছিল। ময়ূরভঞ্জের মহারাজা রামচন্দ্র ভঞ্জদেবেয় সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। কিন্তু বিবাহের আট বছর পরেই তাঁর বৈধব্য ঘটে। এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় তাঁর একমাত্র পুত্রের মৃত্যু ঘটে। ব্যক্তিগত জীবনের ব্যথা ও বেদনার সুর অনুরণিত হয়েছে তাঁর কাব্যে। যেমন—

"আমি শুধু একা।
কেহ নাহি কাছে
কেহ নাহি আশে পাশে
যাই কার উদ্দেশে ?
কোথা জন্ম, কোথা গম্য, কোথা জন্মস্থান ? "

সুচারু দেবী রচিত দুটি কাব্য আছে—'ভক্তি অর্ঘ্য-(১৩৩২ বঙ্গাব্দ) ও 'প্রণতি' (১৩৭৫ বঙ্গাব্দ)। নারীসমাজের উন্নতির জন্য 'পরিচারিকা' নামক মাসিক পত্রিকাটির সম্পাদনার দায়িত্ব ইনি কিছুদিন বহন করেছিলেন।

২৭। হেমলতা ঠাকুর (১৮৭৪-১৯৬৭)

হেমলতা একাধারে ছিলেন কবি, গল্পকার, প্রবন্ধকার, সমাজসেবিকা, স্বদেশপ্রেমিকা এবং আরও অনেক স্ত্রীগুণের অধিকারিণী। ইনি ছিলেন একদিকে রাজা রামমোহন রায়ের পৌত্রীর পৌত্রী এবং অন্যদিকে মহির্ষি দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বিতীয় পক্ষের সহধর্মিণী। হেমলতার পিতার নাম ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়। স্বল্পস্থায়ী দাম্পত্য জীবনকে নানাভাবে ইনি সার্থক করে তুলেছিলেন। আধ্যাত্মিক চিন্তা ও ধর্মজীবনের প্রতি ছিল হেমলতার বিশেষ আকর্ষণ। তাঁর রচিত কবিতার মধ্যে সেই পরিচয় নিহিত আছে। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থগুলি—'জ্যোতিঃ' (১৩১৭ বঙ্গাব্দ), 'অকল্পিতা' (১৩১৯ বঙ্গাব্দ), 'আলোর পাখী' (১ম ও ২য় পর্ব। ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ)। তাঁর কবিতার দুটিমাত্র ছত্র এখানে তুলে ধরা হল—

'ছুঁয়ে যাব সুন্দরের নন্দন-দেয়ালি
সুন্দরে অন্তরে ধরি প্রেম-দীপ জ্বালি।' ('দেয়ালি')

গল্প ও প্রবন্ধ রচনা ভিন্ন ইনি যোগ্যতার সঙ্গে 'বঙ্গলক্ষ্মী' পত্রিকাও পরিচালনা করেছিলেন।

২৮। সরলাবালা সরকার (১৮৭৫-১৯৫৮)

কলকাতার এক সংস্কৃতিসম্পন্ন বংশে সরলাবালা জন্মগ্রহণ করেন। লেখিকা রাসসুন্দরী দেবী ছিলেন এঁর পিতামহী। পিতা কিশোরী লাল সরকার ছিলেন কলিকাতা হাইকোর্টের একজন খ্যাতিমান ব্যবহারজীবী। ডাক্তার সরসীলাল সরকার ছিলেন এঁর ভ্রাতা। বারো বছর বয়সে সরলাবালার বিবাহ হয় শরৎচন্দ্র সরকারের সহিত। মাত্র তেইশ বছর বয়সে তাঁর জীবনে বৈধব্য ঘটে। সেই কারণে এঁর রচিত কবিতাগুলিতেও শোনা যায় বেদনার সুর এবং সেই সঙ্গে গভীর ভগবদ্ বিশ্বাস ও শরণাগতি। সরলার প্রথম রচনা "লজ্জাবতী" নামে একটি কবিতা, প্রকাশিত হয়েছিল 'ভারতী ও বালক' পত্রিকায়। এরপর তিনি 'ভারতী', 'সাহিত্য', 'প্রদীপ', 'জাহ্নবী' প্রভৃতি পত্রিকায় নিয়মিতভাবে কবিতা লিখতেন। তাঁর রচিত দুটি কাব্য-গ্রন্থ 'প্রবাহ' (১৯০৪) ও 'অর্ঘ্য' (১৯৫১) ছাড়াও অন্যান্য প্রবন্ধ, গল্প ও শিশুপাঠ্য রচনাও আছে। 'হারানো অতীত' (১৯৫৪) নামে তিনি একটি স্মৃতিচিত্র রচনা করেছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এঁকে মহিলাদের মধ্যে প্রথম 'গিরিশ লেকচারার' রূপে মনোনীত করে সম্মান প্রদর্শন করেন। কবি নির্ঝরিণী সরকার সরলাবালার কন্যা।

সরলাবালার রচনার সামান্য উদাহরণ দেওয়া যায় তাঁর "বঙ্গবালা" নামক কবিতা থেকে —

"বঙ্গবালা পরাধীনা তুমি ? নহ সখি, পরাধীনা নহ,
অন্তঃপুর কারাগার নহে, অন্তর তোমার চিরগৃহ।
বন্দিনী হয়েছ সখি নিজে, আপনারে হারায়ে বিহ্বল,

সাধ করে পরিয়াছ পায়ে, ভালবাসা কুসুম-শৃঙ্খল।
কে বলে তোমায় পরাধীনা, সর্বময়ী বঙ্গবালা তুমি,
দেবী বলে প্রতিষ্ঠা করেছে অন্তরেতে পিতা, ভ্রাতা, স্বামী।
হৃদয় তো ক্ষুদ্র গৃহ নয়, বিশ্বের সবার বাস এ যে,
সকলে তোমার হৃদয়েতে তুমি সখি সকলের মাঝে।"

২৯। সরোজকুমারী দেবী (১৮৭৫-১৯২৬)

সেকালের মহিলা কবিদের মধ্যে সরোজকুমারী ছিলেন বলিষ্ঠ মনের অধিকারিণী। পিতা মথুরানাথ গুপ্তের কাছে বাল্যশিক্ষা সমাপ্ত হয়। দশ বছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয় কলকাতার কলুটোলা অঞ্চলের অধিবাসী যোগেন্দ্রনাথ সেনের সঙ্গে, ইনি ছিলেন উকিল। স্বামীর সাহচর্যে সরোজকুমারীর শিক্ষা ও সাহিত্য সাধনার উন্নতি ঘটে। 'ভারতী' ও 'সাহিত্য' পত্রিকায় তাঁর অধিকাংশ রচনা প্রকাশিত হত। তিনটি কাব্যগ্রন্থই প্রধান— 'হাসি ও অশ্রু' (১৮৯৫), 'অশোকা' (১৯০১) ও 'শতদল' (১৯১০)। এ ছাড়া তাঁর একাধিক গল্পগ্রন্থও প্রকাশিত হয়। সরোজকুমারীর খণ্ড কবিতাগুলির মধ্যে গীতিকবিতা ও সনেট জাতীয় কবিতাগুলিই উল্লেখযোগ্য রচনা। একদিকে স্বামীপ্রেমে অন্ধ হয়ে তিনি প্রেমের কবিতা লিখেছেন, অন্যদিকে পুত্রবিয়োগের বেদনাজনিত বিলাপও তিনি প্রকাশ করেছেন কবিতায়। 'শতদল' কাব্যের অধিকাংশ কবিতা ভগবানের উদ্দেশে রচিত। প্রেমের কবিতায় ইনি বিচ্ছেদ ও বিরহকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। যেমন 'হাসি ও অশ্রু' কাব্যের 'তবে কেন' কবিতার কয়েকটি ছত্র---

"জান নাকি মিটিবে না এ আশা পরাণে,
নিমেষের সুখ-দুঃখ নিমেষেই ঝরে।
কেন তবে এইখানে সব যাও ভুলে।
হের গো গরজে সিন্ধু সংসারের কূলে।"

৩০। নগেন্দ্রবালা মুস্তাফী (সরস্বতী) (১৮৭৮-১৯০৬)

হুগলীর পালপাড়া গ্রামে পিতা নৃত্যগোপাল সরকারের গৃহে নগেন্দ্রবালার জন্ম হয়। স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তাঁর শিক্ষার সূত্রপাত ঘটে এবং পিতার উৎসাহে বালিকা বয়সেই তিনি সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। দশ বছর বয়সে হুগলীর সুখড়িয়া গ্রামের খগেন্দ্রনাথ মুস্তাফীর সহিত তাঁর বিবাহ হয়। বিবাহ-পরবর্তী জীবনে দীর্ঘকাল ধরে অসুস্থ থাকার দরুন, হাওয়া বদলের জন্য তিনি নানাস্থানে ভ্রমণ করেন। একে একে অনেকগুলি কাব্যগ্রন্থ ইনি প্রকাশ করেন। সেগুলি হল 'মর্মগাথা' (১৮৯৬), 'প্রেমগাথা' (১৮৯৮), 'অমিয় গাথা' (১৯০২), 'ব্রজগাথা' (১৯০২), 'ধবলেশ্বর' (১৯০৩), 'বসন্তগাথা' (১৯০৫), 'কুসুমগাথা' (১৯০৫) ইত্যাদি। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে আছে 'নারীধর্ম' (প্রবন্ধ), 'গার্হস্থ্য ধর্ম' (প্রবন্ধ) এবং 'সতী' (সামাজিক উপন্যাস)।

তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মর্মগাথা'য় কবি অত্যন্ত অকপট ভাবে নিজের মনোভাব ব্যক্ত করেছেন।

"বড় সাধ হয় মনে মানবের ব্যথারাশি,
এ ক্ষুদ্র হৃদয় পাতি লব আমি দিবানিশি।
বড় সাধ হয় মনে হ'য়ে আমি অশ্রুজল,
সখা সম ব্যথিতের সাথে রব অবিরল।"

৩১। মৃণালিনী সেন (১৮৭৯-১৯৭২)

সেকালের সাধারণ বাঙালি মহিলাদের জীবনধারার চেয়ে কিছুটা স্বতন্ত্র ধরণের ছিল কবি মৃণালিনীর জীবন। তাঁর পিতা ছিলেন লাড্‌লিমোহন ঘোষ। মৃণালিনীর প্রথম বিবাহ হয় পাইকপাড়ার জমিদার ইন্দ্রচন্দ্র সিংহের সঙ্গে। বিবাহের মাত্র দুবছর পরেই তাঁর স্বামীর মৃত্যু ঘটে। সাহিত্যচর্চা করে তিনি ভুলে থাকতে চেয়েছিলেন তাঁর ব্যক্তিগত দুঃখ ও বেদনাকে। একে একে তাঁর কয়েকখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়— যেগুলি স্বাভাবিক কারণেই নৈরাশ্য ও বিষাদে ভরপুর। সেগুলি হল—'প্রতিধ্বনি' (১৮৯৪), 'নির্ঝরিণী' (১৮৯৫), 'কল্লোলিনী' (১৮৯৬) ও 'মনোবীণা (১৯৫০)। কবির প্রথম কাব্য 'প্রতিধ্বনি'তে দেখতে পাই তাঁর মনে দার্শনিক জিজ্ঞাসার উদয় হয়েছে—

"কি কাজের তরে এসেছি ভবে ?
কি কার্য সাধি হে আমরা সবে!
কোন্ মহাকার্য করিতে সাধন,
হয়েছে সবার ভবে আগমন,
এস সেই মহাকার্য সাধি প্রাণ পণে।" ইত্যাদি।

কয়েক বছর কঠোর বৈধব্য জীবন যাপনের পর মৃণালিনী পুনরায় বিবাহ করেন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের দ্বিতীয় পুত্র নির্মলচন্দ্র সেনকে। অনেকদিন তিনি ইংলণ্ডে ছিলেন। শেষ জীবনে আর-একটি কাব্য তিনি প্রকাশ করেন 'উত্তরিকা' এবং পূর্ববর্তী কাব্যগুলিও তার সঙ্গে গ্রথিত ক'রে সমগ্র কাব্যগ্রন্থের নামকরণ করেন পূর্ববর্তী কাব্যগ্রন্থের নামের আদ্যাক্ষরগুলি জুড়ে 'প্রনিকম ও উত্তরিকা' (১৯৬০)।

৩২। বনলতা দেবী (১৮৮০-১৯০০)

বনলতার জন্ম কলকাতার বরাহনগর অঞ্চলে। পিতা ছিলেন বিখ্যাত সমাজসংস্কারক শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাতার নাম রাজকুমারী দেবী। বনলতার স্বামী ছিলেন শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার, ইনি 'জীবনী কোষ' সম্পাদনা করেছিলেন। বাড়িতে বসে বনলতা ভালোভাবে বাংলা, সংস্কৃত ও ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করেন। তাঁর পিতা যে বিধবা আশ্রম ও বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন ইনি তার তত্ত্বাবধান করতেন। এ ছাড়া ইনি 'সুমতি সমিতি' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। বিবাহের পর সমাজসংস্কারমূলক কাজে ও স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে ইনি অংশ গ্রহণ করেন। 'অন্তঃপুর'

(১৮৯৭) নামে একটি মেয়েদের পত্রিকা ইনি সম্পাদনা ও পরিচালনা করতেন। বনলতা-রচিত কাব্যগ্রন্থের নাম 'বনজ'।

৩৩। সরোজিনী নাইডু (১৮৭৯-১৯৪৯)

সরোজিনী ছিলেন আর–এক বঙ্গনারী, যিনি ইংরেজীতে তাঁর আশ্চর্য কবিত্বশক্তির পরিচয় রেখে গেছেন। ঢাকা বিক্রমপুবের ব্রাহ্মণগাঁয়ের অধিবাসী অধ্যাপক অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় চাকরিসূত্রে দক্ষিণ ভারতের নিজামরাজ্য হায়দ্রাবাদে বসবাস করতেন। সেখানে জন্মগ্রহণ করেন তাঁর কন্যা সরোজিনী। তাঁর মায়ের নাম বরদাসুন্দরী। সরোজিনী ছিলেন সমৃদ্ধ কল্পনালোকের অধিকারিণী এবং প্রথম থেকেই তিনি ইরেজী ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করতেন। বারো বছর বয়সে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ষোলো বছরে সরোজিনী উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য ইংলন্ডে যান। তিন বছর ধরে ইউরোপের নানাদেশ দেখে তিনি ভারতে ফিরে আসেন (১৮১৮) এবং গোবিন্দ রাজলু নাইডুকে বিবাহ করেন।



সরোজিনী নাইডু

তাঁর রচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ *The Golden Threshold* (১৯০৫) লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয়। পরে প্রকাশিত হয় *The Bird of Time* (১৯১২), *The Broken Wing* (১৯১৭) ও *The Songs of India*। পরবর্তী জীবনে সরোজিনী দেশসেবা ও বহু জনকল্যাণমূলক কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। স্বাধীন ভারতে (১৯৪৭) তিনি হয়েছিলেন উত্তর প্রদেশের রাজ্যপালিকা। নারীদের মধ্যে তিনিই প্রথম এই পদ লাভ করেন। সরোজিনীর রচনার পরিমাণ

স্বল্প হলেও রচনাসৌকর্যে ও ভাব প্রকাশের আন্তরিকতায় সেগুলি অনন্য। তাঁর লেখা "Palanquin Bearers". "Wandering Song", "Village Song" বা "Cradle Song" প্রভৃতি কবিতাগুলি অনেকের নিকট সুপরিচিত।

৩৪। কুসুমকুমারী দাশ (১৮৮২-১৯৪৮)

কুসুমকুমারী-রচিত "আদর্শ ছেলে" কবিতাটি স্কুলপাঠ্য পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত থাকায় প্রায় সকলের কাছেই পরিচিত—

"আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে,
কথায় না বড় হবে, কাজে বড় হবে।" ইত্যাদি

তাঁর আরও একটি পরিচয় আছে, সেটি হল তিনি বিখ্যাত কবি জীবনানন্দ দাশের মা। পূর্ববঙ্গের বাখরগঞ্জ বরিশালের গৈলা গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। পিতামাতা ছিলেন চন্দ্রনাথ দাশ ও ধনমণি দেবী। এঁরা ছিলেন ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী। শৈশবে কুসুমকুমারীর মাতৃ-বিয়োগ হয়। তিনি কলকাতার বেথুন স্কুলে পড়াশুনো করেছিলেন। এই সময় থেকেই তাঁর কবিজীবনের উন্মেষ ঘটে। উনিশ বছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয় সত্যানন্দ দাশের সঙ্গে। গার্হস্থ্য ধর্ম পালনের সঙ্গে তাঁর কাব্যচর্চাও অব্যাহত ছিল। 'প্রবাসী' 'ব্রহ্মবাদী' 'মুকুল' প্রভৃতি পত্রিকায় তিনি নিয়মিত ভাবে লিখতেন। তাঁর একটিমাত্র কাব্যসংকলন প্রকাশিত হয় 'কবিতামুকুল' (আ. ১৮৯৬), এখানে শিশুদের উপযোগী কবিতা আছে। কুসুমকুমারী অনেক ভগবদ্ভক্তি বিষয়ক কবিতা লিখেছেন।

৩৫। নলিনীবালা বসু (ঘোষ) (১৮৮৩-১৯৯৯)

নলিনী ছিলেন বাংলা কাব্যসাহিত্যের কিশোরী কবি। তাঁর পিতা ছিলেন দার্শনিক বিজয় বসু ও মাতা ছিলেন বিখ্যাত নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের কন্যা তমালিনী। নলিনী জন্মগ্রহণ করেন কলকাতায় এবং ছেলেবেলা থেকেই বিদ্যাশিক্ষা ও কাব্যপাঠে তাঁর খুব আগ্রহ ছিল। দশ-বারো বছর থেকেই কাব্যচর্চা শুরু করেন। তেরো বছর বয়সে এঁর বিবাহ হয় হুগলী জেলার বাগুটিয়া গ্রামের সতীশচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে। কিন্তু মাত্র যোলো বছর বয়সে নলিনীর অকালমৃত্যু ঘটল। শোকাহত প্রিয়জনরা তাঁর স্মৃতিকে জাগিয়ে রাখার জন্য, তাঁর রচিত খণ্ড কবিতাগুলির একটি সংকলন প্রকাশ করেন 'নলিনীগাথা' (১৩৪৫ বঙ্গাব্দ) নামে।

৩৬। পঙ্কজিনী বসু (১৮৮৪-১৯০২)

কাব্যপ্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন পঙ্কজিনী কিন্তু অকালমৃত্যু এসে তাঁর কবি-মনের যথাযথ বিকাশের সুযোগ দিল না। মাত্র সতেরো বছরে তাঁকে কালের কবলগ্রস্ত হতে হয়েছিল। তিনি ছিলেন ঢাকা-বিক্রমপুরের নিবারণচন্দ্র গুহ-মুস্তাফীর কন্যা। তেরো বছরে তাঁর বিবাহ হয় বিক্রমপুর বজ্রযোগিনী গ্রামের আশুতোষ বসুর সঙ্গে। বিবাহের পর তাঁর কবিত্বশক্তির বিকাশ ঘটেছিল। প্রথম ইনি শ্বশুরের অনুরোধে রামের বনগমনের কাহিনী অবলম্বন করে একশত

ছত্র-সংবলিত দীর্ঘ এক কবিতা রচনা করেন। তাঁর রচিত কিছু কবিতা 'বালিকার কবিতা' এই পরিচয়ে 'নব্য ভারত' ও 'সখী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। পঙ্কজিনীর মৃত্যুর পর তাঁর স্বামী 'স্মৃতিকণা' নাম দিয়ে তাঁর একটি কাব্যসংকলন প্রকাশ করেন। এখানে আত্মবিষয়ক, ধর্ম, প্রেম, সামাজিক ও সত্যঘটনা প্রভৃতি নানা বিষয় অবলম্বনে রচিত কবিতা আছে। সহজ সরল ভাষা ও ভঙ্গীতে ইনি কবিতা লিখতেন। উদাহরণ-স্বরূপ তাঁর রচিত মৃত্যু সম্পর্কিত কবিতার কয়েকটি ছত্র এখানে দেওয়া হল—

''এ ধরার খেলা সাঙ্গ হলে,
নাহি জানি যাইব কোথায়;
মাঝে মাঝে তাই থেকে থেকে
কাঁপে বক্ষ সন্দেহ শঙ্কায়।
কখনো মরণ ভাল লাগে,
কিন্তু পুনঃ হয় বড় ভয়,
পাছে মহাশূন্যতার মাঝে
শান্তি হারা ঘুরিবারে হয়।'

৩৭। সরযূবালা সেন (১৮৮৯-১৯৪৯)

বিখ্যাত দার্শনিক ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের কন্যা ছিলেন সরযূবালা। এন্ট্রান্স ও এফ. এ. পাস করে ইনি বিলাতের এক প্রতিষ্ঠান থেকে শিশুশিক্ষা সম্পর্কে বিশেষ শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর প্রথম বিবাহ (১৯১৫) হয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের ভাই বসন্তরঞ্জন দাশের সঙ্গে। বিবাহের অল্প দিনের মধ্যেই স্বামীর মৃত্যু ঘটলে, শোকাভিভূত হয়ে সরযূবালা লিখলেন 'বসন্ত-প্রয়াণ' (১৩২০ বঙ্গাব্দ) নামক শোককাব্য। রবীন্দ্রনাথ এই কাব্যের একটি দীর্ঘ ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন। দ্বিতীয়বার সরযূবালা বিবাহ করেন দেশবন্ধুর বিপত্নীক ভগিনীপতি শরৎচন্দ্র সেনকে। সরযূবালার দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'ত্রিবেণী সঙ্গম'। এ ছাড়া 'দেবোত্তর' ও 'অন্নপূর্ণা' নামে ইনি দুটি নাটকও রচনা করেছিলেন।

৩৮। প্রফুল্লময়ী দেবী (১৮৯১- ?)

ইনি জন্মেছিলেন পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলায়। এই কবির কাব্যগ্রন্থ 'পূর্ণিমা' 'বীরবালা', 'পুষ্পরাগ' এবং 'ধাত্রীপান্না' নামে নাটক পাওয়া যায়। তাঁর জীবন সম্পর্কিত তথ্য বিশেষ পাওয়া যায় না।

৩৯। (রানী) নিরুপমা দেবী (১৮৯৫-১৯৫১)

নিরুপমার পিতা ছিলেন মতিলাল গুপ্ত। উত্তর প্রদেশের হোসেঙ্গাবাদে পিতার কর্মস্থলেই নিরুপমার জন্ম হয়। কোনো স্কুল কলেজে না গিয়ে, শুধুমাত্র পিতার নিকট যথোচিত শিক্ষা লাভ করেছিলেন নিরুপমা। তাঁর মা ছিলেন বাংলা সাহিত্যের একনিষ্ঠ পাঠিকা এবং সেই সূত্রেই

নিরুপমার মধ্যে সহিত্যানুরাগ জেগে ওঠে। নিরুপমার প্রথম বিবাহ হয় কোচবিহারের রাজার সঙ্গে। কিন্তু সেই বিবাহবিচ্ছেদের পর পুনরায় তিনি বিবাহ করেন শিশিরকুমার সেনকে। নিরুপমার রচিত দুটি উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ হল— 'ধূপ' (১৩২৫ বঙ্গাব্দ) ও 'গোধূলি' (১৩৩৫ বঙ্গাব্দ)। ভাব, ভাষা ও ছন্দ কিছু পরিমাণে রবীন্দ্রানুসারী হলেও কবি হিসাবে বেশ পরিণতির চিহ্ন আছে এখানে। ইনি 'পরিচারিকা' পত্রিকাটি সচিত্র আকারে নবপর্যায়ে প্রকাশ করেন ও প্রায় আট বছর তা পরিচালনা করেন।

৪০। লীলা দেবী (১৮৯৬-১৯৪৩)

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পবিবারের রণেন্দ্রমোহন ঠাকুরের কন্যা ছিলেন লীলা। তাঁর বিবাহ হয় আশুতোষ চৌধুরীর জ্যেষ্ঠপুত্র আর্যকুমারের সঙ্গে। সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতির প্রতি ছেলেবেলা থেকেই আকর্ষণ অনুভব করতেন লীলা দেবী এবং আপন মনে কবিতা রচনা করতেন। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থের নাম 'কিশলয়' (১৩২৮ বঙ্গাব্দ)। অধিকাংশ কবিতাব মধ্যে ধ্বনিত হয়েছে করুণ সুর এবং ঈশ্বর সম্পর্কিত কবিতাগুলিতে আছে আত্মনিবেদনের ভাব।

৪১। ধরেন্দ্রবালা সিংহ

হুগলীর বাঁশবেড়িয়া অঞ্চলে ধবেন্দ্রবালার জন্ম হয়। পিতা ছিলেন রাজা পূর্ণেন্দু দেবরায় এবং স্বামী গিরীন্দ্রনারায়ণ সিংহ। ধরেন্দ্রবালা –রচিত কাবাগ্রন্থ— 'অশ্রুকণা' ও 'রেণুকণা'।

৪২। (রানী) জ্যোতিস্মতী দেবী

ইনি কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম প্রসন্ন সর্বাধিকারী ও তাঁর স্বামী ছিলেন শোভাবাজারের বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর। জ্যোতিস্মতী-রচিত দুটি কাব্যগ্রন্থ পাওয়া যায়— 'সাজি' ও 'মালা'।

৪৩। তরঙ্গিণী দাসী (? -১৩১৯ (বঙ্গাব্দ))

তরঙ্গিণীর পিতার নাম প্যারীমোহন রুদ্র। কবির নিবাস ছিল হুগলী অঞ্চলের মাহেশ। 'বামাবোধিনী' ও 'বঙ্গমহিলা' পত্রিকায় এঁর রচিত কবিতা প্রকাশিত হত। কাব্যগ্রন্থ— 'ফুলহার'।

উনিশ শতকের আরও কিছু মহিলা কবির রচিত কাব্যগ্রন্থ পাওয়া যায় কিন্তু তাঁদের বিস্তৃত পরিচয় কিংবা জন্ম-মৃত্যুর সঠিক সন-তারিখ জানা যায় না। সেই জাতীয় কয়েকজন কবির নাম ও কাব্যগ্রন্থের নাম দেওয়া হল—

জ্ঞানেন্দ্রমোহিনী দত্ত	—	'ধূলারাশি' (১৮৯৪)।
প্রভাবতী রায়	—	'চিত্রা' (১৮৯৭)।
কুসুমকুমারী রায়চৌধুরী	—	(এর পরিচিতি দেওয়া হয়েছে 'কথাসাহিত্যিক' অংশে)
বিভাবতী সেন	—	'কনককুসুম' (১৯০৩)
রমলা দেবী	—	'উচ্ছ্বাস' (১৯৩৪)

খ. কথাসাহিত্যে বঙ্গমহিলা

শুধু কাব্যের ক্ষেত্রেই নয়, নারীশিক্ষা প্রবর্তনের অব্যবহিত পরে সাহিত্যের অন্যান্য শাখা- উপন্যাস, গল্প. নাটক, প্রবন্ধ সর্বত্রই নারীর আবির্ভাব একটি বিস্ময়কর ঘটনা সন্দেহ নে কথাসাহিত্যে উল্লেখযোগ্য লেখিকা স্বর্ণকুমারী দেবীর আগেও বেশ-কয়েকজন মহিলা লেখি আখ্যায়িকামূলক গদ্য গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, এঁদের আমরা অপরিণতযুগের মহি কথাসাহিত্যিক রূপে গণ্য করতে পারি। তাঁদের কয়েকজনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল:

প্রথম যুগের মহিলা কথাসাহিত্যিক

১।	হ্যানা ক্যাথারিন মুলেন্স	—	(১৮২৬-৬১)
			'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' (১৮৫২)
২।	নবীনকালী দেবী	—	'কামিনী কলঙ্ক' (১৮৭০) ও
			'কিরণমালা' (১৮৭৮)
৩।	শিবসুন্দরী দেবী	—	(১৮০৬-৯৩)
			'তারাবতী' (১৮৭৩)
৪।	হেমাঙ্গিনী দেবী	—	'মনোরমা' (১৮৭৪)
			'প্রণয় প্রতিমা' (১৮৭৭)
৫।	সুরঙ্গিণী দেবী	—	'তারাচরিত' (১৮৭৫)
৬।	কুসুমকুমারী রায়চৌধুরী	—	'স্নেহলতা' (১৮৮৯)
			'প্রেমলতা' (১৮৯২)
			'শান্তিলতা' (১৮৯৫)
			'লুৎফন্নেসা' (১৯০৫)

হ্যানা ক্যাথারিন মুলেন্স

ইনি বিদেশিনী মহিলা হলেও, তাঁকে বঙ্গীয় লেখিকা সম্প্রদায়ভুক্ত করা হল তার কার কলকাতাতেই তাঁর জন্ম এবং মৃত্যু; এ ছাড়া বাংলা ভাষাকে তিনি মাতৃভাষার ন্যায় আয় করেছিলেন। ক্যাথারিনের পিতা ছিলেন লন্ডন মিশনারি সোসাইটির একজন কর্মী, তাঁর না রেভারেন্ড ফাঁসোয়া লাক্রোয়া। ১৮২১ খ্রীস্টাব্দে তিনি কলকাতায় আসেন এবং তখন তাঁ কন্যা জন্ম গ্রহণ করেন। ক্যাথারিন বাড়িতেই লেখাপড়া শিখেছিলেন। এত ভালোভাবে তি বাংলা ভাষা আয়ত্ত করেন যে, মাত্র বারো বছর বয়সে ভবানীপুর মিশনের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠি বালিকা বিদ্যালয়ে তিনি বাংলা পড়াতেন। তাঁর বিবাহ হয় (১৮৪৫ খ্রী.) জে. মুলেন্স নাম এক মিশনারির সঙ্গে। স্বামীর সঙ্গে ইনি প্রকৃত সহধর্মিণীর ন্যায় খ্রীস্টধর্ম প্রচার ও সমাজসেবামূল কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর সাহিত্য সাধনাও ছিল এই কর্মেরই অঙ্গীভূত। দুঃখের বিষ অত্যন্ত অপরিণত বয়সে আকস্মিক ভাবে ক্যাথারিনের মৃত্যু ঘটে।

'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' বইটি এক সময় বাঙালি খ্রীস্টান সমাজে খুবই পরিচিত ছিল। অনেকে মনে করেছিলেন এই আখ্যায়িকামূলক গ্রন্থখানি লেখিকার মৌলিক রচনা। সেই কারণে প্রথম বাংলা উপন্যাস রচনার প্রয়াস রূপে এই গ্রন্থখানির বিশেষ মর্যাদা দিতে চেয়েছিলেন অনেকে। পরে জানা যায় যে, এই গ্রন্থ 'The Last Day of the Week' নামক একটি ইংরেজী আখ্যানের ছায়া অবলম্বনে রচিত। (অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় --রচিত 'বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত'—গ্রন্থের (দ্বিতীয় সং) ৪২৮ পৃষ্ঠার 'পাদটীকা' দ্রষ্টব্য)।

গ্রন্থটি মৌলিক রচনা না হলেও, লেখিকার কৃতিত্ব একেবারে অস্বীকার করা যায় না। কারণ বিদেশিনী হয়েও তিনি আশ্চর্য প্রাঞ্জল বাংলা ভাষায় দেশীয় খ্রীস্টানদের চরিত্রানুযায়ী বাস্তবানুগ কাহিনী বর্ণনা করেছেন অনায়াস ভঙ্গিতে। তবে নিছক প্রচারধর্মী রচনা বলেই, এর সাহিত্যিক মূল্য স্বীকৃত হয় না। গ্রন্থশেষে লেখিকা বলেছেন— "চেষ্টা করিলে তোমরা অনায়াসে ফুলমণির অনুগামী হইতে পার, ...অতএব যে কোন ব্যক্তির মন খ্রীষ্টের প্রতি নিতান্ত আসক্ত আছে, সে অবশ্য তাহার মত সদ্ব্যবহার কাবিতে পারিবে। এই হেতু আমি তোমাদিগকে বিনয় করিয়া বলি, ফুলমণি যেমন খ্রীষ্টেব অনুকারী ছিল, তেমনি তোমবাও তাহার অনুকারী হও।" [২০]

অবশ্য গ্রন্থখানির ঐতিহাসিক মূল্য কেউ অস্বীকার করবে না। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন-- "ইহার মূল্য ঐতিহাসিক দলিল হিসাবে, প্রাণোরসোচ্ছল জীবনকথা রূপে নহে।" [২১]

নবীনকালী দেবী

প্রথম যুগের মহিলা-বিরচিত সাহিত্যে নবীনকালীর নাম সুপরিচিত। একাধিক কাব্য ও গদ্য গ্রন্থ ইনি রচনা করেছিলেন। দুখানি উপন্যাসধর্মী গ্রন্থের মধ্যে প্রথমটি হল— গদ্য-পদ্যের সংমিশ্রণে রচিত 'কামিনী-কলঙ্ক' (১৮৭০) এবং অন্যটি কাল্পনিক ঘটনার ভিত্তিতে রচিত 'কিরণমালা' (১৮৭৮)। 'কামিনী কলঙ্ক' সম্পর্কে ড. সুকুমার সেন বলেছেন— "...কাহিনীতে রচয়িত্রীর আত্মকথার ছায়া আছে বলিয়া মনে হয়, সেজন্য বইটি বাঙ্গালায় প্রথম বাস্তব উপন্যাসের প্রচেষ্টা বলিয়া দাবি করিতে পারে।" [২২]

শিবসুন্দরী দেবী

শিবসুন্দরী ছিলেন ঈশানচন্দ্র মুস্তাফীর কন্যা এবং পাথুরিয়াঘাটার গোপীমোহন ঠাকুরের শাস্ত্রজ্ঞ পুত্র হরমোহন ঠাকুরের পত্নী। ইনি 'তারাবতী' (১৮৭৩) নামে একটি গার্হস্থ্য উপন্যাস রচনা করেন। [২৩]

হেমাঙ্গিনী দেবী

লেখিকার পরিচয় জানা যায় না, কিন্তু তাঁর রচিত উপন্যাসধর্মী দুটি আখ্যায়িকামূলক গদ্যগ্রন্থ পাওয়া যায়। 'মনোরমা' (১৮৭৪) ও 'প্রণয় প্রতিমা' (১৮৭৮)। 'মনোরমা'র মধ্যে লেখিকা

কী দেখাতে চান সেকথা গ্রন্থের শুরুতেই বলে দিয়েছেন—"মনোরমা দরিদ্র ব্রাহ্মণের কন্যা, সম্পত্তির মধ্যে এক সরল, কোমল ও উদার মন। আর সৎচরিত্র স্বামীর সহবাসকে যদি উচ্চ শিক্ষা বলেন তবে মনোরমা সে শিক্ষা লাভ করিয়াছে।" ড. সুকুমার সেন এই গ্রন্থটি সম্পর্কে বলেছেন, "ইহাতে সমসাময়িক আখ্যায়িকার মতো মধ্যে মধ্যে অল্পস্বল্প পয়ার ছত্র থাকিলেও বইটি উপন্যাসের লক্ষণহীন নয়। গার্হস্থ্য চিত্রের পরিকল্পনায় নারীহস্তের স্পর্শ আছে। 'মনোরমা' স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক আখ্যায়িকা তবে সাহিত্য রস বর্জিত নয়।"[২৪] দ্বিতীয় গ্রন্থ 'প্রণয় প্রতিমা' কল্পনামূলক কাহিনী অবলম্বনে রচিত।

সুরঙ্গিণী দেবী

ইনি ছিলেন প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারীর সহধর্মিণী। 'তারাচরিত' (১৮৭৪) নামে ইনি একটি ঐতিহাসিক আখ্যায়িকামূলক গ্রন্থ করেন। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৫৫।

কুসুমকুমারী রায়চৌধুরী

কুসুমকুমারী ছিলেন প্রথমযুগের বিশিষ্ট লেখিকা। তাঁর রচিত 'স্নেহলতা' (১৮৮৯) সামাজিক উপন্যাসটিকে অনেকে মহিলা-রচিত প্রথম উল্লেখযোগ্য উপন্যাসের মর্যদা দিয়েছেন। তাঁর রচিত 'প্রসূনাঞ্জলি' নামক গদ্যও আছে। তা ছাড়া অন্যান্য উপন্যাসগুলি হল—'প্রেমলতা', 'শান্তিলতা' ও 'লুৎফন্নেসা'। কুসুমকুমারীর স্বামী ছিলেন বরিশালের লাখুটিয়ার জমিদার রাখালচন্দ্র রায়চৌধুরী। সেকালে অনেক রক্ষণশীল পরিবারের মহিলারা স্বনামে গ্রন্থ প্রকাশ করতেন না; ইনিও প্রথম দিকে 'কোন মহিলা' এই ছদ্মনামে লিখতেন। লেখিকার পুত্র দেবকুমার রায়চৌধুরী তাঁর মাতৃদেবী সম্পর্কে কিছু তথ্য জানিয়েছেন— "বহুবিধ কুসংস্কার ও বাধা-বিপত্তি তুচ্ছ করিয়া মুষ্টিমেয় সংখ্যক বঙ্গমহিলা যখন মাতৃভাষায় সার্থক রচনায় ব্রতী হইয়াছিলেন তখন চিরাবাধ্যা, প্রেমময়ী মা-আমার, অবকাশ ও উৎসাহের যথেষ্ট অভাব সত্ত্বেও, একাকিনী গৃহকোণে বসিয়া শুধুই প্রাণের ঐকান্তিক আগ্রহে বহুবিধ প্রবন্ধ উপন্যাসাদি রচনায় লেখনী পরিচালন করিয়াছিলেন। তখন স্বর্ণকুমারী দেবী ব্যতীত অন্যান্য বঙ্গমহিলারা উপন্যাস রচনায় তেমন উৎসাহী ছিলেন না।" দেবকুমার একথাও বলেছেন যে পরবর্তী কালে স্বর্ণকুমারী যখন জানতে পারলেন যে তাঁর পূর্বে কুসুমকুমারী 'স্নেহলতা' নামে একটি উপন্যাস লিখেছিলেন তিনি তখন নিজের গ্রন্থের নাম পরিবর্তন করেন 'স্নেহলতা' বা 'পালিতা'—কুসুমকুমারীর পুত্র লিখেছেন— "বিশ্বস্ত সূত্রে শুনিয়াছি,— মাতৃদেবীর প্রথম উপন্যাস যখন মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় তখন দেবী স্বর্ণকুমারীরও কোন উপন্যাস বা গল্প গ্রন্থাদি বঙ্গসাহিত্যের শোভা সম্পাদন করে নাই।" কুসুমকুমারীর এই গ্রন্থটি সম্ভবত 'ভারতী ও বালক' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। সেই কারণে লেখিকা-পুত্র দাবি করেছেন— "অতএব দেখা যাইতেছে— আমার মা-জননীর পূর্বে এদেশে অন্য কোন বঙ্গ মহিলার কোন উপন্যাস বা গল্প মুদ্রিত ও প্রচারিত হয় নাই; এবং নিঃসন্দেহ তিনিই বঙ্গদেশের সর্বপ্রথম মহিলা ঔপন্যাসিক।"[২৫]

'স্নেহলতা' ভিন্ন আরও দুটি সামাজিক উপন্যাস লিখেছেন কুসুমকুমারী—'প্রেমলতা' ও 'শান্তিলতা'— এই সব গ্রন্থে তৎকালীন সমাজ চিত্র, রীতি নীতি, স্ত্রীশিক্ষার কথা থাকলেও, লেখিকার প্রগতিশীল মনের কোনো পরিচয় নেই। কৌলীন্য, বহুবিবাহ, ঘরজামাই রাখার প্রথার কথা বলেছেন এবং নারীজীবনের সমস্যার কথা আছে কিন্তু তিনি সমাজের রীতিনীতিকে নত মস্তকে মেনে নিয়ে রক্ষণশীল মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন সর্বত্র। তাঁর কাছে জীবনের সমস্যার সমাধানের একমাত্র পথ হল ভক্তিধর্মের আশ্রয় গ্রহণ। 'লুৎফন্নেসা' তাঁর রচিত ঐতিহাসিক উপন্যাস এবং অক্ষয়কুমার মৈত্র-রচিত 'সিরাজদ্দৌলা' নামক গ্রন্থ থেকে তিনি তথ্য আহরণ করেছেন।

স্বর্ণকুমারী দেবীকে অনুসরণ করে পরবর্তীকালে যে–সমস্ত মহিলা ঔপন্যাসিক ও গল্পকারের আবির্ভাব ঘটেছে, তাঁদের বলা যেতে পারে—পরিণতযুগের মহিলা কথা- সাহিত্যিক। এঁদের রচনায় বিশেষভাবে প্রতিবিম্বিত হয়েছে সেকালের অন্দরমহলের জীবনযাত্রা প্রণালী, আবহাওয়া, রীতিনীতি এবং নারীমনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, চিন্তাধারা। সেই জাতীয় কয়েকজন ঔ'
বিশেষ পরিচয় দেওয়া হল:

পরিণত যুগের মহিলা কথাসাহিত্যিক

৭।	স্বর্ণকুমারী দেবী	(১৮৫৫-১৯৩২)
৮।	শরৎকুমারী চৌধুরানী	(১৮৬১-১৯২০)
৯।	ইন্দিরা দেবী	(১৮৭৯-১৯২২)
১০।	বেগম রোকেয়া সাখওয়াত হোসেন	(১৮৮০-১৯৩২)
১১।	অনুরূপা দেবী	(১৮৮২-১৯৫৮)
১২।	নিরুপমা দেবী	(১৮৮৩-১৯৫১)
১৩।	পূর্ণশশী দেবী	(১৮৮৫-১৯৬৪)
১৪।	গিরিবালা দেবী	(১৮৯১-১৯৮৩)
১৫।	নূরন্নেছা খাতুন	(১৮৯৪-১৯৭৫)
১৬।	শান্তা দেবী	(১৮৯৩-১৯৮৪)
১৭।	শৈলবালা ঘোষজায়া	(১৮৯৪-১৯৭৪)
১৮।	জ্যোতির্ময়ী দেবী	(১৮৯৪-১৯৮৮)
১৯।	সীতা দেবী	(১৮৯৫-১৯৭৪)
২০।	প্রভাবতী দেবী সরস্বতী	(১৮৯৬-১৯৭২)

স্বর্ণকুমারী দেবী

কাব্যের ধারার মতো উপন্যাসের ধারাতেও স্বর্ণকুমারী দেবী মহিলা ঔপন্যাসিকরূপে বিশেষ স্থান অধিকার করে আছেন। তাঁর রচিত উপন্যাসের সংখ্যা বারোটি। তিনি সামাজিক এবং

ঐতিহাসিক দুই জাতীয় উপন্যাসই লিখেছিলেন। ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার সময় স্বর্ণকুমারী অল্প-বিস্তর বঙ্কিমচন্দ্র এবং রমেশচন্দ্র দত্তের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। কিন্তু সামাজিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে নিজস্ব ভঙ্গিতে লিখেছেন। যেমন 'কাহাকে' নামক উপন্যাসে পাওয়া যায় রোম্যান্টিক প্রেমকাহিনী। এখানে নারীমনের অন্তরঙ্গ চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন এবং 'স্নেহলতা' উপন্যাসের মধ্যেও আমরা তাঁর মনোবিশ্লেষণ রীতি ও গভীর সমাজচিন্তার পরিচয় পাই। এ ছাড়া কয়েকটি উপন্যাসের মধ্যে লেখিকার গভীর স্বদেশানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। স্বর্ণকুমারী-রচিত উপন্যাসগুলির কালানুক্রমিক তালিকা—

১। দীপনির্বাণ (১৮৭৬); ২। ছিন্নমুকুল (১৮৭৯); ৩। মালতী (১৮৮০); ৪। মিবার রাজ (১৮৮৭–ঐতিহাসিক); ৫। হুগলীর ইমামবাড়া (১৮৮৮–ঐতিহাসিক); ৬। স্নেহলতা বা পালিতা (১ম খণ্ড- ১৮৯০, ২য় খণ্ড–১৮৯৩); ৭। বিদ্রোহ (১৮৯০–ঐতিহাসিক); ৮। ফুলের মালা (১৮৯৫) ৯। কাহাকে ? (১৮৯৮); ১০। বিচিত্রা (১৯২০);১১। স্বপ্নবাণী (১৯২১); ১২। মিলনরাত্রি (১৯২৫)।

গল্পরচনাতেও স্বর্ণকুমারী দেবী নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। 'নবকাহিনী' (১৮৯২) ও 'মালতী ও গল্পগুচ্ছ' (১৯১০) এই দুটি গল্প সংকলনের মধ্যে গল্পকাররূপে কৃতিত্বের পরিচয় নিহিত আছে। বসুমতী সাহিত্য মন্দির থেকে স্বর্ণকুমারীদেবীর গ্রন্থাবলী (১ম-৬ষ্ঠ খণ্ড) প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে।

শরৎকুমারী চৌধুরানী (১৮৬১–১৯২০)

শরৎকুমারী-রচিত 'শুভবিবাহ' উপন্যাসটি পড়ে রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন, সমালোচক হিসাবে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনবদ্য ভাষায় বলেছিলেন—

"শুভবিবাহ" একটি গল্পের বই; স্ত্রীলোকের লেখা ইহার গল্পের ক্ষেত্রটি কলিকাতা— কায়স্থ সমাজের অন্তঃপুর। এটুকু বলিতে পারি, মেয়ের কথা মেয়েতে যেমন করিয়া লিখিয়াছে এমন কোনো পুরুষ-গ্রন্থকার লিখিতে পারিত না।... এমন সজীব সত্য চিত্র বাংলা কোনো গল্প বইয়ে আমরা দেখি নাই। গ্রন্থে বর্ণিত অন্তঃপুর ও অন্তঃপুরিকাগণ যে লেখিকার বানানো, এ কথা আমরা কোনো জায়গাতেই মনে করিতে পারি নাই। তাহারাই দেদীপ্যমান সত্য এবং লেখিকা উপলক্ষ্য মাত্র।" [২৫ক]

লেখিকার জীবদ্দশায় একমাত্র গ্রন্থাকারে এই একটি বই প্রকাশিত হয় এবং তাঁর অন্যান্য রচনাগুলি সাময়িক পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই আবদ্ধ হয়ে ছিল। পরবর্তীকালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ তাঁর এই উপন্যাসটি ও 'সোনার ঝিনুক' (উপন্যাস), 'যৌতুক' (গল্প), এবং অন্যান্য গদ্য রচনাগুলি নিয়ে 'শরৎকুমারী চৌধুরাণীর রচনাবলী' প্রকাশ করেন।

কলকাতার নিকটবর্তী ব্যারাকপুরের চানকে মাতুলালয়ে শরৎকুমারীর জন্ম হয়। পিতা

শশিভূষণ বসুর কর্মস্থল ছিল লাহোরে, সেখানেই তাঁর শৈশব ও কৈশোরকাল অতিবাহিত হয়। সেখানকার ইউরোপীয়ান বিদ্যালয়ে কিছুকাল পড়াশুনা করার পর দশ বছর বয়সে তার বিবাহ হয় অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর সঙ্গে। পরবর্তীকালে অক্ষয়চন্দ্র বিখ্যাত অ্যাটর্নি ও কবি বলে পরিচিত হয়েছিলেন। স্বামী স্ত্রী উভয়েই ছিলেন সাহিত্যিক এবং সাহিত্যানুরাগী। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ির সঙ্গে চৌধুরী দম্পতির ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথ শরৎকুমারীকে 'লাহোরিণী' নামে সম্বোধন করতেন। স্বর্ণকুমারী এবং ইনি সখিত্বসূত্রে পরস্পর 'বিহঙ্গিনী' পাতিয়েছিলেন। এঁরা 'ভারতী' গোষ্ঠীর লেখক তালিকাভুক্ত ছিলেন।

ইন্দিরা দেবী (১৮৭১-১৯২২)

এই লেখিকার প্রকৃত নাম ছিল সুরূপা। কিন্তু সেকালে রক্ষণশীল পরিবারের বধূ হয়েও তিনি সাহিত্যচর্চার প্রলোভন ত্যাগ করতে পারেন নি, সুতরাং 'ইন্দিরা দেবী' এই ছদ্মনামের আড়ালে আত্মগোপন করেছিলেন। ইন্দিরা ছিলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পৌত্রী, মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়ের কন্যা এবং 'সাহিত্যসম্রাজ্ঞী' অনুরূপা দেবীর অগ্রজা। মাত্র দশ বছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয় হুগলীর অধিবাসী ও সরকারি উকিল শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। ইন্দিরা ছিলেন কর্তব্যপরায়ণা গৃহিণী, পত্নী, মাতা, আবার একই সঙ্গে নিষ্ঠাবতী লেখিকা। 'স্পর্শমণি' (১৯১৮) নামক উপন্যাসটিই তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। এখানে তিনি সহজ ভাষা ও ভঙ্গিতে ঘরোয়া পরিবেশের জীবন্ত চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর অন্যান্য উপন্যাসগুলি হল—'পরাজিত' (১৯২২), 'ফুলের তোড়া' (১৯২১), 'স্রোতের গতি (১৯২১)। 'প্রত্যাবর্তন' (১৯২২)। তাঁর রচিত ছোটোগল্পের সংকলন 'গীতিগাথা' নামে তাঁর একটি কাব্যগ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছিল। নারীসুসভ কোমলতার পরিচয় তাঁর রচনার সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে।

বেগম রোকেয়া সাখয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২)

মুসলিম মহিলা সমাজে কঠোর অবরোধপ্রথা প্রচলিত থাকলেও, শুধুমাত্র অদম্য চেষ্টা ও মনোবলের জন্যই রোকেয়া বেগমকে আমরা দেখতে পাই সাহিত্যিকা, সমাজসেবিকা ও শিক্ষাবিদ্ রূপে। তাঁর রচনাবলীতে ফুটে উঠেছে মুসলিম নারীসমাজের করুণ চিত্র। 'রোকেয়া রচনাবলী'তে যে-সমস্ত উপন্যাস প্রবন্ধ, কবিতা স্থান পেয়েছে তার মধ্যে প্রধান হল 'মতিচুর' (১ম ও ২য় খণ্ড), Sultana's Dream' ও 'পদ্মবাগ' নামক উপন্যাস এবং 'অবরোধ বাসিনী' নামক প্রবন্ধগ্রন্থ।

'পদ্মরাগ' উপন্যাসের নায়িকা সিদ্দিকার মুখের ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে বেগম রাকেয়ার জীবনদর্শন। সে বলেছে "আমি আজীবন...নারী জাতির কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করিব এবং অবরোধ প্রথার মূলোচ্ছেদ করিব... আমি সমাজকে দেখাইতে চাই, একমাত্র বিবাহিত জীবনই নারী-জন্মের চরম লক্ষ্য নহে।"[২৬]

উত্তরবঙ্গের রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে রোকেয়ার জন্ম হয়।

পিতার নাম জহীর মোহম্মদ আবু আলী। ঘরে বসেই লেখাপড়া শিখেছিলেন রোকেয়া। প্রথম যৌবনে তাঁর বিবাহ হয় ভাগলপুব নিবাসী শিক্ষিত উদার ও উন্নতমনের বিপত্নীক ব্যক্তির সঙ্গে, তাঁর নাম সৈয়দ সাখওয়াত হোসেন। স্বামীর মৃত্যুর পর নিঃসন্তান রোকেয়া একটি বিদ্যালয় স্থাপন করে তাঁর স্বামীর স্মৃতিকে অক্ষয় করে রাখলেন— সেটি আজ 'সাখওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল' নামে পরিচিত।

অনুরূপা দেবী (১৮৮২-১৯৫৮)

স্ত্রী-ঔপন্যাসিকদের সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন— "এক শ্রেণীর লেখিকা হিন্দু সমাজের উপর আক্রমণ ও সমালোচনার প্রতিক্রিয়ারূপে ইহার সনাতন বিধি নিষেধ ও মূলীভূত আদর্শের পক্ষ সমর্থনের কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।"[২৭] এই প্রসঙ্গে দুজনের কথা মনে পড়ে— একজন অনুরূপা দেবী ও আর-একজন নিরুপমা দেবী। অবশ্য দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে মিল থাকলেও উভয়ের রচনায় নিজস্বতা ও স্বাতন্ত্র্য বর্তমান।

ইন্দিরা দেবী ছাড়াও ভূদেব মুখোপাধ্যায়েব আর–এক পৌত্রী ও মুকুন্দদেব বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়া কন্যা অনুরূপা দেবী ছিলেন বাংলা সাহিত্যের স্বনামধন্যা লেখিকা। তাঁব মা ধরাসুন্দরী দেবীও 'এডুকেশন গেজেট' পত্রিকায় লিখতেন মাঝে-মধ্যে। বালিকা বয়সে অনুরূপার বিবাহ হয় শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে, যিনি ছিলেন মজঃফরপুরের বিশিষ্ট ব্যবহারজীবী। অনুরূপা দেবীর জীবনের অনেকগুলি দিন কেটেছে ঐ অঞ্চলে। প্রধানত কথাসাহিত্যিক হলেও ইনি ভ্রমণ কাহিনী ও অন্যান্য অনেক গদ্য গ্রন্থ লিখেছেন। তাঁর রচিত সামাজিক, গার্হস্থ্য ও ঐতিহাসিক উপন্যাসের সংখ্যা তেত্রিশ। এ ছাড়া তিনি ছোটোগল্পও লিখেছেন অনেক। 'মন্ত্রশক্তি' (১৯১৫) উপন্যাসটি তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। এ ছাড়া তাঁব বিখ্যাত উপন্যাসগুলি হল 'পোষ্যপুত্র' (১৯১১), 'গরীবের মেয়ে' (১৯১৫), 'মহানিশা' (১৯১৯), 'মা' (১৯২০), 'বাগদত্তা', 'পথহারা', 'চক্র', 'হারানো খাতা', 'জ্যোতিঃহারা', 'জোয়ার-ভাঁটা', 'উত্তরায়ণ', 'পথের সাথী' প্রভৃতি। এই উপন্যাসগুলিতে তিনি হিন্দুধর্ম ও জনকল্যাণের আদর্শ, ভগবৎপ্রেম ইত্যাদি বিষয়গুলিকে গভীর মনোযোগ দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। বৌদ্ধযুগের কাহিনী অবলম্বনে তিনি দুটি ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেন—'রামগড়' (১৯২৮) ও 'ত্রিবেণী'। এখানে কিছু পরিমাণে ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রভাব অনুভব করা যায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'জগত্তারিণী সুবর্ণপদক' ও 'ভুবনমোহিনী সুবর্ণপদক' দান করে এবং 'লীলা-বক্তৃতা' দিতে আহ্বান করে।

নিরুপমা দেবী (১৮৮৩-১৯৫১)

নিরুপমা দেবীর দুঃখপূর্ণ জীবনে একমাত্র সান্ত্বনা ছিল তাঁর সাহিত্য সাধনা। বঙ্গদেশের বহরমপুর অঞ্চলে জন্ম গ্রহণ করলেও, পিতার কর্মস্থল ভাগলপুরেই তাঁর জীবনের বেশিরভাগ সময়

অতিবাহিত হয়েছে। পিতা নফরচন্দ্র ভট্ট ছিলেন রক্ষণশীল ব্যক্তি। গৃহেই তিনি কন্যার লেখাপড়া শেখার ব্যবস্থা করেন। নিরুপমাব আসল নাম ছিল 'অনুপমা'। 'নিরুপমা' এই ছদ্মনামে তিনি সাহিত্য চর্চা করতেন। দশ বছর বয়সে নবগোপাল ভট্টের সঙ্গে বিবাহ হয়— কিন্তু চোদ্দ বছরে তাঁর অকাল বৈধব্য ঘটে। ভাগলপুরে অবস্থান কালে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁকে গল্প উপন্যাস লিখতে উৎসাহিত করেন। বিষয় বৈচিত্র্যের অভাব থাকলেও গভীর আবেগ সহানুভূতি ও সমবেদনার গুণে তাঁর রচনাগুলি অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। 'উচ্ছৃঙ্খল' উপন্যাসটি তাঁর প্রথম রচনা। 'দিদি' (১৯১৫) উপন্যাসটি তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা বলে গণ্য কবা হয়। অন্যান্য জনপ্রিয় উপন্যাসগুলি হল— 'অন্নপূর্ণার মন্দির' (১৯১৩), 'বিধিলিপি' (১৯১৭), 'শ্যামলী' (১৯১৮) প্রভৃতি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করে 'জগত্তারিণী সুবর্ণ পদক' (১৯৪৩) দান করে। তাঁর সমস্ত রচনার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে নারীর সংবেদনশীল মনটি। সাহিত্যচর্চা ও সমাজসেবাকে অবলম্বন করে তিনি জীবনের দুঃখভার লাঘব করতে চেয়েছিলেন।

নিরুপমা ও অনুরূপা দেবীর বেশ-কয়েকটি উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়ে ছায়াছবি নির্মিত হয় এবং পেশাদারি নাট্যশালায় অভিনীত হয়।

পূর্ণশশী দেবী (১৮৮৫-১৯৬৪)

এক সময় ইনি ছিলেন বাংলা সাহিত্যের জনপ্রিয় লেখিকা, কিন্তু আজ তিনি বিস্মৃতপ্রায় হয়ে গেছেন। পূর্ণশশী ছিলেন কালীকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও রাজবালাদেবীর কন্যা। বেহালা অঞ্চলের অধিবাসী হলেও, চাকরি সূত্রে তাঁর পিতা থাকতেন পাঞ্জাবের কর্নাল শহরে এবং ওখানেই জন্মগ্রহণ করেন পূর্ণশশী। লেখিকা হাসিরাশি দেবী এঁর ভগিনী। বাংলার বাইরে অবস্থান করলেও তাঁর পিতামাতা উভয়েই ছিলেন বাংলা সাহিত্যের অনুরক্ত পাঠক পাঠিকা। সেই কারণে ঘরে বসে বদলা ভাষা শিক্ষা এবং সাহিত্য চর্চা করা সম্ভব হয়েছিল তাঁর কন্যাদের পক্ষে। দশ বছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয় লালামোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। স্বামীর মৃত্যুর পর ইনি কাশীতে গিয়ে বসবাস করেন। তাঁর উপন্যাসের সংখ্যা চোদ্দ। উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলির নাম— 'স্নেহময়ী', 'মেয়ের বাপ', 'ফল্গুধারা', 'রূপহীনা', 'প্রেমের বায়না', 'অনুরাগ', 'দিশেহারা', নিশীথবাদল', 'মহিলামজলিস', 'রাতের ফুল', 'আঁধারে আলো', অভিশপ্তা', 'ঝড়ের পথিক', 'পথে বিপথে', 'সাদা কালো' প্রভৃতি। বেশ-কিছু ছোটোগল্পও ইনি রচনা করেছিলেন।

গিরিবালা দেবী (১৮৯১-১৯৮৩)

গিরিবালার পিতা দীননাথ শাস্ত্রী ও মাতা হেমাঙ্গিনী দেবীর বাস ছিল উত্তরবঙ্গের পাবনা জেলার পেচাকোলা গ্রামে। বারো বছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয় নিকটবর্তী এক রক্ষণশীল অভিজাত পরিবারে পূর্ণচন্দ্র রায়ের সঙ্গে। পল্লীগ্রামের কন্যা ও বধূ হিসাবে তিনি স্কুল-কলেজে পড়ার সুযোগ পান নি। ছেলেবেলায় পিতার নিকট ও পরবর্তী জীবনে স্বামীর কাছে লেখাপড়া শেখেন। সংসার ধর্ম পালনের সঙ্গে তিনি নিষ্ঠা সহকারে সাহিত্য চর্চাও করতেন অবসর সময়ে। বিভিন্ন মাসিকপত্রে

তাঁর লেখা গল্প-উপন্যাস ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হত। কিছু রচনা গ্রন্থাকারেও প্রকাশ করা হয়— 'রূপহীনা' (১৯২৫), 'হিন্দুর মেয়ে' (১৯৩০), 'মুকুটমণি', খণ্ডমেঘ' (১৯৪৫), 'কুড়ানো মাণিক', 'দান প্রতিদান' (১৯৩৭), 'রায়বাড়ী' (১ম ও ২য় খণ্ড) প্রভৃতি উপন্যাস এবং 'তৃণ গুচ্ছ' নামক গল্পগ্রন্থ। 'রায়বাড়ী' তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। এটি তাঁর আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস। নায়িকা বিনুর সঙ্গে লেখিকা একাত্ম হয়ে আছেন। গিরিবালা ছিলেন প্রচারবিমুখ ও অত্যন্ত লজ্জাশীলা নারী। ১৯৮৩ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'লীলা পুরস্কার' দানে সম্মানিত করে। এঁর কন্যা বাণী রায় পরবর্তী যুগের স্বনামধন্যা লেখিকা।

নূরন্নেছা খাতুন (১৮৯২-১৯৭৫)

উনিশ শতকের মহিলা-রচিত বাংলা সাহিত্যে মুসলিম লেখিকারা সংখ্যায় নগণ্য। কারণ সামাজিক অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় কারণে তাঁরা শিক্ষা গ্রহণ ও সাহিত্য চর্চার অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিলেন বহুকাল। নূরন্নেছার জন্ম হয়েছিল মুর্শিদাবাদের সাহাপুর গ্রামে। তাঁর পিতা ছিলেন একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান—খোন্দকার হাবিবুস্ সোবহান। তাঁর গৃহে কঠোর পর্দাপ্রথা প্রচলিত ছিল। নূরন্নেছা এ বিষয়ে বলেছেন—"প্রাচীন ভদ্র বংশীয়া মোসলমান আয়মাদার কন্যা বিধায়ে এবং কঠিন পর্দাবগুণ্ঠনের খাতিরে আমার সামাজিক ও পার্থিব অভিজ্ঞতা খুবই কম। বলিতে কি, পিত্রালয়ে অবস্থানকালে অষ্টমবর্ষ পূর্ণ হইবার পর, চতুর্দিকে চন্দ্রতারকাখচিত নীল চন্দ্রাতপ ভিন্ন কোনই প্রাকৃত সৌন্দর্য নয়নপথের পথিক হয় নাই।"[২৮] নিজের তীব্র জ্ঞানস্পৃহা ও মনোবল সম্বল করে তিনি শিক্ষা লাভ ও সাহিত্য সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। হুগলী শ্রীরামপুরের আইনজীবী কাজী গোলাম মোহাম্মদের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। স্বামীর উৎসাহে তিনি গ্রন্থ রচনা করেন ও বহুদেশ ভ্রমণ করেন। তাঁর রচিত সাতটি উপন্যাসের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য রচনা হল—'স্বপ্নদ্রষ্টা', 'ভাগ্যচক্র', 'বিধিলিপি' ও 'নিয়তি'।

শান্তা দেবী (১৮৯৩-১৯৮৪)

পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষা ও সংস্কৃতি প্রচার ও প্রসারের ফলে বঙ্গীয় নারীসমাজের একাংশের মধ্যে বেশ-কিছু পরিবর্তন দেখা গেল— তাঁদের মনোভাব, মূল্যবোধ ও আচার আচরণে। শান্তা দেবী ও সীতা দেবী এই ভগিনীদ্বয়ের রচিত গল্প-উপন্যাসে সেই ধরণের আধুনিক মনোবৃত্তির কিছু পরিচয় পাওয়া যায়।। এঁদের রচনাগুলি সম্পর্কে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তাব্য করেছেন—

"...রিক্ত, দীন, জীবন-সংগ্রামে ধূলি-ধূসর প্রণয়ের চিত্রই সীতা ও শান্তা দেবীর উপন্যাস সমূহের প্রধান আলোচ্য বিষয়।"[২৯]

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও মনোরমা দেবীর প্রথমা কন্যা ছিলেন শান্তা দেবী। রামানন্দ ছিলেন স্ত্রী শিক্ষা ও স্বাধীনতার সমর্থক। সুতরাং কন্যাদের শিক্ষা দান করতে তিনি কুণ্ঠিত হন নি। বেথুন স্কুল ও কলেজে শিক্ষা গ্রহণ করেন শান্তা দেবী। অনার্সসহ বি.এ. পাস করেন এবং সাহিত্য, শিল্প ও সংগীত সাধনায় রত হন। ড. কালিদাস নাগের সঙ্গে তাঁর বিবাহ সম্পন্ন হয়। সাহিত্য

চর্চার প্রথম দিকে দুই ভগিনীর যুগ্ম প্রচেষ্টায় রচিত হয় 'উদ্যান লতা' উপন্যাস এবং 'সংযুক্তা দেবী' ছদ্মনামে তা প্রকাশিত হয়। কয়েকটি উপন্যাস ও ছোটোগল্প রচনা করেন শান্তা দেবী। বিশেষ করে ছোটোগল্প রচনাতে তিনি কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। 'চিরন্তনী' নামক উপন্যাসটি তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। এখানে নায়িকা করুণার জীবনের অবাঞ্ছিত প্রেমের দ্বন্দ্বকে দক্ষতার সঙ্গে প্রকাশ করেছেন লেখিকা। অন্যান্য উপন্যাসগুলি— 'জীবনদোলা', 'অলখঝোরা' ও 'দুহিতা'। ভারতমুক্তিসাধক রামানন্দ ও অর্দ্ধ শতাব্দীর বাংলা' শান্তা দেবী –রচিত বিখ্যাত প্রবন্ধ গ্রন্থ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এঁকে 'ভুবনমোহিনী স্বর্ণপদক' প্রদান করে।

শৈলবালা ঘোষজায়া (১৮৯৪-১৯৭৪)

মাত্র কুড়ি বছর বয়সে 'সেখ-আন্দু'র মতো উপন্যাস রচনা করে শৈলবালা অসম সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন সেকালে। এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু হল মুসলিম ড্রাইভারের সঙ্গে হিন্দু কন্যার বাস্তবধর্মী প্রেমের কাহিনী। অভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়েছিল গ্রন্থখানি এবং অনেকে কটু সমালোচনা করেছিলেন। এই জাতীয় বিদ্রোহী মনোভাবের আরও কিছু পরিচয় আছে তাঁর রচিত অন্যান্য গল্প বা উপন্যাসে। তিনি প্রায় পঞ্চান্নখানি গল্প ও উপন্যাস রচনা করেন।

শৈলবালার জীবনে পরবর্তীকালে অত্যন্ত অশান্তি দেখা দিয়েছিল। তিনি জন্মেছিলেন সুদূর চট্টগ্রামের কক্সবাজারে। পিতা কুঞ্জবিহারী নন্দী ছিলেন সেখানকার সরকারি ডাক্তার। তাঁর মায়ের নাম ছিল হেমাঙ্গিনী। পরে তাঁরা বর্ধমানের স্থায়ী বাসিন্দা হলেন। বর্ধমান রাজবালিকা বিদ্যালয়ে যখন তিনি পড়াশুনো করছিলেন সেই সময় তেরো বছর বয়সে তাঁর বিবাহ হল নরেন্দ্রমোহন ঘোষের সঙ্গে। কিছুকাল পরে তাঁর স্বামী উন্মাদ হয়ে গেলেন। ঠিক তখন থেকেই তাঁর জীবনে যন্ত্রণার সূত্রপাত ঘটে। একটিই মাত্র তাঁর জীবনে শান্তিলাভের পথ ছিল—তা হল সাহিত্য সাধনা। পরে জীবনে বৈধব্য ঘটে। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলি হল—'ইমানদার', 'অবাক', 'অভিশপ্ত সাধনা', 'মঙ্গলঘট', 'অভিশপ্তা', 'শান্তি', 'বিপত্তি', 'বিনিময়', 'জন্ম অপরাধী', 'করুণাদেবীর আশ্রম' ইত্যাদি।

জ্যোতির্ময়ী দেবী (১৮৯৪-১৯৮৮)

লেখিকা জ্যোতির্ময়ী দেবী প্রধানত গল্প ও উপন্যাস রচনা করলেও ইনি অনেক প্রবন্ধ ও কবিতাও রচনা করেছেন। সুদূর রাজপুতানা রাজ্যের জয়পুর শহরে জ্যোতির্ময়ী দেবীর জন্ম হয়। তাঁর পিতামহ ও পিতা—সংসারচন্দ্র সেন ও অবিনাশচন্দ্র সেন ছিলেন তখনকার রাজদরবারের প্রধান মন্ত্রী ও অন্যতম মন্ত্রী। তাঁর মাতার নাম সরলা দেবী। ঘরে বসেই লেখাপড়া শিখেছিলেন। এগারো বছরে তাঁর বিবাহ হয় কিরণচন্দ্র সেনের সঙ্গে কিন্তু মাত্র পঁচিশ বছরে তাঁর বৈধব্য ঘটে। এই সময় তিনি ছিলেন ছয়টি সন্তানের মাতা। সংসারের নানা কাজকর্ম থাকা সত্ত্বেও ১৯২২ খ্রীস্টাব্দ থেকে ইনি প্রায় নিয়মিত ভাবে নানা পত্র-পত্রিকায় লেখা প্রকাশ করতে থাকেন। কারণ দুঃখপূর্ণ জীবনে এই ছিল তাঁর একমাত্র সান্ত্বনা। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত উপন্যাসগুলি হল—

'ছায়াপথ', 'বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ', 'মনের অগোচরে', 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা' ইত্যাদি। 'নারীবর্ষে' (১৯৭৫) তাঁর এক খণ্ড রচনাবলী প্রকাশিত হয়েছিল। জ্যোতির্ময়ী দেবীর ছোটোগল্পগুলি অসাধারণ। তাঁর 'সোনা নয় রুপা নয়' গল্প-গ্রন্থের জন্য তিনি রবীন্দ্রপুরস্কার লাভ করেন ১৯৭২ খ্রীস্টাব্দে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এঁকে 'ভুবনমোহিনী সুবর্ণ পদক' (১৯৬৫) দান করে এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে দেওয়া হয় 'হরনাথ ঘোষ সুবর্ণ পদক' (১৯৮২)। 'রাজা ও রাণীর যুগ' প্রবন্ধগ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য। 'চক্রবাল' নামে একটি কাব্যগ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে। সকল শ্রেণীর নারীকে ইনি বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন। তাঁর রচিত সাহিত্যে বলিষ্ঠ ও প্রগতিশীল দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় প্রায় সর্বত্র। ১৯৮৮ সালে তাঁর জন্মশতবর্ষে পাঁচখণ্ডে প্রকাশিত হয় 'জ্যোতির্ময়ীদেবীর রচনা সংকলন'।

সীতা দেবী (১৮৯৫-১৯৭৪)

শান্তা দেবীর কনিষ্ঠা সহোদরা ছিলেন সীতা দেবী। এঁদের আদি নিবাস ছিল বাঁকুড়ায়। কিন্তু পিতার কর্মস্থল এলাহাবাদে এঁদের শৈশব ও কৈশোরকাল কেটেছে। বেথুন কলেজ থেকে সীতা দেবী ইংরেজীতে অনার্সসহ বি.এ. পাস করেন। তাঁর বিবাহ হয় সুধীরকুমার চৌধুরীর সঙ্গে। দীর্ঘকাল ইনি স্বামীর সঙ্গে রেঙ্গুনে বাস করেন এবং পরে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। উপন্যাস রচনাতেই বিশেষ মনোযোগ ছিল সীতা দেবীর। কিছু ছোটোগল্প এবং বেশ-কয়েকখানি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস রচনা করেন ইনি : সেগুলি হল— 'সোনার খাঁচা', 'পথিক বন্ধু' (১৩২৭ বঙ্গাব্দ), 'রজনীগন্ধা' (১৩২৮) 'পরভৃতিকা' (১৩৩৭ ব.), 'বন্যা', 'মাতৃঋণ', 'ক্ষণিকের অতিথি' 'জন্মস্বত্ব' ইত্যাদি। 'রজনীগন্ধা' উপন্যাসটি সীতা দেবীর শ্রেষ্ঠ রচনা। এখানে নায়িকা ক্ষণিকার চরিত্র অঙ্কনে তিনি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চরিত্র বিশ্লেষণের পরিচয় দিয়েছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইনি 'লীলা পুরস্কার' লাভ করেন।

প্রভাবতী দেবী সরস্বতী (১৮৯৬-১৯৭২)

ইনি শতাধিক উপন্যাস ও গল্পগ্রন্থের রচয়িত্রী। চব্বিশ পরগনার গোবরডাঙা অঞ্চলের খাটুর গ্রামে এঁর জন্ম। পিতা ছিলেন আইনজীবী গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ঘরে বসেই লেখাপড়া শিখেছিলেন। নয় বছর বয়সে বিবাহ হয়। ষোলো বছর বয়স থেকে প্রায় নিয়মিত ভাবে সাহিত্য সাধনা শুরু করেন। সূচীশিল্প ও অঙ্কনেও ইনি ছিলেন পারদর্শিনী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এঁকে 'লীলা পুরস্কার' দান করে। প্রথম উপন্যাস 'বিজিতা' 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রভাবতীর জনপ্রিয় উপন্যাসগুলি হল— 'রাঙাবৌ', 'মহীয়সী নারী', 'পথের শেষে', 'ব্রতচারিণী' প্রভৃতি।

গ. মহিলা-রচিত বাংলা ছোটোগল্প

উনিশ শতকের মহিলা ঔপন্যাসিকরা অনেকেই ছোটোগল্প রচনায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। অনেকে আবার শুধুই ছোটোগল্প লিখেছিলেন। মহিলা সাহিত্যিকদের মধ্যে স্বর্ণকুমারী দেবীর

হাতে ছোটোগল্প রচনার সূত্রপাত ঘটেছে। এখানে লেখিকাদের ছোটোগল্প রচনার কৃতিত্ব সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করার কোনো অবকাশ নেই। নানা পত্র-পত্রিকায় এইসব লেখিকা কিংবা অন্যান্য অনেক লেখিকার বহু গল্প ছড়িয়ে আছে ঐ সময়ে যে-সব উল্লেখযোগ্য মহিলা ছোটোগল্পকার ছিলেন এখানে তাঁদের নাম এবং গ্রন্থাকারে প্রকাশিত গল্পগ্রন্থগুলির নাম দেওয়া হল মাত্র।

ছোটোগল্প রচয়িত্রী লেখিকা ও তাঁদের গ্রন্থ

১।	স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫ -১৯৩২)	—	'নব কাহিনী' (১৮৯২)'। 'মালতী ও গল্পগুচ্ছ' (১৯১০)।
২।	সরলা দেবী চৌধুরানী (১৮৭২-১৯৪৫)	—	'নববর্ষের স্বপ্ন' (১৩২৫ বঙ্গাব্দ) (৫টি গল্পের সমাবেশ)।
৩।	ইন্দিবা দেবী (১৮৭৯-১৯২২)	—	'নির্মাল্য', 'কেতকী', 'মাতৃহীন' ও 'শেষ দান'।
৪।	অনুরূপা দেবী (১৮৮২-১৯৫৮)	—	'চিত্রদীপ', 'উল্কা', 'রাঙ্গা শাঁখা', 'মধুমল্লী' ও 'ক্রৌঞ্চ মিথুনের মিলনকথা'।
৫।	নিরুপমা দেবী (১৮৮৩-১৯৫১)	—	'আলেয়া' ও 'অষ্টক'। ('অষ্টক' গ্রন্থের ৪টি গল্প নিরুপমা– রচিত)।
৬।	মাধুরীলতা দেবী (১৮৮৬-১৯১৮)	—	'মাধুরীলতার গল্প'।

(রবীন্দ্রনাথের কন্যা মাধুরীলতার রচিত তিনটি মৌলিক ও আবও অনুবাদ গল্প পাওয়া যায়। তাঁর রচিত 'মাতাশত্রু' (ভারতী), 'সুরো' (সবুজপত্র) এবং 'সৎপাত্র (বঙ্গদর্শন) গল্প তিনটিতে তাঁর সাহিত্যপ্রতিভার পরিচয় আমাদের মুগ্ধ করে। যদিও এগুলি বেনামীতে প্রকাশিত হয়েছিল।)[৩০]

৭।	কাঞ্চনমালা দেবী (১৮৯১-১৯৩১)	—	'গুচ্ছ' (১৯৪৪), 'স্তবক', (১৯১৫), 'রসির ডায়েরী' (১৯১৮) ও 'শনির দশা' (১৯১৯)।

('ইনি ছিলেন বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্নী ও সুলেখিকা। 'মানসী' ও 'সাহিত্য' পত্রিকায় এঁর রচিত অনেকগুলি ছোটোগল্প প্রকাশিত হয় ও পরবর্তীকালে তা পুস্তাকারে সংকলিত হয়।)

৮।	শান্তা দেবী (১৮৯৩-১৯৮৪)	—	'উষসী', 'সিঁথির সিঁদুর', 'বধূ বরণ', 'পথের দেখা' ও 'দেয়ালের আড়ালে'।
৯।	শৈলবালা ঘোষজায়া (১৮৯৪-১৯৭৪)	—	'আড়াইচাল', 'মনীষা', 'অকাল কুষ্মাণ্ডের কীর্তি', 'স্মৃতিচিহ্ন' ও 'রুদ্রকান্ত'।

১০। জ্যোতির্ময়ী দেবী (১৮৯৪-১৯৮৮)	—	'রাজযোটক, 'আরাবল্লীর আড়ালে' 'ব্যান্ডমাষ্টারের মা', 'আরাবল্লীর কাহিনী', 'সোনা নয় রুপা নয়'।
১১। সীতা দেবী (১৮৯৫-১৯৭৪)	—	'বজ্রমণি', 'ছায়াবীথি', 'আলোর আড়াল'।
১২। প্রভাবতী দেবী সরস্বতী (১৮৯৪-১৯৭৪)	—	'হারানো-স্মৃতি', 'পাঁকের ফুল', 'লক্ষ্মী প্রতিষ্ঠা', 'শুভা'।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে একটি বিষয়ের উল্লেখ করা যায় যে সেকালের বিখ্যাত রসায়নবিদ্ হেমেন্দ্রমোহন বসু (১৮৬৬-১৯১৬) আবিষ্কার করেন 'কুন্তলীন' নামে মাথায় মাখা তেল এবং 'দেলখোস' নামে সুগন্ধি অনুলেপন। তাঁর বিজ্ঞাপন ও প্রচারের জন্য তিনি অভিনব পন্থা অবলম্বন করেন। ছোটোগল্প রচনা প্রতিযোগিতা আহ্বান করেন তিনি। যাঁরা কৃতিত্ব প্রদর্শন করতেন তারা 'কুন্তলীন পুরস্কারে' ভূষিত হতেন। এর সূত্রপাত হয় সম্ভবত ১৮৯০-৯১ সালে। এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করতে বহু মহিলা গল্পকারের আবির্ভাব ঘটেছিল ঐ সময়। অনেক অখ্যাত মহিলা লেখিকাই ছোটোগল্প রচনায় কৃতিত্ব প্রদর্শনী করে 'কুন্তলীন পুরস্কার' লাভে সমর্থ হয়েছিলেন। হেমেন্দ্রমোহন শুধু সাহিত্যরসিক ছিলেন না। নিজেও নানা ধরণের ছড়া রচনা করেছেন তাঁর নানাধরণের গন্ধদ্রব্য জনপ্রিয় করে তোলার জন্য। সেকালে অনেকের মুখে শোনা যেত এই ধরণের ছড়া—

"কেশে মাখো কুন্তলীন, অঙ্গবাসে দেলখোস
পানে খাও তাম্বুলীন, 'ধন্য হোক এইচবোস।" ইত্যাদি

ঘ. বাংলা সাহিত্যে মহিলা প্রাবন্ধিক

মহিলা–রচিত বাংলা সাহিত্যের ধারায় প্রথম দিকেই বেশ কয়েকজন সন্দর্ভ-রচয়িত্রীর সন্ধান পাওয়া যায়। এঁদের মধ্যে কেউ নারীজীবনের বিবিধ সমস্যা নিয়ে নিজের মতো করে আলোচনা করেছেন, যেমন শিক্ষা, পারিবারিক ও সামাজিক সমস্যার নানা দিক ; কেউ বা লিখেছেন আত্মজীবনী বা স্মৃতিকথামূলক রচনা। গ্রন্থাকারে অনেকে প্রকাশ করেছিলেন নিজেদের লেখা, অনেকে আবার মনের তাগিদে লিখে গেলেও, পুস্তাকাকারে প্রকাশ করেন নি। দীর্ঘকাল পরে অপর ব্যক্তির উৎসাহে সেগুলি ছাপার অক্ষরে আত্মপ্রকাশ করেছে। এঁদের মধ্যে দু-একজন বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ নিজেদের জীবনকথা হয়ে মুখে মুখে বলে গেছেন, অন্যের দ্বারা তা অনুলিখিত হয়েছে। প্রথম পর্যায়ের মহিলা লেখিকারা কেউই কিন্তু স্কুল-কলেজে লেখাপড়া শেখেন নি। কারণ, ঐ সময় এদেশে রীতিমতো নারীশিক্ষার প্রচলন তেমন ভাবে হয় নি। বাড়িতে

বসে নিজেদের চেষ্টায় কিংবা স্বামীর আগ্রহে এঁরা কিছু পরিমাণ শিক্ষা লাভ করেছিলেন। স্বশিক্ষিত যেমন ছিলেন, তেমনি সাহিত্যিক প্রেরণাটিও ছিল সম্পূর্ণ তাঁদের নিজস্ব।

প্রথম পর্যায়ের সন্দর্ভ-রচয়িত্রী

১। বামাসুন্দরী দেবী

'কি কি কুসংস্কার তিরোহিত হইলে এদেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে' (১৮৬১), পৃ. ২০

২। কৈলাসবাসিনী দেবী (১৮৩৭-?)

(দুর্গাচরণ গুপ্তের পত্নী)

হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা' (১৮৬৩), পৃ. ৭২

এবং 'হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস ও তাহার সমুন্নতি', (১৮৬৫) পৃ. ৩৯

৩। মার্থা সৌদামিনী সিংহ

'নারীচরিত' (১৮৬৫), পৃ. ৯৪

৪। দময়ন্তী দেবী- 'পাতিব্রত্যা ধর্ম' (১৮৬৯)

৫। বসন্তকুমারী দেবী - 'যোষিদ্বিজ্ঞান' (১৮৭৫), পৃ. ৬৮

৬। রাসসুন্দরী দেবী - (১৮০৯-১৯০০) 'আমার জীবন' (১৮৭৬)

৭। সারদাসুন্দরী দেবী (১৮১৯-১৯০৭) - 'আত্মকথা'

৮। কৈলাসবাসিনী মিত্র (১৮২৯-১৮৯৫)

(কিশোরী চাঁদ মিত্রের স্ত্রী)--'আত্মকথা'

৯। নিস্তারিণী দেবী (আ. ১৮৩৩-১৯১৬)

'সেকেলে কথা'

১০। প্রফুল্লময়ী দেবী (১৮৫২-১৯৪০)

'আমাদের কথা'।

বামাসুন্দরী দেবী

এই মহিলার জীবন সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য জানা যায় না। তিনি পাবনা অঞ্চলের অধিবাসিনী ছিলেন। ইনিই প্রথম নারী যিনি গদ্যে নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উত্থাপন করে সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন, নিজের সীমিত ধারণা অনুযায়ী তাঁর 'কি কি কুসংস্কার তিরোহিত হইলে এদেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে' (১৮৬১) কুড়ি পৃষ্ঠাব্যাপী এই পুস্তিকায়, নানা প্রসঙ্গের মধ্যে নারীদের কথাও বলেছেন। তাঁর পরবর্তী নিবন্ধ-রচয়িত্রী কৈলাসবাসিনী দেবী তাঁর 'হিন্দু মহিলাগণের

হীনাবস্থা' নামক গ্রন্থের 'বিজ্ঞাপন' অংশে বামাসুন্দরী সম্পর্কে বলেছেন—"বামাসুন্দরী' আমাদিগকে পথপ্রদর্শিকারূপে এই বঙ্গ গ্রামেতে জন্মগ্রহণ করত আমাদিগকে আকর্ষণ করিলেন, আমরা তাঁহারই আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া পদচারণে পারগ হইলাম।"

বামাসুন্দরী দেবীর গ্রন্থের 'ভূমিকা' লিখেছেন লোকনাথ মৈত্রেয়। তিনি বলেছেন—

"কিছুদিন অতীত হইল আমার পরমাত্মীয় কন্যাসমা স্নেহপাত্রী শ্রীমতী বামাসুন্দরী দেবীকে "কি কি কুসংস্কার তিরোহিত হইলে এদেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে" এই প্রশ্নটি দিয়াছিলাম। কতদিন পরে তাহার রচনানৈপুণ্য দর্শন করিয়া যে প্রকার আনন্দিত হইয়াছি তাহা বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করা সম্ভাবিত নহে।" ভূমিকাকার লেখিকা সম্পর্কে আরও বলেছেন—"ইহার রচয়িত্রী তিন বৎসরের অধিক হইবে না, বিদ্যাচর্চা আরম্ভ করিয়াছেন। যত্ন সহকারে বিদ্যার্জনে নিবিষ্টমনা হইলে আমাদের দেশীয় রমণীগণ যে কত অল্পকাল মধ্যে বিদ্যা ও জ্ঞানালঙ্কারে ভূষিতা হইতে পারেন, তা এদেশের লোকের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া আমার এই ক্ষুদ্র পুস্তক প্রচার করিবার অন্যতম উদ্দেশ্য।"

লেখিকা ছিলেন ব্রাহ্মধর্মাবলম্বিনী, সেই কারণে ব্রাহ্মধর্মের সমর্থনে গ্রন্থের প্রথমেই (পৃ. ১) বলেছেন—"ব্রাহ্ম ধর্মের প্রভা এদেশে বিকীর্ণ হইলে জাতিভেদ বিদ্বেষ ও কলহ আপনা আপনি স্থগিত হইবে ; উদ্বাহের নিয়ম পরিশুদ্ধ হইবে, অসত্য, প্রতারণা, মিথ্যা সাক্ষ্য, বিশ্বাসঘাতকতা, এ সকল পাপ বঙ্গদেশে আর কেহই আরোপ করিবে না, ধর্ম এবং ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইলেও আমাদের সকল সৌভাগ্য উদিত হইবে। আহা। এই পবিত্র ধর্ম যেন আমাদের সকলের হৃদয়ে রাজত্ব করে।"

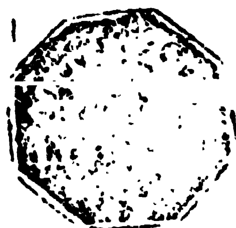
এই পুস্তিকা প্রথম 'সোম প্রকাশ' পত্রিকায় ও পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

কৈলাসবাসিনী দেবী

ইনি দুর্গাচরণ গুপ্তের স্ত্রী ছিলেন। এই পরিচয় ভিন্ন বিস্তৃততর পরিচয় কিছু জানা না গেলেও, বোঝা যায় যে সেই সময় তিনি একজন বিশিষ্ট লেখিকা ছিলেন। কারণ দুটি গুরুত্বপুর্ণ বিষয় সম্পর্কিত প্রবন্ধ রচনা ভিন্ন 'বিশ্বশোভা' নামক একটি কাব্যগ্রন্থও প্রকাশ করেছিলেন।

'হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা' (১৮৬৩) গ্রন্থের "নিবেদন" অংশে লেখিকা তাঁর শিক্ষা ও সাহিত্য চর্চার সূত্রপাত কেমনভাবে ঘটল তার একটি চমকপ্রদ বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন—"আমি বাল্যাবস্থায় পিত্রালয়ে একটি বর্ণও শিক্ষা করি নাই, এবং শিক্ষা বিষয়ে আমার অভিলাষও ছিল না। অধিক কি কহিব কেহ নারীগণের বিদ্যা বিষয়ক কোন কথা উত্থাপন করিলে আমি বিরক্ত হইতাম এবং বিদ্যাভ্যাস করিলে যে অচিরাৎ বিধবা হয়, প্রাচীন পরম্পরাগত এই পুরাতন বাক্যটি অতি প্রযত্ন সহকারে হৃদয় ভাণ্ডারে ধারণ করিতাম।" অথচ তাঁর স্বামী দুর্গাচরণ মহাশয়ের অসীম ধৈর্য ও যত্নে শেষ পর্যন্ত যে তিনি কী ভাবে শিক্ষিত হয়ে উঠলেন সে সম্পর্কে স্বয়ং কৈলাসবাসিনী বলেছেন—"আমি কোন মতেই তাঁহার উপদেশ বাক্য গ্রহণ করিতাম না। কিন্তু

হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা।



শ্রীমতী কৈলাসবাসিনী কর্তৃক

প্রণীত।

এবং তৎস্বামী

শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ গুপ্ত কর্তৃক

প্রকাশিত।

কলিকাতা।

গুপ্ত যন্ত্রে মুদ্রিত।

১৭৮৫ শক।

উক্ত যন্ত্রালয় মির্জাফর্স লেন ১১ নং ভবনে, অথবা গুপ্ত ব্রাদর্স-দিগের পুস্তকালয় কালেজ ষ্ট্রীট ৮১ নং ভবনে, এবং সকল পুস্তকালয়ে পুস্তক ব্যবসায়ীর নিকট পাওয়া যায়।

‘হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা’র প্রচ্ছদ

তিনি তাহাতেও নিরস্ত না হইয়া বরং আরও অধিক পরিমাণে চেষ্টিত হইলেন। পরে অগত্যা তাঁহারও সেই উপদেশ গ্রহণ করিলাম। তিনি বচনাতীত সন্তোষ সহকারে আমাকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন।"

এই গ্রন্থের প্রকাশক হিসাবে তাঁর স্বামী 'প্রকাশকের উক্তি' অংশে স্ত্রী কৈলাসবাসিনী সম্পর্কে বলেছেন যে, দ্বাদশবর্ষ পর্যন্ত তাঁর কোন অক্ষর পরিচয় ছিল না। কিন্তু তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্না কৈলাসবাসিনী অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিস্ময়কর উন্নতি লাভ করেন এবং গ্রন্থ রচনাতেও নিযুক্ত হন। মাত্র পনেরো দিনের মধ্যে তিনি এই নিবন্ধ গ্রন্থটি রচনা করতে সমর্থ হন। প্রকাশক বলেছেন—"সমস্ত দিবা সংসার ও সন্তান সন্ততিগণের কার্যে কাল ক্ষেপণ করিয়া সায়ংকালে যে কিঞ্চিৎ অবকাশ পাইতেন, তাহাতেই এক পক্ষ মধ্যে এই গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছিলেন।" এর থেকে বোঝা যায় সেকালে লেখাপড়া শেখার চলন থাকলে বহু নারীই এই জাতীয় যোগ্যতা এবং দক্ষতার পরিচয় দিতে পারতেন।

নিবন্ধ গ্রন্থ রচনায় কৈলাসবাসিনীর আদর্শ ছিলেন বামাসুন্দরী দেবী সে কথা তিনি বলেছেন। হিন্দু মহিলাদের হীনাবস্থার কারণগুলি একে একে বিচার ও বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন এই গ্রন্থে কৈলাসবাসিনী। আরম্ভেই বলেছেন—"ইহা প্রায় সকলেরই বিদিত আছে যে সকল সভ্য দেশীয় নারীগণাপেক্ষা অস্মদ্দেশীয় মহিলাগণেরাই অতিহীনাবস্থায় অবস্থিতি করিতেছি, আমাদিগকে দোষাকর দেশাচারই ইহার আকর স্বরূপ হইয়াছে।" দেশীয় রমণীগণের দুর্দশাপূর্ণ জীবনের কারণ হিসাবে তিনি দেখিয়েছেন যে, অধিকাংশ পিতামাতা বালকদের প্রতি যে দরদী মনোভাব পোষণ করেন; বালিকাদের সম্পর্কে থাকে তার বিপরীত - উপেক্ষাপূর্ণ মনোভাব। এ ছাড়া ত্রুটিপূর্ণ বিবাহ নীতি, কৌলীন্য প্রথা, সপত্নী জ্বালা, বৈধব্য যন্ত্রণা এবং কুলবধূদের সম্বন্ধে শ্বশুর, শাশুড়ি, ননদিনীর ব্যবহার অধিকাংশ ক্ষেত্রে খুব মধুর ছিল না। এইভাবে তিনি সেকালের অন্তঃপুরচারিণীদের জীবনযন্ত্রণার চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। কেমনভাবে এ-সবের প্রতিবিধান করা যায় সে সম্পর্কেও তাঁর কিছু মতামত ব্যক্ত করেছেন বাহাত্তর পৃষ্ঠাব্যাপী এই সন্দর্ভটিতে।

কৈলাসবাসিনীর দ্বিতীয় পুস্তক—'হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস'। এখানে 'প্রতিষ্ঠা পত্রে' আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয় লেখিকাকে উৎসাহ ও অভয় দান করেছেন। 'মুখবন্ধ' অংশটিতে লেখিকা কৈফিয়ত দিয়েছেন যে, কেন তিনি এই গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হলেন। লেখিকার বক্তব্য হল, বিদ্যানুশীলনের দ্বারা নারী জাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সম্ভব হবে। কিন্তু ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে অনেকেই বালিকাদের শিক্ষা দানে বিমুখ হন। তবে জনসাধারণের মন থেকে যে ক্রমশ ঐ ভ্রান্ত ধারণা অপসারিত হচ্ছে তার জন্য তিনি আনন্দ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন (পৃ. ৩০-৩১)— "পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে এতদ্দেশে তৎকালে স্ত্রীবিদ্যা একপ্রকার দুষ্কর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত ছিল। সুতরাং গুরুজনভীতা কামিনীগণের তৎকালে বিদ্যাভ্যাসের কোন সদুপায়

ছিল না। তবে যাঁহারা নিতান্ত বিদ্যানুরাগী হইতেন তাঁহারাই লোকাপবাদ ও গুরুগঞ্জনা সহ্য করিয়াও ঐ বিদ্যায় মনোযোগিনী হইতেন। কিন্তু তাহাও অতি অল্প অনুসারেই সম্পাদিত হইত। পরে তদ্বিষয়ে রাজার মনোনিবেশ হওয়াবধি অর্থাৎ মহাত্মা বেথুন সাহেবের এতদ্রাজ্যে শুভাগমন পর্য্যন্তই এই স্ত্রীবিদ্যাচর্চা সর্বত্রে ব্যাপ্ত হইয়াছে, অগ্রে ঐ বিদ্যা এতদ্দেশীয়গণের বোধে অতি অহিতকর ও অনাবশ্যক বলিয়া পরিগণিত ছিল। কিন্তু তৎকাল হইতেই লোকের মানস ক্ষেত্র হইতে সে ভাব নিরাকৃত হইয়াছে এবং অনেকেই তদনুশীলনে যত্নবান হইতেছেন। যাঁহারা পূর্বে উক্ত বিষয় শ্রবণ করিলে কর্ণবিবরে হস্তার্পণ করিতেন তাঁহারাও এক্ষণে তাহার উন্নতিকল্পে মনোযোগী হইয়াছেন এবং আপনাপন বালিকাগণকে প্রকাশ্যরূপেই হউক অথবা গুপ্ত ভাবেই হউক বিদ্যাভ্যাসে নিযুক্ত করিয়াছেন।''

মার্থা সৌদামিনী সিংহ

সৌদামিনী ছিলেন খ্রীস্টধর্মাবলম্বিনী একজন শিক্ষিতা মহিলা। কলিকাতা ফিমেল নর্মাল ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়েব ভূতপূর্ব ছাত্রী এবং কোন্নগর বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষাদাত্রী ছিলেন ইনি। তাঁর রচিত 'নাবীচরিত' (১৮৬৫) নামক গ্রন্থে আছে নয়জন বিদেশিনী মহিলাব সংক্ষিপ্ত জীবনকথা। গ্রন্থটি তিনি উৎসর্গ করেছেন রেভাবেন্ড জেমস্ লং সাহেবকে। লেখিকা তাঁর এই গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিজ্ঞাপন অংশে বলেছেন—''জীবন চরিত পাঠে দুই প্রকার ফল লাভ হইয়া থাকে। প্রথমতঃ কেহ কেহ আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যে যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম ও অবিচলিত অধ্যবসায় সহকারে নানা বিঘ্ন বিপত্তি সত্ত্বেও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিয়া স্বীয় স্বীয় মনোরথ সফল করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে এককালে অসংখ্য উপদেশ লাভ হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ সেই সেই ব্যক্তির বর্তমান কালীয় নানা দেশের আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতি প্রভৃতিব বিশেষ জ্ঞান জন্মে।

অতএব বঙ্গ বিদ্যার্থিনী বালিকাগণের শিক্ষা জন্য আমি কতকগুলি বিদ্যাবতী গুণবতী ও ধার্মিকা নারীর জীবন চরিত ইংরেজী হইতে বঙ্গভাষায় সংগ্রহ করিলাম।''

এই গ্রন্থ রচনায় তিনি তাঁর স্বামী চণ্ডীচরণ দের নিকট যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছিলেন, তার উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থটির ভাষা দেখে দেবার জন্য তিনি পণ্ডিত জগন্মোহন তর্কালঙ্কাব মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন। বাংলা ভাষায় নিজের যথাযথ অধিকার আছে কি না, সে কথা ভেবে তিনি কুণ্ঠাবোধ করেছেন এবং জনসাধারণের কাছে গ্রন্থটি আদৌ সমাদর লাভ করবে কি না, সে বিষয়েও তাঁর মনে ছিল গভীর সংশয়। কিন্তু আমরা দেখি বেশ সহজ ভাবে তিনি তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছেন। উদাহরণ— ''পূর্ব্বকালে সেকেন্দ্রিয়া নগর বিদ্যালোচনার একটি প্রধান স্থান ছিল। তথায় প্রধান প্রধান বিদ্যামন্দির ও সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত সকল থাকাতে বিদ্যার্থিগণ নানাদেশ হইতে আগমন করিয়া অধ্যয়ন করিত।... যিনি যে বিদ্যার যতদূর উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন, হাইপেসিয়া তাঁহার নিকট হইতে সেই বিদ্যাশিক্ষা করিতে ত্রুটি

EXAMPLARY AND INSTRUCTIVE

FEMALE BIOGRAPHY

COMPILED IN BENGALI.

BY

MARTHA SHOUDAMINI SINGH

A pupil of "The Calcutta Female Normal and Central Schools'
and Mistress of Connagore Female School.

নারী-চরিত।

শ্রীমতী সৌদামিনী সিংহ কর্তৃক

সংগৃহীত।

কলিকাতা ফিমেল নর্ম্মাল ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব
ছাত্রী এবং কোন্নগর বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষাদাত্রী।

কলিকাতা।

কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে

মুদ্রিত।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দ।

'নারীচরিত' গ্রন্থের প্রচ্ছদ

করে নাই। বাস্তবিক সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও লেখাপড়া শিখিবার ইচ্ছা থাকিলে সকল বিদ্যাই শিখিতে পারা যায়, হাইপেসিয়া তাহার দৃষ্টান্তস্থল।" — ('হাইপেসিয়া' পৃ. ১০)

বসন্তকুমারী দেবী

ইনি পূর্ববঙ্গের বরিশাল অঞ্চলে রায়েরকাঠী গ্রামের অধিবাসিনী ছিলেন তাঁর রচিত "যোষিদ্বিজ্ঞান" (১৮৭৫) গ্রন্থখানি তিনি স্বামী নরনারায়ণ চৌধুরীকে উৎসর্গ করেছেন। আটষট্টি পৃষ্ঠাব্যাপী গ্রন্থখানিতে কুড়িটি "নারীকুলের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহ" স্থান পেয়েছে। 'বিজ্ঞাপন" অংশে বসন্তকুমারী লিখেছেন— "বহুদিন হইতে আমার ঐকান্তিক আন্তরিক অভিলাষ যে একখানি গদ্য গ্রন্থ রচনা করিয়া নারীসমাজে উপস্থিত করিব, কিন্তু দৈহিক অপটুতা এবং সাংসারিক কার্য্যের অনবকাশবশতঃ এযাবৎ তাহা সম্পন্ন করিতে পারি নাই। ...বিশেষতঃ নিজে স্ত্রীলোক, এ অবস্থায় স্ত্রীলোকের উপকারজনক বিষযালম্বন করিয়া স্বজাতির উন্নতিকামনা প্রকাশ করা কর্তব্য ভাবিয়া তদুপযুক্ত বিংশতি বিষয় রচনাকরতঃ হৃদয়েশ্বরের নিকট দেখিতে দিয়াছি...।" ইত্যাদি।

প্রথম প্রবন্ধ হল "স্ত্রী-স্বাধীনতা" (১-১২ পৃষ্ঠা) বিষয়ক। এখানে লেখিকা নিজের যে মত প্রকাশ করেছেন তার কিছুটা পরিচয় দেওয়া যাক- - "বর্তমান সময় রমণীকুলের স্বাধীনতা লইয়া ভয়ানক গোলযোগ হইতেছে। নব্য-সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই অবলা-বান্ধব হইয়া অবলাকুলের পক্ষ সমর্থন করিতেছেন।... স্বাধীনতা সকলের পক্ষেই ঈশ্বরদত্ত ধন ইহা সত্য বটে, কিন্তু কর্তব্যাকর্তব্য চিন্তা করিতে গেলে সময় সময় অধীনভাব গ্রহণ করিতে হয় একথাও স্বতঃসিদ্ধ। যদৃচ্ছাব্যবহারে যে সমূহ অপকার ঘটে, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই।...নব্য সভ্য মহাশয়েরা যে নারীনিকরের হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া স্বাধীনতাদানে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন এজন্য তাঁহারা ধন্যবাদের যোগ্য পাত্র বটেন, কিন্তু হিতে বিপরীত না ঘটে ইহাও চিন্তা করা উচিত।" ইত্যাদি (পৃ. ৬)

নব্যবঙ্গীয় সমাজ সংস্কারবাদের স্ত্রী স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে সেকালের নারীরা কী মনোভাব পোষণ করতেন, এখানে তার একটি নিদর্শন পাওয়া গেল।

রাসসুন্দরী দাসী

রাসসুন্দরীর সবচেয়ে বড়ো কৃতিত্ব হল নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া শিখে তিনিই সর্বপ্রথম বাংলা সাহিত্যে আত্মজীবনী রচনার গৌরব অর্জন করেন। তাঁর পরে অসংখ্য মহিলা ও পুরুষ নিজেদের স্মৃতিকথা অথবা আত্মজীবনী লিখেছেন বটে, কিন্তু রাসসুন্দরীই এ বিষয়ে প্রথম পথ-প্রদর্শিকা। সহজ সরল অনাড়ম্বর ভাষায় নিজস্ব ভঙ্গিতে গদ্যে ও পদ্যে মিলিয়ে নিজের জীবনকথা বর্ণনা করেছেন। সেকালের বাঙালি নারীর নিখুঁত সংসারযাত্রা নির্বাহের চিত্র এখানে ফুটে উঠেছে। সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর সুগভীর ভগবৎ বিশ্বাসের দিকটি। চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থেকে

সুদীর্ঘ জীবন যাপন করলেও তিনি জীবনকে ভালোবেসেছেন এবং দেখেছেন, শুনেছেন, অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন প্রচুর।

রাসসুন্দরীর পিতা ছিলেন পাবনা জেলার পোতজিয়া গ্রামের পদ্মলোচন রায়। সেখানে রাসসুন্দরী জন্মগ্রহণ করেন এবং বারো বছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয় ফরিদপুরের রামদিয়া গ্রামের সম্পন্ন গৃহস্থ সীতানাথ সরকারের সঙ্গে। বিবাহের পূর্বে অক্ষর পরিচয় মাত্র হলেও, অনুশীলনের কোনো সুযোগ হয় নি। বিবাহের পর একদা তাঁর উদগ্র আকাঙ্ক্ষা জাগল 'চৈতন্য ভাগবত' গ্রন্থখানি পড়বার। তখন তিনি বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারের কর্তব্যপরায়ণা বধূ এবং তাঁর স্বামী ছিলেন ঘোর স্ত্রীশিক্ষা বিরোধী। কিন্তু সমস্ত বাধাকে তুচ্ছ করে দিয়ে তিনি নিজে নিজে লেখাপড়া শিখলেন তো বটেই, উপরন্তু একটি সরস আত্মজীবনী রচনা করতে সমর্থ হলেন। ধৈর্য ও আগ্রহের দ্বারা অসম্ভবকে সম্ভব করলেন। ইনি ছিলেন বারোটি সন্তানের জননী। তাঁর লেখা এই গ্রন্থটি পড়ে মুগ্ধ হয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন, ('ভূমিকা') "ইহার আত্মজীবনী পড়িয়া, মনে হয় ইনি একজন আদর্শ-রমণী। যেমন গৃহধর্মে নিপুণা, তেমনি ধর্মপ্রাণ ভগবদ্‌ভক্ত।"

আত্মজীবনী লেখার কৌশলটি লেখিকার নিজেরই উদ্ভাবিত, কারণ তাঁর সামনে তখন এই জাতীয় কোনো নিদর্শন ছিল না। কবিতায় মঙ্গলাচরণ করে লেখা আরম্ভ করেছেন। গ্রন্থটি প্রধানত দুটি অংশে বিভক্ত, প্রথম অংশে ষাট বছরের জীবনকথা ব্যক্ত করেছেন এবং পরবর্তী অংশে আরও পঁচিশ বছরের জীবনকথা বর্ণনা করেছেন। দীর্ঘ ষোলোটি পরিচ্ছেদ রাসসুন্দরী নিজের হাতে লিখেছিলেন। তাঁর রচনার সামান্য নিদর্শন— "আহা কি আক্ষেপের বিষয়। মেয়েছেলে বলিয়া কি এতই দুর্দশা। চোরের মত যেন বন্দী হইয়াই থাকি, তাই বলিয়া কি বিদ্যা শিক্ষাতেও দোষ? সে যাহা হউক এখনকার মেয়ে ছেলেগুলা যে, নিষ্কণ্টকে স্বাধীনতায় আছে, তাহা দেখিয়াও মন সন্তুষ্ট হয়। এখন যাহার একটি মেয়েছেলে আছে, সে কত যত্ন করিয়া লেখাপড়া শিখায়। এই লেখাপড়া শিখিবার জন্য আমাদের কত কষ্ট হইয়াছে। আমি যে যৎকিঞ্চিৎ শিখিয়াছি সে কেবল সম্পূর্ণ পরমেশ্বরের অনুগ্রহে মাত্র।" [৩১]

সারদাসুন্দরী দেবী

ইনি ছিলেন দেওয়ান রামকমল সেনের পুত্রবধূ, রামকমলের দ্বিতীয় পুত্র প্যারীচরণ সেনের স্ত্রী এবং ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের মা। সারদার পিতার নাম গৌরহরি দাস। তিনি চব্বিশ পরগনার গৌরীভা গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। মাত্র নয় বছরে সারদার বিবাহ হয়। স্বামীর উৎসাহে কিছু লেখাপড়া শিখেছিলেন কিন্তু জীবনে নানা উত্থানপতনের মধ্যে দিয়ে চলতে চলতে তাঁর নিজে হাতে লেখার অভ্যাস নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ইনি ছিলেন সাতটি সন্তানের জননী। মাত্র উনিশ বছরে তাঁর বৈধব্য ঘটে। দীর্ঘজীবী ছিলেন ইনি। যখন তিয়াত্তর বছরের বৃদ্ধা তখন 'আত্মকথা' বলতে শুরু করেন। আনুমানিক ১৮৯২ থেকে ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে এই গ্রন্থ লেখা হয়।

আটাত্তর বছরের সুখ-দুঃখময় জীবনকাহিনী সারদাদেবী মুখে বলে গেছেন এবং তাঁরই জবানীতে অপরিবর্তিত আকারে তা লিখেছিলেন যোগেন্দ্রলাল খাস্তগীর মহাশয়। উদাহরণ "তখনকার মেয়েদের আজকালের মেয়েদের মতন লেখাপড়া শিখিবার এমন সুবিধা ছিল না। শিখিতে চাহিতও না। কিন্তু আমার স্বামীর মত এই বিষয়ে সকল অপেক্ষা উন্নত ছিল। তিনি একান্ত ইচ্ছা করিতেন যে, আমি লেখাপড়া করি। অন্যত্র শিখিবার কোনও সুবিধা ছিল না বলিয়া তিনি নিজেই আমায় রাত্রিতে পড়াইতেন।" ৩২

এখানে সেকালের অন্তঃপুরের জীবনের অনেক মূল্যবান তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়। প্রথম এই রচনাটি 'মহিলা' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয় এবং পরে 'আত্মকথা' গ্রন্থমালার প্রথমে খণ্ডে সন্নিবেশিত হয়।

কৈলাসবাসিনী মিত্র

এই কৈলাসবাসিনী ছিলেন বিখ্যাত নব্যবঙ্গীয় সমাজ-সংস্কারক, লেখক ও বক্তা কিশোরীচাঁদ মিত্রের স্ত্রী। তাঁর পিতার নাম গোরাচাঁদ ঘোষ, ইনি রাজপুরের বাসিন্দা ছিলেন। স্বামীর উৎসাহে ঘরে বসেই সামান্য লেখাপড়া শেখেন এবং নিজের মনের কথা অকপটে লিখে রেখেছিলেন। দীর্ঘকাল পরে লেখিকার মৃত্যুর পর এই রচনাটি ধারাবাহিক ভাবে 'মাসিক বসুমতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়—'গত যুগের জনৈকা গৃহবধূর ডায়েরী' এই শিরোনামে। সম্প্রতি 'আত্মকথা' গ্রন্থমালার দ্বিতীয় খণ্ডে রচনাটি সংযোজিত হয়েছে।

মনের উৎসাহে অনেক কথাই লিখেছেন তিনি অশুদ্ধ বানানে। তিনি কী পরিমাণে সুখী ও স্বামীসোহাগিনী ছিলেন, সেই ভাবটি চমৎকার ভাবে ফুটে উঠেছে নানা বর্ণনায়। একবার তাঁরা গড়বেতা অঞ্চলে দোল উৎসব দেখতে গিয়েছিলেন তখন কিশোরীচাঁদের বন্ধু যোগশেচন্দ্র ঘোষের পত্নীর সঙ্গে কৈলাসবাসিনী 'ফাগ' পাতালেন ও প্রচুর আমোদ- আহ্লাদ করলেন। সেই কথা বলেছেন এই ভাবে—"ঠাকুর দেখিতে যে গিএছিলুম তাহা আমাদের জন্যে ও ব্যাড়াবার জন্যে। একে আমাদের বয়েস অল্প, তাতে স্বামীদের মান্য পদ। আবার তাঁদের ভালোবাসা খুব, মর্ত্তে বল্লে মরেন, বাঁচিতে বল্লে বাঁচেন। অমন সব স্বামি পদানত যাদের, তাদের মনে কি অসুখ!"৩৩

নিস্তারিণী দেবী

ইনি ছিলেন ভাগ্য নিপীড়িতা এক কুলীন কন্যা। পিতা হরচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাস ছিল হুগলীর খন্যানে। নিস্তারিণীর ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। আইবুড়ো নাম খণ্ডানোর জন্য ন'-দশ বছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয় খানাকুল কৃষ্ণনগরের ঈশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তাঁর আরও ত্রিশটি বিবাহ ছিল। আজীবন অপরের গলগ্রহ হয়ে দুঃখকষ্টের মধ্যে জীবন কেটেছে পিত্রালয়ে। শেষ জীবন কাটে কাশীধামে।

'সেকেলে কথা' রচনাটি প্রথম 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় (১৩২০ বঙ্গাব্দ) ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। সম্প্রতি 'আত্মকথা' গ্রন্থমালার দ্বিতীয় খণ্ডে স্থান পেয়েছে।

নিস্তারিণী তাঁর স্বামী-বঞ্চিত জীবনের কথা অনাড়ম্বর ভাষায় নিজেই লিখেছেন—"আমি ১৪ বৎসর বয়সে বিধবা হইলাম, ৯।১০ বৎসর বয়সে আমার বিবাহ হয়। বিবাহের পরেই, স্বামী এক বৎসর আমার পিত্রালয়ে ছিলেন। আর, শেষে যখন প্লীহায় পঙ্গু হন, তখন ১০।১২ দিন ছিলেন। আমার স্বামীভোগ মোটেই কপালে লেখা ছিল না।" [৩৪]

প্রফুল্লময়ী দেবী

ইনি ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চতুর্থপুত্র বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী ও বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মা। পিতা হরদেব চট্টোপাধ্যায় ও মাতা বামাসুন্দরীর আদি নিবাস ছিল হুগলীর বাঁশবেড়িয়ায়। মহর্ষির ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন প্রফুল্লময়ীর পিতা। বিবাহের পব চারটি বছর সুখে কেটেছিল কিন্তু তারপর তাঁর স্বামী উন্মাদরোগে আক্রান্ত হন। অকালে তাঁর প্রতিভাশালী পুত্র বলেন্দ্রনাথ মারা যান। পুত্রবধূরও অকালমৃত্যু ঘটে। শুধুমাত্র ভগবদ্ বিশ্বাস সম্বল করে তিনি বেঁচেছিলেন দীর্ঘ কাল। 'আমাদের কথা' রচনাটি তিনি মুখে বলেছিলেন এবং সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা রমা দেবী তা লিখে নিয়েছিলেন। প্রথম 'প্রবাসী' পত্রিকায় (বৈশাখ, ১৩৭৭) প্রকাশিত হয়, পরে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থে' স্থান পেয়েছে।

প্রথম দিকে প্রফুল্লময়ী পুত্রশোকে ভেঙে পড়লেও, শেষ জীবনে একধরণের সান্ত্বনা পেয়েছিলেন মনে। সেই কথা বলেছেন—

"আমার বলুকে আমি হারাইয়াও হারাই নাই, বরং তাহাকে আরও নিকটে পাইয়াছি বলিয়া মনে হয়। এক সে আমার বহু হইয়া অহরহ আমার সম্মুখে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, আজ সে অনন্তরূপে অনন্ত বাহু মেলিয়া আমাব বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে।" [৩৫]

দ্বিতীয় পর্যায়ের মহিলা প্রাবন্ধিক

উনিশ শতকের শেষদিকে বহু সন্দর্ভ-রচয়িত্রীর সন্ধান পাওয়া যায়। বিচিত্র বিষয় যথা— বিজ্ঞান, শিক্ষা, দর্শন, ইতিহাস, সাহিত্য, রাজনীতি, জীবনী, আত্মস্মৃতি, ভ্রমণ কাহিনী ইত্যাদি তাঁদের অনেক ধরণের নিবন্ধই প্রকাশিত হয়েছে এ সময়ে সাময়িকপত্রে ও গ্রন্থাকারে। এখানে শুধুমাত্র কয়েকজন বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক সম্পর্কে আলোচনা করা হল— তাঁরা হলেন—

১।	স্বর্ণকুমারী দেবী	(১৮৫৫-১৯৩২)
২।	বিনোদিনী দাসী	(১৮৬৩-১৯৪১)
৩।	কৃষ্ণভাবিনী দাস	(১৮৬৪-১৯১৯)
৪।	হেমলতা সরকার	(১৮৬৮-১৯৪৩)
৫।	ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী	(১৮৭৩-১৯৬০)

৬। অনিন্দিতা দেবী (আ. ১৮৮৫-১৯৪১)
৬। হরিপ্রভা তাকেদা (১৮৯৪-১৯৭২)

স্বর্ণকুমারী দেবী

প্রবন্ধের ক্ষেত্রেও স্বর্ণকুমারীর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। পরিমাণে অল্প হলেও বিচিত্র বিষয় নিয়ে বিচিত্র ধরণের প্রবন্ধ লিখেছিলেন তিনি। মহিলারা যে বিজ্ঞান বিষয়ে আলোচনা করতে উৎসাহী ছিলেন, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ দেয় স্বর্ণকুমারী–রচিত 'পৃথিবী' (১২৮৯) প্রবন্ধটি। 'বালক' পত্রিকার (১২৯২ চৈত্র) "ছায়াপথ" নামক অপর একটি প্রবন্ধ জ্যোতিষ্কলোকের কথাও উল্লেখ করা যায়। মৌলিক রচনা ভিন্ন, অন্যের আকর গ্রন্থের উপর রচিত একাধিক সমালোচনামূলক প্রবন্ধ আছে স্বর্ণকুমারীর। সাহিত্যতত্ত্ব সংক্রান্ত আলোচনা যেমন, 'কবি', 'নাস্তিকতা ও শেলি' (ভারতী ও বালক, জ্যৈষ্ঠ ১২৯৪)। স্মৃতিকথামূলক আলোচনা আছে 'সেকেলে কথা'য়। পত্রের আকারে রচিত ভ্রমণ কাহিনী 'দার্জিলিং-এর পত্র' (ভারতী ও বালক, ভাদ্র ১২৯৫)। ডায়েরি বা দিনলিপির ভঙ্গিতে লেখা ভ্রমণ বৃত্তান্ত 'সমুদ্রে' (ভারতী, ভাদ্র, ১৩০২)। 'নীলগিরিবর টোডাজাতি' (ভারতী, মাঘ ১৩০২) ভ্রমণের অভিজ্ঞতার উপর রচিত প্রবন্ধ। কিছু কিছু খেয়ালী রচনাও তিনি লিখেছিলেন 'ভারতী'তে 'বিবিধ প্রসঙ্গ' ও 'বিবিধ কথা' নামে।

স্বর্ণকুমারীর মধ্যে ছিল গভীর স্বাদেশিকতাবোধ ও রাজনৈতিক চেতনা। একাধিক প্রবন্ধে তিনি তার পরিচয় দিয়েছেন যেমন—'আমাদের কর্তব্য কোন পথে' (ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৫), 'লর্ড কার্জন ও বর্তমান অরাজকতা' (ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৫), 'রাজনৈতিক প্রসঙ্গ' (ভারতী, শ্রাবণ ১৩১৫), 'আমাদের কর্তব্য' (ভারতী, ভাদ্র ১৩১৫) প্রভৃতি। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর আলোচনা করেছেন 'একটি প্রস্তাব' (ভারতী, বৈশাখ ১২৯২) প্রবন্ধে। স্ত্রী-শিক্ষার সমর্থনে তিনি লিখেছিলেন 'স্ত্রী শিক্ষা ও বেথুন স্কুল' (ভারতী ও বালক, শ্রাবণ ১২৯৪)। সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন ভাষায় তিনি এখানে নিজের অভিমত প্রকাশ করে বলেছিলেন—"মহিলাগণ সুশিক্ষিত হইলে পুরুষ দিগেরই যে সুখ-সন্তোষ বৃদ্ধি হইবে, স্ত্রীলোকে মার্জিতরুচি মার্জিতবুদ্ধি মার্জিতজ্ঞান হইলে নিজের কর্তব্য যে সুচারুরূপে পালন করিতে পারিবেন, উপযুক্ত গৃহিণী উপযুক্ত সঙ্গিনী উপযুক্ত মাতা হইতে পারিবেন।"

বিনোদিনী দাসী

'নটী বিনোদিনী' নামে পরিচিত বিখ্যাত অভিনেত্রী ছিলেন ইনি। কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন এবং বারো বছর বয়স থেকে তাঁর অভিনেত্রী জীবনের সূত্রপাত ঘটে। গ্রেট ন্যাশনাল, বেঙ্গল, ন্যাশনাল ও স্টার থিয়েটারে নানা ভূমিকায় অভিনয় করে তিনি খ্যাতির অধিকারিণী হয়েছিলেন। শুধু অভিনয়-প্রতিভা নয়, সেইসঙ্গে তাঁর সাহিত্যপ্রতিভার পরিচয়ও পাওয়া যায়। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থ 'বাসনা' (১৩০০ বঙ্গাব্দ) ও কাহিনীকাব্য 'কনক ও নলিনী' (১৩১২) ভিন্ন কয়েকটি নিবন্ধ জাতীয় গ্রন্থ রচনা করেন ইনি। আত্মজীবনীমূলক রচনা 'আমার কথা' (১৩১৯) বিশেষ

উল্লেখযোগ্য। মঞ্চাভিনেত্রী রূপে যে-সব অবিজ্ঞতা তিনি সঞ্চয় করেছিলেন তার কথা বলেছেন তিনি 'আমার অভিনেত্রী জীবন' ইত্যাদি রচনায়। বিনোদিনীর এই সাহিত্যপ্রয়াস খুবই প্রশংসনীয় সন্দেহ নেই। বিনোদিনী দাসীব সমগ্র সাহিত্যকৃতির নিদর্শনস্বরূপ 'আমার কথা ও অন্যান্য রচনা' নামে (সুবর্ণরেখা প্রকাশিত পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ ১৩৯৪) গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

কৃষ্ণভামিনী দাস

সমাজসেবিকা রূপে কৃষ্ণভামিনী গণ্য হলেও, তাঁর রচিত বিচিত্র ধরণের সুচিন্তিত বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় 'ভারতী', 'সাহিত্য', 'সখা', 'প্রদীপ', 'প্রবাসী' প্রভৃতি পত্রিকায়। নদীয়া জেলায় চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলে তাঁর জন্ম। পিতার নাম জয়নারায়ণ সর্বাধিকারী। নয় বৎসর বয়সে তাঁর বিবাহ হয় বৌবাজারের বিখ্যাত ব্যবসায়ী শ্রীনাথ দাসের পুত্র অধ্যাপক দেবেন্দ্রনাথ দাসের সঙ্গে। কৃষ্ণভামিনী তাঁর স্বামীর সঙ্গে ইংলন্ডে যান এবং চোদ্দ বছর সেখানে বাস করেন। সেই অভিজ্ঞতা থেকে লিখেছিলেন 'ইংলন্ডে বঙ্গমহিলা' (১৮৮৫) নামক গ্রন্থ।

এই গ্রন্থটি কৃষ্ণভামিনী অতি যত্ন সহকারে রচনা করেছিলেন। সমগ্র পুস্তকের পৃষ্ঠা-সংখ্যা হল ৩০৯ এবং কুড়িটি অধ্যায়ে বিভক্ত। 'পূর্বকথা'য় প্রকাশক সত্যপ্রসাদ সর্বাধিকারী তাঁর মতামত প্রকাশ করেছেন। লেখিকা গ্রন্থের সূচনায় কৈফিয়ত দিয়েছেন, কেন তিনি সেটি বচনা করলেন। তিনি লিখেছেন (পৃ. ১)—"আমি গ্রন্থকর্ত্রী নাম পাইবার বা নিজের বিদ্যাবুদ্ধি প্রকাশ করিবাব অভিলাষে এই পুস্তক লিখিতে আবম্ভ করি নাই; অনেক নূতন দ্রব্য দেখিয়াছি এবং তদ্দর্শনে আমার মনে অনেক নূতন ভাবের উদয় হইয়াছে কেবল সেইগুলি অবকাশমতো সরলভাষায় যথাসাধ্য পরিষ্কার রূপে বর্ণনা করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতেছি।" কৃষ্ণভামিনী তাঁর বর্ণনা শুরু করেছেন তিনি কী ভাবে ইংরেজীপোশাকে সজ্জিত হয়ে মাথায় টুপি দিয়ে ২৬ সেপ্টেম্বর রাত্রি সাড়ে আটটায় স্বামীর সঙ্গে উপস্থিত হলেন হাওড়া স্টেশনে বোম্বাই যাবেন বলে। সেখান থেকে জাহাজে উঠলেন। যাবার সময় মনে যে বেদনা উপস্থিত হয়েছিল 'বিদায়' নামক কবিতা রচনা করে তা ব্যক্ত করেছেন। এর পর পথে ইটালী, ফ্রান্স ইত্যাদি অনেক দেশ অতিক্রম করে অবশেষে ইংলন্ডের ডোভারে গিয়ে উপস্থিত হলেন। প্রকাণ্ড লন্ডন শহরের বর্ণনা আছে (৬ষ্ঠ অধ্যায়), মহারানী ভিক্টোরিয়ার সম্পর্কে অনেক কথা বলেছেন (৮ম অধ্যায়), লন্ডনের ভূগর্ভ রেল দেখে বিস্মিত হয়ে লিখেছেন: (নবম অধ্যায়,পৃ. ১৩৩), "লন্ডনে একটা 'আন্ডার গ্রাউন্ড রেলওয়ে' অর্থাৎ মাটির নীচের কলের গাড়ী আছে; উহা ক্রমাগত রাস্তার নীচে, অনেক স্থানে বাড়ীর নীচে, কেবল মাটির ভিতর দিয়া ঘুরিয়া লন্ডন প্রদক্ষিণ কবে। এরূপ আশ্চর্য রেলওয়ে আর কোন দেশে নাই।" আবার বলেছেন তিনি এই গাড়ি চড়ে তেমন সুখ বা আমোদ অনুভব করেন নি। ইংরেজ মহিলাদের সম্পর্কে তাঁর নিজের ধারণার কথা বলেছেন (দশম অধ্যায়, পৃ. ১৩৯)— "ইংরাজ স্ত্রীলোকেরা সর্বগুণ সম্পন্ন না হইলেও ইহাদেব অনেকগুলি সদ্গুণ আছে।" এই অধ্যায়ের শেষে তিনি পঞ্চদশ স্তবকে রচিত একটি কবিত দিয়েছেন এবং আক্ষেপ

প্রকাশ করেছেন—

"য়ুরোপ দেশেতে যাইরে যথায়,
দেখি নারীগণ পুরুষের প্রায়,
কিন্তু বিপরীত দুর্ভাগ্য ভারতে
মহিলারা সদা পদানত হায় !"

(চতুর্থ স্তবক, পৃ. ১৫৭)

পরবর্তী জীবনে তিনি সমাজসেবামূলক কাজে আত্মনিয়োগ করে ভুলতে চেয়েছিলেন একমাত্র কন্যা তিলোত্তমা ও স্বামীকে হারানোর ব্যথা। পর্দানসীন মেয়েদের শিক্ষাদানের ব্রত গ্রহণ করেছিলেন তিনি। স্কুল কলেজে না গিয়েও তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁরই উদ্যোগে 'ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের' তিনটি শাখা স্থাপিত হয় কলকাতায়। তিনি একটি 'বিধবা আশ্রম' (১৯১৬) গড়ে তুলেছিলেন।

হেমলতা সরকার

বিখ্যাত নারীহিতৈষী ও সমাজ-সংস্কারক মনীষী শিবনাথ শাস্ত্রীর কন্যা ছিলেন হেমলতা। তাঁর স্বামী ছিলেন চিকিৎসক বিপিনবিহারী সরকার। স্বামীর সঙ্গে তিনি নেপালে গিয়ে কিছুকাল বসবাস করেন। সেই অভিজ্ঞতা থেকে বচিত হয় 'নেপালে বঙ্গনারী' গ্রন্থটি।

হেমলতা দেবী প্রথম 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রবন্ধাকারে নেপাল সম্পর্কে আলোচনা করেন। পরে তিনি 'নেপালে বঙ্গনারী' নামে পুস্তক রচনা করেন (১১৫ পৃষ্ঠা) এবং ১৯১২ খ্রীস্টাব্দে সেটি প্রকাশ করেন। প্রকাশক ছিলেন গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়। দুটি পর্যায়ে গ্রন্থটি বিভক্ত। প্রথম পর্যায়ে লেখিকা নেপালযাত্রা, কাটমাণ্ডু, নেপালের অধিবাসী, প্রধান তীর্থ পশুপতিনাথ, বৌদ্ধধর্ম, বৌদ্ধমন্দির, পূজা-পার্বণ, জাতীয় উৎসব ইত্যাদি নিয়ে লিখেছেন। দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচ্য বিষয় হল— নেপালের প্রাকৃতিক বিবরণ, কয়েকটি প্রসিদ্ধস্থান, পুরাবৃত্ত, গুর্খা বিজয়, নেপালের আদর্শ সতী স্বর্গীয়া বড় মহারানীর কথা প্রভৃতি। গ্রন্থের শুরুতে সুরসিকা লেখিকা বলেছেন (পৃ. ১-২), "তখন কাটমাণ্ডু পড়িলেই শিহরিয়া উঠিতাম। কাটমাণ্ডুতে গেলে বুঝি কেহ আর মুণ্ড ফিরিয়া পায় না। না জানি সে কি ভীষণ রাজ্য। ...নেপাল প্রত্যাবৃত্ত সাক্ষাৎ মানব দেখিলাম, কৈ মুণ্ড তো যায় নাই বরং কিছু লাভ হইয়াছে। তখন কাটমণ্ডু ভীতি কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইল। কিন্তু তখনও ভাবি নাই যে সেই কাটমণ্ডুতে একদিন আসিতে হইবে।" সেকালে তাঁকে কত কষ্ট করে কার্পেটমোড়া দোলায় চড়ে যেতে হয়েছিল, তার বর্ণনা দিয়েছেন।

আজীবন তিনি শিক্ষা প্রচার ও প্রসারের কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। দার্জিলিঙের 'মহারাণী স্কুল' প্রতিষ্ঠায় হেমলতা ছিলেন অন্যতমা উদ্যোক্তা। কলিকাতা পৌরসভার ইনি ছিলেন প্রথম মহিলা সদস্যা। পিতার জীবনচরিত রচনা

করেন 'শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবনচরিত' নামে। তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থ 'মিবার গৌরব কথা' 'তিব্বতে তিন বৎসর' ইত্যাদি।

ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্রী ও সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর কন্যা ইন্দিরার ছিল বহুমুখী প্রতিভা। শিক্ষায়, সংগীতে, পত্রিকা-পরিচালনায় তিনি যেমন কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, তেমনি মননধর্মী মৌলিক প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রেও তাঁর দান কম নয়। 'নারীর উক্তি' (১৯২০) প্রবন্ধ গ্রন্থটি তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য রচনা। এখানে সাহিত্যিক গুণপনা-সম্পন্ন সাতটি ছোটোবড়ো রচনা স্থান পেয়েছে। তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে 'বাংলার স্ত্রী আচার', 'রবীন্দ্রস্মৃতি' 'পুরাতনী' প্রভৃতি গ্রন্থ। স্বর ও সুরের সাধনার সঙ্গে তিনি সংগীত- বিষয়ক গ্রন্থও লিখেছেন। 'হিন্দু সঙ্গীত' গ্রন্থটি তাঁর স্বামী প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে একত্রে রচিত। সংগীত সম্পর্কিত তাঁর অপর গ্রন্থ 'রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণী সঙ্গম'। ইংরেজী ও ফরাসি ভাষা তিনি মাতৃভাষা বাংলার মতো আয়ত্ত করেছিলেন। অনুবাদকার্যেও ইন্দিরা ছিলেন সুদক্ষ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর সাহিত্যপ্রতিভাকে স্বীকৃতি দেন— 'ভুবনমোহিনী স্বর্ণপদক' (১৯৪৪) দান করে। বিশ্বভারতী তাঁকে 'দেশিকোত্তম' উপাধি (১৯৫৭) দান করে সম্মান প্রদর্শন করেন। ইনিই সর্বপ্রথম 'রবীন্দ্র পুরস্কার' (১৯৫৯) লাভ করেন।

অনিন্দিতা দেবী

'বঙ্গনারী' এই ছদ্মনামে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় সামাজিক, পারিবারিক নানা সমস্যা এবং নারীজীবনের নানা দিক নিয়ে যিনি বহুসংখ্যক প্রবন্ধ প্রকাশ করে গেছেন দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে, তিনিই হলেন অনিন্দিতা দেবী (চক্রবর্তী)। যে-সকল পত্রিকায় তাঁর রচনা প্রকাশিত হয়েছে সেগুলি হল 'ভারতী', 'বিজলী', 'নব্যভারত', 'বিচিত্রা', 'প্রাচী', 'উত্তরা', 'বঙ্গলক্ষ্মী', 'জয়শ্রী', 'উদয়ন', 'শঙ্খ', 'অলকা', 'শ্রেয়সী', 'কল্লোল', 'রূপ ও রীতি' প্রভৃতি। তাঁর জীবিতকালে একটি মাত্র প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশিত হয় ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে 'আগমনী' নামে। এখানে তিনি 'বঙ্গনারী' ছদ্মনামই ব্যবহার করেছিলেন এবং পঁয়তাল্লিশটি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছিল। বর্তমানে তাঁর ৫৯০ পৃষ্ঠা সংবলিত রচনা-সংকলন প্রকাশিত হয়েছে (১৯৯৭)।

বঙ্গদেশের এক শিক্ষিত, রুচিশীল পরিবারে অনিন্দিতা দেবী জন্মগ্রহণ করেন১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে। ছেলেবেলা থেকেই লেখাপড়ার প্রতি ছিল তাঁর তীব্র আকর্ষণ এবং অল্প বয়স থেকেই লেখালেখি শুরু করেন। বিবাহোত্তর জীবনেও তা অব্যাহত ছিল। গল্প বা কবিতা রচনা না করে, একান্তভাবে প্রাবন্ধিক রূপেই তিনি তাঁর পরিচয় রেখে গেছেন। এই সব রচনায় প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর যুক্তি, বুদ্ধি ও মননের পরিচয়। উদাহরণস্বরূপ সামান্য উদ্ধৃতি তুলে ধরা হল।

"ভালো মা ও স্ত্রী হওয়া যে মেয়েদের উচিত সে বিষয়ে কাহারো সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা

হইলেই কি কাহারও 'graduate' হওয়া বা 'learned proffesion'-এ যাওয়া অন্যায় হইবে' সকল মেয়ের পক্ষে ঠিক এক আদর্শ কখনই খাটিতে পারে না কারণ সকলের শক্তি, সামার্থ্য, ইচ্ছা, প্রকৃতি ও প্রয়োজন এক রকম নহে।"

'নারীপ্রচেষ্টা' পর্যায়ের 'শিক্ষা এবং মাতা ও পত্নীর আদর্শ' নামক প্রবন্ধ।

পৃ. ১৩৮। 'অনিন্দিতা দেবীর রচনা সংকলন', দে'জ পাবিলিশিং, ১৯৯৭

অনিন্দিতা দেবীর স্বামী দ্বিজেশচন্দ্র ছিলেন আসাম-গৌরীপুরের জমিদারের দেওয়ান। তাঁদের তিনপুত্র ও এক কন্যা ছিল। দ্বিতীয় অমিয় চক্রবর্তী ছিলেন রবীন্দ্রত্তোর যুগের বিখ্যাত কবি।

আজীবন অনিন্দিতা দেবী শোকেতাপে জর্জরিত হয়েছেন এবং রোগজীর্ণ শরীর নিয়েও ছিলেন বিব্রত। শেষজীবনে পুরীতে সমুদ্রতীরবর্তী নিজস্ব গৃহ 'আরুণি'তে অবস্থান করেন এবং সেখানেই তাঁর জীবনাবসান হয ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দে।

হরিপ্রভা তাকেদা

হরিপ্রভা জন্মগ্রহণ করেন ঢাকায়। পিতার নাম শশিভূষণ মল্লিক। ইনি সেকালে এক জাপানি ভদ্রলোক ওয়েমন তাকেদাকে বিবাহ (১৯০৭) করেন, তেরো বছর বয়সে। স্বামীর সঙ্গে জাপানে গিয়ে বেশ কিছুকাল ছিলেন সেখানে। সেই অভিজ্ঞতার স্মৃতি বহন করে প্রকাশিত হয় 'জাপান যাত্রীর চিঠি" (সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত) এবং 'বঙ্গমহিলার জাপান যাত্রা' গ্রন্থ। ইনি আরও দু-একটি গ্রন্থ রচনা করেন–– 'আশাচন্দ্র ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন' ও 'সাধ্বী জ্ঞানদেবী'।

উনিশ শতকের আরও অনেক মহিলা তাঁদের স্মৃতিকথা বা আত্মজীবনীমূলক রচনা লিখে গেছেন, তাঁদের সকলের পরিচয় দেওয়া এখানে সম্ভব নয়। কয়েকজনের নাম ও গ্রন্থের উল্লেখ মাত্র করা হল। যেমন— প্রতিমা দেবীর (১৮৯৩-১৯৬৯) 'স্মৃতিচিত্র', মীরা দেবীর (১৮৯৪-১৯৬৯) 'স্মৃতিকথা'; হেমন্তবালা দেবীর (১৮৯৪-১৯৭৬) 'পুরাণো দিনের কথা'; পূর্ণিমা দেবীর (১৮৯৫-১৯৮০) 'ঠাকুরবাড়ির গগন ঠাকুর', সাহানা দেবীর (১৮৯৭-১৯৯০) 'স্মৃতির খেয়া' প্রভৃতি।

ঙ. নাটক-রচয়িত্রী বঙ্গমহিলা

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বঙ্গরঙ্গমঞ্চে অভিনয় উপযোগী বাংলা নাটকের অভাব মোচনের জন্যই প্রধানত বাংলা নাটক রচনার সূত্রপাত ঘটে। বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য শাখাগুলির তুলনায়, নাটকের শাখাটি ছিল নবীন এবং অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও অপরিণত। পর পর কয়েকজন শক্তিশালী নাট্যকারের অবির্ভাবে অল্প সময়ের মধ্যে এই ধারাটি কিছু পরিমাণে পরিণতি লাভ করে; এঁরা হলেন মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পরম বিস্ময় ও গৌরবের বিষয় হল এই যে, বাংলা নাটকের প্রথম যুগেই কয়েকজন মহিলা নাট্যকারের আবির্ভাব ঘটেছিল। অথচ মহিলা সাহিত্যিকরা এ সময় সংখ্যায় ছিলেন অল্প এবং

গুণগরিমায় নগণ্য। তার প্রধান কারণ সেকালে লেখাপড়ার চর্চা ও সাহিত্য রচনা ছিল মেয়েদের পক্ষে নিন্দনীয় কর্ম। সেই প্রচলিত বিশ্বাসকে লঙ্ঘন করেছিলেন, একালের মহিলা নাট্যকাররা। প্রথম পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য নাটক-রচয়িত্রী ছিলেন দুজন: কামিনীসুন্দরী দেবী ('দ্বিজতনয়া') ও সুকুমারী দত্ত ('গোলাপ')। এঁদের রচনা ছাড়াও আরও অনেক মহিলা নামাঙ্কিত নাটক পাওয়া যায়, কিন্তু পরীক্ষা করে গবেষকরা বলেছেন তার অধিকাংশই ছিল বেনামিতে পুরুষেরই রচনা।[৩৬] উনিশ শতকের মহিলা লেখিকাদের মধ্যে কবিতা ও গল্প উপন্যাস লেখাব ঝোঁক যতটা ছিল, নাটক লেখায় তেমন উৎসাহ ছিল না।

কামিনীসুন্দরী দেবী ('দ্বিজতনয়া')

ইনিই বাংলাসাহিত্যে প্রথম মহিলা নাট্যকারের গৌরবময় পদবীটি অধিকার করে আছেন। কামিনীসুন্দরী ছিলেন শিবপুর অঞ্চলের অধিবাসিনী, এর বেশি তাঁর জীবন সম্পর্কে কোনো তথ্য জানা যায় না। তিনটি নাটক ছাড়া তিনি বালিকাদের পাঠোপযোগী একটি পাঠ্যপুস্তকও রচনা করেছিলেন 'বালা-বোধিকা' (১৮৬৮) নামে। তাঁর সম্পর্কে আরও একটি বড়ো খবর হল, তিনি ছিলেন গিরিশ-পূর্ব যুগের মহিলা নাট্যকার। এই সময়কার পুরুষ নাট্যকারদের রচনাগুলির ঐতিহাসিক মূল্য ভিন্ন— সাহিত্যিক মূল্য তেমন নেই। যেমন যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত বা জে. সি. গুপ্ত ('কীর্তি বিলাস' ১৮৫২), তারাচরণ শিকদার ('ভদ্রার্জুন' ১৮৫২), হবচন্দ্র ঘোষ (১৮১৭-৮৪) প্রভৃতির নাম করা যায়। মাইকেল মধুসূদন দত্ত এই সময় বেশ কয়েকটি নাটক ও প্রহসন রচনা করেছিলেন, কিন্তু কবি হিসাবে তিনি আধুনিক কাব্যধারাব স্রষ্টা হলেও, নাটকের ক্ষেত্রে তাঁর প্রভাব সুদূরপ্রসারী ছিল না। 'নাটুকে রামনারায়ণ' বা রামনারায়ণ তর্করত্ন (১৮২২-৮৬) 'কুলীন কুলসর্বস্ব' (১৮৫৪) কিংবা 'নব নাটক' লিখে সাড়া জাগালেও, বিষয়বস্তুর অভিনবত্বই তার কারণ, নাট্যগুণ নয়। এমন-কি দীনবন্ধু মিত্রের (১৮৩০-৭৩) 'নীলদর্পণ' (১৮৬০) নাটকের প্রকৃত খ্যাতিও তার বিষয়বস্তুর মহিমা। এই রকম সময় বাংলা নাট্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে মহিলা নাট্যকার কামিনীসুন্দরী দেবীর আত্মপ্রকাশ ঘটল। তিনি তিনটি পৌরাণিক নাটক রচনা ও প্রকাশ করেন। এই সময়ে পৌরাণিক নাটকের যথেষ্ট চাহিদা ছিল এবং নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষই পৌরাণিক নাটক রচনায় সর্বাপেক্ষা কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। 'দ্বিজতনয়া' এই ছদ্মনামে কামিনীসুন্দরী দেবীর রচিত নাটকগুলি হল—

১। 'উর্বশী নাটক' (১৮৬৬) পৃ. ৮৫ (জৈমিনী সংহিতার দণ্ডীপর্ব অনুকরণে রচিত)।

২। 'রামের বনবাস নাটক' (দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৭৭) (বাল্মীকি রামায়ণ অনুকরণে রচিত করুণ রসাত্মক নাটক)।

৩। ঊষা নাটক (১৮৭১)

সেকালে অনেক সময় মহিলার ছদ্মনামে গ্রন্থ রচনা করে পুরুষরা সহজে যশোলাভ ও দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। কিন্তু 'দ্বিজতনয়া' অর্থাৎ কামিনীসুন্দরী দেবী যে, সেই জাতীয় কোনো জাল

ব্যক্তি নন তার সাক্ষ্য ও প্রমাণ পাওয়া যাবে 'রহস্য সন্দর্ভ' পত্রিকায়। সেখানে লেখা হয়েছিল (তৃতীয় পর্ব, ৩১ খণ্ড, পৃ. ১১২)— "সম্প্রতিকার প্রকাশিত একখানি স্ত্রী রচনার প্রতি সাধারণের সন্দেহ হইয়াছে বলিয়া ইহা বক্তব্য যে প্রস্তাবিত পুস্তক প্রকৃত দ্বিজতনয়াব বচনা বটে, তদ্বিষয়ে কলেজের একজন অধ্যাপক সাক্ষ্য দিয়াছেন, অতএব তাহার সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।" ৩৭

'উর্ব্বশী নাটকে' লেখিকার আবেগধর্মী ও কল্পনাপ্রবণ মনের পরিচয় পাওয়া যায়। গদ্য সংলাপ প্রধান হলেও, সেকালের রীতি অনুযায়ী মাঝে মাঝে কাব্য সংলাপ ও সংগীতের ব্যবহার আছে। সবসুদ্ধ নয়টি গান ও পাঁচটি কবিতা আছে। চরিত্র চিত্রণের ক্ষেত্রে উর্বশী ও অবন্তীরাজ দণ্ডীই প্রধান । চারি অঙ্ক (অমবাবতী, দ্বারাবতী. দ্বারাবতী ও হস্তিনাপুরী)--সমন্বিত নাটক। 'বিজ্ঞাপন' অংশে লেখিকা বলেছেন— "দণ্ডীপুবাণের বৃত্তান্তে উর্ব্বশী ও দণ্ডীরাজাই প্রধান। আমিও নাটকে তাঁহাদিগেরই প্রাধান্য রাখিয়াছি।" এখানে তিনি নাটকের মূল্যায়নের ভার দিয়েছেন পাঠকদের উপর। তিনি লিখেছেন ('বিজ্ঞাপন')— "এই নাটকে ভূরি ভূরি দোষ আছে, তথাপি আমি ইহাকে পাঠক সমাজে প্রেরণ করিলাম। আমি অশিক্ষিত অবলা, এই আমার প্রথম বচনা এই কথা বলিয়া পাঠকগণের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতে সাহসী হই না। গ্রন্থ মাত্রেই নিজগুণে পরিচিত হয়, গ্রন্থকারের অবস্থা বিবেচনা করিয়া হয় না। পাঠক সমাজ অপক্ষপাত বিচারপতি সদৃশ।" ইত্যাদি

নাটকের কাব্য সংলাপের সামান্য উদাহরণ—

উর্ব্বশী রাজার বিরহে অস্থির হয়ে বলেছেন—

(গীত)

"তোমারি অধীনী আমি, গুণমণি জান মনে।
বিনা দেখা প্রাণসখা, বিচ্ছেদে বাঁচি কেমনে ॥
নিতান্ত তব আশ্রিতা, যেন মীন জলাশ্রিতা,
চকোরিণী হরষিতা, সুধাকর দরশনে।
চাতকিনী ঘন ঘন, চাহে যেন নব ঘন,
তেমতি হে প্রাণধন,
সদা ভাবি মনে মনে।"

উর্বশীর এই সকাতর প্রেম নিবেদনে দণ্ডীরাজার উত্তর—

(গীত)

"তোমাকে যে ভালবাসি, প্রেয়সি কি তা জান না।
গেল রাজ্য, সে ঐশ্বর্য, তাহে করি না ভাবনা।
যাবত রব জীবনে, হব সুখী তব সনে,
অভিলাষ ছিল মনে, পূরিল না সে বাসনা।

নিরাশ হইনু যদি, যদি বিধি প্রতিবাদী,
তবে আর কারে সাধি কে নাশিবে এ যাতনা।" ইত্যাদি

(৩য় অঙ্ক, পৃ. ৪১)

গদ্য সংলাপের উদাহরণ—

"রাজা। শশিমুখি, আমি সহজে তোমাকে কি ত্যাগ করতে চাইলেম।
উর্ব। না মহারাজ। আমার জন্যই তোমার এ বিপদ।
রাজা। এ বিপদকে আমি ভয় করি না,
আমার রাজত্ব যাক্, আর সর্ব্বস্বই যাক্।"

(পৃ. ৪১)

সুকুমারী দত্ত ('গোলাপ')

বাংলা সাহিত্যে ইনি প্রথম নটী ও নাটক-রচয়িত্রী। এঁর রচিত নব্বই পৃষ্ঠা ব্যাপী নাটকের নাম —'অপূর্ব সতী' (১৮৭৫)। এই নাটক রচনায় তাঁকে সহযোগিতা করেন আশুতোষ দাস নামে এক ব্যক্তি। নাটকটির বিষয়বস্তু— নলিনী নামে এক পতিতা কন্যার প্রেমনিষ্ঠা। শিক্ষার আলোক পেয়ে তার মনের আমূল পরিবর্তন ঘটল। নলিনী ভালোবাসল সুবর্ণপুরের জমিদারপুত্র চন্দ্রকেতুকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিফল মনোরথ হয়ে আত্মহত্যা করল নলিনী। সংক্ষেপে এই হল কাহিনী। এর সঙ্গে কিছু পরিমাণে লেখিকার ব্যক্তিজীবনের কথা মিশে আছে।

পূর্বে সুকুমারীর নাম ছিল 'গোলাপকামিনী'। উপেন্দ্রনাথ দাস রচিত 'শরৎসরোজিনী' নাটকে ইনি নায়িকা সুকুমারীর ভূমিকায় চমৎকার অভিনয় করেছিলেন। তারপর অভিনেতা গোষ্ঠবিহারী দত্তের সঙ্গে তাঁর বিবাহ (১৮৭৫) হয়। তখন থেকেই ইনি গোলাপকামিনীর পরিবর্তে সুকুমারী দত্ত নামে পরিচিত হলেন।

অভিনেত্রী-রচিত এই 'অপূর্ব সতী' নাটকটি মঞ্চস্থ করা হয় 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে (১৮৭৫, ২৩ আগস্ট)।

এই সময়কার আরও কয়েকটি নারী-নাট্যকার রচিত নাটকের সন্ধান পাওয়া যায়, যেমন—

লক্ষ্মীমণি দেবী –রচিত 'চির সন্ন্যাসিনী' (১৮৭২)(গার্হস্থ্য নাটক);
'জনৈক ভদ্র মহিলা প্রণীত'— ত্র্যঙ্ক 'সন্তাপিনী নাটক' (১৮৭৬);
'শ্রীমতী' স্বর্ণলতা –রচিত 'শূরবালা সুরবালা' (১৮৭৮);
নয়নতারা দে-রচিত 'মণিমোহিনী' (১২৮৬ বঙ্গাব্দ);
মণিমোহিনী -রচিত 'বিনোদকানন' (১৮৮৪);
প্রফুল্লনলিনী দাসী-রচিত 'ষষ্ঠী বাঁটা প্রহসন' (১২৮৪ বঙ্গাব্দ) ইত্যাদি।

এই সময়কার নারী রচিত যাত্রাপালাও পাওয়া যায় :

তরঙ্গিণী দাসী-রচিত 'সুগ্রীব-মিলন যাত্রা' (১৮৭৮)। [৩৮]

দ্বিতীয় পর্যায়ের মহিলা নাট্যকাররা প্রায় সকলেই ছিলেন সুপ্রতিষ্ঠিতা কবি অথবা কথা-সাহিত্যিক। তাঁরাই অন্যান্য রচনার সঙ্গে কয়েকটি নাটকও লিখেছিলেন। এখানেও প্রথমে স্বর্ণকুমারী দেবীর নামই উচ্চারণ করতে হবে।

স্বর্ণকুমারী দেবী

সাহিত্যের সকল ক্ষেত্রেই বিচরণ করেছেন স্বর্ণকুমারী। তাঁর রচিত কয়েকটি উন্নত ধরণের নাটক— গীতিনাট্য, কাব্যনাট্য ও প্রহসন আছে। তাঁর রচিত নাটকেব একটি কালানুক্রমিক তালিকা দেওয়া হল—

'বসন্ত-উৎসব' (১৮৭৯) গীতিনাট্য।

'বিবাহ-উৎসব' (১৯০১) কৌতুক নাটক।

'দেবকৌতুক' (১৩১২ বঙ্গাব্দ) কাব্যনাট্য।

'কনে-বদল' (১৩১৩) প্রহসন।

'পাকচক্র' (১৩১৮) প্রহসন।

'রাজকন্যা' (১৩১৮)

'যুগান্ত' (১৯১৮) নাট্যকাব্য।

'নিবেদিতা' (১৩২৪)

'দিব্য কমল' (১৯৩০)।

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী রচিত নাটক

'সন্ন্যাসিনী বা মীরাবাই' (১৮৯২)। (ঐতিহাসিক নাট্যকাব্য)

কামিনী রায়

দুটি নাটক লিখেছিলেন—

'অম্বা' (১৯১৫) (নাট্যকাব্য)

'সিতিমা' (১৮১৬) (গদ্য নাটিকা)।

অনুরূপা দেবী

ইনি কয়েকটি নাটক লিখলেও, তাঁর জনপ্রিয় উপন্যাসগুলির নাট্যরূপ দিয়ে রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছিল দীর্ঘকাল ধরে।

নাটক—

'বিদ্যারত্ন' (১৯১৯)
'কুমারিল ভট্ট' (১৯২২)
'নাট্য চতুষ্টয়' (১৯৩৩)।

শৈলবালা ঘোষজায়া

একটি নাটক লিখেছিলেন— 'মোহের প্রায়শ্চিত্ত' (১৯২১)।

অমলা দেবী

ইনি ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের ভগিনী। 'ভিখারিণী' (১৯১১) নামে একটি নাটক লিখেছিলেন তিনি।

এই ভাবে আরও অনেকের নাম করা যায়।

চ. শিশু-সাহিত্য রচনায় বঙ্গনারী

শিশুদের মনের মতো করে সাহিত্য রচনার প্রয়োজন আছে, এই চেতনাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে শিশু ও কিশোরদের পাঠোপযোগী সাহিত্য রচনা যাঁরা করেছেন, তাঁদের সংখ্যা বেশি নয়। শিশু-সাহিত্য বলতে ঠিক যে জাতীয় গ্রন্থ বোঝায়, গত শতাব্দীতে সে বিষয়ে সচেতন মন নিয়ে খুব বেশি বই লেখা হয় নি। যদিও গবেষকরা বলেন যে, মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শিশুপাঠ্য গল্প গ্রন্থ রচিত হয়েছে। সেটি হল—"নীতিকথা" (১৮১৮)।

কলিকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় যে-সব বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়, সেখানে পড়ানোর উপযোগী পাঠ্যপুস্তক রচনার জন্য 'স্কুল বুক সোসাইটি' (১৮১৭) স্থাপন করা হয়। এই সংস্থার সহযোগিতায় এবং রাধাকান্ত দেব, তারিণীচরণ মিত্র এবং রামকমল সেনের যৌথ উদ্যোগে এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এখানে আছে আঠারোটি নীতিকথামূলক গল্প। পরবর্তীকালে যাঁদের সযত্ন ও সচেতন প্রয়াসে ধীরে ধীরে প্রকৃত শিশুরঞ্জন সাহিত্যের ধারাটি পরিপুষ্টি লাভ করে তাঁরা হলেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রভৃতি।

সেইসঙ্গে শিশু সাহিত্যের আসরে মহিলাদের দানকে কোনো ক্রমেই অস্বীকার করা যাবে না। তার কারণ চিরকাল ধরে ঠাকুরমা, দিদিমা, মা, পিসিমা, মাসিমা, দিদি এঁরা সব মুখে মুখে গল্প বলে, ছড়া শুনিয়ে শিশুদের মনোরঞ্জন করে এসেছেন। তাই প্রত্যক্ষভাবে প্রথমযুগে শিশু সাহিত্য রচনা না করলেও, এক্ষেত্রে নারীদের অবদান আছে, এ কথা মানতেই হবে। "ঠাকুরমার ঝুলি'র (দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার —সম্পাদিত) মতো আরও যে-সব রূপকথা, উপকথা জাতীয় গল্প সংকলন করা হয়েছে, তা অধিকাংশ নারীদেরই সৃষ্টি। তার প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়া যাবে গল্পগুলির বিষয়বস্তু, কাহিনী, বাগ্‌ভঙ্গি, ছড়া ইত্যাদির মধ্যে। নারীমনের নিবিড় সংযোগ অনুভব

করা যায় এইসব গল্পে। তা হলেই বুঝতে পারা গেল হাতে-কলমে না হলেও, দীর্ঘকাল ধরে শিশুর মন ভোলানোর দায়িত্ব পালন করে এসেছেন মেয়েরাই।

যখন থেকে একক প্রচেষ্টায় শিশু সাহিত্য রচনা আরম্ভ হল, তখন দেখা গেল মৌলিক গ্রন্থ ভিন্ন, অনুবাদের প্রাচুর্য। সংস্কৃত, ইংরেজী, হিন্দী বা অন্যান্য প্রাদেশিক অথবা বিদেশী ভাষা থেকে শিশুদের উপযোগী নানা গল্প কবিতা ছড়া বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

স্বর্ণকুমারী দেবীকে আধুনিক বাংলা মহিলা সাহিত্যিকদের মধ্যে অগ্রগণ্যা বলা হয়। মহিলাদের মধ্যে তিনিই প্রথম শিশুদের উপযোগী গ্রন্থ রচনা করেছেন 'গল্প-সল্প' (১৮৯২) ১ম ও ২য় ভাগ।

সেকালের বিশিষ্ট মহিলা লেখিকারা যেমন, গিরীন্দ্রমোহিনী দত্ত, কামিনী রায়, মানকুমারী বসু প্রভৃতি সকলেই কয়েকটি করে শিশুপাঠ্য গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

বিশেষভাবে শিশু সাহিত্য রচনার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন জ্ঞানদানন্দিনী দেবী (১৮৫৫ ১৯৪১)। ইনি লিখেছিলেন দুখানি নাটিকা—'টাক্‌ডুমাডুম্ ডুম্' (১৯৩০) ও 'সাত ভাই চম্পা' (১৯১১)।

হেমলতা দেবী ছোটোদের জন্য দুটি গল্প গ্রন্থ লেখেন—'দুপাতা' ও 'মাসিমা' (১৯১৩)। সীতা দেবী ও শান্তা দেবী দু বোনে মিলে রচনা করেন 'হিন্দুস্থানী উপকথা' (১৯৩৮) ও 'সাতরাজার ধন'। এ ছাড়া শান্তা দেবী রচনা করেন 'হুক্কাহুয়া' (১৯৫৭) ও সীতা দেবী রচনা করেছিলেন কয়েকটি গল্পগ্রন্থ—'আজব দেশ' (১৯৫৬), 'কথা সপ্তক' (১৯৩৮), 'তিনটি গল্প' ও 'নিরেট গুরুর কাহিনী'। সরলবালা সরকার-রচিত গল্প গ্রন্থ—'পিন্‌কুর ডাইরি' (১৯৬১) এবং প্রিয়ম্বদা দেবীর রচিত গল্প 'অনাথ' (১৯১৫)।

সুখলতা রাও (১৮৮৬-১৯৬৯) বিশেষ করে ছোটোদের জন্য লিখেছিলেন—'আরো গল্প', 'আলিভুলির দেশে' (গল্প), 'খোকা এল বেড়িয়ে' (গল্প), 'গল্প আর গল্প', 'দুই ভাই' (গল্প), 'নতুন ছড়া', 'নানা গল্প', 'বিদেশী ছড়া' ও 'সোনার ময়ূর' (গল্প)। শৈলবালা ঘোষজায়া ছোটোদের জন্য দুটি গল্প গ্রন্থ লেখেন—'জয় পতাকা' (১৯৫৪) ও 'রঘু সর্দার'।

পুণ্যলতা চক্রবর্তী (১৮৯০-১৯৭৪) ছিলেন বিশেষভাবে শিশু সাহিত্যিক। তিনি অনেক লিখলেও, গ্রন্থাকারে পাওয়া যায়, দুটি গ্রন্থ—'ছেলেবেলার দিনগুলি' ও 'ছোট ছোট গল্প'।

সুরুচিবালা সেন ছোটোদের জন্য কাব্যাকারে ইতিহাস লিখেছিলেন—'ছন্দে পুরাতনী' (১৯০৬)। সন্ধান করলে একালে রচিত এমনি আরও অনেক মহিলা-রচিত শিশুপাঠ্য গ্রন্থের কথা জানা যাবে। সেই কারণে বলা যায়, শিশু সাহিত্য সম্ভারে মহিলা সাহিত্যিকদের সংযোজন নেহাত কম নয়।

শিশু-সাহিত্য পত্রিকা

এইসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে যে, প্রথম মহিলাদের মধ্যে শিশুদের উপযোগী 'বালক' পত্রিকা (১৮৮৫) প্রকাশ ও সম্পাদনা করেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িব সুযোগ্য সম্পাদিকা জ্ঞানদানন্দিনী দেবী। প্রথম দিকে বড়োদের পত্রিকায়, ছোটোদের জন্য নির্দিষ্ট কয়েকটি পাতা থাকত। পরে স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত হয় কয়েকটি ছোটদের পত্রিকা—'বালকবন্ধু' (১৮৭৮)—সম্পাদক ছিলেন কেশবচন্দ্র সেন; 'সখা' (১৮৮৩) সম্পাদক প্রমদাচরণ সেন, 'সাথী' (১৮৯৩) সম্পাদক ভুবনমোহন রায়; 'মুকুল' (১৮৯৫) সম্পাদক শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি। উপসংহারে বলা যায় উনিশ শতকের লেখিকারাই মহিলা-রচিত শিশু সাহিত্যের সূচনা করেন।

ছ. পত্রিকা সম্পাদনায় বঙ্গনারী

বাংলা সাময়িক পত্রিকার ইতিহাস খুব প্রাচীন নয়। কিন্তু এদেশের নারী জাগবণের ক্ষেত্রে এই সব পত্র-পত্রিকার একটি বিশেষ স্থান আছে। ইংরেজের আগমন ও বাংলা মুদ্রাযন্ত্রের প্রবর্তনেব সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় সাময়িক পত্রিকার আবির্ভাব ঘটেছে। প্রথম দুটি বাংলা সাময়িক পত্রিকা—'দিগ্‌দর্শন' (১৮১৮) ও 'সমাচার দর্পণ' (১৮১৮) প্রকাশিত হয় শ্রীবামপুর মিশন থেকে। তাব কিছুদিন পরেই যেন বাংলা পত্র-পত্রিকার বান ছুটে এল। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে, বিচিত্র ধরণের সব পত্রিকা প্রকাশিত হতে লাগল। কিছুকাল পবে (১৮৭০) দেখা গেল মহিলাব সম্পাদনায় প্রকাশিত পত্রিকা।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি কয়েকজন নারীহিতৈষী ব্যক্তি নারীদের শিক্ষাব উপযোগী কয়েকটি পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। যেমন প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার-সম্পাদিত 'মাসিক পত্রিকা' (১৮৫৪, আগস্ট)। তাব কিছুদিন পরে প্রকাশিত হল—উমেশচন্দ্র দত্ত –সম্পাদিত 'বামাবোধিনী পত্রিকা' (মাসিক ১৮৬৩) ও দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'অবলাবান্ধব' (পাক্ষিক, ১৮৬৯ মে)। অনুরূপ আর কয়েকটি পত্রিকার নাম জানা যায়—রেভাবেন্ড এস. সি. ঘোষ-সম্পাদিত 'জ্যোতিরিঙ্গণ' (মাসিক, ১৮৬৯ জুলাই)। 'নাবী-শিক্ষা পত্রিকা' (মাসিক, ১৮৭০ অক্টোবর)—ঢাকায় প্রকাশিত। 'বালারঞ্জিকা' (সাপ্তাহিক ১৮৭৩ এপ্রিল)—বরিশাল থেকে প্রকাশিত। 'হেমলতা' (পাক্ষিক, ১৮৭৩ অক্টোবর)। 'বঙ্গমহিলা' (মাসিক, ১৮৭৫ এপ্রিল) ডা. ভুবনমোহন সরকার-সম্পাদিত। 'পরিচারিকা' (মাসিক, ১৮৭৮ মে) ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত।[৪০] আরও পরে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 'দাসী' (১২৯৯ বঙ্গাব্দ) নামে এই জাতীয় একটি পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন।

এই সব পত্রিকাগুলি এদেশের নারীমনের উপর গভীর ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিল। ফলে—'অন্তঃপুরবাসিনীদের জ্ঞানার্জন স্পৃহা উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল, ক্রমশ তাঁহাবা নিজেদের অধিকার ও অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধেও সচেতন হইয়া উঠিলেন। এবিষয়ে

আন্দোলনের ভার তাঁহারা নিজেরাই গ্রহণ করিলেন, দেশে মহিলা-সম্পাদিত সাময়িক পত্রের আবির্ভাব হইল।"[৪১]

উনিশ শতকে বঙ্গ মহিলাদের দ্বারা সম্পাদিত পত্রিকার একটি তালিকা ও বিবরণ নীচে দেওয়া হল :

১. 'বঙ্গমহিলা' (পাক্ষিক, এপ্রিল ১৮৭০)

মহিলা-সম্পাদিত প্রথম বাংলা সাময়িক পত্রিকা। তবে স্বনামে সম্পাদিকার পরিচয় ছিল না। লেখা ছিল 'খিদিরপুর নিবাসিনী জনৈক মহিলা' দ্বারা সম্পাদিত। সম্পাদিকা মোক্ষদাদায়িনী মুখোপাধ্যায়। ইনি উবলিউ. সি. বোনার্জীর ভগিনী। প্রথম যুগের মহিলা সাহিত্যিকরা যেমন সংকোচবশত অনেকেই নাম গোপন করতেন এবং লিখতেন 'জনৈকা বঙ্গ মহিলা' বা 'কুলবালা বিরচিত' ইত্যাদি, এখানেও মনে হয় দ্বিধাবশতই সম্ভবত সম্পাদিকা নিজের নাম গোপন রেখেছিলেন। এই নতুন পত্রিকার আবির্ভাবে খুশি হয়ে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদক লিখেছিলেন (জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯২ শক)—"... একটি হিন্দু স্ত্রী এই পত্রিকার সম্পাদিকা, কলিকাতা প্রাকৃত যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইতেছে। সম্পাদিকা আশা করেন, এখানি বঙ্গদেশের সকল শ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগের মুখ স্বরূপ হইবে। স্ত্রীলোকদিগের স্বত্ব প্রভৃতির সমর্থন করা ইহার উদ্দেশ্য। স্ত্রীলোকের সম্পাদিত সংবাদপত্র এদেশে এই নূতন প্রকাশিত হইল।" ইত্যাদি।[৪২]

২. অনাথিনী (মাসিক পত্রিকা, জুলাই ১৮৭৫)

এই পত্রিকাটি মহিলা-পরিচালিত প্রথম মাসিক যেখানে সম্পাদিকা থাকমণি দেবী, স্বনামে আত্মপ্রকাশ করেছেন। পত্রিকাটির আবির্ভাবে 'এডুকেশন গেজেট' পত্রিকার সম্পাদক ভূদেব মুখোপাধ্যায় লেখেন—"স্ত্রীলোকের দ্বারা সম্পাদিত সাময়িক পত্র এদেশে এই আমরা প্রথম দেখিলাম। পত্রিকাখানি স্ত্রী শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদিগের আনন্দ আহ্লাদের কারণ হইবে।"[৪৩]

৩. হিন্দু ললনা (পাক্ষিক, ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৮)

কোনো এক হিন্দু ললনা দ্বারা সম্পাদিত এই পত্রিকাটি বারাকপুরের নবাবগঞ্জ থেকে প্রকাশিত হত।

৪. ভারতী (জুলাই, ১৮৭৭)

এই পত্রিকাটি প্রথম দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও পরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর পরিচালনা করতেন। পরবর্তীকালে একাধিক মহিলা এই পত্রিকাটি সম্পাদনায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। যেমন স্বর্ণকুমারী দেবী ও তাঁর দুই কন্যা হিরণ্ময়ী দেবী এবং সরলা দেবী। এ ছাড়া শরৎকুমারী চৌধুরানী ছিলেন সম্পাদক মণ্ডলীতে।

৫. পরিচারিকা (মাসিক, ৮ মে ১৮৭৮)

এই স্ত্রীপাঠ্য পত্রিকাটির সম্পাদনার ভার ছিল প্রথম প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের উপর। কয়েক বছর

পরে এটি পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন কেশবচন্দ্র সেনের জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ মোহিনী দেবী। মোহিনী দেবীর মৃত্যুর পর ময়ূরভঞ্জের মহারানী সুচারু দেবী এই পত্রিকাটি কিছুদিন পরিচালনা করেন।

পরে নব পর্যায়ে এই পত্রিকাটি প্রকাশের দায়িত্ব নেন কুচবিহারের রানী নিরুপমা দেবী।

৬. খৃষ্টীয় মহিলা (মাসিক পত্রিকা, জানুয়ারি ১৮৮১)

সম্পাদিকা— কুমারী কামিনী শীল। এখানে কেবলমাত্র মহিলাদের রচিত গদ্য ও কবিতা প্রকাশিত হত।

৭. বঙ্গবাসিনী (১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে, ২৮ সেপ্টেম্বর, সাপ্তাহিক পত্র)

এই পত্রিকাটি প্রকাশিত হলে 'এডুকেশন গেজেট' সমালোচনা প্রসঙ্গে লেখে "বঙ্গবাসিনী (১ম ভাগ, ১ম সংখ্যা) সাপ্তাহিক পত্রিকা স্ত্রী লোক কর্ত্তৃক বঙ্গবাসিনীগণের হিতোদ্দেশ্যে সম্পাদিত।"[৪৪]

পত্রিকাটি কলকাতার টালা অঞ্চল থেকে প্রকাশিত হত। কিন্তু কোনো বিশেষ কারণে লেখিকা বা সম্পাদিকার নাম প্রকাশ করা হত না।

৮. সোহাগিনী (এপ্রিল ১৮৮৪ মাসিকপত্র)

দুই মহিলা— কৃষ্ণরঞ্জিনী বসু ও শ্যামাঙ্গিনী দে ১নং গরাণহাট স্ট্রীট থেকে এই পত্রিকা সম্পাদনা করে প্রকাশ করতেন।

৯. বালক (এপ্রিল, ১৮৮৫, মাসিকপত্র)

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী এই সচিত্র মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। এক বছর পরে 'বালক' 'ভারতী' পত্রিকার সঙ্গে যুক্তভাবে প্রকাশিত হত।

১০. বিরহিণী (অক্টোবর ১৮৮৮; মাসিকপত্র)

সম্পাদিকা— সুশীলাবালা দেবী।

পত্রিকাটিতে প্রধানত গল্প প্রকাশিত হত।

১১. পুণ্য (অক্টোবর, ১৮৯৭, মাসিকপত্র)

হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী এই পত্রিকাটি সম্পাদনা করতেন। এই পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রথম সংখ্যায় লেখা হয়—"এই পত্রে জন সমাজের উপযোগী সাহিত্য, বিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব, সঙ্গীত প্রভৃতি নানা বিষয়ক প্রবন্ধই স্থান লাভ করিবে"[৪৫] ইত্যাদি

১২. অন্তঃপুর (জানুয়ারি, ১৮৯৮) মাসিকপত্র

প্রথম এই পত্রিকার সম্পাদিকা ছিলেন সেবাব্রতী শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়া কন্যা বনলতা

দেবী। তাঁর মৃত্যুর পর যাঁরা এই পত্রিকার সম্পাদনা ভার গ্রহণ করেন, তাঁরা হলেন—হেমন্তকুমারী চৌধুরী, কুমুদিনী মিত্র, লীলাবতী মিত্র, সুখতারা দত্ত ও বিরাজমোহিনী রায়।

'এইভাবে অচিরকালের মধ্যে মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত ও সম্পাদিত অসংখ্য পত্রিকার আবির্ভাব হল। এখানে শুধুমাত্র উনিশ শতকের মধ্যে যে-কয়টি মহিলা সম্পাদিত পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল, তার কথাই বলা হল। পত্রিকাগুলিতে নারীসমাজের নানা সমস্যার কথা প্রকাশিত হত। তাঁদের কাছে আদর্শ ছিল পুরুষ-পরিচালিত পত্রিকাগুলি। বিংশ শতাব্দী থেকে অনেক মহিলাই আগ্রহ সহকারে নতুন নতুন পত্রিকা প্রকাশে মনোনিবেশ করেন। কারণ পূর্ববর্তী পত্রিকাগুলির সাফল্য, তাঁদের মনে আত্মবিশ্বাস এনে দিয়েছিল ও আস্থা জাগিয়ে তুলেছিল।

পঞ্চম অধ্যায়টি রচনার সময় 'নির্দেশিকা'য় উল্লিখিত প্রবন্ধ ও গ্রন্থগুলি ছাড়া অন্যান্য কিছু গ্রন্থ ও প্রবন্ধের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। তার একটি তালিকা দেওয়া হল—

গ্রন্থ :

১। ভারতকোষ (১-৫ খণ্ড)। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ

২। সাহিত্য সাধক চরিতমালা। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ

৩। বাঙালীর চরিতাভিধান। সাহিত্য সংসদ

৪। সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জী। অশোক কুমার কুণ্ডু সম্পাদিত

৫। বঙ্গীয় সাহিত্যকোষ। অশোক কুমার কুণ্ডু সম্পাদিত

৬। স্বর্ণকুমারী দেবী ও বাংলা সাহিত্য। ড. পশুপতি শাসমল

৭। রবীন্দ্র সমকালীন কয়েকজন কবি। অজয়কুমার ঘোষ

৮। স্বাদেশিকতা ও বাংলা সাহিত্য। ড. অঞ্জলি কাঞ্জিলাল

৯। বাংলা সাহিত্যে সনেট। উত্তম দাস

১০। বিস্মৃতপ্রায় বাংলা কাব্য। শৈলেনকুমার দত্ত

১১। তরু দত্ত। পদ্মিনী সেনগুপ্ত (সাহিত্য-একাডেমী)

১২। সরোজিনী নাইডু। পদ্মিনী সেনগুপ্ত (সাহিত্য-একাডেমী)

১৩। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য। ড. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

১৪। সাহিত্যে স্রষ্টা ও সৃষ্টি। অনুরূপা দেবী

১৫। *Condition of Bengali Women*—(Around the 2nd half of the 9th century) By Dr. (Mrs.) Usha Chakraborty.

১৬। অন্তঃপুরের আত্মকথা। চিত্রা দেব

১৭। বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প। ড. ভূদেব চৌধুরী

১৮। বাংলা পৌরাণিক নাটক। ড. রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

২০। বাঙালির সাহিত্য। ড. ভবতোষ দত্ত

২১। নারীজাগৃতি ও বাংলা সাহিত্য। ড. জ্ঞানেশ মৈত্র

প্রবন্ধ :

১। "অন্নদাসুন্দরী ঘোষ", নির্মল সাধুখাঁ—সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জী ১৩৮১, পৃ. ২৪৮-৫২

২। "সুরমাসুন্দরী ঘোষ", মঞ্জুলা ভট্টাচার্য—সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জী ১৩৮২, পৃ. ১৩২-৩৪

৩। "লজ্জাবতী বসু", অনির্বাণ রায়চৌধুরী—সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জী ১৩৮২, পৃ. ১৫৫-৬৪

৪। "সুচারু দেবী", মঞ্জুলা ভট্টাচার্য—সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জী ১৩৮২, পৃ. ১৩৫-৩৭

৫। "হেমলতা ঠাকুর", নির্মল সাধুখাঁ—সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জী—১৩৮১, পৃ. ২৪০-৪৭

৬। "সরলাবালা সরকার", ড. বারিদবরণ ঘোষ—সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জী ১৩৮৩, পৃ. ২৭৮-৮৬

৭। "বিস্মৃতপ্রায় লেখিকা : পূর্ণশশী দেবী", শর্মিলা বসু কলেজ স্ট্রীট পত্রিকা। জানুয়ারি ১৯৮৫, পৃ. ১৩-১৪

৮। "শৈলবালা ঘোষজায়া স্মরণে" পরিমল চক্রবর্তী —সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জী ১৩৮২, পৃ. ৫৪-৬৮

৯। "সীতা দেবী", ড. সুশীলকুমার গুপ্ত— সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জী ১৩৮২, পৃ. ৮৫-৯৬

১০। "সরোজকুমারী দেবী", মঞ্জুলা ভট্টাচার্য—সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জী ১৩৮৩, পৃ. ৩৩৪-৪০

১১। "প্রভাবতী দেবী সরস্বতী", সনৎকুমার মিত্র —সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জী—১৩৮৫ পৃ. ৩৮৮-৮৯

১২। "ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী", ড. অরুণ বসু—সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জী—১৩৮১, পৃ. ১৪৬-৬২

১৩। বাংলার নবজাগরণ : নাটক ও নাট্যশালা, ড. অরুণ সান্যাল
"উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল", পৃ. ৩৮৫

১৪। "পুণ্যলতা চক্রবর্তী", শঙ্কর মিত্র—সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জী ১৩৮২, পৃ. ৮৩-৮৪

১৫। প্রবাসী ষষ্টিবার্ষিকী সংখ্যা, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ

নির্দেশিকা

১। 'কামিনী রায়', সাহিত্য সাধক চরিতমালা। গ্রন্থসংখ্যা ৫৮। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ) পৃ. ৮

২। 'আরোগ্য' কাব্যগ্রন্থের ২৩ নং কবিতা, রবীন্দ্র-রচনাবলী। তৃতীয় খণ্ড (জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ), পৃ. ৮৩০-৩১

৩। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বঙ্গ সাহিত্যে নারী'— (বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ) পৃষ্ঠা ৭

৪। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, 'বঙ্গের মহিলা কবি'— (২য় সংস্করণ, ১৩৬০ সাল), 'ভূমিকা'

৫। তদেব,—ভূমিকা

৬। তদেব,—ভূমিকা

৭। 'বেথুন কলেজ শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ', পৃ. ৩৮

৮। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, 'বঙ্গের মহিলা কবি', পৃ. ৩৬৯

৯। ড. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, 'ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য'— ২য় সংস্করণ, পৃ. ৮৭

১০। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা সাহিত্য বিকাশের ধারা', ২য় খণ্ড, পবিবর্ধিত সংস্করণ ১৯৬৩, পৃ. ১১৮

১১। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, 'বঙ্গের মহিলা কবি', পৃ. ৪২৩

১২। তদেব 'ভূমিকা'

১৩। সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', দ্বিতীয় খণ্ড সপ্তম সংস্করণ, পৃ. ৪৩৬ (পাদটীকা দ্রষ্টব্য)

১৪। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বঙ্গসাহিত্যে নারী'—(বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ) পৃ.৪

১৫। নূরন্নেছা গ্রন্থাবলীর ভূমিকা। পৃ.এক; ভূমিকা রচয়িতা—মোহম্মদ আবদুল কাইউম। ঢাকা-বাঙলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত।

১৬। তপতী রায়, 'রূপকের আলোকে রূপ জালাল' (প্রবন্ধ), সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ৮৩ বর্ষ ১ম সংখ্যা। বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৮৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২১-২২

১৭। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, 'বঙ্গের মহিলা কবি', পৃ. ৬৮

১৮। তদেব, পৃ. ৮৪

১৯। তদেব, পৃ. ২৬৮

২০। চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ'—নতুন সংস্করণ ১৯৫৯ পৃ. ১৪৬।

২১। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' (৪র্থ সংস্করণ), পৃ. ২৭১

২২। সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'—২য় খণ্ড (৭ম সংস্করণ), পৃ. ৩৬

২৩। অনুরূপাদেবী, 'সাহিত্যে নারী : স্রষ্টা ও সৃষ্টি', পৃ. ১৩২
২৪। সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪০
২৫। কুসুমকুমারী রায়চৌধুরী প্রণীত 'প্রেমলতা' গ্রন্থের (দ্বিতীয় সংস্করণ) প্রকাশকের নিবেদন অংশটি দ্রষ্টব্য।
২৫ক। রবীন্দ্র রচনাবলী (১৩ খণ্ড) জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, পৃ. ৯৫৯-৬০।
২৬। আবদুল কাদির-সম্পাদিত, 'রোকেয়া রচনাবলী', পৃ. ৫৯৪-৯৫
২৭। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা', পৃ. ২৮৯।
২৮। 'স্বপ্নদ্রষ্টা' গ্রন্থের 'নিবেদন' অংশ দ্রষ্টব্য। নূরন্নেছা গ্রন্থাবলী।
২৯। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা', পৃ. ২৯১
৩০। 'মাধবীলতার গল্প'- সংকলক পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়
৩১। শ্রীমতী রাসসুন্দরী 'আমার জীবন' 'আত্মকথা' ১ম খণ্ড,(অনন্য প্রকাশন), পৃ. ৩০
৩২। সারদাসুন্দরী দেবী, 'আত্মকথা', আত্মকথা—১ম খণ্ড, পৃ. ১১
৩৩। কৈলাসবাসিনী, 'আত্মকথা' আত্মকথা ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬
৩৪। নিস্তারিণী দেবী, 'সেকেলে কথা', আত্মকথা ২য় খণ্ড, পৃ. ২৯
৩৫। প্রফুল্লময়ী দেবী, 'আমাদের কথা' 'বলেন্দ্র শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ', পৃ. ৩৮
৩৬। সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'। ২য় খণ্ড। (৬ষ্ঠ সংস্করণ), পৃ. ৩২৮
৩৭। তদেব, ৭ম সংস্করণ, পৃ. ১০২
৩৮। তদেব, পৃ. ৩২৭-২৮
৩৯। বাণী বসু -সংকলিত 'বাংলা শিশু সাহিত্য গ্রন্থপঞ্জী', পৃ. ২৩
৪০। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সাময়িক পত্র সম্পাদনে বঙ্গনারী', (বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ), 'পাদটীকা' দ্রষ্টব্য
৪১। তদেব, পৃ. ১
৪২। তদেব, পৃ. ১-২
৪৩। তদেব, পৃ. ৩
৪৪। তদেব, পৃ. ৮
৪৫। তদেব, পৃ. ৮



ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে বঙ্গনারী

নিতান্ত জৈব অস্তিত্ব রক্ষার মধ্যে মানুষের সম্পূর্ণ পরিচয় নিহিত থাকে না; তার আত্মিক পরিচয় বা মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটে নানা দিকে ও নানাভাবে। এই অধ্যায়ে আমরা ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গীয় নারীদের, সাংস্কৃতিক জীবনের বিচিত্র বিকাশের যেটুকু সন্ধান নিতে পেরেছি, তারই সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরব।

১. ধর্মচর্যায় বঙ্গনারী

পরম সত্যকে জানাবার আকাঙ্ক্ষা সকল দেশের ও সকলযুগের মানুষের মনেই আছে। উনিশ শতকে বঙ্গদেশের নবজাগরণের ক্ষেত্রে যে ধর্মজিজ্ঞাসা জেগে উঠেছিল, তাকে কেন্দ্র করে ধর্মসংস্কার আন্দোলন দেখা দিয়েছিল। এ বিষয়ে যাঁরা অগ্রণী ছিলেন তাঁদের মধ্যে বিশেষ করে নাম করা যায়— রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩), মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫), ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-৮৪) প্রমুখ মনীষীগণের। তাঁদের ধর্মবিশ্বাস ও আচার-আচরণের সঙ্গে সনাতনপন্থীদের রীতিনীতির পার্থক্য প্রকট হয়ে উঠল। পরিণতিতে গড়ে উঠল ব্রাহ্মধর্ম সম্প্রদায়। প্রতিমাপূজার পরিবর্তে এঁরা নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনায় রত হলেন। এই সময়েই অন্যাদিকে এক অবতার পুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের (১৮৩৬-৮৬) আবির্ভাব ঘটল। ইনি দেখালেন সর্বধর্ম সমন্বয়ের আদর্শ। ঈশ্বরের সাকার ও নিরাকার উভয় রূপকেই ইনি স্বীকার করে নিয়েছিলেন। পরম সত্যকে উপলব্ধি করার জন্য তিনি নিজে শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, মুসলিম, খ্রীস্টান প্রভৃতি সকল রীতিতেই সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। এই ভাবেই তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন "যত মত তত পথ" বা সর্বধর্ম সমন্বয়ের আদর্শ। উদার দৃষ্টি নিয়ে তিনি সনাতন হিন্দু ধর্মকে প্রচার করেছিলেন তাঁর উপযুক্ত সুযোগ্য শিষ্য ও শিষ্যাবর্গের মাধ্যমে। এই উদার মতবাদের বাণী বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২) পাশ্চাত্য দেশে। বলিষ্ঠ মানবতাবাদী ধর্মাচরণের মধ্যে দিয়ে 'জীব'কে 'শিব' জ্ঞানে পূজা করার জন্য একদা আইরিশ-কন্যা মার্গারেট নোবল এদেশে এসে হলেন 'নিবেদিতা'।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেমন সকল নারীকে মহাশক্তির আধার বলে মনে করতেন, স্বামীজীর মনেও ছিল সেই একই বিশ্বাস। তাঁর দৃঢ় ধারণা ছিল মধ্যযুগে ভারতের অধঃপতনের মূল কারণ হল

নারীর অবমাননা ও অনাদর। তিনি বলেছিলেন— "মেয়েদের পূজা করিয়াই সব জাতি বড় হইয়াছে। যে দেশে যে জাতিতে মেয়েদের পূজা নাই, সেই দেশ, সেই জাতি কখনও বড় হইতে পারে নাই, কস্মিন কালে পারিবেও না।"[১] এদেশের মেয়েদের জন্য স্বামীজী পাশ্চাত্যরীতির শিক্ষা চাননি; তিনি এমনভাবে দেশীয় মেয়েদের শিক্ষিত করে তুলতে চেয়েছিলেন, যাতে তারা ভারতীয় নারীর আদর্শ থেকে কোনোক্রমে বিচ্যুত না হয়।

উনিশ শতকের সাধারণ অন্তঃপুরচারিণী নারীদের জীবনে ধর্মীয় পটভূমিটি কেমন ছিল তার উল্লেখ করা যেতে পারে। আশৈশব বাঙালি মেয়েদের মনে ধর্মীয় নিষ্ঠা, বিশ্বাস ও ভক্তিভাবটি খুব প্রবলভাবে জেগে থাকত। তার প্রধান কারণ হল— পাঁচ বছর বয়স থেকে বয়োজ্যেষ্ঠাদের নির্দেশে তাদের নানারকম ব্রত-উপবাস করতে হত। বৈশাখ থেকে শুরু করে চৈত্র মাসের শেষদিন পর্যন্ত কত ধরণের বার-ব্রত যে তাদের পালন করতে হত তার সঠিক হিসাব দেওয়া দুরূহ কর্ম। আবার প্রাত্যহিক জীবনে ভোর না হতেই গৃহের সর্বত্র ছড়া ঝাঁট দিতে হত। সন্ধে হতেই তুলসী মঞ্চের কাছে সাঁঝের প্রদীপ জ্বেলে, শাঁখ বাজিয়ে, প্রণাম করে মনে মনে নিজের এবং প্রিয়জনদের মঙ্গলকামনা করতে হত। এমনি করেই বালিকা বয়েস থেকে তাদের মনে ভবিষ্যতের জন্য শান্তি ও শৃঙ্খলাপূর্ণ গার্হস্থ্য জীবনের কামনা ও বাসনাটি ধীরে ধীরে গড়ে উঠত। বাল্য বিবাহের প্রচলন ছিল। বিবাহের পর স্বামী স্ত্রী দুজনকেই কুলগুরুর কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করতে হত। নিয়মিতভাবে ইষ্টনাম জপের মধ্যে দিয়ে অভ্যাস যোগের সাধনা চলত। বধূ-জীবনে দীক্ষা গ্রহণ না করলে, তার হাতের জল শুদ্ধ হয়েছে বলে মনে করতেন না গুরুজনেরা। অনেক বাড়িতে গৃহ-দেবতার জন্য ভোগ রান্না করে নিবেদন করার রীতি ছিল। কিন্তু অদীক্ষিত মেয়ে বা বউরা ভোগরান্নার অধিকার থেকে বঞ্চিত হতেন। পরবর্তীকালে নারীসমাজের একাংশ পাশ্চাত্য রীতিতে শিক্ষিত হয়ে ভিন্ন পথের পথিক হলেন কিন্তু বৃহত্তর অংশ পুরাতন রীতিতে জীবন যাপন করতেন।

সাংসারিক গণ্ডির মধ্যে বাস করে অথবা সংসার ত্যাগ করে উনিশ শতকের কিছু উচ্চকোটির সাধিকা বর্তমান ছিলেন— সেই ধরণের কয়েকজন সাধিকার কথা এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা হল।

ভৈরবী যোগেশ্বরী

যোগেশ্বরী তন্ত্র ও বৈষ্ণব সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। এই ভৈরবীই সর্ব প্রথম ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবকে অবতার পুরুষ বলে ঘোষণা করেন। এঁর সহায়তায় ঠাকুর তন্ত্রসাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দের এক সকালে ঠাকুর যখন দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গাতীরবর্তী ফুলবাগানে পূজার ফুল তুলছিলেন সেই সময়ে নৌকায় করে এসে ভৈরবী ঠাকুরানী নেমেছিলেন বকুলতলার ঘাটে। তখন তাঁর বয়স ছিল আনুমানিক চল্লিশ। পরনে ভৈরবীর বেশবাস। সুন্দরী, আলুলায়িত কেশা, দীর্ঘ দেহা এই নারী পূর্ববঙ্গে যশোহর জেলার কোনো অঞ্চলে জন্মেছিলেন। তাঁর বিস্তৃত পরিচয়

জানা যায় না। তবে তিনি যে বড়ো ঘরের মেয়ে ছিলেন, তাঁর চেহারা বা চালচলনের মধ্যে সে পরিচয় পরিস্ফুট ছিল। ভৈরবীর ইষ্টদেবতা 'রঘুবীর' সর্বদা তাঁর সঙ্গেই অবস্থান করতেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণকে তিনি দেখতেন বাল-গোপালরূপে এবং নিজেকে ভাবতেন মাতা যশোদা। ঠাকুরের যখন দিব্যোন্মাদ অবস্থা এবং সারা শরীরে ঊনিশটি মহাভাব ও সাত্ত্বিক চিহ্নসমূহ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে তখন সাধারণ লোক তাঁকে উন্মাদ বলে গণ্য করত কিন্তু যোগেশ্বরীই তখন মথুরানাথের (রানী রাসমণির কনিষ্ঠ জামাতা) সাহায্যে ধর্মসভা আহ্বান করে প্রমাণ করে দিলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার বিশেষ। সভায় উপস্থিত ছিলেন পণ্ডিত ও সাধক বৈষ্ণবচরণ ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। কার্যসিদ্ধির পর ভৈরবী ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে কোনো একটি দিনে বারাণসীর অভিমুখে যাত্রা করেন। তাঁর শেষ জীবনটি কেটেছিল বৃন্দাবনে।[১]

শ্রীশ্রী সারদামণি দেবী (১৮৫৩-১৯২০)

সারদামা ছিলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের সহধর্মিণী ও লীলাসঙ্গিনী। একই সঙ্গে তিনি ছিলেন 'সদ্যোবধূ' ও ব্রহ্মবাদিনী' নারী। সংসার জীবনে আবদ্ধ থেকেও ইনি অলৌকিক মাতৃস্নেহ বিস্তার কবে দেখিয়েছিলেন বিশ্বমৈত্রীর আদর্শ। তিনি তাঁর জীবনের মধ্যে দিয়ে দেখিয়েছিলেন যে, ভারতীয় শাশ্বত জীবনধারাকে অনুসরণ করে চলতে পারলে মায়ের মধ্য দিয়ে সন্তান-সন্ততির মধ্যেও সেই আদর্শ সঞ্চারিত হবে। আধ্যাত্মিক সাধনার সঙ্গে তিনি সাধারণ গৃহস্থ জীবনেব যে আশ্চর্য সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন, সেটিই আজ আমাদেব কাছে বিস্ময়ের বিষয়। সম্পূর্ণ সংস্কাবমুক্ত মন নিয়ে সারদা মা এগিয়ে এসেছিলেন প্রাচীন ধর্মমত ও বিশ্বাসের নবমূল্যায়ন করতে।

শ্রীমায়ের জন্মস্থান বাঁকুড়া জেলার জয়রামবাটী গ্রামে। পিতা রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও মাতা শ্যামাসুন্দরী দেবী। ছেলেবেলায় সারদা মায়ের নাম ছিল 'ক্ষেমঙ্করী'। পরে সেই নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'সারদা'। গদাধরের অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের বয়স যখন চব্বিশ বছর এবং সারদার ছয়, তখন তাঁদের বিবাহ হয়। সাধারণ দম্পতির ন্যায় কোনো ভোগাকাঙ্ক্ষা তাঁদের মনে ছিল না। ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দের ফলহারিণী অমাবস্যা তিথিতে কালীপূজার দিনে ঠাকুর রামকৃষ্ণ শ্রীমাকে 'সাক্ষাৎ জগদম্বা' জ্ঞানে পূজা করেন। সারদা মাকে লেখাপড়া শেখানোর প্রবল আগ্রহ ও ইচ্ছা ছিল ঠাকুরের মনে। তিনি যে ভাবে স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে নিজের শক্তি সঞ্চাব করেছিলেন, তেমনি ভাবে তিনি তাঁর সহধর্মিণীর মধ্যেও নিজের সাধনালব্ধ শক্তি সঞ্চারিত করেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মৃত্যুতে শোকাভিত হলেও শেষ পর্যন্ত সারদা মা তাঁর দীক্ষিত সন্তানদের নিয়ে ঠাকুরের আদর্শকে সার্থক করে তুলেছিলেন। শ্রীমা সম্পর্কে বলা হয়েছে "What strikes us most in the life of the Holy Mother is this wonderful synthesis of ordinary home—life and the highest spirituality."[২]

গৌরীমা (১৮৫৭-১৯৩৮)

যিনি উত্তরজীবনে গৌরীমা বলে পরিচিত হলেন, তিনি পূর্বজীবনে ছিলেন হাওড়া শিবপুর নিবাসী

পার্বতীচরণ চট্টোপাধ্যায় ও গিরিবালা দেবীর কন্যা মৃড়ানী। তাঁর শৈশব কেটেছিল ভবানীপুর অঞ্চলে মাতুলালয়ে। ছেলেবেলাতেই তিনি শ্রীকৃষ্ণে মন প্রাণ সমর্পণ করে হয়েছিলেন গৌরীদাসী। 'দামোদর' ছিলেন তাঁর ইষ্টদেবতা। তেরো বছর বয়সে তাঁর বিবাহের আয়োজন করা হল কিন্তু আত্মগোপন করে থেকে তিনি বাদ সাধলেন কারণ সন্ন্যাসিনীর জীবনই ছিল তাঁর কাম্য। ছেলেবেলায় কিছুদিন মিশনারি স্কুলে পড়াশুনো করেন। বাংলা ও সংস্কৃত বেশ ভালোই জানতেন। অল্প স্বল্প ইংরেজী ও ফার্সিও জানতেন। প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী ছিলেন ইনি। আঠারো বছরে গঙ্গাসাগরে যান। সেখানে থেকে হরিদ্বার ও অন্যান্য তীর্থ ভ্রমণ করেন দীর্ঘ কাল ধরে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সংস্পর্শে এলে তিনি তাঁকে গুরু দায়িত্ব দিলেন। এদেশের মেয়েদের দুঃখ দুর্দশা ঠাকুরকে বড়োই বিচলিত করত। তাই তিনি গৌরী দাসীকে তাদের জন্য কিছু করতে বলেছিলেন। রূপকের ছলে বলেছিলেন— 'আমি জল ঢালব আর তুই মাটি চট্কাবি।' ভারতভ্রমণে বেরিয়ে স্বচক্ষে গৌরীমা দেখেছিলেন নারী-জাতির দুঃখের জীবন। শিক্ষার আলোকবঞ্চিত এই সব মেয়েদের জন্য তিনি শিক্ষার ব্যবস্থা করে তাদের স্বাবলম্বী করে তুলতে চেয়েছিলেন। বালিকা বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত আশ্রমটি আজ গৌরীমার আশ্রম নামে পরিচিত। এ ছাড়া আধ্যাত্মিক পরিবেশে বসবাসের জন্য কলকাতার অদূরে ব্যারাকপুরে তিনি গড়ে তুলেছিলেন (১৮৯৫) 'শ্রীশ্রী সারদেশ্বরী আশ্রম'। আধুনিক যুগে ভারতে এটিই প্রথম নারীমঠ বা সন্ন্যাসিনীদের আশ্রম।[৩]

যশোদা মাঈ (১৮৮১ - ১৯৪৪)

যশোদা মাঈ নামে পরিচিত হলেও তাঁর প্রকৃত নাম ছিল মণিকা। ইনি ছিলেন উত্তর প্রদেশের এক প্রবাসী বাঙালি গগনচন্দ্র রায়ের কন্যা। স্বামীজী যখন গাজীপুরে রায় মহাশয়ের বাড়ি পদার্পণ করেন, তখন তিনি নয় বৎসরের বালিকা মণিকাকে তাঁর আশীর্বাদ দানে ধন্য করেন। মণিকার বিবাহ হয় অধ্যাপক জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সঙ্গে। জ্ঞানেন্দ্রনাথ একদা লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে আসীন ছিলেন। থিয়োসফি ছিল তাঁর প্রিয় বিষয়। মণিকার মধ্যে আকস্মিক ভাবে আধ্যাত্মিক শক্তির স্ফুরণ ঘটে। এই পরিবারের সঙ্গে সংগীতজ্ঞ ও সাধক দিলীপকুমার রায়ের ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ ইংরেজ অধ্যাপক রোনাল্ড নিকসন যশোদামাঈ অর্থাৎ মণিকাদেবীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে 'কৃষ্ণপ্রেম' নামে অভিহিত হন। রোনাল্ড ছিলেন তাঁর 'গোপাল'। শেষ জীবনে বৈষ্ণবসাধিকা যশোদামাঈ সন্ন্যাস গ্রহণ করে হিমালয় অঞ্চলে আলমোড়ার মের্তোলা পাহাড়ে আশ্রম গড়ে তোলেন। সেখানেই তাঁর জীবনাবসান হয়।

আনন্দময়ী মা (১৮৯৬-১৯৮৩)

সাধারণ সাংসারিক পরিবেশে জীবন অতিবাহিত করেও ইনি সিদ্ধ সাধিকারূপে দেখা দিলেন। ত্রিপুরাজেলার খেওড়া গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। পিতা ছিলেন বিপিনবিহারী ভট্টাচার্য এবং মাতার নাম মোক্ষদাসসুন্দরী দেবী। সংসার জীবনে আনন্দময়ী মার নাম ছিল নির্মলাসুন্দরী দেবী।



সারদা দেবী



আনন্দময়ী মা

ছেলেবেলা থেকেই তাঁর মধ্যে ধর্মনিষ্ঠা ও সরলতার পরিচয় পাওয়া যেত। তেরো বছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয় ঢাকা বিক্রমপুরের আটপাড়া গ্রামের রমণীমোহন চক্রবর্তীর সঙ্গে। ইনি পরে 'ভোলানাথ' নামে পরিচিত হন এবং সকলের মঙ্গল সাধন করাই ছিল তাঁর জীবনের ধর্ম।

শোনা যায় মৈমনসিং অঞ্চলের বাজিতপুরে অবস্থান কালে আনন্দময়ী মা অলৌকিকভাবে নিজেকেই নিজে দীক্ষা দান করেন (১৯২২) এবং তারপর থেকেই তাঁর জীবনে দেখা দেয় এক অভাবিত পরিবর্তন। মায়ের কাছে তাঁর দীক্ষা বা গুরু সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছিলেন, "শৈশবে পিতামাতা, গার্হস্থ্য জীবনে পতি এবং সকল অবস্থায় জগন্ময় সবই আমার গুরু; তবে জানিয়া রাখিস্ গুরু বলিতে একমাত্র স্বয়ং একই।" [৩] শাহবাগে (১৯২৬) কিংবা রমনার আশ্রমে (১৯২৯) যখন ছিলেন তখন ভক্তবৃন্দ তাঁর মুখনিঃসৃত বাণী শুনে শান্তি ও তৃপ্তি লাভ করেছিলেন। পরে দেরাদুনে একটি কেন্দ্র স্থাপিত (১৯৩২) হয়, তখন থেকে উত্তর প্রদেশে তাঁর মহিমা প্রচারিত হল। এখান থেকে তিনি কৈলাস তীর্থে যাত্রা করেন এবং প্রত্যাবর্তনেব কয়েকমাস পরেই ভোলানাথ দেরাদুনে দেহত্যাগ করেন। বারাণসী ও হরিদ্বারে অজস্র শিষ্য-শিষ্যা তাঁর সাহচর্য লাভ করে ধন্য হয়েছেন। ধর্মকে তিনি সহজভাবে জীবনের অঙ্গীভূত করার কথা বলেছেন। "মার উপদেশের মূলতত্ত্ব এই, ধর্মের প্রাণ কোন জটিল বাঁধা আচারেব কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ নয়। জীবন রক্ষা মানেই ধর্মরক্ষা এই ধারণা দৃঢ়ভাবে মনে রাখিয়া নিত্য দিনের আহার, বিহার অর্থোপার্জন ইত্যাদির ভিতর দিয়া আন্তরিকতা ও সরসতার সহিত সহজ ধাবায় ধর্ম-সাধনাকে মানুষের স্বাভাবিক অনুষ্ঠানরূপে প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক।" [৫]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জমিদারী পরিচালনায় বঙ্গনারী

মধ্যযুগে যেমন কয়েকজন মহিলা-জমিদার শাসনকার্য ও জমিদারি পরিচালনায় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন, উনিশ শতকেও বঙ্গদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এই ধরণের কয়েকজন নারীর কথা জানা যায়। এই কাজে তাঁরা গভীর মানবতাবোধ, প্রজাহিতৈষণা, স্বাদেশিকতাবোধ, অসমসাহসিকতা, দানশীলতা প্রভৃতি নানাগুণের পরিচয় দিয়েছিলেন।

রাণী ইন্দ্রাণী

মহিষাদলের রানী ছিলেন ইন্দ্রাণী। রাজা জগন্নাথ গর্গের মৃত্যু ঘটে ১৮২২ খ্রীস্টাব্দে। এরপর দীর্ঘকাল রাণী ইন্দ্রানী এই রাজ্য শাসন করেছিলেন।

রানী শিরোমণি (১৭৫৬ - ১৮১২)

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে রানী শিরোমণি মেদিনীপুর এলাকায় নাড়াজোল, ঝাড়গ্রাম, কর্ণগড়, প্রভৃতি অঞ্চল জুড়ে বিশাল একটি জমিদারি পরিচালনা করতেন। এই সময় জঙ্গল মহলের মানুষের সঙ্গে ইংরেজদের যে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, তাকে ইতিহাসে 'চুয়াড় বিদ্রোহ' নামে অভিহিত করা হলেও প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল 'গণ-বিদ্রোহ'। এই বিদ্রোহকে দমন করতে ইংরেজদের যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল। ১৮১৬ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে এই বিদ্রোহ তারা দমন করতে সমর্থ হয়। 'চুয়াড়' শব্দটি, বর্বর ও নিষ্ঠুর অর্থে ব্যবহৃত হয়। বিদ্রোহের প্রকৃত স্বরূপ গোপন রাখবার জন্যই এই নাম দেওয়া হয়েছিল। রানী শিরোমণি এই বিদ্রোহী দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করে যে দৃঢ়তা, সাহসিকতা ও নির্ভীকতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তা খুবই আশ্চর্য ও গৌরবজনক। ১৭৯৮-৯৯ খ্রীস্টাব্দে এই চুয়াড় বা পাইক বিদ্রোহে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন রাণী। বাগ্দী জাতীয় সাহসী লোকেরা এই সংগ্রাম পরিচালনা করত। রক্তক্ষয়ী এই যুদ্ধে রানী শিরোমণি ইংরেজের হাতে বন্দী হন এবং কলকাতার কেল্লায় তাঁকে নিয়ে আসা হয়। পরে মুক্তিলাভ করে তিনি মেদিনীপুরে ফিরে যান। ১৮১২ খ্রীস্টাব্দের ১৭ সেপ্টেম্বর তাঁর মৃত্যু ঘটে। [৬]

রানী কিশোরমণি

মেদিনীপুরে ঝাড়গ্রামের কাছে শিল্দা নামক স্থানে যে রাজারা রাজত্ব করতেন, তাঁরা ছিলেন শৈব ও শাক্ত ধর্মাবলম্বী। প্রজারা ছিল লোধা ও সাঁওতাল জাতীয়। এই অঞ্চলে রানী কিশোরমণি রাজত্ব করেছিলেন ১৮২০ থেকে ১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত। তিনি দেবালয় ও 'শিলদার বাঁধ' নামে একটি জলাশয় প্রতিষ্ঠা করেন। স্থানীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক অমরেন্দ্রনাথ মজুমদার 'ভৈরব-রঞ্জিনী

মাহাত্ম্য' নামে দেবদেবী মাহাত্ম্যমূলক যে পুস্তিকা রচনা করেন তাতে রানী কিশোরমণি সম্পর্কে লিখেছেন —

'জননী কিশোরমণি ছিলা রাজমাতা।
এ সামন্তভূমে তাঁর আছে কীর্তিগাথা ।।
দেশ রক্ষণে কত শক্তি ছিল তাঁর।
যুদ্ধে কেটেছিল মাথা পাঁচশ ভুঞার।
এখনও সে কাটামুণ্ড 'হঁদকুড়ি' ভূমে।
অস্ত্রসহ কবরস্থ আছে শিল্‌দা গ্রামে ।।'[৭]

ইত্যাদি।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দশশালা বন্দোবস্তের সময় এই শিল্‌দার জমিদার ছিলেন রাজা মানগোবিন্দ মল্লরায়। রাজার ছিল সাত রানী। রানী কিশোরমণি ছিলেন তাঁদের অন্যতমা। ১৮০৬ খ্রীস্টাব্দে রাজার মৃত্যু হলে ইনিই রাজ্যভার গ্রহণ করেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে বীরত্ব তো আছেই, সেইসঙ্গে আবার দান-ধ্যান ও প্রজা বাৎসল্যের ক্ষেত্রে রানীরা ছিলেন রাজাদের চেয়ে বেশি উদার ও জন-দরদী মনোভাবাপন্ন।

মণিবেগম (? - ১৮১২)

বাঙ্গালার নবাব মীরজাফরের বহু বেগমের মধ্যে ইনি ছিলেন একজন প্রভাবশালিনী বেগম। প্রথম জীবনে ছিলেন নর্তকী, পরে নবাবের অনুগ্রহ লাভ করে বেগমপদ লাভ করেন। শাসনকার্য পরিচালনার ব্যাপারেও ইনি মীরজাফরকে সলা-পরামর্শ দান করতেন। নবাবের মৃত্যুর পর ইনি তিন নাবালক পুত্রের অভিভাবিকা রূপে রাজকার্য পরিচালনা করতেন। পরে অবশ্য ইংরেজরা তাঁকে ঐ পদ থেকে অপসারিত করে, রেজা খাঁকে নিযুক্ত করে। দানশীলতার জন্য মণিবেগমের খ্যাতি ছিল। মুর্শিদাবাদে ইনি সুন্দর একটি মসজিদ নির্মাণ করান। ইংরেজের কাছ থেকে ইনি এক লক্ষ টাকা করে বৃত্তি পেতেন। তাঁকে তারা 'মাদার -ই-কোম্পানি' বলে অভিহিত করত। তাঁর মৃত্যুতে কোম্পানির তরফ থেকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য তোপধ্বনি করা হয়েছিল।

রানী স্বর্ণময়ী (১৮২৭ - ৯৭)

কাশিমবাজারের রানী স্বর্ণময়ী জন্মগ্রহণ করেছিলেন বর্ধমান জেলার ভট্টকোল গ্রামের এক দরিদ্র পরিবারে। তিনি অপরূপ রূপসী ছিলেন বলেই এগারো বছর বয়সে তাঁর সঙ্গে কাশিমবাজারের কুমার কৃষ্ণনাথ নন্দীর বিবাহ হয়। মাত্র সতেরো বছরেই স্বর্ণময়ীর অকাল বৈধব্য ঘটে। এই সময় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাঁদের সমস্ত সম্পত্তি অধিকার করে নেয়। কিন্তু সুপ্রীম কোর্টে আবেদন করে ১৮৪৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি আবার সব সম্পত্তি ফিরে পেয়েছিলেন। স্বর্ণকুমারী কাশিমবাজার রাজ এস্টেটের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং যোগ্যতার সঙ্গে তা পরিচালনা করেন।

স্বর্ণময়ী বহুজনহিতকর কাজে অকাতরে অর্থব্যয় করেন। তিনি শিক্ষিতা মহিলা ছিলেন বলেই যে-কোনো সাংস্কৃতিক বিষয়ে উৎসাহ প্রদর্শন করতেন। তাঁর ইচ্ছায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতাল স্থাপন করা হয়। পানীয় জল সরববাহের জন্য তিনি সরোবর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। জাতীয়তাবোধের প্রেরণায় উনিশ শতকের সপ্তম দশক থেকে এদেশে রাষ্ট্রীয় আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। সিভিল সার্ভিসে ভারতীয়দের প্রবেশাধিকারের জন্য 'ভারত সভা'র পক্ষ থেকে একটি আন্দোলন করা হয়। সভার মত সমর্থনের জন্য একজন ব্যারিস্টার লালমোহন ঘোষকে বিলেতে পাঠানোর প্রয়োজন ছিল। অথচ ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার বলে সকলে চিন্তিত হয়ে পড়েন। এই সময় স্বেচ্ছায় আর্থিক সাহায্য দান করতে এগিয়ে এসেছিলেন স্বর্ণময়ী। এই উদ্দেশ্যে তিনি সভাকে কয়েক সহস্র টাকা দান করেন। ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দে ইনি ইংরেজদের কাছ থেকে 'মহারানী' ও সি. আই. অর্থাৎ 'ক্রাউন অব ইন্ডিয়া' উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। বহু প্রতিষ্ঠানকে তিনি নানাভাবে অর্থসাহায্য করেন। প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা তিনি দান করেছিলেন— উত্তরবঙ্গের দুর্ভিক্ষে, বহরমপুরের উন্নতিকল্পে, কৃষ্ণনাথ কলেজ, মেডিকাল কলেজের ছাত্রীনিবাস, ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুলে (বর্তমান নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ), ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের 'বিজ্ঞান সভা', শিবপুর বটানিক্যাল গার্ডেন, বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ প্রভৃতি তাঁর দানে উপকৃত হয়েছে।

বিন্ধ্যবাসিনী চৌধুরানী

বিন্ধ্যবাসিনী ছিলেন ময়মনসিং সন্তোষের জমিদার দ্বারকানাথ রায়চৌধুরীর পত্নী। অল্প বয়সে তাঁর বৈধব্য ঘটে। অথচ অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে তিনি তখন থেকেই জমিদারি পরিচালনা করে জমিদারির আয়বৃদ্ধি ও নানা উন্নতি করেন। তাঁর দানশীলতার খ্যাতি ছিল। সৎকাজে অকাতরে অর্থব্যয় করেছেন। নিজে শিক্ষিতা ছিলেন, কাজেই শিক্ষা বিস্তারের মূল্য বুঝতেন। অনেক দরিদ্র মেধাবী ছাত্রকে তিনি বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করেছিলেন। টাঙ্গাইলে 'বিন্ধ্যবাসিনী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়' তাঁরই কীর্তি। অনেক বালক ও বালিকা এখানে বিদ্যা শিক্ষার সুযোগ লাভ করে। এখানে তিনি একটি 'হরিসভা' প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর স্বামীর নামাঙ্কিত 'দ্বারকানাথ হাসপাতালে'র জন্য তিনি পাকাবাড়ি নির্মাণ করান। এ ছাড়া মন্দির ও অতিথিশালাও প্রতিষ্ঠা করিয়েছিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে বঙ্গনারী

উনিশ শতকে ভারতবাসী তথা বঙ্গবাসীর রাজনৈতিক স্বাধিকার ছিল না। ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দে 'পলাশীর যুদ্ধে' নবাব সিরাজদ্দৌলা পরাজিত হলেন ও লর্ড ক্লাইভ জয়ী হলেন। ফলে ইংরেজ সাম্রাজ্য দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হল। এরপর পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার গুণে ক্রমে এদেশের মানুষের মনে জেগে উঠল প্রবল জাতীয়তাবোধ ও স্বদেশপ্রেম। তার প্রত্যক্ষ বহিঃপ্রকাশ দেখা গেল 'সিপাহী বিদ্রোহে'র (১৮৫৮) মধ্যে। বঙ্গদেশে ধারাবাহিক রাষ্ট্রীয় আন্দোলন শুরু হয়েছিল ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে 'বঙ্গভঙ্গ'কে কেন্দ্র করে লর্ড কার্জনের সময় থেকে। এই সময় এদেশের মেয়েরা ব্যাপকভাবে 'অরন্ধনব্রত' উদ্‌যাপন করেছিলেন।

জাতীয় জাগরণের শুরুতেই নারীরা একযোগে পুরুষদের সহায়তা করতে এগিয়ে এসেছিলেন। এই কারণে দেখা যায় যে, স্বাধীনতালাভের পূর্বেই ভারত শাসন আইন অনুযায়ী (১৯৩৫) এদেশের নারীরা অনায়াসে ভোটাধিকার লাভ করছেন। এজন্য পাশ্চাত্য দেশের নারীদের মতো তাঁদের স্বতন্ত্র কোনো আন্দোলন করতে হয় নি। আবার স্বাধীন ভারতের সংবিধানেও সর্বক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমানাধিকার স্বীকৃত হয়েছে। স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই নিরক্ষর, পর্দানসীন, এমন-কি বারাঙ্গনা শ্রেণীর মহিলারাও হাসিমুখে এগিয়ে এসেছিল আন্দোলনে যোগ দিতে। প্রথম দিকে পরোক্ষভাবে অংশ নিলেও অল্প কিছুদিন পরে তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে যোগ দিয়ে কারাবরণ এবং অকথ্য অত্যাচার নীরবে সহ্য করেছেন।

যে সময় নারীরা সংসারের অন্তরালে থেকে দেশের কাজ করেছেন, সেই সময়কার কয়েকজন নেত্রীস্থানীয়া মহিলা হলেন— কৃষ্ণকুমার মিত্রের স্ত্রী লীলাবতী মিত্র, ডা. নীলরতন সরকারের স্ত্রী নির্মলা সরকার, ডা. প্রাণকৃষ্ণ আচার্যের স্ত্রী সুবালা আচার্য, ডা. সুন্দরীমোহন দাসের স্ত্রী হেমাঙ্গিনী দাস প্রভৃতি। এঁরা সংসার জীবনে আবদ্ধ থেকেও, জনসাধারণ বিশেষ করে নারীজাতির মধ্যে স্বাদেশিকতাবোধ জাগিয়ে তুলতে যথেষ্ট ভাবে সাহায্য করেছিলেন।[৮]

একটি বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাঙালি মেয়েদের মনে প্রথম রাজনৈতিক চেতনার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে 'ইলবার্ট বিল' যাতে দ্রুত কার্যকরী হয় তার জন্য মেয়েদের পক্ষ থেকে লর্ড রিপনকে একটি লিখিত আবেদন পাঠানো হয়। কবি কামিনী রায়, বেথুন স্কুলের মেয়েদের নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে এই বিলকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। "ভারতে বসবাসকারী

ইউরোপীয়দের ফৌজদারী আইনে দণ্ডনীয় অপরাধের বিচারে মফঃস্বলে দেশীয় বিচারকদের অক্ষমতা অবিলম্বে দূর করাই ছিল ইলবার্ট বিলের অন্যতম উদ্দেশ্য।" ৯

ভারতীয়েরা যাতে সিভিল সার্ভিসে অংশ গ্রহণ করতে পারে এজন্য 'ভারত সভা'র পক্ষ থেকে আন্দোলন করা হয়। এই আন্দোলন পরিচালনার জন্য ব্যারিস্টার লালমোহন ঘোষকে ইংলন্ডে প্রেরণ করা হয় মহারানী স্বর্ণকুমারী দেবীর অর্থানুকূল্যে।

বঙ্গনারীর রাজনৈতিক চেতনার আরও পরিচয় উনিশ শতকে পাওয়া যায়। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে। এর চার বছর পরে ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দে বোম্বাইতে জাতীয় কংগ্রেসের যে অধিবেশন আহ্বান করা হয়, তাতে দুজন বঙ্গনারী যোগদান করেন -- বিখ্যাত লেখিকা স্বর্ণকুমারী দেবী ও প্রখ্যাত চিকিৎসক কাদম্বিনী গাঙ্গুলী। পরের বছর কলিকাতায় কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়, সেখানেও তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করেন। ডা. কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় কংগ্রেস সভাপতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা প্রদান করেন। অ্যানি বেশান্ট এই ঘটনার উল্লেখ করে বলেন যে, ভারতের স্বাধীনতার সঙ্গে ভারতের নারী জাতিও উন্নতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে "A symbol that India's freedom would uplift Indian Womanhood."

এই সময় "বাঙালীর মনোরাজ্যে যে ভাবের প্লাবন আসে তাহার মূলেও মহিলা কবি ও সাহিত্যিকদের প্রেরণা কম ছিল না। স্বর্ণকুমারী দেবী, কামিনী রায়, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, মানকুমারী বসু, হিরণ্ময়ী দেবী, কুমুদিনী মিত্র প্রমুখ কবি ও সাহিত্যিকাগণের সংগীত, কবিতা, প্রবন্ধ এবং পুস্তকাদি ক্রমশ প্রকাশিত হইয়া নরনারী নির্বিশেষে বাঙালী মাত্রকেই জাতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত করে।" ১০

উনিশ শতকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে যে- সকল নারী অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল :

স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫ - ১৯৩২)

শুধু সাহিত্য রচনা করেই ক্ষান্ত হন নি স্বর্ণকুমারী দেবী, নিজের দুই কন্যা হিরণ্ময়ী ও সরলাকে নিয়ে তিনি নানা ধরণের জনকল্যাণমূলক দেশের ও দশের কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে স্বর্ণকুমারী পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ দুই ভাবেই যুক্ত ছিলেন। 'সখি সমিতি' স্থাপন করে তিনি নারীদের মধ্যে স্বদেশচেতনা জাগাবার চেষ্টা করেছিলেন। এজন্য তিনি স্বতন্ত্র ধরণের সংগীত রচনা করেছিলেন—

শত কণ্ঠে কর গান জননীর পূত নাম
মায়ের রাখিব মান— লয়েছি এ মহাব্রত।
আর না করিব ভিক্ষা, স্বনির্ভর এই শিক্ষা
এই মন্ত্র, এই দীক্ষা, এই জপ অবিরত।

নমো নমো বঙ্গভূমি, মোদের জননী তুমি
তোমার চরণে নমি, নরনারী মোরা যত।"

দেশাত্মবোধের জাগরণে যখন বিদেশী পণ্য বর্জনের মনোভাব জেগে উঠেছিল দেশীয় মানুষেব মনে তখন উৎসাহ দানেব জন্য স্বর্ণকুমারী গান লিখলেন—

"সাক্ষী তুমি মহাশূন্য, না লব বিদেশী পণ্য,
ঘুচাব মায়ের দৈন্য, করিলাম এ শপথ।
পরিছিন্ন দেশী সাজ, মানি ধন্যা ধন্যা আজ,
মায়ের দীনতা লাজ হবে দূর পরাহত।"

কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৬১ - ১৯২৩)

চিকিৎসার কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকলেও কাদম্বিনী সুযোগ ও সুবিধা মতো বাজনৈতিক ও জনহিতকর কাজে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতেন। এ ছাড়া পরোক্ষভাবেও নানা কাজে যুক্ত থেকে সকলকে উৎসাহ এবং উপদেশ দান করতেন।

ভগিনী নিবেদিতা (১৮৬৭ - ১৯১১)

আয়ারল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করলেও নিবেদিতা স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে সুদূর ভারত তথা বাংলার মাটিতে তাঁর কর্মক্ষেত্র করে নিলেন। উনিশ শতকের বঙ্গসংস্কৃতির সঙ্গে ইনি নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছেন। তিনি ভারতের মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। সেই কারণে ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে তাঁকে রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করতে হয়েছিল। না হলে ঐ সন্ন্যাসী সম্প্রদায়কে রাজরোষে পড়তে হত।

এদেশের মেয়েদের স্বদেশী দ্রব্য উৎপাদন ও ব্যবহারের উপদেশ দিতেন নিবেদিতা। আর্থিক স্বয়ম্ভরতা লাভের উপায়স্বরূপ তিনি নারীদের চরকা গ্রহণের পরামর্শ দিতেন। বিপ্লবীদের তিনি নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন।

সরলাদেবী চৌধুরানী (১৮৭২ - ১৯৪৫)

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ক্ষেত্রে সরলাদেবীর নামটি উজ্জ্বল হয়ে আছে। অন্যান্য কাজের সঙ্গে দেশহিতৈষণার কাজে তিনি বিশেষ ভাবে আত্মনিয়োগ করেন। 'ভারতী' পত্রিকা সম্পাদনার সঙ্গে তিনি "বিলাতি ঘুষি বনাম দেশী কিল" প্রভৃতির ন্যায় প্রবন্ধ ও সংগীত রচনা করে দেশের যুবসমাজকে স্বদেশপ্রেমের মন্ত্রে উদ্‌বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। জাতীয় গৌরব জাগিয়ে তুলবার জন্য তিনি 'শিবাজী উৎসব', 'প্রতাপাদিত্য উৎসব' 'উদয়াদিত্য উৎসব' এবং দুর্গোৎসবের মহাষ্টমী তিথিতে 'বীরাষ্টমী ব্রত' পালনের রীতি প্রবর্তন করেন। নিজ ব্যয়ে তিনি বঙ্গের যুবকদের জন্য শরীর চর্চার উপযোগী ব্যায়ামাগার ও কুস্তির আখড়া গড়ে তোলেন। 'বীরাষ্টমী ব্রতে' গাইবার



ভগিনী নিবেদিতা



সরলা দেবীচৌধুরাণী

উপযোগী গানও তিনি রচনা করেছিলেন—

"স্বদেশানুরাগে যে জন জাগে,
অতি মহাপাপী হোক না কেন,
তবুও সেজন অতি মহাজন
সার্থক জনম তাহার জেনো।"

সরলা দেবী "লক্ষ্মীর ভাণ্ডার" নামে একটি প্রতিষ্ঠান খুলোছিলেন, যেখানে স্বদেশজাত বিবিধ দ্রব্য সংগ্রহ করা হত এবং প্রদর্শনীর আয়োজন করে সুলভে সেগুলি বিক্রি করা হত।

সরোজিনী নাইডু (১৮৭৯-১৯৪৯)

সরোজিনী সাহিত্য এবং রাজনীতি উভয় ক্ষেত্রেই সুপরিচিত। ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দ থেকে তিনি প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে যোগদান করেন। বাগ্মীরূপে তাঁব যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। ভারতীয় নারীর অধিকার– প্রতিষ্ঠার কাজে তিনি ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন (১৯১৯)। কানপুরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে (১৯২৫) তিনি ছিলেন সভানেত্রী। আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করে তিনি কারাবরণ করেন (১৯৩০)। ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দে তিনি গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করেন। স্বাধীন ভারতে (১৯৪৭) ইনি উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল নিযুক্ত হয়েছিলেন।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে বঙ্গনারী ভূমিকা

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনেব পর থেকে দুই ভাবে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হল— অহিংস এবং সহিংস। দলে দলে নারী এই সব আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের পরিবারের মেয়েরা স্বইচ্ছায় ফেরারি বা পলাতক কর্মীদের গোপনে আশ্রয় দিতেন, পিস্তল বা রিভলবার রাখা বা স্থানান্তরে নিয়ে যেতে সাহায্য করতেন, এবং চিঠি আদানপ্রদানের কাজেও সহায়তা করতেন। অন্যদিকে গান্ধীজীর নেতৃত্বে যে অসহযোগ, আইন অমান্য, ভারতছাড়ো আন্দোলন শুরু হল সেখানেও নারীকর্মীর সংখ্যা নেহাত কম ছিল না। এ ক্ষেত্রে বলাই বাহুল্য যাঁদের জন্ম হয়েছিল উনিশ শতকে, শুধুমাত্র তাঁদের কয়েকজনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে তুলে ধরা হল :

মাতঙ্গিনী হাজরা (জন্ম ১৮৭০ খ্রী.)

মাতঙ্গিনী মেদিনীপুর জেলার তমলুক থানার হোগলা গ্রামের এক কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩০-এ মেদিনীপুরে রাজনৈতিক চেতনা এত তীব্র আকারে জেগে উঠেছিল যে, সেখানকার প্রায় প্রতিটি নর-নারী দেশের জন্য আত্মোৎসর্গ করতে প্রস্তুত ছিলেন।

১৯৩২ খ্রীস্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি যখন স্বদেশী স্বেচ্ছাসেবকেরা শোভাযাত্রা করে যাচ্ছিলেন সেইদিন মাতঙ্গিনী প্রথম তাতে যোগ দেন। ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দের ২৯ সেপ্টেম্বর তমলুকে পাঁচটি বিরাট শোভাযাত্রা বেরিয়েছিল, তাতে অসংখ্য নারীও অংশ গ্রহণ করেন। উত্তরদিক থেকে এসেছিলেন বাহাত্তর বছরের বৃদ্ধা মাতঙ্গিনী হাজরা—তিনি জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে

চলেছিলেন পাঁচ হাজার নরনারীর মিছিলেন অগ্রভাগে। সেই সময় পুলিশের গুলিবিদ্ধ হয়ে তার প্রাণহীন দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিল।

মোহিনী দেবী (জন্ম ১৮৬৩)

ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জের বেউথা গ্রামে জন্মেছিলেন মোহিনী। ভিক্টোরিয়া স্কুলে তিনি লেখাপড়া করেছিলেন। একদিকে অসহযোগ আন্দোলন প্রভৃতি রাজনৈতিক কর্মপন্থা ও অন্যদিকে জনকল্যাণমূলক বহুকাজে ইনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

বাসন্তী দেবী (জন্ম ১৮৮০)

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সহধর্মিণী বাসন্তী দেবীব আত্মত্যাগের তুলনা নেই। তাঁর পিত্রালয় ছিল ঢাকা-বিক্রমপুর। সাংসারিক দায়িত্বভার ভিন্ন তিনি স্বামীর পাশে দাঁড়িয়ে রাজনৈতিক গুরু দায়িত্বে অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

সরমা গুপ্তা (জন্ম ১৮৮২)

ঢাকায জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২১ খ্রীস্টাব্দে অসহযোগ আন্দোলনের সময় থেকে ইনি সম্পূর্ণ ভাবে দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

ক্ষীরোদাসুন্দরী চৌধুরী (জন্ম ১৮৮৩)

ময়মনসিংহ জেলার সুন্দাইল গ্রামে জন্ম। দেবরপুত্র বিপ্লবী ক্ষিতীশ চৌধুরীকে সাহায্য করতে গিয়ে, নিজেও শেষ পর্যন্ত বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান 'যুগান্তর'-এর সদস্যা হয়েছিলেন।

চারুশীলা দেবী (জন্ম ১৮৮৩)

মেদিনীপুরের অধিবাসিনী ছিলেন। বিখ্যাত শহীদ ক্ষুদিরাম বসু তাঁর গৃহে অনেক সময় অবস্থান করতেন। রাজনৈতিক বন্দিনী রূপে তাঁকে বহুদিন কারাবাস করতে হয়েছিল।

সুরমা মুখোপাধ্যায় (জন্ম ১৮৮৪)

জন্মেছিলেন কলকাতায় কিন্তু বিবাহের পর কাটোয়াতে বসবাস করতে হয়। প্রথমে স্বামীর প্রভাবে দেশসেবার আদর্শ গ্রহণ করেন। অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। পরবর্তী জীবনে তিনি নানাভাবে দেশের কাজ করে গিয়েছেন।

ঊর্মিলা দেবী (জন্ম ১৮৮৩)

ইনি ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের কনিষ্ঠা ভগিনী। অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। লবণ আইন ভঙ্গের সময় যে 'নারী সত্যাগ্রহী সমিতি' (১৯৩০) গড়ে ওঠে, ইনি ছিলেন ঐ সমিতির সভানেত্রী।

নেলী সেনগুপ্তা (জন্ম ১৮৮৬)

ইনি ইংরেজ ললনা হলেও ছিলেন বঙ্গের বধূ— দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের সহধর্মিণী। এদেশের মানুষের পরাধীনতার গ্লানির কথা স্মরণ করে, গভীর সহানুভূতি সম্পন্ন হয়ে ইনি অক্লেশে ও হাসিমুখে কারাবরণ করেছিলেন।

শশীবালা দেবী (জন্ম ১৮৮৬)

বগুড়া জেলার অধিবাসিনী শশীবালা ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ থেকে রাজনৈতিক আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

স্নেহশীলা চৌধুরী (জন্ম ১৮৮৬)

ইনি জন্মেছিলেন খুলনা জেলার রাড়ুলি গ্রামে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় থেকেই তাঁর মনে দেশসেবার কাজে আত্মনিয়োগের ইচ্ছা জেগে ওঠে। অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনে তিনি যোগ দিলেন এবং এই সময় থেকেই তিনি প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কর্মী হয়ে উঠলেন।

দুকড়িবালা দেবী (জন্ম ১৮৮৭)

বীরভূম জেলার নলহাটি থানার কাউপাড়া গ্রামের অধিবাসিনী ছিলেন। বিপ্লবী নিবারণ ঘটকের সহায়তার জন্য ইনি সাতটি মসার (Mauser) পিস্তল লুকিয়ে রাখেন। এজন্য পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার (১৯১৭) করে এবং তাঁকে দুবছর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়েছিল।

ননীবালা দেবী (জন্ম ১৮৮৮)

ইনি হাওড়া জেলার বালি অঞ্চলের অধিবাসিনী ছিলেন। ননীবালা তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র অগ্নি-যুগের বিপ্লবী অমরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী ও আরও কয়েকজনকে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিলেন বলে সেই অপরাধে পুলিশ তাঁকে দুবছর কারারুদ্ধ করে রাখে এবং অকথ্য অত্যাচার চালায়। পরে কারামুক্ত হয়ে তিনি অতি কষ্টে জীবনযাপন করেছিলেন।

হেমপ্রভা মজুমদার (জন্ম ১৮৮৮)

নোয়াখালিতে হেমপ্রভার জন্ম। প্রথম অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন, পরে আজীবন তিনি নানা ভাবে দেশের সেবা করে গিয়েছেন।

লাবণ্যপ্রভা দত্ত (জন্ম ১৮৮৮)

বহরমপুরে মাতুলালয়ে জন্ম। ইনি এক রক্ষণশীল বৈষ্ণব জমিদার বংশের বধূ হয়েও নারী-সত্যাগ্রহীদের দলে যোগ দিয়েছিলেন প্রত্যক্ষভাবে।

সরযূ গুপ্তা (জন্ম ১৮৮৮)

এঁর পিত্রালয় ছিল ঢাকা-বিক্রমপুরের সোনারং গ্রামে। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-বিদ্যায় দক্ষতা

অর্জন করেন এবং কলিকাতায় অবস্থান করেন। ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে কংগ্রেস প্রতিনিধিরূপে যোগদান করেন।

জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী (জন্ম ১৮৮৯)

ইনি ছিলেন বিখ্যাত দম্পতি দ্বারকানাথ ও কাদম্বিনী গাঙ্গুলীর কন্যা। এম. এ. পাস করে ইনি বিভিন্ন মহিলা শিক্ষায়তনে অধ্যক্ষারূপে কাজে যোগ দেন এবং স্ত্রীশিক্ষা প্রচার ও প্রসারের কাজে ব্যস্ত থাকতেন। স্বদেশপ্রেমে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে ইনি নানা রাজনৈতিক ও সমাজ-সেবামূলক কাজও করতেন। ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দের ২১ নভেম্বর ছাত্রদের পুলিশী অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করতে গিয়ে এক দুর্ঘটনায় ইনি মৃত্যু বরণ করেন।

সরযূবালা সেন (জন্ম ১৩০০ বঙ্গাব্দ)

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় থেকেই এঁর মনে রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত হয় এবং ইনি স্বদেশী আন্দোলনে সক্রিয় ভাবে যোগদান করেন।

সুশীলা মিত্র (জন্ম ১৮৯৩)

ত্রিপুরা জেলার আশাকাঠি গ্রামে জন্ম হয়। বিবাহের পর নোয়াখালিতে অবস্থান করেন। ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্রের কিছু বিপ্লবীকে তিনি ও তাঁর স্বামী কুমুদিনীকান্ত মিত্র গৃহে আশ্রয় দিয়েছিলেন (১৯১৪-১৫)। পরবর্তীকালে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেন।

সরযূবালা সেন (জন্ম ১৮৮৯)

ঢাকা-বিক্রমপুরের মূলচর গ্রামে জন্ম। প্রথম অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন এবং পরে সম্পূর্ণ ভাবে দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

প্রভা চট্টোপাধ্যায় (জন্ম ১৮৯৭)

জন্মেছিলেন ঢাকা-বিক্রমপুরে। অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেবার পর আজীবন দেশসেবা করে গেছেন।

চারুপ্রভা সেনগুপ্তা (জন্ম ১৮৯৭)

ময়মনসিংহ জেলার কাঠালিয়া গ্রামে জন্ম। ফরিদপুরে বিবাহ হয়। গান্ধীজীর আহ্বানে ডান্ডী অভিযানে অংশ গ্রহণ করেন (১৯৩০) এবং পরে সম্পূর্ণভাবে রাজনীতিতে যোগ দেন।

প্রফুল্লমুখী বসু (জন্ম ১৮৯৮)

বরিশালের বানরীপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। মহাত্মা গান্ধী ঢাকায় যান যখন (১৯২১) তখন থেকে ইনি স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করেন।

কিরণবালা (জন্ম ১৮৯৯)

ঢাকা-বিক্রমপুরে পূর্বখিলা পাড়ায় জন্ম। পনেরো বছর বয়সে মুকুন্দ দাসের স্বদেশী যাত্রা শুনে, স্বদেশপ্রেমে অভিভূত হন এবং আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করে কারারুদ্ধ হন।

ঊষা গুহ (জন্ম ১৮৯৯)

ময়মনসিংহ জেলায় জন্ম। গান্ধীজীর আহ্বানে ইনি লবণ আইন ভঙ্গ আন্দোলনে যোগদান করেন।

এঁরা ছাড়াও বহু নাম-না-জানা মহিলা সেদিন স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়েছিলেন এবং দেশের কাজে আত্মহারা হয়ে অন্তঃপুর ছেড়ে বাইরের জগতে পা বাড়িয়েছিলেন।[১১]

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

চিকিৎসাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বঙ্গমহিলা

সেবাশুশ্রূষা করার একটি স্বাভাবিক প্রবণতা আছে নারীজাতির মনে। এদেশের মেয়েরা শিশুদেব পালনের ক্ষেত্রে অথবা ঘরোয়া চিকিৎসার ব্যাপারে চিরকালই কিছু কিছু ভেষজ গাছ-গাছড়া ব্যবহার করে এসেছেন, যা তাঁদের বাড়ির আশেপাশে সহজলভ্য ছিল। বিশেষ করে কবিরাজদের ঘরের মেয়েদের মধ্যে অনেকের রীতিমতো নাড়ীজ্ঞান ছিল এবং তাঁরা আয়ুর্বেদিক ওষুধ তৈরি ও প্রয়োগে ছিলেন সিদ্ধহস্ত। স্মরণাতীত কাল থেকে ভারতে প্রায় সর্বত্রই আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার প্রচলন ছিল। কিন্তু ইংরেজ আমলে পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে এল অ্যালোপ্যাথিক পদ্ধতিব চিকিৎসা। তারও পরে এল হোমিওপ্যাথিক রীতির চিকিৎসা। এদেশের জনসাধারণের মনে ধীবে ধীবে কবিরাজী চিকিৎসার প্রতি আগ্রহ ও আস্থা স্তিমিত হয়ে এল।

কলিকাতা মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয় ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দে। বঙ্গীয় নারীদের উচ্চশিক্ষার পথ প্রশস্ত হল প্রকৃতপক্ষে ১৮৪৯ সনের ৭ মে। এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আন্তরিক প্রচেষ্টায় ঐদিন প্রতিষ্ঠিত হল 'হিন্দুবালিকা বিদ্যালয়'। বেথুন সাহেবের মৃত্যুর পর বিদ্যালয়টি 'বেথুন বিদ্যালয়' নামে পরিচিত হয়। এই স্কুলের অনেক ছাত্রী চিকিৎসা বিজ্ঞান পড়ার জন্য উৎসুক হলেন এবং সেজন্য আবেদনও করলেন। কিন্তু মেডিকেল কলেজেব কর্তৃপক্ষ তখন শুশ্রূষাকারিণী বা নার্স হিসাবে নারীদের গ্রহণ করলেও, চিকিৎসকরূপে তাঁদের প্রবেশাধিকার দিতে নারাজ হলেন। সেজন্য দুর্গামোহন দাসের কন্যা অবলা বেথুন স্কুল থেকে ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মাদ্রাজ মেডিকেল কলেজে পড়তে যান ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে। শেষপর্যন্ত অবশ্য তাঁর চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন সম্পূর্ণ করেন নি। ইনিই প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসুর সহধর্মিণী লেডী অবলা বসু নামে বিখ্যাত হন।

ব্রজকিশোর বসুর কন্যা কাদম্বিনী বসু ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে ভারতীয় নারীদের মধ্যে প্রথম প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং বেথুন কলেজে প্রবেশ করেন। সেখান থেকে ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে তিনি এবং চন্দ্রমুখী বসু ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে প্রথম বি.এ. পাস করেন। বিখ্যাত সমাজসেবক দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে তিনি বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন। এর পর কাদম্বিনী কলিকাতা মেডিকেল কলেজে পাঁচ বছর পড়াশোনা সম্পন্ন করেন ১৮৯২খ্রীস্টাব্দে। যোগ্যতার পরিচয় দিলেও তাঁকে এম. বি. ডিগ্রির পরিবর্তে দেওয়া হল স্পেশাল সার্টিফিকেট। তার প্রকৃত কারণ হল "মহিলাদের মেডিকেল কলেজে ভর্তির জন্য তখন চেষ্টা হচ্ছিল। অধ্যাপক গোষ্ঠীর

অনেকেই মহিলাদের ডাক্তার হওয়ার বিরুদ্ধে ছিলেন। ডা. চন্দ্রও (রাজেন্দ্রচন্দ্র চন্দ্র) বিরুদ্ধবাদীদের একজন। ১৮৮৪ সালে যখন কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় মেডিকেল কলেজে ভর্তি হলেন তখন ডা. চন্দ্র খোলাখুলি অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর জন্যই কাদম্বিনী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি লাভে বঞ্চিত হলেন।"[১১]

উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য কাদম্বিনী ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দে বিলাতে যান এবং অনায়াসে এল. আর. সি.পি. (এডিনবরা), এল.আর.সি.এস. (গ্লাসগো) এবং ডি.এফ.সি.এস. (ডাবলিন) উপাধি অর্জন করে দেশে ফিরে আসেন। কলিকাতা মেডিকেল কলেজের প্রথম ছাত্রী কাদম্বিনী দীর্ঘকাল ধরে চিকিৎসা ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন এবং সুনাম অর্জন করেছিলেন।

এরপর বেথুন স্কুলের দুজন ছাত্রী বিধুমুখী বসু ও ভার্জিনিয়া মেরী মিত্র ১৮৮৯ সালে মেডিকেল কলেজ থেকে এম. বি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বিধুমুখী ছিলেন বিদুষী চন্দ্রমুখী বসুর ভগিনী। ভার্জিনিয়া মেরী মিত্র (নন্দী) ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দে মেডিকেল কলেজের এম.বি. পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করেছিলেন।

এ সময়কার আরও একজন কৃতী মহিলা চিকিৎসক ছিলেন ডা. যামিনী সেন (১৮৭১-১৯৩২)। ইনি ছিলেন চণ্ডীচরণ সেনের কন্যা ও কবি কামিনী রায়ের ভগিনী। আই. এম. এস. উপাধি-ভূষিতা এই মহিলা চিকিৎসক বিলাতের 'সোসাইটি অফ সার্জনস্ অ্যান্ড ফিজিক্যাল সায়েন্স'-এর ফেলো নির্বাচিত হন।

পরবর্তীকালে বহু জ্ঞানী ও গুণী মহিলা চিকিৎসকের আবির্ভাব ঘটে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সমাজসেবায় বঙ্গমহিলা

উনিশ শতকের শিক্ষিত ও সংস্কৃতিসম্পন্ন বাঙালি মহিলারা আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থপর ছিলেন না। একক ও সমবেতভাবে তাঁরা সাধ্যমতো দেশের ও দশের সেবায় অগ্রসর হয়েছিলেন। নারীমঙ্গলকামী কয়েকজন পুরুষের সহায়তায় বেশ কয়েকটি সংস্থা গড়ে তুলে তাঁরা নিজেদের সংগঠনী প্রতিভা, কর্মদক্ষতা ও পরিচালন ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছিলেন। আদর্শ হিসাবে তাঁদের সামনে ছিল হয়তো কয়েকটি ইংরেজী ও খ্রীস্টান মহিলা প্রতিষ্ঠান—'ফিমেল জুভিনাইল সোসাইটি', 'লেডিজ সোসাইটি', 'লেডিজ অ্যাসোসিয়েশন' প্রভৃতি। এই জাতীয় কয়েকটি সংস্থার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল:

'ব্রাহ্মিকা সমাজ' (১৮৬৫)

প্রধানত কেশবচন্দ্র সেনের চেষ্টায় 'ব্রাহ্মিকা সমাজ' গড়ে উঠেছিল। এখানে মহিলারা নিজেদের মধ্যে নানা আলাপ-আলোচনা, বিতর্ক, গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ পাঠ করতেন।

'বামাহিতৈষিণী সভা' (১৮৭১-১৮৭৯)

এই সভারও সভাপতি ছিলেন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন। সম্পাদিকা ছিলেন রাধারানী লাহিড়ী। পরবর্তীকালে ব্রাহ্মসমাজে মতবিরোধ ঘটায় কেশবচন্দ্রের অনুবর্তিনীরা প্রতিষ্ঠা করেন 'আর্যনারী সমাজ' (১৮৭৯) ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সমর্থকরা স্থাপন করেন 'বঙ্গমহিলা সমাজ' (১৮৮০) বা 'বেঙ্গল লেডিজ অ্যাসোসিয়েশন'।

'বঙ্গমহিলা সমাজে'র প্রথম অধিবেশনটি অনুষ্ঠিত হয় আনন্দমোহন বসুর বাড়িতে (১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দে ৮ই আগস্ট)। এই সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন রামতনু লাহিড়ী। এই সংস্থার স্থায়ী সভানেত্রী ছিলেন আনন্দমোহন বসুর স্ত্রী স্বর্ণপ্রভা বসু। এখানকার সদস্যারা দেশ ও বিদেশের নারীজীবনের নানা সমস্যা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতেন এবং বহু জনহিতকর কাজেও তাঁরা মনোনিবেশ করেছিলেন।

'সখি সমিতি' (১৮৮৬)

'সখি সমিতি'র উদ্যোক্তা ছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী। একদা অভিজাত ও শিক্ষিত মহিলা মহলে মাদাম ব্লাভাট্‌স্কি (১৮৩১-৯১), অ্যানি বেসান্ট (১৮৪৭-১৯৩৩) প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল মহিলা থিয়সফিস্ট সোসাইটি। অল্প কিছুদিন পরে সেটি ভেঙে যায়। তখন ঐ-সব

সদস্যাদের নিয়ে স্বর্ণকুমারী উৎসাহ সহকারে গড়ে তুললেন এই 'সখি-সমিতি'। তিনি নিজে ছিলেন এর স্থায়ী সভানেত্রী। সমিতির নামকরণ করেছিলেন কবি রবীন্দ্রনাথ। সমিতির উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে— 'অসহায় বঙ্গবিধবা ও অনাথা বঙ্গকন্যাগণকে সাহায্য করা এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য।..." ইত্যাদি [১৩]

এই সমিতির উদ্যোগে একাধিক শিল্পমেলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। পরে এই 'সখি সমিতি' পরিণত হয় 'বিধবা শিল্পাশ্রমে' (১৯০৬)। হিরণ্ময়ী দেবী এই আশ্রমের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পরে ঐ প্রতিষ্ঠানকে 'হিরণ্ময়ী বিধবা শিল্পাশ্রম' নামে অভিহিত করা হত।

সেকালের কয়েকজন বিশিষ্ট সমাজসেবিকার কথা এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে। স্বর্ণকুমারী দেবী ছিলেন একজন প্রথম শ্রেণীর সমাজসেবিকা এবং এই দিক থেকে তাঁর কন্যাদ্বয়—হিরণ্ময়ী ও সরলাও ছিলেন তাঁর সুযোগ্যা উত্তরাধিকারিণী।

কৃষ্ণভামিনী দাস (১৮৬৪-১৯১৯)

ইনি ছিলেন অধ্যাপক দেবেন্দ্রনাথ দাসের সহধর্মিণী। স্বামীর সঙ্গে চোদ্দ বছর ইংলন্ডে অবস্থান করেন। কিন্তু অল্প দিনের ব্যবধানে স্বামী ও পুত্রকে হারিয়ে শোকাভিভূত হয়েও, দেশে ফিরে তিনি মানবসেবার কাজে নিজের সকল শক্তি নিয়োগ করেন। ব্যক্তিগত আরাম বিলাস চিরতরে ত্যাগ করেছিলেন। দেশী মোটা খদ্দরের শাড়ি পরে, খালি পায়ে, তিনি কলকাতার সর্বত্র পরিভ্রমণ করতেন এবং অন্তঃপুরচারিণী নারীদের শিক্ষাগ্রহণের জন্য উৎসাহ দিতেন। তাঁর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত 'ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলে'র তিনটি শাখায় মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর সঙ্গে সেলাই, গান, যন্ত্র সংগীত ইত্যাদিও শেখানো হত। তিনি একটি বিধবা আশ্রমও (১৯১৬) গড়ে তুলেছিলেন। সু-চিন্তিত প্রবন্ধের লেখিকা হিসাবেও তাঁর খ্যাতি ছিল।

লেডি অবলা বসু (১৮৬৪-১৯৫১)

অবলা বসু ছিলেন বিখ্যাত আইনজীবী ও ব্রাহ্মসমাজের কর্মী দুর্গামোহন দাশের মধ্যমা কন্যা এবং আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর পত্নী। ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে বেথুন স্কুল থেকে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন। সেকালে কলিকাতা মেডিকেল কলেজে ছাত্রীদের নেওয়া হত না, সেই কারণে তিনি মাদ্রাজ মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন।

তিনি ভগিনী নিবেদিতার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলেন। একদিকে জীবনসঙ্গিনী হিসাবে বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্রকে সর্ববিষয়ে সহায়তা করতে হত, অন্যদিকে সমাজসেবামূলক কাজেও তাঁর উৎসাহের অন্ত ছিল না। নারীজাতির মঙ্গল সাধনের জন্য তিনি নারী শিক্ষা সমিতি (১৯১৯) স্থাপন করেছিলেন। এখানে শিল্পভবন ও বাণী ভবন দুটি শাখায় বাল-বিধবা ও দুর্গত মহিলাদের নানাবিধ শিল্পশিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। স্বাদেশিকতাবোধের বশবর্তী হয়ে তিনি দেশের মঙ্গলজনক আরও নানা কাজ করে গিয়েছেন।

ভগিনী নিবেদিতা (১৮৬৭-১৯১১)

মার্গারেট এলিজাবেথ নোব্‌ল্ নিজের পড়াশোনা সাঙ্গ করে শিক্ষয়িত্রীরূপে যখন নিজেকে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন, ঠিক সেই সময় তিনি সাক্ষাৎ লাভ করেন স্বামী বিবেকানন্দের এবং সেইসঙ্গে তাঁর যেন নবজন্ম লাভ হল। জগতের কাছে তিনি 'ভগিনী নিবেদিতা' নামে পরিচিত হলেন। গুরুর কাছে ব্রহ্মচর্যের দীক্ষা নিয়ে তিনি ভারতের জনসাধারণের মঙ্গলকর্মে তাঁর জীবন উৎসর্গ করলেন।

শ্রী সারদা মায়ের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলেন নিবেদিতা। আধ্যাত্মিক সত্যকে জানার যেমন চেষ্টা করেছিলেন, সেইসঙ্গে জেনেছিলেন এদেশের সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি ও জনসাধারণকে। এদেশের মেয়েদের জীবন থেকে তিনি অশিক্ষা ও কুসংস্কারের অন্ধকার দূর করতে চেয়েছিলেন। কলকাতার বাগবাজার অঞ্চলে তিনি অতি যত্নে এবং অনেক কষ্টে গড়ে তুলেছিলেন একটি বিদ্যালয়, সেটি আজ তাঁর নামে নামাঙ্কিত হয়ে বিরাজ করছে।

প্রথম যখন তিনি কলকাতায় এলেন (১৮৯৮), তার দুবছর পরেই প্লেগ মহামারীতে কলকাতাবাসী ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল। মৃত্যুভয়কে তুচ্ছ করে তিনি সেই সব বিপন্ন মানুষদের সেবা করেছিলেন। তাঁর সহায় ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী সম্প্রদায়। পূর্ববঙ্গে বরিশাল জেলার মানুষরা যখন দুর্ভিক্ষের কবলগ্রস্ত হয়েছিল। সেইসব আর্ত মানুষের সেবার জন্য তিনি সেখানে ছুটে গিয়েছিলেন। এদেশকে তিনি স্বদেশ জ্ঞানে সেবা করে গেছেন।

মোহিনী সেন (১৮৬৩-১৯৫৫)

ঢাকার অধিবাসী রামশঙ্কর সেনের কন্যা, বারো বছর বয়সে মোহিনী দেবী তারকচন্দ্র দাশগুপ্তের পত্নী হলেন—সেই পরিচয় ছাড়াও তাঁর অন্য পরিচয় আছে। ভিক্‌টোরিয়া স্কুলের ইনি ছিলেন প্রথম হিন্দু ছাত্রী। ভালোভাবে তিনি ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করেন। পরবর্তীকালে তিনি সমাজকল্যাণ ও দেশসেবায় জীবন উৎসর্গ করেন। 'নিখিল ভারত মহিলা সম্মিলনী'তে ইনি সভানেত্রী রূপে চমৎকার ভাষণ দান করেন। ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার সময় উভয়ের মধ্যে ঐক্য সাধনের অনেক চেষ্টা করেছিলেন।

পণ্ডিতা রমাবাঈ (১৮৫৮-১৯২২)

জন্মের দিক থেকে রমাবাঈ বাঙালিনী না হলেও বিবাহসূত্রে ছিলেন বঙ্গবধূ। মহারাষ্ট্রের মাঙ্গালোর জেলার এক মারাঠী পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। শৈশবে পিতা অনন্ত শাস্ত্রীর কাছে মারাঠী ও সংস্কৃত ভাষা তিনি ভালোভাবে শিক্ষা করেছিলেন। পরবর্তী জীবনে তিনি হিন্দুস্থানী, কর্ণাটকী ও বাংলা ভাষাও আয়ত্ত করেন। যখন পিতামাতা উভয়েই মারা যান (১৮৭৪) তখন তিনি একমাত্র ভাইকে সঙ্গে নিয়ে পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ, আসাম প্রভৃতি ভারতের নানাস্থানে ভ্রমণ করেন। ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে আসেন কলকাতায়। তাঁরা ভাইবোনে মিলে বড়ো বড়ো শহরে

স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বক্তৃতা দিতেন। রমাবাঈয়ের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে কলকাতার পণ্ডিতসমাজ তাঁকে 'সরস্বতী' ও 'পণ্ডিতা' উপাধিতে ভূষিত করেন। ভ্রাতার মৃত্যুর পর ইনি শ্রীহট্ট প্রবাসী এক তরুণ বাঙালি আইনজীবী বিপিন-বিহারী দাসকে বিবাহ করেন এবং ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু মাত্র দু'বছর পরেই রমাবাঈয়ের জীবনে বৈধব্য ঘটে। এর পর ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দ থেকে তিনি নারীকল্যাণের কাজে মগ্ন হলেন। তিনি 'আর্যসমিতি' প্রতিষ্ঠা করেন। এই সমিতিব উদ্দেশ্য ছিল নারীশিক্ষা বিস্তার। বাল্যবিবাহ প্রভৃতি কু-প্রথা দমন এবং যাবতীয় নারীমঙ্গলজনক কাজ। এর ফলে তিনি রক্ষণশীল সম্প্রদায় কর্তৃক এমনভাবে নির্যাতিতা হলেন যে শেষ পর্যন্ত খ্রীস্ট ধর্ম গ্রহণ করে, ইংল্যান্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করেন। তাঁর রচিত কয়েকটি ইংরেজী ও মারাঠী ভাষায় রচিত গ্রন্থ আছে।

রোকেয়া বেগম (১৮৮০-১৯৩২)

সেকালে মুসলিম সম্প্রদায়ের মেয়েরা শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে খুব পিছিয়ে ছিলেন, তার প্রধান কারণ হল, তাঁদের মধ্যে ছিল কঠোর পর্দাপ্রথা। রোকেয়া বেগম ছিলেন এঁদের মধ্যে ব্যতিক্রম। নিজের চেষ্টায় ভালোমতো লেখাপড়া শিখেছিলেন, কিন্তু শুধুমাত্র আত্মোন্নতি নয়, তিনি অপরাপর অসহায় নারীদের উন্নতি সাধনের জন্য আন্তরিকভাবে চিন্তা করেছিলেন। তাই তিনি অনেক কষ্ট স্বীকার করেও সমাজসেবার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর রচিত সাহিত্যের মধ্যেও এই মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি যে স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁর স্বামীর নামে সেই সাখওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলটি আজও বর্তমান আছে। নারীপ্রগতির কথা চিন্তা করে তিনি 'আঞ্জুমান খাওয়াতীন' (১৯১৬) নামে একটি মহিলা সমিতিও গড়ে তুলেছিলেন।

চারুশীলা দেবী (১৮৮২-১৯৭৯)

চারুশীলা বেথুন কলেজে পড়াশুনা শেষ করে ঢাকা ইডেন স্কুলে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। তাঁর মামা স্বামী পরমানন্দ মহারাজের উপদেশ শুনে তিনি তিন বছরের জন্য ইউরোপে যান। ফিরে এসে সমাজসেবার কাজে মনোনিবেশ করেন। পরে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার (১৯৪৬) পর তিনি এই আশ্রম ঢাকা থেকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করেন, তাঁর কয়েকজন আশ্রমকন্যাকে নিয়ে। অসহায় মেয়েরা আর্থিক দিক থেকে স্বনির্ভর হয়ে, মর্যাদাসম্পন্ন জীবন যাপন করুক, এই ছিল তাঁর শিক্ষার উদ্দেশ্য।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

নাটকাভিনয়ে বঙ্গনারী

পুরাতনের প্রতি আকর্ষণ বাঙালির মনে খুব প্রবল, তাই হয়তো দীর্ঘকাল ধরে যাত্রাগান, পাঁচালী, কবিগান, আঁখড়াই, হাফ-আখড়াই ইত্যাদি এদেশের জনসাধারণের মনোরঞ্জন করতে সমর্থ হয়েছে। পাশ্চাত্য শিক্ষাব প্রভাবে উনিশ শতকে এদেশের লোকের মনে পাশ্চাত্য থিয়েটারেব অনুসরণে বাংলা রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করার ইচ্ছা হল। যদিও প্রথম যুগে অভিনয় উপযোগী বাংলা নাটক পাওয়া যেত না। সেজন্য ইংরেজী বা সংস্কৃত নাটকের বাংলা অনুবাদ করে অভিনীত হত। কিন্তু সেগুলি তেমন জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারে নি।

সর্বপ্রথম বাংলা নাটকাভিনয়ের সংবাদ পাওয়া যায় ১৭৯৫ খ্রীস্টাব্দে। গোলকনাথ দাশের সহায়তায় এক রুশ ভদ্রলোক হেরেসিম লেবেডফ কলকাতায় 'বেঙ্গলী থিয়েটার' নামে এক রঙ্গমঞ্চে দুটি ইংরেজী নাটকের বঙ্গানুবাদ করে বাঙালী নট-নটীদের দিয়ে অভিনয় করিয়েছিলেন। তারপর দীর্ঘকাল আর অনুরূপ কোনো নাটকাভিনয়ের কথা শোনা যায় না।

দীর্ঘকাল পরে কয়েকজন ইংরেজী শিক্ষিত ধনী বাঙালি যুবক থিয়েটার প্রতিষ্ঠার বিলাসিতা নিয়ে মেতে উঠলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষিত নব্য বাঙালির প্রতিষ্ঠিত প্রথম নাট্যশালা হল প্রসন্নকুমাব ঠাকুরের 'হিন্দু থিয়েটার' (১৮৩১)। এর পর বাঙালির উদ্যোগে প্রথম বাংলা নাটকের অভিনয় দেখা গেল শ্যামবাজারে নবীনচন্দ্র বসুর প্রতিষ্ঠিত বিলাতী ধরণের নাট্যশালায় (১৮৩৫)। এখানে 'বিদ্যাসুন্দর' নাটকেব অভিনয় হয়েছিল। 'হিন্দু পাইয়োনিয়ার' পত্রিকায় তার বিবরণ প্রকাশিত হয়। এই নাটকাভিনয়ের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল তিনজন নারী—রাধামণি, জয়দুর্গা ও রাজু অভিনয় করেন— বিদ্যা, বিদ্যার সখী, রানী এবং মালিনীর ভূমিকায়। নারী চরিত্রের ভূমিকায় যাঁরা অভিনয় করেছিলেন তাঁদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে—"এই নাটকে বিশেষ করিয়া স্ত্রী চরিত্রের অভিনয় খুব চমৎকার হইয়াছিল। রাজা বীর সিংহের কন্যা ও সুন্দরের প্রণয়িনী বিদ্যার ভূমিকা রাধামণি বা মণি নামে একটি ষোলো বছরের বালিকা অভিনয় করিয়াছিল। সে আগাগোড়া খুব নৈপুণ্য দেখাইয়াছিল। তাহার সুললিত অঙ্গভঙ্গি, মধুর কণ্ঠস্বর, সুন্দরের প্রতি প্রণয়সূচক হাবভাব দর্শক মণ্ডলীকে অতিশয় মুগ্ধ করিয়াছিল। অভিনয় কালে সে একবারও নৈপুণ্যের অভাব দেখায় নাই।... অন্যান্য স্ত্রী চরিত্রের অভিনয়ও খুব উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে রাণীর ও মালিনীব অভিনয়ের উল্লেখ না করা অন্যায় হইবে। জয়দুর্গা নামে একটি প্রৌঢ়া রমণী এই দুইটি ভূমিকাই গ্রহণ করিয়া উভয় অংশেই সমান কৃতিত্ব দেখাইয়াছিল।... রাজকুমাবী

বা রাজু নামে আর একটি স্ত্রীলোকও বিদ্যার সখীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়া জয়দুর্গার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ না হইলেও সমান কৃতিত্ব দেখাইয়াছিল।"[১৪]

এর পর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় অনেকগুলি শখের থিয়েটার গড়ে উঠেছিল। যেমন—

বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ (১৮৫৬)

কালীপ্রসন্ন সিংহের ইচ্ছায় 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'র (১৮৫৩) উদ্যোগে গড়ে ওঠে এই রঙ্গমঞ্চ।

বেলগাছিয়া নাট্যশালা (১৮৫৮)

পাইকপাড়ার রাজাদের বেলগাছিয়া অঞ্চলের বাগানবাড়িতে এই নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও তাঁর ভাই ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ।

মেট্রোপলিটান থিয়েটার (১৮৫৯)

চিৎপুর সিঁদুরিয়াপটিতে রামগোপাল মল্লিকের বাড়িতে এই রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হয়।

পাথুরিঘাটায় বঙ্গ নাট্যালয় (১৮৬৫)

মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়িতে এই শখের নাট্যশালা গড়ে উঠেছিল।

কলকাতার এই জাতীয় নাট্যশালা ও শখের নাট্যাভিনয়ের হুজুগ এক সময় মফঃস্বল অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৮৭২ খ্রী. সর্বসাধারণের জন্য রঙ্গমঞ্চ গড়ে উঠেছিল—**'ন্যাশনাল থিয়েটার'**; বাগবাজার অঞ্চলের কয়েকজন যুবক ছিলেন এর উদ্যোক্তা। পেশাদারি নাট্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে নাটকাভিনয়ের ক্ষেত্রে এল নতুন প্রাণ ও নতুন যুগ। আগে শখের নাট্যাভিনয় দেখতেন শুধুমাত্র নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরাই, জনসাধারণের প্রবেশাধিকার সেখানে ছিল না। কিন্তু প্রবেশমূল্যের বিনিময়ে যখন থিয়েটার দেখার সুযোগ হল তখন নতুন উৎসাহে গড়ে উঠল একে একে অনেকগুলি রঙ্গমঞ্চ। যেমন---- ন্যাশনাল, হিন্দু ন্যাশনাল, বেঙ্গল থিয়েটার, রয়েল বেঙ্গল, গ্রেট ন্যাশনাল, স্টার থিয়েটার, সিটি, এমারেল্ড, ক্লাসিক, কোহিনুর প্রভৃতি। রঙ্গমঞ্চগুলির মধ্যে তখন প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়ে গেল ব্যবসায়ের খাতিরে। এই সব থিয়েটারের মধ্যে কোনো কোনোটিকে আশ্রয় করে একাধিক প্রতিভাশালী নাট্যকার, নট ও নাট্যাচার্যের আবির্ভাব ঘটেছিল। তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে নাম করা যায়— অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল বসু, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি।

প্রথম দিকে বাংলা নাটকে স্ত্রীলোকের ভূমিকায় পুরুষ-অভিনেতারাই ছদ্মবেশে অভিনয় করতেন। অনেকে এই জাতীয় অভিনয়ে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে যশোলাভ করেছিলেন। যেমন স্ত্রী ভূমিকায় অভিনয় করতে দক্ষ ছিলেন ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়।

প্রথম পেশাদারি রঙ্গমঞ্চে স্ত্রী-ভূমিকা নারীদের দ্বারা অভিনয় করান বিডন স্ট্রীট অঞ্চলের 'বেঙ্গল থিয়েটার' (১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দের ১৬ আগস্ট)। সেকালে ভদ্র ও গৃহস্থ ঘরের মেয়েরা

নাটকে অভিনয় করতেন না। এই অভিনেত্রীরা বারাঙ্গনা শ্রেণীভুক্ত হলেও, অনেকেই বেশ অভিনয় নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। এঁরা সংখ্যায় নেহাত কম ছিলেন না। তবে সর্বাপেক্ষা প্রতিভাশালিনী অভিনেত্রী ছিলেন বোধ হয় নটী বিনোদিনী। সেকালের কয়েকজন উল্লেখযোগ্য অভিনেত্রীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে দেওয়া হল:

এলোকেশী

পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ 'বেঙ্গল থিয়েটারের'র প্রথম যুগের একজন মঞ্চাভিনেত্রী ছিলেন ইনি। মধুসূদন দত্ত-রচিত 'শর্মিষ্ঠা' নাটকে দেবযানীর ভূমিকায় যোগ্যতার সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন (১৮৭৩)। ১৮৯২ পর্যন্ত ইনি বহু নাটকে উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় অংশগ্রহণ করতেন বলে জানতে পারা যায়।

ক্ষেত্রমণি

'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে' ইনি 'সতী কি কলঙ্কিনী' নাটকে প্রথম অভিনয় করেন (১৮৭৪)। পরে 'নীলদর্পণ' নাটকে সাবিত্রী, 'বিবাহ বিভ্রাটে' ঝি, 'বিল্বমঙ্গলে' থাকমণি ইত্যাদি অনেক ভূমিকায় অভিনয় করে ইনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। নটি বিনোদিনী তাঁর আত্মকথায় ক্ষেত্রমণি সম্পর্কে লিখেছিলেন—"ক্ষেতুদিকে কিছু শেখাতে হতো না। একবার বললেই চরিত্রটি সুন্দর উপস্থাপিত করতে পারতেন।"

গোলাপবালা ওরফে সুকুমারী দত্ত

যে চারজন অভিনেত্রী প্রথম পেশাদারি রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করেছিলেন (১৮৭৩, ১৬ আগস্ট) তাঁরা হলেন জগত্তারিণী, এলোকেশী, শ্যামাসুন্দরী ও গোলাপবালা। ইনি 'শর্মিষ্ঠা' নাটকে দেবিকার ভূমিকাটি অভিনয় করেছিলেন। 'সুকুমারী' এই নামকরণের আসল কারণ হল—'শরৎ-সরোজিনী' নাটকে ইনি সুকুমারীর ভূমিকায় আশ্চর্য অভিনয় করেছিলেন বলেই পরবর্তীকালে তাঁকে সকলে ঐ নামে ডাকত। এ ছাড়া অভিনেতা গোষ্ঠবিহারী দত্তের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয় (১৮৭৫) সেই কারণে 'দত্ত' উপাধিটি তিনি লাভ করেন। অন্যান্য যে-সব উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় সুকুমারী ভালো অভিনয় করেছিলেন সেগুলি হল—'পুরুবিক্রমে'—ঐলবিলা, 'রজনীতে' রজনী, 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' রোহিণী, 'আনন্দমঠে' শান্তি প্রভৃতি। শুধু অভিনেত্রী মাত্র ছিলেন না গোলাপবালা, ইনি 'অপূর্ব সতী' (১৮৮৫) নামে একটি নাটকও রচনা করেছিলেন।

নরীসুন্দরী

ইনি কলকাতার বহু রঙ্গমঞ্চে প্রধানত সংগীতপ্রধান নাটকে অভিনয় করে গেছেন (১৮৯৪-১৯২৬ পর্যন্ত)। তাঁর অভিনীত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা হল 'দলনী', 'সূর্যমুখী', 'বিজয়া', 'মেহের', 'ছায়া' প্রভৃতি।

বিনোদিনী দাসী (১৮৬৩-১৯৪২)

সেকালের অভিনেত্রীবৃন্দের মধ্যে উজ্জ্বলতম রত্ন বিশেষ ছিলেন এই নটী বিনোদিনী। জন্মসূত্রে ইনি ছিলেন বারাঙ্গনা শ্রেণীভুক্ত। ছেলেবেলায় তাঁর নামেমাত্র বিবাহ হয়েছিল। দারিদ্র্যের জ্বালা নিবারণের জন্য ইনি বারো বছর বয়সে রঙ্গমঞ্চে যোগ দেন। ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দে 'গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটারে', 'শত্রু সংহার' পৌরাণিক নাটকে তিনি প্রথম অবতীর্ণ হন, দ্রৌপদীর সখীর একটি ক্ষুদ্র ভূমিকায়। তারপর ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইনি গ্রেট ন্যাশনাল, বেঙ্গল, ন্যাশানাল ও স্টার থিয়েটারে সেকালীন যাবতীয় শ্রেষ্ঠ নাটকের প্রধান প্রধান নারীচরিত্রে যোগ্যতার সঙ্গে অভিনয় করে প্রভূত প্রশংসা লাভ করেন। অথচ মাত্র ২৩।২৪ বছর বয়সে তিনি তাঁর খ্যাতি ও ক্ষমতার চরমসিদ্ধির লগ্নে রঙ্গালয়ের সংস্রব চিরতরে ত্যাগ করেন।[১৪]

মাত্র বারো বছরের অভিনয় জীবনে ইনি পঞ্চাশটি নাটকে ষাটটিরও অধিক ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। জটিল মনস্তত্ত্বমূলক চরিত্র রূপায়ণে ইনি ছিলেন অদ্বিতীয়া। ইনি নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র ঘোষের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় তাঁর প্রশংসা করা হত। ইংরেজী সংবাদপত্রে তাঁকে 'ফ্লাওয়ার অব দি নেটিভ স্টেজ', 'প্রাইমা ডোনা অব দি বেঙ্গলী স্টেজ' ইত্যাদি আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। গিরিশচন্দ্র -রচিত 'চৈতন্যলীলা' নাটকের নাম ভূমিকায় ইনি যে অভিনয় করেন, তা দেখে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব মুগ্ধ হন এবং তাঁকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করে বলেন—"আসল নকল সব এক দেখলাম। তোমার চৈতন্য হোক।" সেকালে আরও অনেক দেশী বিদেশী মনীষী তাঁর অভিনয় দেখেছিলেন— বঙ্কিমচন্দ্র, ফাদার লাফোঁ, এডুইন আর্নল্ড প্রভৃতি। নাটকের ব্যাপারে বিনোদিনীর উৎসাহের অন্ত ছিল না। তাঁরই চেষ্টা ও অর্থানুকূল্যে 'স্টার থিয়েটাব' স্থাপিত হয়।

নিজের চেষ্টায় ইনি ভালোমতো লেখাপড়া শিখেছিলেন এবং তাঁর সাহিত্যপ্রতিভার পরিচয় রেখে গেছেন তিনি— আত্মজীবনী, কাব্য, প্রবন্ধ প্রভৃাতি রচনা করে। অসামান্য প্রতিভার অধিকারিণী এই অভিনেত্রী সম্পর্কে বলা হয়েছে—"নাট্যপটীয়সী বিনোদিনী এই বাংলা" নাট্যশালার ইতিহাসে সন্ধ্যাতারার মতোই উজ্জ্বল থাকবে চিরকাল।[১৫]

বনবিহারিণী (ভূণি)

ইনি প্রথম ন্যাশানাল থিয়েটারে 'কামিনীকুঞ্জ' অপেরায় নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করে খ্যাতি অর্জন করেন (১৮৭৯)। বেঙ্গল, স্টার ও এমারেল্ড থিয়েটারে ইনি সংগীতপ্রধান চরিত্রে অভিনয় করতেন।

কুসুমকুমারী (১৮৭৪-১৯৪৮)

নৃত্যপটীয়সী অভিনেত্রীরূপে ইনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। প্রথম মিনার্ভা, পরে ক্লাসিক, গ্র্যান্ড, স্টার, কোহিনুর, মিত্র প্রভৃতি থিয়েটারে যোগ দিয়েছিলেন। 'আলিবাবা' গীতিনাট্যে 'মর্জিনা'র চরিত্রে নাচ-গানে-অভিনয়ে ইনি অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন (১৮৯৭)। আরও কয়েকটি



নটী বিনোদিনী

উল্লেখযোগ্য ভূমিকা হল— ভ্রমর (ভ্রমর), সরলা (সরলা), গঙ্গাবাঈ (ভ্রান্তি), ফুলজানি (প্রতাপাদিত্য) প্রভৃতি। বাংলা নাটকে প্রথম নৃত্যপরিচালিকার সম্মান ইনিই লাভ করেছেন।

তারাসুন্দরী (১৮৭৭-১৯৪৮)

তারাসুন্দরী বিনোদিনীব সহায়তায় প্রথম রঙ্গমঞ্চে যোগ দেন (১৮৮৪)। স্টার থিয়েটারে 'চৈতন্যলীলা' নাটকে প্রথম তিনি বালকের ভূমিকায় অভিনয় করেন। এই নাট্যাভিনেত্রী অমৃতলাল, অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী প্রভৃতি নটশ্রেষ্ঠদের কাছে অভিনয় শিক্ষা করেন। দীর্ঘকাল ধরে ইনি অভিনয়ের দ্বারা বাংলা রঙ্গমঞ্চকে মাতিয়ে রেখেছিলেন। যে-সব বিশিষ্ট ভূমিকাগুলিতে ইনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন সেগুলি হল— রিজিয়া (রিজিয়া), আয়েষা (দুর্গেশ- নন্দিনী), কল্যাণী (প্রতাপাদিত্য), জহরা (সিরাজদৌল্লা), শৈবলিনী (চন্দ্রশেখর), জাহানারা (সাজাহান), গুলনেয়ার (দুর্গাদাস), ধারা (রাখীবন্ধন) প্রভৃতি।

গঙ্গামণি

ইনি সেকালে গঙ্গাবাইজী নামে পরিচিত ছিলেন। চমৎকার গান গাইতে পারতেন ইনি। স্টার থিয়েটার প্রতিষ্ঠার সময় থেকে (১৮৮৩) ইনি রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন। নানা ভূমিকায় ইনি অংশ গ্রহণ করে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। 'কালাপাহাড়' নাটকে মুরলার ভূমিকায় ইনি যে ধরণেব ধ্রুপদী গীত পরিবেশন করেছিলেন, তার জন্য প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন।

তিনকড়ি (১৮৭০-১৯১৭)

স্টাব থিয়েটারে 'বিল্বমঙ্গল' নাটকে (১৮৮৬) ইনি প্রথম নির্বাক সখীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। পরে নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্রের নিকট অভিনয় শিক্ষা করে ইনি বীণা, এমারেল্ড, সিটি, মিনার্ভা প্রভৃতি থিয়েটারে অভিনয় করেছিলেন। মিনার্ভায় লেডি ম্যাকবেথের চরিত্রে অভিনয় করে ইনি অজস্র প্রশংসা অর্জন করেন। তাঁর অন্যান্য স্মরণীয় ভূমিকাগুলি হল—তারা (মুকুল মুঞ্জরা), দাই (আবু হোসেন), করমেতি (করমেতিবাঈ), শ্রী (সীতারাম), বিমলা (দুর্গেশনন্দিনী), তারা (মীরকাশিম), জনা (জনা) প্রভৃতি। বারবনিতার কন্যা হলেও ইনি অভিনেত্রী জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে প্রচুর অর্থ ও যশ লাভ করেন। সেই অর্থ ইনি আবার জনকল্যাণ মানসে উদার হস্তে দান করেছিলেন।[১৬]

নীরদাসুন্দরী (১৮৮৯ - ১৯৭৩)

উনিশ শতকের শেষদিকে যে প্রতিভাশালিনী অভিনেত্রীর আবির্ভাব ঘটে, তিনি হলেন নীরদাসু- দরী। এখন যেখানে গিরিশ পার্ক সেইখানে এককালে ছিল খোঁড়া সাহেবের বাগান ও বস্তি। সেখানেই ১৮৮৯ সালে জন্মেছিলেন নীরদাসুন্দরী। তাঁর মা দাসীবৃত্তি করে কন্যাকে লালন পালন করতে যখন অক্ষম হলেন, তখন তিনি সেকালের নৃত্যগীতপটীয়সী অভিনেত্রী কুসুমকুমারীর সহায়তায় বালিকাকন্যাকে রঙ্গালয়ে প্রেরণ করেন, কিছু রোজগারের আশায়।

১৮৯৮ সালে 'ক্লাসিক থিয়েটারে' দোল উপলক্ষে 'দোললীলা' নাটকে মাত্র নয় বছরের বালিকা নীরদা সখীর দলে নেচেছিলেন। এই থিয়েটারে ১৮৯৮ সালে অমরেন্দ্র দত্ত-রচিত 'নির্মলা' নাটকে তিনি প্রথম বাঁশরীর ভূমিকায় অভিনয় করেন। ক্লাসিক থিয়েটাবকে অবলম্বন করেই তাঁর নটীজীবনের সাফল্য দেখা দিয়েছিল। ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে যখন ক্লাসিক থিয়েটাব বন্ধ হয়ে গেল তখন নীরদা বাধ্য হয়ে এক ভ্রাম্যমাণ নাট্যদলে যোগদান করেন কিছুদিনের জন্য। পরে ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে তিনি মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনেত্রী হিসাবে যোগদান করেন। এরপর ১৯১৬তে পুনরায় তিনি মিনার্ভা থিয়েটারে 'রামানুজ' নাটকে চমাম্বার ভূমিকায় অভিনয় করে শ্রীশ্রীসারদা মায়ের আশীর্বাদ লাভে ধন্য হয়েছিলেন।

নীরদাসুন্দরী জীবনে অনেক দুঃখকষ্ট পেলেও বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে নানাধরণের চরিত্রে অভিনয় করে অনেক খ্যাতি ও প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। ১৯৭২ সনের ৭ ডিসেম্বর বঙ্গীয় নাট্যশালার শতবর্ষ উৎসবে উপস্থিত হবাব সৌভাগ্যও তিনি অর্জন করেছিলেন। ১৯৭৩ -এ তাঁর মরজীবনের অবসান ঘটে। তাঁর সম্পর্কে দেবনারায়ণ গুপ্ত মহাশয় 'বাংলার নটনটী' (১ম খণ্ড) গ্রন্থে (পৃ. ১৪৫) বলেছেন "নীরদার নটীজীবনের হাতেখড়ি অমরেন্দ্রনাথের কাছে। অভিনয় জীবনের ব্যাপ্তি ঘটেছিল নটগুরু গিরিশচন্দ্রের শিক্ষায়। পরবর্তীকালে নব-নাট্যযুগেব প্রবর্তক শিশিরকুমারের কাছে তাঁর অভিনয় জীবনের পরিমার্জিত রূপটি প্রকাশ পেয়েছিল। এক সময় তিনি 'নাচে, গানে ও অভিনয়ে দর্শকচিত্ত জয় করেছিলেন।"

এঁদের দেখাদেখি বহু নারী বঙ্গমঞ্চে যোগদান করে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন যেমন, প্রভা দেবী, কৃষ্ণভামিনী, নীহারবালা, ব্রজরাণী, চুনীবালা, নিভাননী, সরযূবালা প্রভৃতি। এঁদের সফল অভিনয় দর্শনে আকৃষ্ট হয়ে ক্রমে অনেক শিক্ষিত ভদ্র পরিবারের মহিলারাও রঙ্গমঞ্চে অভিনেত্রী রূপে যোগ দিলেন।[১৭]

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সঙ্গীত সাধনায় বঙ্গনারী

কলকাতা আন্তর্জাতিক শহর। এখানে কার্যসূত্রে নানা ভাষা-ভাষী হিন্দু, মুসলমান, ইহুদী, ইংরেজ প্রভৃতি লোকের সমাবেশ হয়েছিল। কলকাতার সংস্কৃতিতে সংগীতের যে একটি বিশেষ স্থান ছিল সেখানে নানা রীতির সংমিশ্রণ ঘটতে দেখা গেল ধীরে ধীরে নানা কারণে। আগে রাঢ়-বঙ্গে বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরকে কেন্দ্র করে দীর্ঘকাল ধরে একটি স্বতন্ত্র ঘরাণা গড়ে উঠেছিল, তার প্রচলন প্রধানত অঞ্চল-বিশেষেই সীমাবদ্ধ ছিল। উনিশ শতকের শেষার্ধে কলকাতায় হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ সংগীতের মজলিশ জমে উঠেছিল। তার একটা প্রধান কারণ হল, লক্ষ্মৌ-এর সংগীত প্রেমিক নবাব ওয়াজিদ আলি শাহ কলকাতার মেটিয়াবুরুজ অঞ্চলে দীর্ঘ একত্রিশ বছর (১৮৫৬-৮৭) রাজনৈতিক কারণে বন্দীজীবন যাপন করেন। তিনি ছিলেন সংগীতের অদ্বিতীয় সমঝদার এবং সংগীতজ্ঞও বটে। তিনি নিজে অনেক ধ্রুপদ, খেয়াল, গজল, ঠুমরী গান রচনা করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন নাচে গানে বাজনায় অভিজ্ঞ কলাবত ও কলাবতীরা। তাঁরা অনেকে স্থায়ীভাবে কলকাতায় বসবাস করতে আরম্ভ করলেন। এখানকার অনেক ধনী অথচ গুণগ্রাহী ব্যক্তি এঁদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। এই ভাবে ঐ সময় থেকে লক্ষ্মৌ-এর সংগীত ধারার সঙ্গে বাঙালি জীবনের ঘনিষ্ঠ একটি যোগসূত্র গড়ে উঠল। শুধু লক্ষ্মৌ-এর নবাব নয়, ঘটনাচক্রে এই সময় মহীশূরের রাজ্যহীন নবাবও কলকাতার টালিগঞ্জ এলাকায় এসে আশ্রয় নিলেন এবং মুর্শিদাবাদের নবাব ছিলেন চিৎপুর অঞ্চলে। এঁরা সকলেই ছিলেন সংগীত ও কলারসিক। এইভাবে দেখা গেল বিশেষ কারণে কলকাতায় নাচ-গান-বাজনার জম-জমাট আসর গড়ে উঠল। তা সত্ত্বেও কিন্তু বাঙালি ভদ্র-গৃহস্থ অথবা অভিজাত মেয়েদের মধ্যে সংগীত চর্চার রেওয়াজ তো ছিলই না বরং ভদ্রঘরের মেয়ে এমন-কি ছেলেদের পক্ষেও গানবাজনা করা একটি গর্হিত কর্ম বলে গণ্য করা হত। অন্তঃপুরচারিণী মেয়েদের নাচ গান শেখা তো দূরের কথা, বাড়িতে কোনো উৎসবে বাই-নাচের আসর হলে কর্তা বা গৃহিণীর অনুমতি নিয়ে মেয়ে-বউদের দেখতে হত চিকের আড়াল থেকে।

উনিশ শতকের প্রথম দিক থেকেই বেশ-কয়েকজন পশ্চিমা-বাইজী সংসার জীবনের বাইরে জম-জমাট আসর বসিয়েছিলেন। রামমোহন রায়ের বাগানবাড়িতে ১৮২৩ খ্রীস্টাব্দে বিখ্যাত নিকি বাইজীর যে নাচ-গানের আসর হয়েছিল তার কথা মিস্ ফ্যানি পার্কস্ তাঁর স্মৃতিকথায় বর্ণনা করেছেন। আরও যে-সব নাম করা বাইজী ছিলেন তাঁরা হলেন অস্রুন, জীন্নৎ, বেগম

জান, হিঙ্গুল, নান্নী জান, সুপর্নান, শ্রীজান, হীরা বুলবুল (হিন্দু), মাক্কাজান, গহরজান প্রভৃতি। অর্থশালী ব্যক্তির গৃহে বিবাহ, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন প্রভৃতি উৎসব উপলক্ষে বাইজীদের নাচ-গানের আসর বসত। বাঙালি বাইজীদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন—যাদুমণি, সুরমা, শ্বেতাঙ্গিনী ও কৃষ্ণভামিনী। এই সব বাইজীরা অনেকে নাচ ও গান সমানভাবে পরিবেশন করতে সক্ষম ছিলেন। একদিকে ছিল লোকসংগীতের ধারা— পাঁচালীগান, কথকতা, কীর্তন, যাত্রাগান, কবিগানের স্রোত, অন্যদিকে বাইজীরা পরিবেশন করতেন খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরী, গজল ইত্যাদি। অনেক বাইজী উচ্চাঙ্গ-সংগীতের সঙ্গে আবার কিছু রবীন্দ্রসংগীতও শোনাতেন, যেমন এ ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে নামকরা যায় মানদাসুন্দরী, কৃষ্ণভামিনী, পূর্ণকুমারী প্রভৃতির।

এই সময় যাত্রাগানের জনপ্রিয়তা দেখে সোনাগাছির এক নারী— ত্রৈলোক্যতারিণী একটি যাত্রার দল করেছিলেন। রাধারানীর যাত্রাদলে এবং নীলমণি কুণ্ডুর স্ত্রী মুক্তামণির দলে (এই দল 'বৌ-কুণ্ডুর দল' নামে পরিচিত ছিল) বেশ কয়েকজন সংগীতজ্ঞা অভিনেত্রীর সন্ধান পাওয়া যায়।

উনিশ শতকে ঢপ্-কীর্তনের বেশ চাহিদা ছিল। পান্নাদাসী নামে এই সময়কার একজন বিখ্যাত ঢপ্ কীর্তনীয়া ছিলেন। তিনি ছিলেন বিখ্যাত-যাত্রাওয়ালা নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের সমসাময়িক। সেকালে এমন কোনো ধনীগৃহ ছিল না, যেখানে কোনো-না-কোনো উৎসব অনুষ্ঠানে তাঁর সংগীত পরিবেশিত না হয়েছিল। একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন— "....সুরের এমন সতেজ উচ্চ গ্রামের সাধনায় কোন পুরুষ কীর্তনীয়াও তাঁকে (পান্নাবাই) পরাস্ত করতে পারে নি। এর উপরে ছিল পান্নার হৃদয়ের গভীর আবেগ ও নিবিড় আবেদন। তিনি যখন তাঁর প্রসিদ্ধ গান— "কোথায় আছে হে, একবার দেখা দাও হে, গোপীজন বল্লভ"—বলে উচ্চৈঃস্বরে সুদীর্ঘ টানে হৃদয়ের আকুতি প্রকাশ করে ভগবানকে ডাকতেন, তখন সভার সমস্ত শ্রোতারা তাঁর সেই আন্তরিক আবেদনে এক মনপ্রাণ নিয়ে যোগ দিতেন।"[১৮] বর্ধমান অঞ্চলে এই সময়ে আরও দুজন ঢপ্-কীর্তন গায়িকা সুপরিচিত ছিলেন— বামী কীর্তনী ও জগন্মোহিনী কান বা কিন্নরী।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে কবিওয়ালার যুগ এসেছিল, তার রেশ ছিল উনিশ শতকেও বেশ-কিছুদিন পর্যন্ত। কয়েকজন কবিওয়ালীও আসরে নামতেন, যদিও এঁরা কেউ ভদ্র সমাজের নারী ছিলেন না। বিশেষ করে যাঁরা নাম করেছিলেন তাঁরা হলেন— যজ্ঞেশ্বরী, অক্ষয়া বাইতিনী, মোহিনী, ক'বেলকামিনী (যশোহর), বিলাসিনী (ত্রিপুরা), গঙ্গামণি ও পদ্মাবতী (বরিশাল) প্রভৃতি।

যাত্রাগানের আসরে নামকরা গায়িকা ছিলেন বিন্দুবাসিনী। ইনি বিখ্যাত মুসলমান গায়ক জনাব আলির ধর্মকন্যা ছিলেন। তাঁর কাছে উচ্চাঙ্গ সংগীতের তালিম পেয়ে অত্যন্ত পারদর্শিতার সঙ্গে এই গায়িকা সংগীত পরিবেশন করতেন। ইনি কৃষ্ণযাত্রার দল করে নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় পালায় গাইতেন। পালাগানের আসরে ইনি যশোদার ভূমিকায় অভিনয় করতেন।

যাদুমণি (১৮৫৩ ? - ১৯১৮)

বাঙালি বাইজীর সম্প্রদায়ের মধ্যে যাদুমণির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একাধারে কণ্ঠসংগীত, নৃত্য ও অভিনয়ে পটু ছিলেন ইনি। শৌরীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সংগীতপ্রতিভার পরিচয় পেয়ে, সেকালের বিখ্যাত ধ্রুপদী গুরুপ্রসাদ মিশ্রের কাছে তাঁর গান শেখার ব্যবস্থা করে দিলেন। পরে তিনি সংগীতজ্ঞ ও নৃত্যবিদ্ জগদীশ মিশ্রের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন। বারাণসীর একজন বিখ্যাত গায়ক সারদাসহায় মিশ্রও তাঁকে গান শেখান।

প্রথমে যাদুমণি গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে গায়িকা অভিনেত্রীরূপে সমাদর লাভ করেন। 'সতী কি কলঙ্কিনী', 'শরৎ সরোজিনী' ইত্যাদি নাটকে তাঁর অভিনয় দেখে সকলে প্রশংসা করেন। খেয়াল, টপ্পা ও ঠুংরি অঙ্গের গানে ইনি ছিলেন পারদর্শিনী। প্রচুর অর্থ ও যশ লাভ করেও এক সময়ে ইনি নিঃস্ব হয়ে যান। তাঁকে জীবনে পুনরায় সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিরা 'সঙ্গীত পরিষদ বিদ্যালয়'' স্থাপন করেন। সেখানে যাদুমণি গান শেখাতেন।

সাধারণভাবে ভদ্র-গৃহস্থবাড়ির মেয়েদের কাছে নাচ, গান, অভিনয় নিষিদ্ধ হলেও, কোনো কোনো উদারপন্থী পরিবারে কিছুটা ব্যতিক্রম ছিল। বিশেষ করে পাথুরিয়াঘাটার রাজবাড়ী ও জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িকে এই পর্যায়ে ফেলা যায়। পাথুরিয়াঘাটার সংগীতজ্ঞ রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর (১৮৪০-১৯১৪) নিজে ছিলেন প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সংগীতে পারদর্শী। তিনি মেয়ে-পুরুষ নির্বিশেষে কারো মধ্যে সংগীতপ্রতিভার পরিচয় পেলে সর্বদা উৎসাহ দিতেন এবং তার প্রতিভা বিকাশে সহায়তা করতেন। এ ছাড়া জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে স্বয়ং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তাঁর পুত্রকন্যারা সকলেই ছিলেন উচ্চ সংস্কৃতিসম্পন্ন এবং সংগীতানুরাগী। সেখানে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়রীতির সংগীতেরই চর্চা হত। সংগীত- প্রেমিক মহর্ষির চমৎকার পরিচয় দিয়েছেন সরলাদেবী তাঁর আত্ম-স্মৃতিতে। তিনি বলেছেন— "সেবার আমি 'ভারতী'তে 'আহিতাগ্নিকা' কবিতা ও ঋগ্বেদের মন্ত্র অবলম্বনে 'শুনঃশেফের বিলাপ' লিখি, দাদামশায়কে ও দুটি পড়ে শোনানো হয়। তিনি শুনে খুব প্রীত হন এবং আমায় বলেন— "আমি তোমায় হাফেজের এই কটি লাইন দিচ্ছি, এতে সুর বসিয়ে আমায় শোনাতে পারবে ' আমি বিনম্র ভাবে স্বীকৃত হলুম। এক সপ্তাহ পরে তাঁর কাছে খবর গেল—"সুর দেওয়া হয়েছে যেদিন তিনি বলবেন শোনাতে যাব। ...আমি বেহালা বাজিয়ে হাফেজ গাইলাম আমার দেওয়া সুরে। দাদামশায় মজে মজে শুনতে লাগলেন।"[১৯] সরলার গান শুনে মুখের বাক্যেই শুধু তিনি তাঁর খুশী প্রকাশ করেন নি, সেই সঙ্গে পুরস্কার স্বরূপ তাকে তিনি দিয়েছিলেন বহুমূল্য হীরে ও চুনির সেট— নেকলেস ও একজোড়া ব্রেসলেট। নাতনীকে তিনি বলেছিলেন— "তুমি সরস্বতী। তোমার উপযুক্ত না হলেও এই সামান্য ভূষণটি এনেছি তোমার জন্যে।"[২০] মহর্ষি একবার রবীন্দ্রনাথের গান শুনে তাঁকেও দিয়েছিলেন পাঁচ শত টাকার একখানি চেক। কোনো কোনো সময় নাতিদের গান শুনে তিনি খুশি হয়ে কাউকে দিতেন কোনো হাতির দাঁতের খেলনা অথবা মোহর, উপহার স্বরূপ। এই সব ঘটনা সংগীতপ্রেমিক দেবেন্দ্রনাথের রসজ্ঞ মনের পরিচয়

দেয়। সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে তিনি বাড়ির মেয়েদের সংগীতচর্চা করতে উৎসাহ দিতেন। প্রতিমা দেবী তাঁর 'স্মৃতিচিত্র' গ্রন্থে বলেছেন-— "মহর্ষিদেবের বাড়ীতে চলেছে তখন নতুন সৃষ্টির কাজ। সনাতনী প্রথা ও প্রাচীন সংস্কারকে পরিমার্জন করে তৈরী হচ্ছে সভ্যতার নতুন রূপ। সেকালে মেয়েদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া সে কেবল ও-বাড়িতেই সম্ভব হয়েছিল। সমাজের পাথরের দেওয়াল ভেঙে ফেলে মেয়েরা বেরিয়ে এসেছিলেন বাইরে। তখনকার দিনেও ও বাড়ির মেয়েরা ঘোড়ায় চলেছেন, স্টেজে নেবেছেন, বক্তৃতা দিয়েছেন, গ্র্যাজুয়েট হয়েছেন। সমাজ আতঙ্কিত চিত্তে তাকিয়ে থাকত তাঁদের দিকে একটা উদ্ভট কিছু দেখবার জন্য। তাঁদের চালচলন সমাজের চোখে তাক লাগিয়ে দিত। শেষে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা না করতে পেরে সাধারণ লোকে বলত, ওঁরা যে ব্রহ্মজ্ঞানী।"[২১]

অনেক বড়ো বড়ো সংগীতবিদ্যাবিদ্‌রা ঠাকুর বাড়ির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। শ্রীকণ্ঠ সিংহ ছিলেন একজন বড়ো গায়ক এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এ ছাড়া আদি ব্রাহ্ম-সমাজের গায়ক বিষ্ণু চক্রবর্তী ছিলেন এ বাড়ির সংগীত শিক্ষক। বিখ্যাত যদু ভট্টও এক সময় ঠাকুরবাড়িতে সংগীত শিক্ষা দিতেন। মহর্ষির অনুমতি নিয়ে হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর স্ত্রী নীপময়ী ও কন্যাদের সংগীতে পারঙ্গম করে তুলেছিলেন। বিষ্ণু চক্রবর্তী প্রথম তাঁদের গান শেখান। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী কাদম্বরী ভালো গান জানতেন কারণ সংগীতের আবহাওয়ায় তিনি মানুষ হয়েছিলেন, তাঁর পিতামহ জগমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ও পিতা শ্যামলাল গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন কলিকাতাবাসী বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ। মহর্ষির বেশ- কয়েকজন নাতনী ছিলেন সংগীতপ্রতিভায় অতুলনীয়া।

প্রতিভা চৌধুরী (১৮৬০-১৯২২)

হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নীপময়ী দেবীর প্রথম সন্তানের নাম প্রতিভা এবং প্রকৃতই তিনি ছিলেন প্রতিভাশালিনী। অভিজাত ঘরের কন্যা হয়েও তিনি প্রথম প্রকাশ্য সভায় সংগীত পরিবেশন করেছিলেন। বয়সে যখন তিনি কিশোরী, সেই সময় একবার মাঘোৎসব অনুষ্ঠানে জ্ঞাতি ভাইদের সঙ্গে একত্রে ব্রহ্মসংগীত পরিবেশ করেন। ঘটনাটি যে সেকালের মেয়েদের পক্ষে কতবড়ো একটি দুঃসাহসিক পদক্ষেপ, সেদিনের পরিপ্রেক্ষিতে ভেবে দেখলে সেটা বোঝা যাবে। বেথুন ও লোরেটো স্কুলে পড়াশুনো করার সঙ্গে নিয়মিত ভাবে তিনি সংগীতেরও রেওয়াজ করতেন। বিষ্ণু চক্রবর্তীর কাছে প্রাথমিক শিক্ষার পর, তিনি হিন্দুস্থানী সংগীত শেখেন যদুভট্টের কাছে। পরে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় রীতির সংগীত ও পিয়ানো এবং অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র শিক্ষা করেন। তাঁর বিবাহ হয়েছিল পাবনার বিখ্যাত চৌধুরী পরিবারে আশুতোষ চৌধুরীর সঙ্গে। সংগীত সম্পর্কে প্রতিভা তাঁর মৌলিক চিন্তাধারার পরিচয় দিয়েছেন, নিজস্ব রীতিতে স্বরলিপি রচনা করে। "সঙ্গীতের ক্ষেত্রে প্রতিভার সত্যিকারের অবদান হলো স্বরলিপি রচনার সহজতম পন্থা আবিষ্কার। তিনি দ্বিজেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বরলিপি পদ্ধতি এবং স্বরসন্ধি প্রয়োগ পদ্ধতিতে যেমন নতুনত্ব এনেছিলেন তেমনি তাকে করে তুলেছিলেন সকলের ব্যবহারের উপযোগী। প্রতিভার আগে কোনো মহিলা স্বরলিপি নির্মাণের ব্যাপারে এগিয়ে আসেননি।"[২২]

'বালক' ও 'পুণ্য' পত্রিকায় প্রতিভা দেবীর স্বরলিপি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হত। কারণ এগুলি ঠাকুর বাড়ি থেকেই সম্পাদনা করা হত। প্রতিভা দেবী অনেকগুলি রবীন্দ্রসংগীত, ব্রহ্মসঙ্গীত ও হিন্দুস্থানী সংগীতের স্বরলিপি প্রকাশ করেছিলেন। 'বালক' পত্রিকায় একটি স্বতন্ত্র বিভাগে এই স্বরলিপি অনুসরণের নির্দেশ দেওয়া হত ধারাবাহিক ভাবে 'সহজে গান শিক্ষা'' এই নামে (দ্রষ্টব্য 'বালক', বৈশাখ, ''গান অভ্যাস'', জ্যৈষ্ঠ থেকে ভাদ্র; ''স্বরলিপি : কালমৃগয়া'', আশ্বিন থেকে মাঘ ১২৯২)। ''আনন্দ সভা'' নাম দিয়ে প্রতিভা দেবী একটি সংগীত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁর নিজের বাড়িতে। পরে অবশ্য পূর্বনামটি পরিবর্তন করে, ''সঙ্গীত সঙ্ঘ'' নাম দেওয়া হয়েছিল। এখানে তিনি বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে উত্তর ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীত শেখাতেন। পরবর্তীকালে তাঁকে এই কাজে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলেন, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী। ইন্দিরাও এই চৌধুরী পরিবারেরই বধূ।

এই সময় থেকে সংগীতবিদ্যা আয়ত্ত করবার জন্য ভদ্র গৃহস্থ ঘরের মেয়েদের মধ্যে বেশ-কিছুটা আগ্রহ ও উৎসাহ দেখা গেল। বিবাহের বাজারে পাত্রীর সন্ধানে বেরিয়ে অনেকেই খোঁজ করতে লাগলেন লেখাপড়া জানা এবং গান-বাজনা জানা মেয়ের। সঙ্গীত সম্মিলনী' নামে আরও একটি সংগীত শিক্ষা কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। প্রতিভা দেবীর সম্পাদনায় সঙ্গীত সম্পর্কিত 'আনন্দ সঙ্গীত পত্রিকা' (১৩২০ বঙ্গাব্দ ১লা শ্রাবণ) প্রকাশের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, শিক্ষিত মেয়েদের মধ্যে সংগীত সম্পর্কিত আগ্রহ জাগিয়ে তোলা। এই পত্রিকায় প্রতিভার স্বরচিত কয়েকটি সংগীত, স্বরলিপিসহ প্রকাশিত হয়েছিল। কয়েক ছত্র উদাহরণ—

''দীন দয়াময় প্রভু ভুল না অনাথে
জীবন সাগরে ভাসি চাহি তব পথে।
নয়ন মেলিয়া দেখি তোমারি আলোকে
প্রভু স্থান দিও তব চরণ কমলে
তুমি দেখা দাও এসেছি তব দুয়ারে
প্রাণমন সবি মম সঁপিনু তোমারে
দয়া করে মোবে রেখো প্রভু তব পদে।''

ইত্যাদি।

পাশ্চাত্য সংগীতে প্রতিভা চৌধুরীর পারদর্শিতা সম্বন্ধে প্রমথ চৌধুরী বলেছিলেন— ''তিনি পিয়ানোয় বাজাতেন ওস্তাদী ও বিলিতি বাজনা। বেঠোফেনের Funeral March ও Moonlight Sonata আমি অন্ততঃ হাজার বার শুনেছি। তাই থেকে আমার বিলিতি গানের উপর যে অশ্রদ্ধা ছিল তা কমে যায়।'' [২৩] প্রতিভার স্বামী আশুতোষ চৌধুরী সংগীত বিষয়ে তাঁকে উৎসাহ দান করতে কখনো কার্পণ্য করেন নি। সাতান্ন বছর বয়সে প্রতিভার মৃত্যু ঘটে। তাঁর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের জন্য যে স্মৃতিসভার আয়োজন হয়েছিল সেখানে ইন্দিরা দেবী তাঁর উদ্দেশে একটি কবিতা রচনা করে পড়েছিলেন—

''যে দেবীর বর-পুত্রী ছিলে তুমি দেবী,

কাটাইলে আজীবন যাঁর পদ সেবি,
মিলেছি আমরা তাঁর অর্চনার তরে,
আজিকে নয়নে কিন্তু শুধু অশ্রু ঝরে।"

ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতিতর্পণ করতে গিয়ে বলেছিলেন—"বাল্যকালে প্রতিভা আর আমি একসঙ্গে মানুষ হয়েছিলুম। তখন আমাদের বাড়িতে সংগীতের উৎস নিরন্তর প্রবাহিত হত। প্রতিভার জীবনারম্ভাকাল সেই সঙ্গীতের অভিষেকে অভিষিক্ত হয়েছিল। সেই সংগীত শুধু যে তাঁর কণ্ঠে আশ্রয় নিয়েছিল তা নয়, এ তাঁর প্রাণকে পরিপূর্ণ করেছিল। এরই মাধুর্য প্রবাহ তাঁর জীবনের সমস্ত কর্মকে প্লাবিত করেছে। তাঁর চরিত্রে যে ধৈর্য ছিল, শান্তি ছিল, নম্রতা ছিল, সংযমের যে গাম্ভীর্য ছিল, তার সুর লয় ছিল যেন সেই সঙ্গীতের মধ্যে। সেই সঙ্গীতের মাধুর্যই তার স্বাভাবিক ভগবদ্‌ভক্তিতে নিয়ত প্রকাশ পেত এবং এই সঙ্গীতের প্রভাব সাধ্বী স্ত্রীর সমস্ত কর্তব্যকে সুন্দর করে তুলেছিল।"[২৪] কত অল্প কথায় রবীন্দ্রনাথ এখানে প্রতিভা দেবীর একান্ত সংগীতময় জীবনের কথা সুন্দরভাবে বলেছেন।

অভিজ্ঞা দেবী

হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নীপময়ী দেবীর এগারোটি সন্তানের মধ্যে আরও একজন সংগীত-প্রতিভাসম্পন্ন কন্যার কথা জানা যায়, তিনি অভিজ্ঞা। খুবই দুঃখের বিষয় কিশোরী বয়সে বিবাহের কিছুদিনের মধ্যেই দারুণ যক্ষ্মা রোগে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর আশ্চর্য কণ্ঠস্বরের কথা বার বার বলেছেন রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী, তাঁদের স্মৃতিকথামূলক ও অন্যান্য রচনায়। ঠাকুর বাড়ির ঘরোয়া অনুষ্ঠানে গান ও অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করে অভিজ্ঞা দর্শক সাধারণকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতেন। তাঁর অকালমৃত্যুতে দুঃখে অভিভূত হয়ে রবীন্দ্রনাথ চারটি সনেট জাতীয় কবিতা লেখেন—'মৃত্যু মাধুরী', 'নদীযাত্রা', 'স্মৃতি' ও 'বিলয়'। 'ঘরোয়া' নামক স্মৃতিকথামূলক গ্রন্থে অবনীন্দ্রনাথ অভিজ্ঞার সংগীত পরিবেশনের চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন এবং তার সঙ্গে এই অকালমৃত্যুর জন্য আক্ষেপ করেছেন আন্তরিক ভাবে।

ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী

ইন্দিরা দেবীর বহুমুখী প্রতিভার মধ্যে তাঁর সংগীতবিদ্যায় পারদর্শিতার কথা বিশেষভাবে স্মরণ করতে হয়। বাংলাগানের জগতে যে কয়েকজন অভিজাত ঘরের নারী বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়ে নিজস্ব একটি স্থান করে নিয়েছেন— ইনি তাঁদের অন্যতমা। শোনা যায়, যখন তাঁর মাত্র সাত বছর বয়স, সেই সময় তিনি সিমলা পাহাড়ে বসে ব্রাহ্ম নেতা প্রতাপচন্দ্র মজুমদারকে তাঁর সুরেলা কণ্ঠে রবীন্দ্রসংগীত শুনিয়ে বিস্মিত করে দিয়েছিলেন। অথচ তিনি বলেছেন— "আমি রবিকাকার কাছে আলাদা করে বসে কখনো গান শিখেছি বলে মনে পড়ে না। কেবল বাড়িময় হাওয়ায় হাওয়ায় যে গান ভেসে বেড়াত, তাই শুনে শুনে শিখেছি।"[২৫] বালিকা বয়সে ইনি



প্রতিভা দেবী



ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী

ট্রিনিটি কলেজ অব মিউজিক থেকে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ডিগ্রি লাভ করেন। দেশী ও বিলেতি গান এবং তার সঙ্গে নানা বাদ্যযন্ত্র— পিয়ানো, বেহালা, সেতার, এসরাজ প্রভৃতিও তিনি বাজাতে পারতেন। সংগীত বিষয়ক একাধিক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ তিনি রচনা করেছেন। প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে একত্রে 'হিন্দু-সংগীত' নামে যে গ্রন্থটি রচনা করেছেন, সেখানে তাঁর সংগীতচিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। 'রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণী সংগম' গ্রন্থটিও রবীন্দ্র সংগীত-সম্পর্কিত একটি মূল্যবান গ্রন্থ। নিজে কয়েকটি গান রচনা করে তিনি সুর সংযোজন করেছিলেন। তাঁর স্বরচিত গানের তালিকাটি হল—

১। কে শোনে সব কথা, তবু তাঁর নাহি কান

২। তাঁরে রেখো রেখো তব পায় (মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু উপলক্ষে রচিত)

৩। আয় বীণা কোলে আয়

৪। সবে তুমি গাও গান

৫। এসো দয়া গলে যাক পাষাণ হৃদয়

৬। রজনীরূপিণী শ্যামা

৭। এই তো জীবন

৮। ওগো জলে কমল দোলে (পদ্মফুলের গান)

৯। আছে সান্ত্বনা মধু কোমল পরকালে

১০। সখা বন্ধু তুমি কোথায়

১১। যে দেবীর বরপুত্র ছিলে তুমি দেবী (প্রতিভা দেবীর মৃত্যুতে রচিত)

ইন্দিরা দেবীর যত্নে রবীন্দ্রনাথের গানের অনেক সুর সযত্নে রক্ষিত হয়েছে। যেমন তাঁর কয়েকটি গীতিনাট্যের কথা স্মরণ করা যেতে পারে—ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী, কালমৃগয়া প্রভৃতি। ইনি প্রতিভা চৌধুরীকে তাঁর সংগীত শিক্ষায়তন পরিচালনায় যথেষ্ট সাহায্য করতেন। তা ছাড়া কলকাতায় অনুষ্ঠিত নানা সংগীতানুষ্ঠান এবং বিশ্বভারতীর সংগীত-ভবনের সঙ্গে ইন্দিরা দেবীর আমৃত্যু ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল।

সরলা দেবীচৌধুরানী

সংগীতচর্চার ক্ষেত্রে স্বর্ণকুমারীর কনিষ্ঠা কন্যা সরলা দেবীও কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। সুদক্ষ সংগীতজ্ঞের নিকট শৈশবেই তাঁর সংগীতের তালিম শুরু হয়। সরলাকে সুরকার ও সংগীত-রচয়িত্রীরূপেও দেখতে পাওয়া যায়।

"অতীত গৌরব-বাহিনী মম বাণি! গাহ আজি হিন্দুস্থান"— তাঁর রচিত জাতীয় চেতনা-বাহী এই গানটি কলকাতায় অনুষ্ঠিত ন্যাশনাল কংগ্রেসে (১৯০১) ছাপান্নজনের সম্মিলিত কণ্ঠে পরিবেশন করা হয়েছিল। দুর্গাপূজার মহাষ্টমীতে সরলা দেবী 'বীরাষ্টমী ব্রত' উদ্‌যাপনের রীতি প্রবর্তন করেন। সেখানে গাইবার উপযোগী গানও তিনিই রচনা করেছিলেন।

সংগীতশাস্ত্রে তাঁর অগাধ জ্ঞান ছিল বলেই, ছোটোমামা রবীন্দ্রনাথ সরলাকে বিশেষ ধরণের স্নেহ করতেন— শুধু ভাগ্নী বলে নয়। বঙ্কিমচন্দ্র-রচিত 'বন্দেমাতরম্' গানের প্রথম দুটি পদে সুরারোপ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, বাকি অংশটুকুতে সুর বসাবার ভার তিনি দিয়েছিলেন সরলার উপরে। 'জীবনের ঝরাপাতা'য় সরলা লিখেছেন— "ত্রিংশ কোটি কণ্ঠ কলকল নিনাদ করালে থেকে শেষ পর্যন্ত কথায় প্রথমাংশের সঙ্গে সমন্বয় রেখে আমি সুর দিলুম। তিনি শুনে খুশী হলেন। সমস্ত গানটা তখন থেকে চালু হল।" 'শতগান' নামক গ্রন্থে সরলা দেবী সহজ স্বরলিপি সহ একশতটি গান প্রকাশ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ যাতে বিভিন্ন ধরণের সংগীতের আদলে নতুন ধরণের গান রচনা করেন সেই উদ্দেশ্যে সরলাদেবী নানা স্থান থেকে বিচিত্র ধরণের সংগীত আহরণ করে তাঁকে উপহার দিতেন।

অমলা দাশ

অমলা ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের কনিষ্ঠা ভগিনী। ইনি সেকালে সংগীত চর্চা করে প্রভূত যশের অধিকারিণী হয়েছিলেন। ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে বেথুন স্কুল ও কলেজে যে সংগীত শিক্ষা দানের ব্যবস্থা হয়— সেখানে অমলাই ছিলেন শিক্ষিকা। নিজে তিনি অনেক সংগীত রচনা ও সুরারোপ করেছেন। আজীবন অবিবাহিতা থেকে ইনি সংগীতকেই জীবনের সাধনা করে নিয়েছিলেন।

অপর্ণা দেবী (১৮৯৯-১৯৭৩)

ইনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের কন্যা ছিলেন। তাঁর স্বামীর নাম সুধীরচন্দ্র রায়। কীর্তন গানে আশ্চর্য দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। ভদ্র ঘরের মহিলাদের নিয়ে ইনি "ব্রজমাধুরী সঙ্ঘ" নামে একটি কীর্তনের দল গড়ে তুলেছিলেন। ইনি ছিলেন নবদ্বীপ ব্রজবাসীর ছাত্রী।

উনিশ শতকের শেষদিকে এই ভাবে অনেকের চেষ্টায়, মেয়েদের সংগীত সাধনা সম্পর্কে এদেশের লোকের মনে যে বিরূপ মনোভাব ছিল তা দূরীভূত হল। ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী তাঁর 'রবীন্দ্রস্মৃতি' গ্রন্থে লিখেছেন— "ব্রাহ্মসমাজের কতগুলি পরিবারের সঙ্গে রবিকাকার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। যেমন— চিত্তরঞ্জন দাশের পরিবার, সার কে. জি. গুপ্তের পরিবার, ডাক্তার নীলরতন সরকারের ইত্যাদি। এঁদের সকলেরই ঘরে সুগায়িকা ছিলেন, যাঁরা রবিকাকার কাছেই তাঁর গান শেখবার সুযোগ পেয়েছেন। যেমন ডাক্তার নীলরতনের বড়ো কন্যা নলিনী, তাঁর অপর এক কন্যা অরুন্ধতী, সুকুমার রায়ের স্ত্রী সুপ্রভা, কনক দাস, সাহানা বসু।" [২৬]

বর্তমানে শুধু কলকাতা বা তার আশেপাশে নয়, সুদূর গ্রামাঞ্চলে ও মফস্বল শহরেও গড়ে উঠেছে অসংখ্য সংগীত-শিক্ষায়তন, যেখানে, শুধু মেয়েরাই দলে দলে গান, বাজনা, ন্যাচ শিক্ষা ও সাধনা করে চলেছে। অথচ ভাবতে অবাক লাগে যে, মাত্র গত শতাব্দীর শেষ দিকে এই প্রয়াস দেখা গিয়েছিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

চিত্রশিল্পে বঙ্গ মহিলা

আধুনিক ভারতীয় চিত্রশিল্পের জগতে নব যুগ নিয়ে এলেন অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ প্রভৃতি শিল্পীরা। এঁদের আবির্ভাবের ঠিক পূর্বে রাজা রবি বর্মা এবং আরও কয়েকজন শিল্পী পাশ্চাত্য, বিশেষ করে ইতালীয় শিল্পীদের অনুকরণে চিত্র রচনা করতেন, যদিও তাঁদের ছবির বিষয়বস্তু ছিল ভারতীয় নানা পৌরাণিক কাহিনী। এঁদের আঁকা ছবি দক্ষিণ ভারত থেকে বঙ্গদেশ পর্যন্ত ভারতের প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল।

উনিশ শতকের শেষ দিকে ই.বি.হ্যাভেল ও অবনীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ভারতীয় চিত্রকলায় নব্যরীতির প্রবর্তন ঘটেছিল। নবজাগরণের মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবোধের পরিচয়টিও বড়ো হয়ে উঠেছিল। "সাহিত্যে যেমন বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের ঘরে ডেকে ফিরিয়ে আনলেন, শিল্প-কলার ক্ষেত্রে তেমনি অবনীন্দ্রনাথ।" [২৭]

পালযুগে বাংলার নিজস্ব শিল্প-কলাও ভাস্কর্যের একটা বিশেষ গৌরব ছিল। সেইসঙ্গে স্মরণীয় হয়ে আছেন দুজন অনন্যসাধারণ শিল্পী বীতপাল ও ধীমান। কবে এবং কী ভাবে যে শিল্পের সেই প্রাণবন্ত ধারাটি চিরতরে হারিয়ে গেল, তার কোনো সঠিক কারণ আজ আর জানা যায় না। দীর্ঘকাল পরে আধুনিক যুগে নতুন করে চিত্রকলার যে বিশেষ একটি ধারা দেখা গেল, সেই শিল্পান্দোলনের পুরোধা হলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এ সম্পর্কে এক কলা- সমালোচক লিখেছেন—"The Bengal School is the name given to a new style of painting that was the first aesthetics development that appeared at the turn of the century....

The Bengal School, while it originated in Bengal with the work of Abanindranath Tagore, nevertheless soon became national. The students of Abanindranath himself were mostly Bengali, but in the second generation the activity of his followers spread over the country and their students (the third generation) were from many parts of India." [২৮]

বাংলার এই নিজস্ব নূতন শিল্পরীতি প্রবর্তনের কৃতিত্ব জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ির, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এ বিষয়ে হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—"উনবিংশ শতাব্দীর শেষে, ভারতের নিজস্ব চিত্রশিল্পের কোনো আদর্শ ছিল না। প্রাচীন চিত্রশিল্পের ধারায় ছেদ পড়ে গিয়েছিল। ভারতের পশ্চিমে তবু রাজস্থানী বা কাংড়া রীতির চিত্রশিল্পের প্রচার ছিল। পূর্ব অঞ্চলে

তাও ছিল না। পাশ্চাত্য চিত্রশিল্পই তখন আমাদের আদর্শ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই পথে দক্ষিণের চিত্রশিল্পী রবিবর্মা বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। কিন্তু তা বিদেশ হতে আমদানি করা জিনিস। এই গ্লানি হতে ভারতকে মুক্তি দেবার ভার নেন এই ঠাকুর বাড়িরই এক সন্তান। তিনি হলেন অবনীন্দ্রনাথ।"[২৯]

ঊনিশ শতকে চিত্র-আন্দোলনের সূত্রপাত কীভাবে ঘটেছিল সে বিষয়টি আরও বিশদ ভাবে আলোচনা করলে দেখা যাবে— প্রথম একজন বিদেশীর চোখেই ধরা পড়েছিল ভারত-শিল্পের মহান স্বরূপটি। কলকাতায় নব প্রতিষ্ঠিত সরকারি শিল্প বিদ্যালয়ে ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে অধ্যক্ষ হয়ে এলেন ইংরেজ শিল্পী আর্নেস্ট বিনফিল্ড হ্যাভেল। "যদিও তিনি ইউরোপীয় রীতিতে শিক্ষাদানের দায়িত্ব নিয়ে এখানে এসেছিলেন, কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য ও আদর্শ ছিল ভারতের প্রাচীন ও নিজস্ব শিল্পধারার মূলসূত্রকে খুঁজে বার করা ও তার মহিমাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। তিনিই এদেশের এবং বিদেশের মানুষকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন ভারতবর্ষ কলাশিল্পে দীন হীন তো নয়ই, বরং মহিমান্বিত। ভারতের একটি নিজস্ব সুপরিণত শিল্পের ভাষা আছে, আদর্শ আছে এবং তা দেশ ও জাতির আধ্যাত্মিক জীবন ও উচ্চ মানসিকতারই সুষ্ঠু প্রতিফলন। তিনি নানা লেখা ও বক্তৃতা দ্বারা প্রমাণ করলেন যে, ভারতের শিল্প 'অদ্ভুত ও কিম্ভূতকিমাকার' তো নয়ই বরং জাগতিক সাধারণ সৌন্দর্যের অনেক ঊর্ধ্বেকার ভাব ও আদর্শ আছে এতে নিহিত।"[৩০] ধীরে ধীরে পাশ্চাত্য শিল্প-রসিকেরাও ভারতীয় শিল্পের তাৎপর্য গভীরভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। হ্যাভেল সাহেবের উৎসাহ এবং আগ্রহেই অবনীন্দ্রনাথ, সরকারি শিল্পশিক্ষালয়ের সহকারী-অধ্যক্ষরূপে যোগ দিয়েছিলেন। প্রথম জীবনে অবনীন্দ্রনাথও পাশ্চাত্য শিল্পী গিলার্ডি ও পামার সাহেবের কাছে কিছু পরিমাণে শিল্পশিক্ষা করেছিলেন। পরে সম্পূর্ণ নিজস্বরীতিতে তিনি ছবি আঁকতে লাগলেন। অবনীন্দ্রের নিজস্ব শিল্পরীতির সঙ্গে সংমিশ্রণ ও সমন্বয় ঘটেছিল দেশজ, মুঘল, রাজস্থানী, পারসিক ও জাপানী রীতির। এই ভাবেই একদিন দেখা গেল নব্যভারতীয় চিত্রশিল্পের সূচনা।

বাঙালি মেয়েদের মধ্যে শিল্পচেতনার অভাব কোনো দিনই ছিল না। তাঁরা যে পরিবেশে দিন অতিবাহিত করতেন, সেখানে রঙ তুলি নিয়ে কাগজ বা কাপড়ের ওপর রেখায় ও রঙে চিত্র রচনার অবকাশ বিশেষ ছিল না। কিন্তু তাঁদের স্বভাব-সুন্দর শিল্পীমনের পরিচয় তাঁরা দিতেন— বার-ব্রতের আলপনায়, কাঁথার সেলাইয়ে, চিত্রিত হাঁড়ি, সরা বা কুলায়, মাটির পুতুল গড়ে, বড়ির আলপনায়, আমসত্ত্ব বা খাবারের ছাঁচ গড়ে। অনেকে আবার তুলি বা কলম নিয়ে ছবিও আঁকতেন— তার সামান্য কিছু উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন গিরীন্দ্রমোহিনী দত্ত তাঁর আঁকা ছবি 'সখি-সমিতি'তে দিয়েছিলেন প্রদর্শনের জন্য। তাঁর "শিখা" (১৮৯৬) নামক কাব্যগ্রন্থে ছিয়াত্তরটি কবিতার সঙ্গে কবির স্বহস্ত-অঙ্কিত চিত্রও সেখানে প্রকাশিত হয়েছিল।[৩১] মৃৎশিল্পেও কবি গিরীন্দ্রমোহিনীর দক্ষতা ছিল তার প্রমাণ দেয় তাঁর তৈরি "মাটির গ্রাম্য

ছবি"। 'সখি সমিতি'র প্রদর্শনীতে এই কাজটি দেখে অনেকে ভেবেছিলেন কৃষ্ণনগরের কারিগরদের তৈরি। এই কাজটির জন্য তিনি পুরস্কারও পেয়েছিলেন। কেশবচন্দ্রের কন্যা মহারানী সুচারু দেবীর চিত্রাঙ্কনের খ্যাতি ছিল। ঠাকুরবাড়ির অনেক মেয়ে ও বউ ছবি আঁকা শিখেছিলেন ও তাঁদের আঁকা ছবির প্রতিলিপি প্রকাশিত হয়েছিল কোনো কোনো পত্র-পত্রিকায়। হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী নীপময়ী দেবী ও তাঁর কন্যা প্রতিভা, প্রজ্ঞা প্রভৃতি শিল্পী কালিদাস পাল ও White সাহেবের কাছে ছবি আঁকা শিখেছিলেন। 'পুণ্য' পত্রিকাতে এঁদের আঁকা কিছু ছবির প্রতিলিপিও প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু এঁরা ছবি আঁকতেন, কিছু পরিমাণে নিজেদের খেয়াল-খুশি চরিতার্থ করার জন্য। প্রথম যে মহিলা চিত্ররচনায় অসাধারণ নিষ্ঠা ও মৌলিকতার পরিচয় দিলেন তিনিও ছিলেন ঠাকুর বাড়িরই কন্যা— সুনয়নী দেবী। বাড়ির পরিবেশই তাঁকে শিল্পী করেছিল, যদিও একটু বেশি বয়সেই তিনি ছবি আঁকা শুরু করেছিলেন।

সুনয়নী দেবী (১৮৭৫-১৯৬২)

সুনয়নী ছিলেন গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠা কন্যা এবং গগনেন্দ্র, অবনীন্দ্র ও সমরেন্দ্রনাথের সহোদরা। আপন মনে সুনয়নী চিত্র রচনা করতেন। বারো বছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয় আইনজীবী রজনীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। প্রায় ত্রিশ বছর বয়স থেকে সুনয়নী নিয়মিতভাবে ছবি আঁকতে শুরু করেন। তাঁর চিত্রয়াঙ্কনের বৈশিষ্ট্য ছিল তিনি সরাসরি রঙ-তুলি দিয়ে মনের মতো চিত্র-ফুটিয়ে তুলতেন কাগজে বা কাপড়ে ; পেনসিল দিয়ে প্রাথমিক কোনো খসড়া তৈরির প্রয়োজন হত না তাঁর। দাদাদের কাছে সামান্য রকম তালিম নিয়েছিলেন হয়তো। তিনি প্রায় স্বশিক্ষিত শিল্পী ছিলেন। জলরঙে ও 'ওয়াশ' পদ্ধতিতেই তিনি অধিকাংশ ছবি এঁকেছিলেন, অথচ দাদাদের প্রভাবে প্রভাবিত হন নি, সর্বত্র তাঁর মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। কিছুটা পটুয়াদের রীতিতে আঁকা হত ছবিগুলি। পৌরাণিক ও বাস্তব জীবনের নানা বিষয়ে নিয়ে চমৎকার সব ছবি এঁকেছিলেন সুনয়নী দেবী। যেমন হরপার্বতী, অর্ধনারীশ্বর, রাধা, মা যশোদা, বৃন্দাবনের গোপিনী, গোকুল থেকে কৃষ্ণের বিদায়, রামায়ণ ও মহাভারতের অনেক বিষয়। এ ছাড়া অন্তঃপুরিকা হিসাবে তিনি ঘর-গৃহস্থালীর জীবন্ত চিত্র ফুটিয়ে তুলেছিলেন তাঁর— লাজুক গৃহবধূ, বিবাহের দৃশ্য, প্রসাধনরতা নারী, বরণডালা হাতে রমণী, জাপানী মেয়ে, গ্রাম্যবধূ, পূজারতা নারী প্রভৃতি চিত্রে। তাঁর চিত্রে আঙ্গিকের বৈচিত্র্য তেমন দেখা যায় না। সহজ অনায়াস ভঙ্গিতে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন এক-একটি ভাবকে। এর কারণ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন প্রতিমা দেবী— তিনি বলেছেন, "আমার মাসিমা সুনয়নী দেবী। সনাতন প্রথা অনুসারেই তাঁকে চলতে হত, সংসারে যেমন সব সাধারণ গৃহিণীরা গৃহিণীপণা করে থাকেন। অসংখ্য ছেলেমেয়ে চাকরবাকরের বৃহৎ পরিবার, তারই মাঝখানে মাসিমা কোন্ দূরান্তরের মানুষ যেন। মেয়েলি গল্পগুজব হাসি-ঠাট্টা সবের মধ্যেই তিনি নিজেকে সমানভাবে মিলিয়ে দিয়েছিলেন, তবু তাঁর মন নিজেকে হারিয়ে ফেলেননি জীবনের খুঁটিনাটি অবান্তর জিনিষের মধ্যে।"[৩২] সুনয়নী দেবীর স্বকীয়তা কোথায়



সুনয়নীদেবীর স্ব-অঙ্কিত আত্মপ্রতিকৃতি

সে সম্পর্কে প্রতিমা দেবী বলেছেন—"আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার নব উদ্বোধনের যুগে অবনীন্দ্রনাথ যেমন পারশিয়ান ও মোগল টেকনিক গ্রহণ করলেন, গগনেন্দ্রনাথ নিলেন জাপানী ও কিউবিস্টিক টেক্‌নিকের ধারা, তেমনি তাঁদের ভগ্নী সুনয়নী দেবী একেবারে জন-সাধারণের আর্ট পটুয়াশিল্পের ভিত্তির উপর তাঁর চিত্রাবলী রচনা করলেন।" [৩৩] শিল্পী যামিনী রায়ের আবির্ভাবের অনেক আগেই সুনয়নী দেবী পটের রীতিতে নিজস্ব ভঙ্গির সঙ্গে মিশিয়ে বিশেষ একটি আঙ্গিকে চিত্র রচনা করে গুণী সমাজে সমাদর পেয়েছিলেন। এই ক্ষেত্রে তিনিই পথিকৃৎ। আধুনিক এক চিত্রসমালোচক সুনয়নীর আঙ্গিক সম্পর্কে বলেছেন—

"One of Abanindranath's sisters, Sunayani Devi also painted gentle native pictures, related to primitive art but bearing the impress of her serene and quiescent personality."

এই মহিলা শিল্পী দেশী বিদেশী বহু চিত্ররসিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। স্টেলা ক্র্যামরিশ তাঁর ছবির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। তিনি সুনয়নী দেবীর শিল্পকলা বিষয়ে *Modern Review* পত্রিকায় জুলাই ১৯২২ একটি মনোজ্ঞ নিবন্ধ লিখেছিলেন। লন্ডনে সুনয়নীর আঁকা ছবির একটি মনোজ্ঞ প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন (১৯২৭) 'লন্ডন উইমেন্স ক্লাবে'র সভ্যরা। কলিকাতা, মাদ্রাজ, মহীশূর, ত্রিবান্দ্রম প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে চিত্রসংগ্রহশালায় সুনয়নী দেবীর চিত্র রক্ষিত আছে। সাহিত্যচর্চাতেও তাঁর উৎসাহ ছিল। তবে তাঁর প্রধান পরিচয় হল—আধুনিক চিত্রকলার জগতে তিনিই প্রথম বাঙালি মহিলা চিত্রশিল্পী।

সুনয়নীর ভগিনী বিনয়িনীর মধ্যেও ছিল সূক্ষ্ম শিল্পচেতনা ও রুচিবোধ। বিশেষ করে নানা ছাঁদের কেশবিন্যাসে তিনি ছিলেন পারদর্শিনী। তাঁরই কন্যা প্রতিমা দেবীর মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল শিল্প-প্রতিভা।

সুখলতা রাও (১৮৮৬-১৯৬৯)

সুখলতা ছিলেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী কন্যা। শৈশবে শিল্পী পিতার কাছেই তাঁর শিল্পের অনুশীলন চলেছিল। ব্রাহ্মবালিকা বিদ্যালয় ও বেথুন কলেজে লেখাপড়া করার অবসরে সাহিত্য ও শিল্পের সাধনা করতেন। ডা. জয়ন্ত রাও-এর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। বাংলা ও ইংরেজী মিলিয়ে প্রায় কুড়িখানি গ্রন্থের তিনি রচয়িত্রী। 'বেহুলা' নামে নিজের লেখা বইতে লেখিকা নিজেই চিত্রাবলী অঙ্কন করেছিলেন। সুখলতার আঁকা একাধিক চিত্র-শিল্প- রসিকদের প্রশংসা অর্জন করেছিল। একাধিকবার তাঁর আঁকা চিত্রের প্রদর্শনী হয়েছিল। 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিয়ু'তে সুখলতার অনেক চিত্রের প্রতিলিপি প্রকাশিত হয়।

প্রতিমা দেবী (১৮৯৩-১৯৬৯)

ইনি ছিলেন ঠাকুর বাড়ির কন্যা, আবার ঠাকুর বাড়িরই বধূ। প্রতিমা দেবীর পিতামাতা হলেন শেষেন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায় ও বিনয়িনী দেবী। তিনি ছিলেন বাল-বিধবা। সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতি

নানা সদ্‌গুণের বিকাশ ঘটেছিল তাঁর মধ্যে। প্রতিমার ছবি আঁকার হাতে-খড়ি হয়েছিল তাঁর মামা শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ এবং তাঁদের গৃহে অবস্থানকারী জাপানী শিল্পীর কাছে। প্রতিমার ছবির প্রতিলিপি প্রকাশিত হয়েছিল 'প্রবাসী' পত্রিকায়। রবীন্দ্রনাথের পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নীরূপে তাঁর উপরে বিশ্বভারতীর অনেক গুরু দায়িত্ব ছিল। সেই সময় প্রতিমা দেবী বাটিক ও অন্যান্য কারুশিল্প শিক্ষার আয়োজন করেন সেখানে। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি— 'নৃত্য', 'চিত্রলেখা', 'স্মৃতিচিত্র', 'নির্বাণ' প্রভৃতি।

শান্তা দেবী (১৮৯৩-১৯৮৩)

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও মনোরমা দেবীর কন্যা শান্তাদেবীর পিতৃগৃহে ছিল সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ। যদিও কলকাতার বেথুন স্কুল ও কলেজে তিনি পড়াশোনা করেন কিন্তু সাহিত্য ও শিল্পের সাধনাও সেইসঙ্গে করেছেন। তাঁর প্রাথমিক শিল্পশিক্ষা লাভ হয় অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর সুযোগ্য শিষ্যা নন্দলাল বসুর কাছে। তাঁর অঙ্কিত চিত্রের মধ্যে কয়েকটি প্রাকৃতিক দৃশ্য, বেশ-কিছু পরিচিত ও অপরিচিত মানুষের প্রতিকৃতি ও গোয়ালিনী, বালিকার পুতুলের সংসার প্রভৃতি বিখ্যাত। 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন' রিভিয়ু'তে তাঁর একাধিক চিত্রের প্রতিলিপি প্রকাশিত হয়।

সংগীতের মতো চিত্রকলা এমন-কি ভাস্কর্যের চর্চাতেও এখন বহু মহিলা আত্মনিয়োগ করেছেন। বিশ্বভারতীর 'কলাভবন'কে কেন্দ্র করে দেখা দিয়েছিলেন বহু মহিলা শিল্পী। এই পথটি সুগম করে গেছেন উনিশ শতকের কয়েকজন মহিলা শিল্পী।

ফোটোগ্রাফি বা আলোকচিত্রের ক্ষেত্রে বাঙালি মহিলা

উনিশ শতকে শুধু চিত্রশিল্প বা ভাস্কর্য নয়, ফোটোগয়াফি বা আলোকচিত্রেও নৈপুণ্য অর্জন করেছিলেন একাধিক বঙ্গনারী। সেকালে ভালো ফোটো তোলা খুব সহজ কাজ ছিল না। কারণ তখনকার ক্যামেরা বস্তুটি ছিল খুবই জটিল ধরণের। তার যথাযথ ব্যবহার আয়ত্তে আনতে হলে আলোকচিত্রীকে নিজের সূক্ষ্ম বিচার-বুদ্ধি ও হাতের কলাকৌশল প্রয়োগ করতে হত অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে।

কলকাতায় প্রথম ক্যামেরার আমদানি হয় ১৮৪০-এ। কিন্তু সাধারণ মানুষে আলোকচিত্রের সঙ্গে ভালোমত পরিচিত হল ১৮৮০-৯০তে। প্রথম দিকে পাশ্চাত্য মহিলা ফোটোগ্রাফাররা এগিয়ে এসেছিলেন এদেশের পর্দানসীন অন্তঃপুরচারিণীদের ফোটো তোলার জন্যে। 'ফোটোগ্রাফিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল' এর সদস্য তালিকায় অনেক শ্বেতাঙ্গিনী মহিলার নাম দেখতে পাওয়া যায় তবে সর্বপ্রথম পেশাদার পাশ্চাত্য মহিলা ফোটোগয়াফার ছিলেন বোধহয় মিসেস্ ই. মায়ার (Mayer)। ১৮৬৪তে তিনি ৭নং ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিটে একটি স্টুডিও খুলেছিলেন, যাতে অভিজাত ঘরের বাঙালি মেয়েরা অকুণ্ঠিতভাবে নিজেদের ছবি তোলাতে পারেন। পরে সেটি স্থানান্তরিত হয় ৫, ওয়াটার্লু স্ট্রিটে।

এরপর ১৮৭৭-এ মিসেস ডি. গ্যারিক জেনানা স্টুডিও খুলেছিলেন ওয়াটার্লু স্ট্রিটে। আরও একজন বিদেশিনী মিসেস্ উইন্স শুধুমাত্র এদেশীয় মেয়েদের জন্য স্টুডিও খুলেস ক্ষান্ত হননি— বাঙালি ঘরের অন্দরমহলের বাসিন্দাদের সমাজ ফোটো তোলা শেখাবার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। প্রগতিশীল ব্রাহ্মসমাজ এ-বিষয়ে তাঁর সহায় হয়েছিলেন। এই মর্মে "বামাবোধিনী" পত্রিকার (১৮৮৫ এপ্রিল) বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল—"বিবী উইন্‌স অনেক ব্যয় ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া অতিসুন্দর নূতন প্রণালীতে এই বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছেন, তিনি অন্তঃপুরে গিয়া অথবা কলিকাতা বা মফঃস্বলের স্থান বিশেষে শ্রেণী খুলিয়া ইহা মহিলা ও ভদ্রলোকদিগকে শিক্ষা দিতে ইচ্ছুক। শিক্ষার্থে ব্যয় সম্বন্ধে বন্দোবস্ত তাঁহার সহিত কথা হইলে ঠিক হইতে পারিবে।" ইত্যাদি

বঙ্গদেশের প্রথম সুদক্ষ ফোটোগ্রাফার ছিলেন ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের তৃতীয়া পত্নী মহারাণী মনমোহিনী। তিনি মহারাজ বীরচন্দ্রের কাছে উৎসাহ পেয়ে ফোটো তোলা ও ডেভলাপ করার বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। বিষয়টি জানা যায় ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দের মে মাসের ফোটোগ্রাফিক সোসাইটি অফ ইন্ডিয়ার জার্নাল থেকে।

আলোকচিত্রে জ্ঞানদানন্দিনী দেবী

সংস্কৃতির অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন ঠাকুরবাড়ির মেয়ে-বউরা ছিলেন অগ্রণী, তেমনি ফোটোগ্রাফিতেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহধর্মিনী জ্ঞানদানন্দিনী ছিলেন এ বিষয়ে পারদর্শিনী। তাঁর কন্যা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে একটি পত্র লেখেন তখনকার আর-একজন বিখ্যাত ফোটোগ্রাফার দেবলীনা সেন রায়কে। সেখানে তিনি প্রসঙ্গক্রমে বলেছেন—"আমার মা প্রায় শতাধিক বৎসর আগে বোর্ন-শেফার্ডের কাছে ছবি তুলতে শিখে বাড়ির এমন সব লোকের ছবি তুলেছিলেন যাদের অন্য কোন ছবি নেই বা হবার সম্ভাবনা ছিল না।"

সেকালের মেয়েদের ফোটো তোলার এই ঝোঁক সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ পরিচিত ছিলেন বলেই তিনি তাঁর 'যোগাযোগ' উপন্যাসের নায়িকা কুমুদিনী সম্বন্ধে অনায়াসে বলতে পেরেছিলেন—"বিপ্রদাসের ফোটোগ্রাফ তোলার শখ। কুমুও তাই শিখে নিলে।"

এই সময়কার মহিলারা শুধুমাত্র শখের ফোটোগ্রাফার ছিলেন না; একাধিক পেশাদার বাঙালী মহিলা আলোকচিত্রীর সন্ধান পাওয়া যায়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পেশাদারী মহিলা ফোটোগ্রাফার ছিলেন সম্ভবত। সরোজিনী ঘোষ। ইনি নিজের স্টুডিও খুলেছিলেন। ১৮৯৮-এর ১০ জানুয়ারির 'অমৃতবাজার' পত্রিকায়। 'এ লেডি ফোটোগয়াফার' এই শিরোনামে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল—"৩২ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিটের মহিলা আর্ট স্টুডিওর সুদক্ষা হিন্দু মহিলা শিল্পীর কাজ দেখে আমরা মুগ্ধ হয়েছি। আমাদের জন্য তিনি কিছু কাজ করেছেন যার 'ফিনিশ' লক্ষ্য করলে ফোটোগ্রাফার রূপে তাঁর যোগ্যতা ও দক্ষতা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না।"

পরে অনেক বাঙালি মহিলা এক্ষেত্রে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। তবে এই সময়কার সর্বাপেক্ষা

উল্লেখযোগ্য নামটি হল অন্নপূর্ণা দত্ত (১৮৯৪-১৯৭৬)। ইনি ফোটোগ্রাফিকে জীবিকারূপে গ্রহণ করেছিলেন এবং দীর্ঘকাল এই পেশায় নিযুক্ত থেকে নিজের গুণপণাব প্রভূত পরিচয় বেখে গেছেন। অন্নপূর্ণা জন্মেছিলেন এবং শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারে। তাঁর পিতা ছিলেন দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক অম্বিকাচরণ মিত্র। বারো বছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয় উপেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গের। উপেন্দ্রনাথ নিজে ব্যবহারজীবী হলেও, ফোটোগ্রাফি ও ছবি আঁকা ছিল তাঁর নেশা। অন্নপূর্ণা ছিলেন পাঁচ সন্তানের জননী। তাঁব এক কৃতী সন্তান হলেন অমরেন্দ্রনাথ দত্ত। অন্নপূর্ণা সম্পর্কে এক গবেষক বলেছেন—"পেশাদার ফোটোগ্রাফার রূপে তিনি বিশেষ সাফল্য লাভ করেছিলেন ১৯৩০ থেকে ১৯৪০-এর মধ্যে। কোনো ফলকধারী স্টুডিও অবশ্য তিনি স্থাপন করেননি। নিজের বাড়িতে বসেই কাজ করতেন। বাইরে যেতেন ছবি তুলতে। ডেভালাপিং, প্রিন্টিং, ফিনিশিং—সবই একা হাতে। অন্নপূর্ণা দত্তের আত্মপ্রতিকৃতি একটি মূল্যবান সম্পদ।

'ছবি তোলা'— বাঙালির ফোটোগ্রাফি চর্চা—সিদ্ধার্থ ঘোষ, ১৯৮৮, পৃ. ১০১ এই অংশের যাবতীয় তথ্য উপরোক্ত গ্রন্থটি থেকে সংগৃহীত হয়েছে।

সূচীশিল্প ও কারুশিল্প রচনায় বঙ্গমহিলা

প্রাচীন ও মধ্যযুগের ধারা অনুসরণ করে, আধুনিক যুগের বাঙালি মহিলারাও নানা ধরণের সূচীশিল্প ও হস্তশিল্প রচনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তবে যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে রুচিরও পরিবর্তন ঘটেছে। সেকালের মানুষের প্রয়োজনে যে বস্তুর কদর ছিল, পরবর্তীকালে তা অপ্রয়োজনীয় হয়েছে এবং নতুন জিনিসের আমদানি হয়েছে তার পরিবর্তে। এক সময়ে ঘরে কাপাসের চাষ করে, চরকায় মেয়েরা চিকনসুতো কাটতেন। এমন-কি সূক্ষ্ম মসলিন কাপড়ের সুতো তৈরি হত কিশোরী মেয়েদের নমনীয় হাতের ছোঁয়ায়। পুরোনো কাপড়ের উপর পাড়ের রঙিন সুতো দিয়ে নানাবিধ নক্শীকাঁথা বানাতেন এ দেশের মেয়েরা প্রিয়জনদের জন্য। দৈনন্দিন প্রয়োজনে খাবার-দাবার বা বিছানাপত্র ঝুলিয়ে রাখতে রঙিন দড়িতে বোনা নানা ধরণের নক্শার সিকা বানাতেন মেয়েরা। বুননের বৈচিত্র্য অনুসারে নানা নামও থাকত তার—'ফুলঝুরি', 'সাগরবেলা', 'আনন্দ লহরী'—আরও কত কী। ইংরেজ আগমনের পর আমাদের জীবনযাত্রা প্রণালীতে নানা পরিবর্তন এল, সেইসঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তন দেখা গেল। সাদামাটা ধুতি ও শাড়ির পরিবর্তে, দেখা গেল সেলাই করা পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধানের রীতি। সার্ট, প্যান্ট, কোট পুরুষদের, মেয়েদের শাড়ির সঙ্গে এল সায়া, ব্লাউজ বা জ্যাকেটের ব্যবহার এবং ছোটো ছেলেমেয়েদের প্যান্ট, সার্ট, ফ্রক ইত্যাদি বিবিধ পোশাকের প্রচলন হল। তখন বাড়িতে বসে ছাঁট-কাট শিখে মেয়েরা নিজেদের বা ছোটো ছেলেমেয়েদের পোশাক বানাতে চাইলেন নিজেরাই। নানা ধরণে এমব্রয়ডারি করা জামা, শাড়ি বা টেবিল ঢাকা, রুমাল ব্যবহারের রীতি দেখা গেল। সেই-সঙ্গে মহিলা সমিতিতে বা স্কুলে মেয়েদের জন্য স্বতন্ত্রভাবে সূচীশিল্প শিক্ষার রেওয়াজ দেখা গেল। কাঁটা বা ক্রুশ দিয়ে জামা বা লেস ইত্যাদি বোনা শিখতে লাগল সকলে।



অন্নপূর্ণা দত্তের আত্মপ্রতিকৃতি

কার্পেটের উপর উল দিয়ে নানা নক্‌শা দিয়ে আসন তৈরি বা ছবি করতে শিখলেন মেয়েরা। এইভাবে ছাঁটা-ফুল বা নানা ধরণের আসন বোনা হত। কার্পেটের তৈরি জুতো বা ব্যাগ ব্যবহার করতেন সৌখীন মানুষরা। বিছানার চাদর বা বালিশের ওয়াড়ে রঙিন সুতো দিয়ে ফুল-লতাপাতার নক্‌শা তুলতেন মেয়েরা। অভিজাত ঘরের মেয়েদের সেলাই বোনা শেখানোর জন্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে সীবননিপুণা ইংরেজ মহিলা নিযুক্ত করা হত। শোনা যায় প্রথম বাঙালি মহিলা চিকিৎসক কাদম্বিনী গাঙ্গুলী চমৎকার লেস বুনতেন, যখন তিনি ঘোড়ার গাড়ি করে বাড়ি বাড়ি রোগিণী দেখতে যেতেন, সেই অবসরে। পরবর্তীকালে অনেক অসহায় ও দুঃস্থ মহিলা, বালিকাদের সেলাই শিখিয়ে রুজি-রোজগারের পথ খুঁজে পেলেন। দু-একজন সেলাই বিদ্যায় অভিজ্ঞ মহিলা এ বিষয়ে বই লিখেছিলেন। যেমন কমলাবালা বিশ্বাস -রচিত 'সচিত্র সেলাই শিক্ষা' অথবা প্রবোধশশী দেবীর লেখা 'সহজ বুনন শিক্ষা' ইত্যাদি।

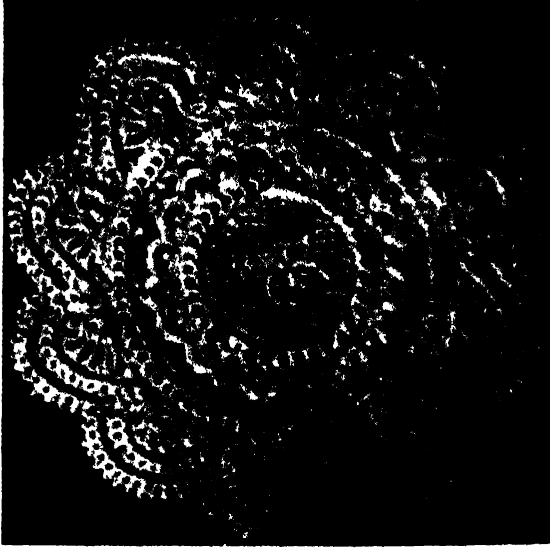
বিবাহে তত্ত্ব-সাজানোর প্রয়োজনে অনেকে মশলা দিয়ে বড়ি অথবা প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী তৈরি করতেন। নানা ভঙ্গিতে ফল কেটে জলখাবারের থালা সাজাতেন, ক্ষীর, মাখন, ছানা দিয়ে পুতুল, কিংবা নানা ধরণের নক্‌শা তৈরি করতেন। পুঁতি দিয়ে তৈরি করতেন আসবাবপত্র অথবা গয়না। পরবর্তীকালে ছাপা, বাটিক, চামড়া, এপলিক ইত্যাদি নতুন ধরণের সব কারুশিল্পের ও সূচীশিল্পের প্রচলন ঘটল। একালে সূচী ও কারুশিল্পে নানা বৈচিত্র্য দেখা গেলেও এর সূচনা হয় উনিশ শতকের মেয়েদের হাতে।

বড়ি শিল্প

ঝালে, ঝোলে, সুক্তো ও অম্বলে খাবার জিনিস ডালের বড়িকে এদেশের মেয়েরা যে শিল্পের পর্যায়ে পৌঁছে দিতে পেরেছেন, তার সাক্ষ দেয় 'নক্‌শাবড়ি' বা 'গহনাবড়ি'। আলপনার মতো নক্‌শা করে অথবা অলংকারের আদলে তৈরি হয় নানা ছাঁদের বড়ি। বিশেষ করে মেদিনীপুর, হুগলী ও হাওড়া অঞ্চলে এই জাতীয় বড়ি দেখতে পাওয়া যায়।

একদা মেয়েদের অবসর বিনোদনের উৎকৃষ্ট উপায় হিসাবে হয়তো এই জাতীয় বড়ি দেবার রীতির প্রচলন হয়েছিল। তারপর থেকে ঠাকুমা, মা, মেয়ে, নাতনী পরম্পারায় তা আজও চলেছে কোনো কোনো পরিবারে।

বিভিন্ন ঋতুতে সময়মতো তৈরি করা হয় নানাবিধ আচার, মোরব্বা, কাসুন্দি, আমসত্ত্ব ইত্যাদি। তেমনি সারাবছরের জন্য বড়ি তৈরির উপযুক্ত সময় হল অগ্রহায়ণ মাস। যতদিন শীতের রোদ্দুর পাওয়া যায়, একেবার মাঘ মাসের শেষ পর্যন্ত তার সদ্ব্যবহার করতে ভোলেন না বাংলার মহিলারা। বড়ির প্রধান উপকরণ হল বিউলির ডাল। কিন্তু যে বিশেষ প্রক্রিয়া অবলম্বনে উৎকৃষ্ট সুস্বাদু ও দুধ-সাদা বড়ি করা যায় তা জানেন শুধু এ বিষয়ে অভিজ্ঞ যাঁরা। কখন, কিভাবে, কতটা সময়ের জন্য ডাল ভিজানো হবে, কেমনভাবে বাটতে হবে, কী পদ্ধতিতে তা প্রয়োগ করা হবে সেটি তাঁদের করায়ত্ত। রবীন্দ্রনাথ একবার গহনাবড়ি উপহার পেয়ে মুগ্ধ ও বিস্মিত



গয়নাবড়ি

হয়েছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল প্রমুখ শিল্পীরাও গহনাবড়ির সৌন্দর্য ও সৌকর্যে চমৎকৃত হয়েছিলেন। এ-হেন গহনাবড়ির নিদর্শন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের যাদুঘরে দর্শনীয় বস্তুরূপে প্রদর্শিত। সামান্য জিনিসকে নিজেদের শিল্পীমনের সযত্ন প্রয়াসে অসামান্য করে তুলেছেন-- এইখানেই নিহিত আছে বাঙালি নারীর কৃতিত্ব।

রন্ধন নৈপুণ্যে বঙ্গনারী

ভোজনরসিক বাঙালির ঘরে খাওয়া এবং খাওয়ানো দুটিকেই জীবনের অন্যতম প্রধান অঙ্গরূপে দেখা হয়। বাঙালির খাদ্য-তালিকার বৈচিত্র্য দেখলে বিস্ময় জাগে ; কারণ, আমিষ, নিরামিষ ও মিষ্টান্ন মিলিয়ে কত যে অসংখ্য ধরণের খাদ্যবস্তু প্রস্তুত করতে পারা যায় তার সঠিক হিসাব সংগ্রহ করাও দুরূহ ব্যাপার। সেকালের গৃহিণীরা মনের সুখে 'পঞ্চাশ ব্যঞ্জন' রোজ না রাঁধলেও অন্ততপক্ষে সম্পন্ন গৃহস্থ ঘরে 'পঞ্চব্যঞ্জন' তো হতই। টক, মিষ্টি, তেতো, ঝাল, কষা ও নোন্‌তা এই ছয় রসের সমাবেশ দেখা যেত আমাদের দৈনন্দিন খাদ্য-বস্তুতে। সেকালের মেয়েরা নিজে হাতে রান্না করে, সযত্নে পিঁড়ি বা আসন পেতে, জল দিয়ে, নিজে হাতে সাজানো ভাতের থালা ধরে দিতেন। গ্রীষ্মপ্রধান দেশ বলে হাতপাখাটি হাতে নিয়ে, বাতাস করতে করতে অনুরোধ ও উপরোধ করে ভূরিভোজন করাতেন। সেকালের বাঙালি ঘরের গৃহিণী মাত্রই হতেন ঘর-সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম তত্ত্বাবধানে পটু। আত্মীয়-স্বজন অতিথি ও প্রতিবেশীদের আদর

যত্ন বা সেবার কোনো ত্রুটি হত না। তার একটি বিশেষ দিক ছিল— উপাদেয় ও মনোলোভা চর্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয় নানাবিধ খাদ্য রন্ধন ও সেইসঙ্গে পরিবেশন। আমাদের দেশে শুধু নয়, পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই দেখা যায় প্রেম-প্রীতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার বহিঃপ্রকাশ ঘটে অনেক সময় বসনালোভন খাদ্যসামগ্রী পরিবেশনের মধ্যে দিয়ে। বাঙালি গৃহিণীরা নিজে হাতে রান্না করে অপরকে পরিতৃপ্তি সহকারে খাইয়ে নিজেরাও তৃপ্তি বোধ করেন। সেকালে তার পরিচয় বিশেষভাবেই পাওয়া যেত। অবস্থাপন্ন ঘরের গৃহিণীকেও রন্ধনপটু হতে হত। কারণ—"সেকালে বেতনভোগী পাচক ব্রাহ্মণের হস্তে কর্তারা আহার করিতেন না। যত বড় ধনী জমিদার গৃহিণী হউন না কেন, তাঁহাকে স্বামী পুত্র আত্মীয়স্বজনের জন্য দুই বেলা রন্ধন করিতে হইত। বিবাহিত কন্যাগণ পিত্রালয়ে থাকাকালীন পিতা পিতামহদিগকে পরিবেশন করিত। তখন কুটুম্ব ছাড়া গৃহই ছিল না। প্রত্যহ দেবসেবা, বারমাসে তের পার্বণ ব্রত, নিয়ম, ব্রাহ্মণ ভোজন লাগিযাই থাকিত। ঠাকুরের ভোগ বিধবারা রাঁধিতেন।" ৩৫

সেকালে অধিকাংশ মেয়েরাই যে দ্রৌপদীতুল্য রন্ধনপটু হতেন তার একটা বিশেষ কারণ ছিল। যে বিশেষ পদ্ধতিতে মেয়েরা রন্ধনবিদ্যা আয়ত্ত করতেন তার শুরুতেই বলতে হবে, রন্ধনবিদ্যাটি হল 'গুরুমুখী বিদ্যা'। সেকালে মা, ঠাকুমা, দিদিমা, পিসিমা, মাসিমা, কাকিমা, জ্যাঠাইমা বা মামিমা -- অর্থাৎ বয়োজ্যেষ্ঠা মহিলারা বাড়ির প্রতিটি ছোটো ছোটো মেয়েদের হাতে ধরে শেখাতেন— কেমন করে কুট্নো বা মাছ কুট্তে হয়, মশলা বাটার রীতি অথবা রান্নাবান্না করার নানা কলা কৌশল, এমন-কি পরিবেশনের কৌশলটি পর্যন্ত। তখনকার দিনে বাড়িতে অতিথি এলে আজকের মতো মিষ্টির দোকান ছিল না, কাজেই সারা বছরই মেয়েরা বাড়িতে কিছু কিছু মিষ্টি ও নোন্তা খাবার তৈরি করে রাখতেন। যেমন, নারকোল নাড়ু, চিঁড়ে বা মুড়ির মোয়া, তিলের নাড়ু, কুচো নিমকি, জিবে গজা, চালের গুঁড়োর আনন্দ নাড়ু বা ঝাল নাড়ু, নানা ধরণের পিঠেপুলি, পাটিসাপ্টা, রস বড়া, সরু চাক্লি, ক্ষীরের খাবার, ডালের বরফি— এমন কত কী। বাড়িতে লোক এলে জল ও জলখাবার দিয়ে আপ্যায়ন করা হত। কারণ সেকালে চা-বিস্কুট দেবার পদ্ধতি জানা ছিল না। নানাবিধ আচার ও চাটনি বড়ি তৈরিতেও তাঁরা ছিলেন সিদ্ধহস্তা। পরবর্তীকালে মেয়েরা যখন স্কুল কলেজে যেতে আরম্ভ করল, তখন থেকে কিছু পরিমাণে পরিবর্তন দেখা দিল। পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন গৃহে অনেকে মাইনে করা ঠাকুর, চাকর ও বাবুর্চি খানসামা নিযুক্ত করতে লাগলেন।

কালের পরিবর্তনের সঙ্গে আহারের রুচিও পরিবর্তিত হতে লাগল। আমাদের প্রাচীন কাব্যসমূহে— শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, মঙ্গলকাব্য, কৃত্তিবাসী রামায়ণ বা চৈতন্যচরিতামৃতে যে ধরণের খাদ্যবস্তুর উল্লেখ দেখা যায়— ধীরে ধীরে তার পরিবর্তন ঘটতে দেখা গেল। সাধারণ বাঙালির খাদ্য বলতে বোঝাত ভাত, ভাজা, সুক্তো, ডাল, চচ্চড়ি, ছেঁচকি, ঘণ্ট, ডাল্না, ঝোল, চাটনি, পায়েস, পিঠে-পুলি ইত্যাদি। পরবর্তীকালে কিছু মোগলাই রান্না মিশে গেল এর সঙ্গে, যেমন— কালিয়া, কোর্মা, কোপ্তা, কাবাব, পোলাও, বিরিয়ানি ইত্যাদি। ইংরেজ আগমনের ফলে

আমাদের খাদ্যতালিকায় যুক্ত হল চপ্, কাটলেট, ফ্রাই, রোস্ট, স্যালাড, আইসক্রীম, পুডিং, কেক্, প্যাস্ট্রি, প্যাটিস্ ইত্যাদি। কবি ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর কবিতায় সম-সাময়িককালের অনেক খাদ্যবস্তুর তালিকা দিয়েছেন। সেকালে সাধারণ বাঙালি ঘরে মাংস খাওয়ার তেমন চল্ ছিল না, তবে 'প্রসাদী' মাংস হলে স্বতন্ত্র কথা। মাছের প্রচলনই ছিল বেশি। ডিমের মধ্যে হাঁসের ডিমই চলত। মুরগির ডিম বা মাংস অধিকাংশ বাড়ির হেঁশেলে ঢোকা নিষিদ্ধ ছিল। মেয়েরা মাংস খেতেন না—সাধারণত।

সেকালে গ্রাম বা শহর অঞ্চলের সকল গৃহেই রন্ধননিপুণা নারীর অভাব ছিল না। প্রগতিশীল ঠাকুরবাড়ির মেয়েরাও এ ব্যাপারে পিছিয়ে ছিলেন না। অনেকেরই এ-বিষয়ে সুখ্যাতি ছিল—নীপময়ী, কাদম্বরী, মৃণালিনী, শরৎকুমারী, সরোজাসুন্দরী প্রভৃতি। কিন্তু প্রজ্ঞাসুন্দরীর খ্যাতি ছিল একটু বিশেষ কারণে। ইনি শুধু রেঁধে ও খাইয়ে তৃপ্ত হতে পারেন নি, সেইসঙ্গে চমৎকার ও বিশাল একখানি রন্ধন বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করে সমস্ত বঙ্গললনাদের তিনি এ-বিষয়ে সচেতন করে তুলতে চেয়েছিলেন।

প্রজ্ঞাসুন্দরী (১৮৭০-১৯৫০)

হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নীপময়ীয় এই রন্ধননিপুণা কন্যাটির আরও অনেক গুণ ছিল—লেখাপড়ায় যেমন ভালো ছিলেন, তেমনি যত্ন নিয়ে শিখেছিলেন গান, ছবি আঁকা। অভিনয়-পটুও ছিলেন। রান্না নিয়ে নানা ধরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন এবং সেই পরিচয় ইনি রেখে গেছেন তাঁর বিশালাকৃতির তিন খণ্ডে প্রকাশিত রন্ধন বিষয়ক গ্রন্থ—"আমিষ ও নিরামিষ" রচনা করে। প্রজ্ঞা দেবী তাঁর গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছেন তাঁর পিতৃদেব হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। চমৎকার একটি 'ভূমিকা' লিখেছেন প্রথমে। প্রথম খণ্ডে আছে সাতটি অধ্যায়। প্রথম অধ্যায়ে 'সাধারণ কথা' বলতে গিয়ে তিনি 'রন্ধনের উপকারিতা'র কথাও আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন (পৃ. ১)—"সাধারণতঃ সকলেই উপাদেয় আহার চায়। উপাদেয় আহার চাই বলিলেই তো তাহা সহজে মিলে না। অনেক কষ্টে তবে ভাল খাবার প্রস্তুত হয়। আমাদের দেশের অনেকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়াও সকল সময়ে ভাল খাবারটি পান না। তাঁহারা অনেক প্রকার ভাল ভাল উপকরণ দ্রব্য আনাইতে থাকেন, রাঁধা হইবে বলিয়া। কিন্তু তবু এত খরচ করিলেও, সকল সময়ে খাবারের ভাল্ আস্বাদটি হয় না। কেন, তাহার কি কারণ নাই ? আছে।" এই ভাবে তিনি একে একে—দাসদাসী পাচক রান্নাঘর—রন্ধন গৃহের সরঞ্জাম—ভাঁড়ার ঘর—খাবার ঘর— ওজন ও পরিমাণ ইত্যাদি রন্ধন-সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়ের আলোচনা করেছেন। 'পুণ্য' পত্রিকার পৃষ্ঠায় প্রজ্ঞা দেবী নিয়মিত ভাবে পাক-প্রণালীর একটি বিভাগ পরিচালনা করতেন। রন্ধন সম্পর্কিত নতুন নতুন পরিভাষা তিনি ব্যবহার করেছেন। ইংরেজী 'মেনু-কার্ড'-এর মতো 'ক্রমণী' রচনা করেছেন তিনি বহুবিধ। তাঁর 'আমিষ ও নিরামিষ' গ্রন্থে দেখা যায় বাংলার ছয় ঋতু ও বারোমাস অনুযায়ী তিনি বিভিন্ন ধরণের 'ক্রমণী' দিয়েছেন—বৈশাখ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক,

অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র মাস অনুযায়ী।

একটি নিদর্শন—

বৈশাখ মাস :

পটোলের ডালনা; পাতলা মুগের ডাল থোড় ও পটোল দিয়া; ঝাল কাসুন্দি দিয়া ভেলোর অম্বল; কলি আমের ঝোল; ঘোল সাঁতলান; আমানি সাঁতলান।"; (পৃষ্ঠা-৭০০)

এই প্রজ্ঞাদেবী ছিলেন বিখ্যাত অসমীয়া লেখক লক্ষ্মীনাথ বেজবড়ুয়ার পত্নী।

সেকালের মেয়েদের জীবনের অধিকাংশ সময় কাটত রান্নাঘরকে কেন্দ্র করে। সেকালের আরও অনেক মহিলা রান্নার বই লিখেছিলেন, যেমন—কিরণলেখা রায়ের 'বরেন্দ্র রন্ধন' নির্মলা দেবীর 'রন্ধন শিক্ষা', কিরণবালা রায়ের 'জল খাবার', নীহারবালা দেবীর 'আদর্শ রন্ধন শিক্ষা', উমাদেবীর 'সনাতন পাক প্রণালী' ইত্যাদি।[৩৬]

কিরণলেখা রায়

কিরণলেখা রায়ের 'বরেন্দ্র রন্ধন' গ্রন্থটি তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। উত্তরবঙ্গের রাজশাহী জেলার দয়ারামপুরে (দিঘাপাতিয়া) লেখিকার মৃত্যু হয় ১৩২৫ বঙ্গাব্দের কার্তিকমাসে। তাঁর স্বামী শরৎকুমার রায় গ্রন্থটি যত্নসহকারে প্রকাশ করেন ১৩২৮ বঙ্গাব্দে। 'সূচনা' (পৃ. ১নং) অংশে তিন উল্লেখ করেছেন "আমাদের পরিবারে আমার পত্নীর রন্ধন নিপুণতার যে একটু খ্যাতি জন্মিয়াছিল তাহার কারণ জিজ্ঞাসু হইলে তিনি হাসিয়া কহিয়াছিলেন— 'পাচিকার প্রধানতঃ দুইটি গুণ থাকা প্রয়োজন; একটি রন্ধনের প্রতি আন্তরিক অনুরাগ বা শ্রদ্ধা, অপর, রন্ধনকালে তৎপ্রতি গভীর মনঃসংযোগ।' আমার পত্নীর অটল ধৈর্যশীলতা দেখিয়া আমার বোধ হয় সুপাচিকার তৃতীয়গুণ ধৈর্য্যশীলতাও বটে।"

গ্রন্থটি চতুর্দশ অধ্যায়ে বিভক্ত এবং বরেন্দ্র রান্না ভিন্ন কিছু মোগলাই রান্না, যা তিনি বেনারসে থাকতে শিখেছিলেন, তার প্রণালীও বিবৃত করেছেন। আমিষ ও নিরামিষ উভয়রীতির রন্ধন পদ্ধতি—পোড়া, সিদ্ধ, ভাজি, ছেঁচকি, চড়চড়ী, শুক্তা, ঝোল, ঘণ্ট, ঝাল, অম্বল, চাটনি এবং আচার ও কাসুন্দি যেমন আছে, তার সঙ্গে তিনি লিখে গেছেন পোলাও, কাবাব, কালিয়া ইত্যদির কথা।

খেলাধুলা ও শারীরিক কসরৎ প্রদর্শনে বঙ্গনারী

খেলাধুলায় আছে নির্মল আনন্দের আয়োজন এবং তা সুস্থ ও সুন্দর স্বাস্থ্য ও মানসিকতা গড়ে তোলার সহায়কও বটে। বৈদিক, পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক যুগের ভারতীয় নারী সমাজে শরীর চর্চার সময় ও সুযোগের অভাব-হয়তো ছিল না। সেই কারণে রথ বা অশ্বচালনা, এমন-কি অস্ত্র চালনাতেও তাঁরা পটু ছিলেন। এই প্রসঙ্গে বিশ্‌পলা, সুভদ্রা, সংযুক্তা কিংবা লক্ষ্মীবাঈ-এর কথা মনে পড়ে। কিন্তু বঙ্গীয় নারী সমাজে প্রাচীন বা মধ্য যুগে মেয়েদের অবসর বিনোদনের উপায় হিসাবে খেলাধুলার সুযোগ কতটা কী ছিল সে কথা তেমনভাবে জানা যায় না। তবে

দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলেছেন এক সময় এদেশের নারী সমাজেও পাশা খেলা প্রচলিত ছিল। তিনি বলেছেন—"মাণিক চাঁদের গানে এবং ডাক ও খনার বচনে দৃষ্ট হয়, ব্রাহ্মণ, ভদ্রলোকগণও কৃষি-ব্যাবসা করিতেন এবং স্ত্রীলোকগণ পর্যন্ত অক্ষক্রীড়াসক্ত ছিলেন। স্ত্রীলোকগণের অক্ষ ক্রীড়াসক্তি কবিকঙ্কণের সময়েও বিদ্যমান ছিল।"[৩৭] তবে বিগতযুগের বাঙালী মেয়েদের জীবনে খেলাধুলার সুযোগ সুবিধা ছিল না বললেই হয়। একান্নবর্তী পরিবারের গণ্ডীতে আবদ্ধ থেকে সংসার ধর্ম পালন করাই ছিল তাঁদের নিকট অবশ্য কর্তব্য কর্ম। শৈশবে বালিকারা খেলনাবাটি খেলে বা পুতুলের বিয়ে দিয়ে—অদূর ভবিষ্যতে ঘর-কন্না করার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করত— পুতুল খেলা রূপ অভিনয়ের মধ্য দিয়ে। অনেকে আবার ছেলেদের সঙ্গে লুকোচুরি, কানামাছি, এক্কা-দোক্কা খেলতো। পল্লীগ্রামের মেয়েরা অনেক সময় ছেলেদের সঙ্গে হাডু-ডু, চোব-চোব, ড্যাংগুলি খেলে, গাছে চড়ে বা নদীতে সাঁতার দিয়ে, ঘুড়ি উড়িয়ে আনন্দ পেয়েছে। কিন্তু ঐ জাতীয় ডান-পিটে মেয়েদের কেউ সুখ্যাতি করতেন না। নদীমাতৃক দেশের অনেক পল্লীবধূও সাঁতারে পটু হতেন। প্রতিমাদেবী তাঁর স্মৃতিচিত্র গ্রন্থে সহর অঞ্চলের মেয়েদের মধ্যেও যে ঘুড়ি-ওড়ানোর বাতিক ছিল, সেকথা লিখেছেন- "সেকালে শৌখিন মেয়ে মহলে ঘুড়ি ওড়ানোর ছিল বাতিক এবং ঘুড়ির প্যাঁচ খেলায় অনেক কিছু কাহিনী তৈরি হত।" কোনো কোনো মেয়ে মজলিশে ঘরের মধ্যে বসে দশ-পঁচিশ ঘুঁটি খেলা, বাঘবন্দী, কড়িখেলা বা গোলকধাম, লুডো অথবা তাসের কোনো কোনো খেলা চলত। কিন্তু প্রকৃত খেলার সুযোগ সুবিধা থেকে মেয়েরা ছিলেন বঞ্চিত। খেলাধুলার চর্চা ছিল মেয়েদের পক্ষে রীতিবিরুদ্ধ কাজ, এছাড়া বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল এবং অবরোধ প্রথা মেনে চলতে হত।

এত প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও আমরা সেকালের কয়েকজন দুঃসাহসী ও ক্রীড়া নিপুণ বাঙালি মেয়ের কথা জানতে পারি। সংক্ষেপে কয়েকজনের কথা আলোচনা করা প্রয়োজন।

দ্রবময়ী দাসী

নিম্নবর্ণের এই মহিলাটি তার স্বামীর মৃত্যুর পর সেকালে পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেটকে নিজের অসাধারণ শারীরিক বল ও আশ্চর্য খেলা দেখিয়ে, গ্রামের চৌকিদারের পদ লাভ করে। তার স্বামী আগে ঐ পদে বহাল ছিল। দ্রবময়ীর বাস ছিল বর্ধমান জেলার দুর্গাপুর অঞ্চলে এবং জাতিতে ছিল চণ্ডাল। তার স্বামীর নাম ছিল বৈকুণ্ঠ সর্দার। তাঁকে স্বামীর প্রকৃত সহধর্মিণী বলা যায় বিশেষ অর্থে। বঙ্গললনাদের মধ্যে শৌর্যবীর্যশালিনী হিসাবে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই দ্রবময়ী।[৩৮] অবশ্য সেকালে বা একালে অনেক সাহসিনী পল্লীবালা বা বধূর কথা শুনতে পাওয়া যায়, যাঁরা দুর্ধর্ষ ডাকাতদের ঘায়েল করেছেন উপস্থিত বুদ্ধি ও সাহস এবং শারীরিক বলের দ্বারা।

উনিশ শতকে কয়েকজন বাঙালি ক্রীড়ানিপুণ নারীর কথা শোনা যায় যাঁরা সার্কাসের দলে আশ্চর্য সব খেলা দেখিয়ে বহু দর্শককে স্তম্ভিত করে দিয়েছিলেন। তাঁরা হলেন—সুশীলাসুন্দরী, মৃন্ময়ী, কুমুদিনী, রাজবালা, সুলতান বালা, সুচিন্তা, সুকুমারী ইত্যাদি।

বাঙালির মনে জাতীয়তাবোধের জাগরণ ঘটল এবং নানা ভাবে তার বহিঃপ্রকাশ দেখা গেল। যেমন 'হিন্দু মেলা'র প্রবর্তন ঘটল ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দে। ১৮৭৯ পর্যন্ত প্রতিবছর নিয়মিত ভাবে নানা ক্রীড়ানুষ্ঠানের ব্যবস্থা হত এই হিন্দুমেলা উপলক্ষে। এ বিষয়ে যিনি প্রধান উদ্যোগী পুরুষ ছিলেন তাঁর নাম, নবগোপাল মিত্র - সকলে তাঁকে 'ন্যাশনাল নবগোপাল' নামে অভিহিত করতেন। ইনিই প্রথম বাঙালিদের নিয়ে ছোটো একটি সার্কাস দল গড়ে তুলেছিলেন।

সেকালে প্রায়ই কোনো-না-কোনো বিদেশী সার্কাসদল কলকাতায় এসে সার্কাস দেখিয়ে যেত। তার মধ্যে বিখ্যাত বিলেতি সার্কাস দল-- "উইলসন্‌স্ গ্রেট ওয়ার্ল্ড সার্কাস" এসে খেলা দেখিয়েছিল ১৮৭৩-৭৪ খ্রীস্টাব্দের শীতকালে। সাধারণ লোকের মধ্যে দারুণ উৎসাহ দেখা গিয়েছিল ঐ খেলা দেখার জন্য। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবও এসেছিলেন সার্কাস দেখতে, তাঁর রোজনামচার মধ্যে তার বর্ণনা আছে।[৬৯] তার পরেই দেখা গেল বাঙালি সার্কাসের স্বর্ণযুগ। বাঙালির জীবনে এই সময় সার্কাস একটি বিরাট আকর্ষণ হয়ে দেখা দিয়েছিল। বাঙালির উদ্যোগে একাধিক সার্কাস দল গড়ে উঠল। ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে গড়ে ওঠে "গ্রেট ইন্ডিয়ান সার্কাস"। এই দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বিখ্যাত খেলোয়াড়--শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি খালি হাতে বাঘের সঙ্গে খেলা দেখাতেন। বাঙালি সার্কাসের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত দলটি হল "গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস" বা "প্রোফেসর বোসেস্ সার্কাস"। কবি ও নাট্যকার মনোমোহন বসুর কনিষ্ঠপুত্র, প্রিয়নাথ বসুই হলেন এই "প্রোফেসর বোস্"। প্রিয়নাথ ছিলেন একজন সুদক্ষ ব্যায়ামবীর ও ক্রীড়াবিদ্। তাঁর প্রদর্শিত জিমন্যাস্টিকের নানাবিধ কসরৎ দেখে বড়লাট লর্ড ডাফরিন এতই মুগ্ধ হন যে, তাঁর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে আলাপ করেন। তাঁকে তিনি "প্রোফেসর বোস্" বলে সম্বোধন করেন, এই সময় থেকেই প্রিয়নাথের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। নিষ্ঠাসহকারে প্রিয়নাথ তাঁর সিমলা অঞ্চলের ব্যায়ামাগার বা আখড়াতে গড়ে তোলেন এই দলটি। তাঁর বাড়ির মেয়েরা গোপনে তাঁকে প্রয়োজনীয় অর্থ জুগিয়েছিলেন। বিদেশী সার্কাসদলের মতো কিছু বাঙালি মেয়েকে তিনি ভালোভাবে খেলা শিখিয়ে নিজের দলে নিলেন। শুধু ভারতে নয়, ভারতের বাইরে দূর প্রাচ্যে খেলা দেখিয়ে অজস্র প্রশংসা পেয়েছিল এই দলটি, কিন্তু সিঙ্গাপুরে অকস্মাৎ প্রিয়নাথের মৃত্যু ঘটায়, এই দলটি ভেঙে যায়। প্রিয়নাথের দলের ক্রীড়ানিপুণ মেয়েদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন সুশীলাসুন্দরী।

সুশীলাসুন্দরী (১৮৭৯-১৯২৪)

ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে ইনিই প্রথম সার্কাসদলে যোগদান করেন। এঁর বাবা-মার পরিচয় জানা যায় না, শুধু শোনা যায় যে মাত্র এগারো বছর বয়সে সুশীলা তাঁর সাত বছরের ভগিনী কুমুদিনীকে নিয়ে প্রোফেসার বোসের সার্কাস দলে যোগ দেন। নির্ভীক ভাবে সুশীলা বাঘের খেলা ও অন্যান্য খেলা দেখাতেন। ঐ সার্কাস দলে তখন চারটি বাঘ ছিল--- লক্ষ্মী, নারায়ণ, শুম্ভ ও নিশুম্ভ। আধঘণ্টা ধরে তিনি ঐ বাঘেদের সঙ্গে কাটাতেন খালি হাতে। এ ছাড়া আরও যে-সব খেলা

দেখাতেন সেগুলি হল— সিংগল্ ও ডবল ট্রাপিজ, ল্যাডার, বল, রিং ইত্যাদি নানা কসরতের খেলা। "জীবন্ত সমাধিস্থ" করে রাখার মতো বিপজ্জনক খেলা দেখাতে গিয়ে, একাধিকবার তাঁর জীবন সংশয় দেখা দিয়েছিল। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় একবার 'ফরচুন' নামে নতুন একটি বাঘের সঙ্গে খেলা দেখাতে গিয়ে সুশীলা চিরকালের মতো পঙ্গু হয়ে যান এবং মাত্র পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু ঘটে। দর্শক সাধারণ তাঁর খেলা দেখে হতবাক্ হয়ে যেতেন। তাঁর সম্পর্কে 'দি ইংলিশম্যান' কাগজ লিখেছিল (২৫ নভেম্বর ১৯০১ খ্রী.)

"But what impresses the observers most are the performances of Miss Susila with two Royal Bengal tigers. Hindu women are notoriously timid, but in the person of Susila, there is one who, with fearlessness, enters the den of two apparently savages, without any whip or any defensive appliances, and goes through her performance with these animals with a nerve and fearlessness really startling to witness. She was over and over encored and deservedly so, a number of Zenana ladies in the closed boxes joining in these marks of appreciation."

কুমুদিনী

ইনি ছিলেন সুশীলার ছোটোবোন। প্রিয়নাথের দলে কুমুদিনী ঘোড়া ও নানারকম জিম্‌নাস্টিকের খেলা দেখাতেন। এই সময় যোগীন পালের সার্কাস দলেও দুটি মেয়ে ঘোড়ার খেলা দেখাত কিন্তু তাদের চেয়ে অনেক উঁচু দরের খেলা ছিল কুমুদিনীর খেলা।

মৃন্ময়ী

এই মেয়েটি প্রিয়নাথ বসুর দলে বাঘ ও হাতির খেলা দেখাতেন।

রাজবালা

সার্কাস দলে ব্যালান্সের খেলা দেখাতেন ইনি। পরে প্রিয়নাথের দাদা মতিলাল বোস্ এই মেয়েটিকে বিবাহ করেন।

সুলতানবালা

বাঙালি মেয়ে সুলতানবালা বোসের সার্কাস দলে, ভলটিং হাউল, জাম্প ও ঘোড়ার খেলা দেখাতেন।

সুচিন্তা ও সুকুমারী

এঁরা ছিলেন দুইবোন। তাঁরা ল্যাডার ও ঝোলাতারের খেলা দেখাতেন। তবে সুকুমারী আবার ঘোড়ার খেলা দেখাতেও ওস্তাদ ছিলেন।

এই সময় যখন অন্যান্য সার্কাস দলে ছেলেদের মেয়ে সাজিয়ে খেলা দেখানো হত তখন প্রিয়নাথ যেভাবে মেয়েদের খেলায় পারদর্শী করে তুলেছিলেন— এটি যে কত বড়ো সাহস ও কৃতিত্বের কথা, তৎকালীন পটভূমিকায় সে কথা ভেবে দেখলে তার প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করা যাবে। আজকের দিনে ক্রীড়ামোদী ও খেলাধুলায় পারদর্শিনী বাঙালি মেয়ের অভাব নেই। নানাবিধ খেলা— ফুটবল, ভলিবল, ব্যাটমিন্টন, ক্রিকেট, টেনিস, টেবিল টেনিস, রাইফেল স্যুটিং, সাঁতার, দৌড়, নৌকাচালনা, সাইকেল চড়া অথবা শারীরিক বহু কসরত দেখাতেও তারা অভ্যস্ত। কিন্তু উনিশ শতকে ঐ সব মেয়েরা প্রথম খেলার জগতে আবির্ভূত হয়ে এই পথটি পরবর্তী কালের ক্রীড়া পারদর্শিনীদের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়ে গেছেন, সেকথা মনে রাখতে হবে।[৪০]

সাজসজ্জায়-বেশবিন্যাস-কেশবিন্যাস-অলংকার পরিধান ও প্রসাধন-এ বঙ্গনারী

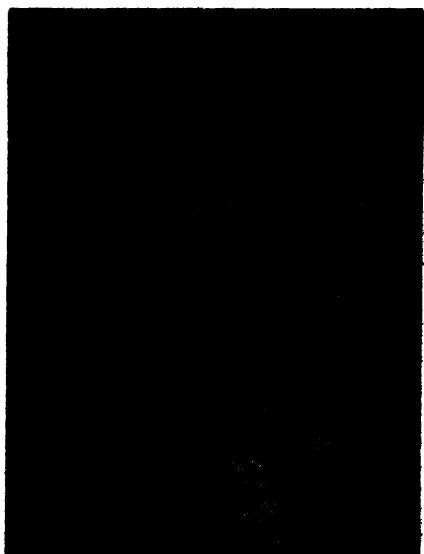
নারীজাতির একটি স্বাভাবিক আকর্ষণ ও প্রবণতা আছে সাজসজ্জার প্রতি। বাঙালি মেয়েরাও এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নন। সুন্দর ও স্বাভাবিক সাজ যেমন মনকে তৃপ্তি দেয়, সাজের আতিশয্য বা উৎকট সাজ তেমনি মনকে পীড়া দেয়। সূক্ষ্ম রুচিবোধের পরিচয় বহন করে রুচিশীল নর বা নারীর সজ্জা। শুধু নরনারীবিশেষে সাজসজ্জার পার্থক্য দেখা যায় তা নয়— দেশ, কাল, জাতি, ধর্ম ও ব্যক্তিগত রুচি অনুযায়ী সাজের রকমফের দেখা যায়। প্রাচীন দিনের সাহিত্য, চিত্রে, ভাস্কর্যে সেকালের সাজ-পোশাকের মধ্যেও আমাদের জাতীয়তাবোধের পরিচয় প্রকাশ পায়। যুগবিশেষে এবং কালের পরিবর্তনে সাজেরও কিছু-না-কিছু পরিবর্তন ঘটে।

'অনেক দিন ধরে এদেশের মেয়েরা আটপৌরে ধরণে একবস্ত্র পরিধান করতেন। গায়ে জামা পরার রেওয়াজ ছিল না। কেবলমাত্র বাইরে যেতে হলে ওড়না বা চাদর ব্যবহার করতেন ও ঘোমটা দিতেন। প্রায় উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত এই রীতি চলেছিল। আধুনিক যুগে বাইরের জগতের সঙ্গে নারীজাতির যোগাযোগ রক্ষার প্রয়োজন হল, তখন ভদ্রগোছের বা বাইরে আনাগোনা করার উপযোগী পোশাকেরও প্রয়োজন হয়ে পড়ল। সেকালে অনেক প্রগতিশীলা নারী নানাবিধ পরীক্ষা করেছিলেন পোশাক-পরিচ্ছদ নিয়ে। পাশ্চাত্য মেয়েদের 'গাউনে'র সঙ্গে শাড়ির আঁচল ধরণের কিছু একটা ব্যবহারের চেষ্টা করেছিলেন কেউ কেউ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঠাকুর-বাড়ির জ্ঞানদানন্দিনী দেবীই একালের কুঁচিয়ে কাপড় পরার রীতিটির প্রবর্তন করলেন।

ঠাকুর পরিবারে অন্তঃপুরচারিণী ছোটো বড়ো সব মেয়েদের সাজপোশাক নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছেন অনেকেই। স্বয়ং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিন্তাধারা কেমন ছিল এ বিষয়ে, সে কথা বলেছেন সৌদামিনী দেবী তাঁর 'পিতৃস্মৃতি' প্রবন্ধে: "ছোটো মেয়েরা ভালো করিয়া কাপড় সামলাইতে পারিত না তাই তাহাদের শাড়ি পরা তিনি [দেবেন্দ্রনাথ] পছন্দ করিতেন না। বাড়িতে দরজি ছিল--- পিতা নিজের কল্পনা হইতে নানাপ্রকার পোশাক তৈরি করাইবার চেষ্টা করিতেন। অবশেষে আমাদের পোশাক অনেকটা পেশোয়াজের ধরনের হইয়া উঠিয়াছিল।"[৪১]



প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী



জ্ঞানদানন্দিনী দেবী

এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথ বলেছেন— "বাইরে বেরোবার মতো কাপড় তখনও মেয়েদের মধ্যে চলতি হয় নি। এখন শাড়ি জামা নিয়ে যে সাজের চলন হয়েছে, তারই প্রথম সুরু করেছিলেন বউ-ঠাকরুন [জ্ঞানদানন্দিনী দেবী]।

বেণী দুলিয়ে তখনও ফ্রক ধরে নি ছোটো মেয়েরা— অন্তত আমাদের বাড়িতে। ছোটোদের মধ্যে চলন ছিল পোশোয়াজের।"[৪২] জ্ঞানদানন্দিনী দেবী বম্বের পার্শি মেয়েদের শাড়ি পরার ধরণের সঙ্গে, নিজস্ব উদ্ভাবিত রীতির সংমিশ্রণ ঘটিয়ে একালে বাঙালি মেয়েদের শাড়ি পরাব ধরণটি তৈরি করেন। সেইসঙ্গে শুরু হয় অন্তর্বাস পরিধানের রীতি—সায়া, সেমিজ, জ্যাকেট ইত্যাদি।

সেকালের মেয়েরা উৎসব-অনুষ্ঠানের দিনে পরতেন সোনালি বা রুপালি জরির কাজকরা বেনারসী, রেশমী বালুচরী, ঢাকাই জামদানী বা নয়নতারা, আশমান তারা অথবা আরও নানা ধরণের বহুমূল্য শাড়ি। মন্দিরে বা পূজা মণ্ডপে যেতেন পবিত্র তসর বা গরদের শাড়ি পরে। মোটামুটি ভাবে বলা যায় শাড়ি হল সর্বভারতীয় মেয়েলী পোশাক--- যদিও প্রদেশ ও জাতি বিশেষে কিছু কিছু বৈচিত্র্য দেখা যায় শাড়ি পরার ধরণ-ধারণে।

কেশ পরিচর্যা ও কবরী বিন্যাস

সেকালে বাঙালির ঘরে কেশবতী কন্যার খুব সমাদর ছিল। প্রচলিত ছড়ায় আছে—

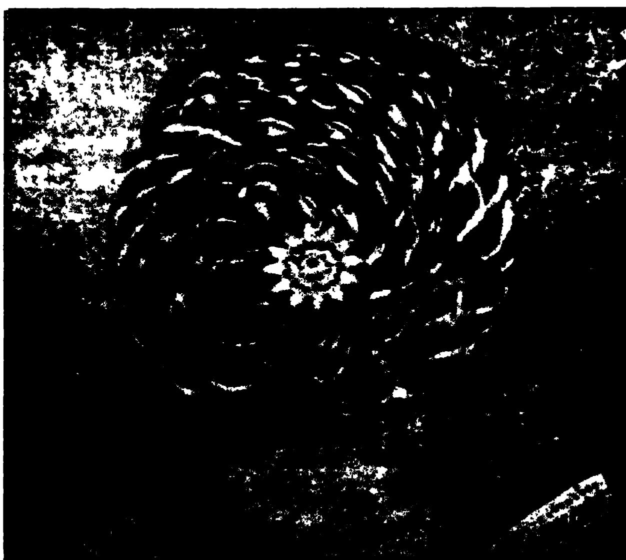
"কাক কালো কোকিল কালো কালো ফিঙের বেশ।
তাহার অধিক কালো কন্যে তোমার মাথার কেশ।"

রূপকথার গল্পের রাজকন্যার মেঘবরণ চুলের বর্ণনা শুনতে পাওয়া যায়। সেই চুলে নানা ছন্দের কবরী বন্ধনের মধ্যে দিয়ে মেয়েদের শিল্পীমনের পরিচয় প্রকাশ পেত। চুলের গোড়া ফিতে দিয়ে বেঁধে তিন বা পাঁচ গুছি নয়— একবোরে নয়, সতেরো বা উনিশ কিংবা একুশ গুছির বেণী অনেকেই বাঁধতে পারতেন। এলো খোঁপার চেয়ে, বেণী করে, তা দিয়ে এক-এক ধরণের খোঁপা বাঁধা হত। বন্ধনরীতির বৈচিত্র্য অনুযায়ী তার ছিল বিভিন্ন নাম—বেনে, কলকা, পাটি, জিলিপীর প্যাঁচ, চালচিত্র, হরতন বা পান, ইস্কাপন, রাজার বাগান, জলতরঙ্গ, মন-ভোলানো, জালফাঁস, বিবিয়ানা, অজন্তা, গঙ্গা-যমুনা, চালতা ফুল, চাটাই, প্রজাপতি খোঁপা— এমনি আরও কত সব নাম ছিল। যে মহিলারা কেশ বিন্যাসে পটীয়সী ছিলেন, মেয়ে-মজলিসে তাঁদের যথেষ্ট খাতির ছিল। ঐ সময় পাতা-কেটে চুল আঁচড়ানোর রীতি ছিল। সুগন্ধি মাথা-ঘষা দিয়ে চুল পরিষ্কার করে, তেল মেখে সযত্ন কেশবিন্যাস করাই ছিল সেকালের অন্তঃপুরচারিণী মেয়েদের প্রয়োজনীয় বিলাস।

ভূষণপ্রিয় বঙ্গললনা

রূপকথার একটি প্রচলিত গল্পে দেখা যায়, মা তার মেয়েকে শঙ্খচূড় সাপের সঙ্গে ঘরে বন্ধ





কেশ বিন্যাসের নিদর্শন—রাজার বাগান ও জলতরঙ্গ

(অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত 'বঙ্গলক্ষ্মীর ঝাঁপি' গ্রন্থ থেকে গৃহীত)

শুনে মেয়ে ভাবলেন ঐ সাপও বোধ হয় ছদ্মবেশী রাজপুত্র। বিষধর সাপের ছোবলে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে মেয়ে যখন আর্ত চীৎকার করছে, মা তখন বাইরে বসে সানন্দে বলছে "পর, পর মা গহনা পর।" এখানে মেয়েদের অলংকার পরিধানের আত্যন্তিক ইচ্ছাকেই হয়তো তীব্র ব্যঙ্গ করা হয়েছে। তবে শুধু সাজবার জন্য বা ঐশ্বর্যের বিজ্ঞাপন তুলে ধরার জন্য এদেশের মেয়েরা গহনা পরতেন না। বিশেষ কয়েকটি অলংকার ছিল পারিবারিক জীবনের মঙ্গল, শ্রী ও সমৃদ্ধির পরিচয়জ্ঞাপক। সেই কারণে ঐ বিশেষ বিশেষ অলংকারগুলি ছিল বিবাহিতা নারীর পক্ষে অবশ্য পরিধানযোগ্য। কোনো সৌভাগ্যবতী নারী যেমন প্রিয়জনের মঙ্গল কামনা করে সীমন্তে সিন্দূর, কপালে টিপ, হাতে শঙ্খ জোড়া, বাম হাতে লোহা, পায়ে আলতা ও লালপেড়ে শাড়ি পরতেন ঠিক সেই একই সংস্কার নিয়ে নাকে নাকছাবি পরতেন—কারণ স্বামীর গায়ে 'খর' নিশ্বাস লেগে তার আয়ুক্ষয় না হয়, এবং সেইসঙ্গে পরতেন কানের গয়না, গলার হার ও হাতের মকরমুখো বালা। সন্তানের মা কোনো দিনই গলা খালি রাখতেন না। প্রসাধন সংস্কারের সঙ্গে, অলংকার পরিধানের সংস্কারও এদেশে বহুদিন থেকে প্রচলিত আছে। কোনো সুলক্ষণা নারীর সঙ্গে আমরা লক্ষ্মীর উপমা দিয়ে থাকি, তার কারণ সেখানে রূপের চেয়ে, তাঁর কল্যাণী মূর্তির কথাটাই আমাদের মনে বিশেষ করে ছায়া ফেলে। তাই দেখতে পাওয়া যায় বাঙালি মেয়েদের দৈনন্দিন বসনভূষণ প্রসাধনের সঙ্গে তার পারিবারিক জীবনের মঙ্গল চিন্তা ও জীবনচর্যার ধ্যান-ধারণা অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে আছে।

উনিশ শতকের মেয়েদের মধ্যে গয়না পরার রেওয়াজ যথেষ্টই ছিল। উচ্চবিত্ত, মধ্য-বিত্ত ও নিম্নবিত্ত সকল ঘরের মেয়েদের কাছেই অলংকার ছিল বড়ো প্রিয় বস্তু। ধনী ঘরের মেয়েরা পরতেন- হীরে, মুক্তো, চুনি পান্নার জড়োয় ও সোনার গহনা। মাথায় পরা হত— মুকুট, সিঁথিপাটী বা টায়রা, ঝাপটা, লেস-পিন; গলায়— চিক, কলার, কণ্ঠহার, সরু ও মোটা নানা ধরণের হার, সাতনরী বা পাঁচনরী মফচেন, পেনডেণ্ট কানে— কুণ্ডল, ঢেঁড়ী ঝুমকো, নানা ধরণের মাকড়ী ও দুল, কানবালা; নাকে— নোলক, টানা দেওয়া নথ ও নাকছাবি; হাতে রতনচূড়, বালা, চূড়, বাউটি, কঙ্কণ, চুড়ি, রিস্টলেট, ব্রেসলেট; ওপর হাতে— তাগা, তাড়, বাজুবন্দ, তাবিজ, কেয়ুর, আর্মলেট; আঙুলে— নানা ধরণের আংটি; কোমরে— গোট বা চন্দ্রহার, পায়ে— তোড়া, মল, চুটকি, পা-পদ্ম, অজুঠী ইত্যাদি হরেক রকমের গা-ভরা গহনা তাঁরা পরতেন। তার উপর খোঁপায় দিতেন চিরুনি ও নানা ধরণের কাঁটা ও ফুল। নিম্নশ্রেণীর মেয়েরা পরত রুপা ও কাঁসার তৈরি গহনা। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সধবা হিন্দু নারীর কাছে শাঁখা জোড়া, লোহা ও সিঁদুরের মহিমা অপরিসীম। তাই এদেশে শঙ্খশিল্প গড়ে উঠেছে এবং শাঁখারী সম্প্রদায় শঙ্খজাত অলংকার বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে চলেছে।

কালের ব্যবধানে শুধু গয়নার নক্শা বা গঠনের রীতি পালটায় না, সেইসঙ্গে গয়না পরার রীতি-নীতিরও আমূল পরিবর্তন ঘটে। অন্তঃপুরিকাদের গয়না পরার হের-ফের সম্পর্কে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর দিদিমার মুখে যা শুনেছিলেন 'ঘরোয়া' গ্রন্থে তার বর্ণনা দিয়েছেন:

"দিদিমা বলতেন, আমাদের কালে এ রকম (অর্থাৎ দেখিয়ে গয়না পরা) ছিল না, আমাদের দস্তুর ছিল গয়নার উপরে একটি মসলিনের পটি বাঁধা থাকত।... তিনি বলতেন...ঘরে আমরা গয়না এমনিই পরতুম, কিন্তু বাইরে কোথাও যেতে হলেই হাতের চুড়ি-বালা-বাজুর উপরে ভালো করে মসলিনের টুকরো দিয়ে বেঁধে দেওয়াই দস্তুর ছিল তখনকার দিনে। ওই মসলিনের ভিতর দিয়েই গয়নাগুলো একটু একটু ঝক্ ঝক্ করতে থাকত। দেখা-গয়না তো পরে বাঈজী, নটীরা, তারা নাচতে নাচতে হাত নেড়েচেড়ে গয়নার ঝক্‌মকানি দেখাতো, ও-সব হচ্ছে ছোটোলোকি ব্যাপার।" ৪৩

বয়স অনুযায়ী এবং বিবাহিতা ও অবিবাহিতা নারীদের গয়না পরার পার্থক্য থাকত। প্রসন্নময়ী দেবী তাঁর 'পূর্বকথা' গ্রন্থে বলেছেন— "তখন গহনা পরা এখনকার মত ছিল না, সাজসজ্জাও অন্যরূপ। আমার হাতে রুপার বালা, গলায় সুবর্ণ কণ্ঠমালা, মাথায় সোনার চূড়া ও পায়ে নূপুর ছিল। ঘাঘরা কুর্তা চাদর এবং নানাবর্ণের নাগরা জুতা পরিতাম। কপালের উপর থরকাটা ও কানের পাশে জুলপি ছিল। বিবাহের পরে সে সব সাজের পরিবর্তে অন্য অলঙ্কার পরিতে হইত। হাতে বেঁকি চুড়ী, নারিকেল ফুল পৈঁছে, গলায় চাঁপকলি, তুলসীদানী, কানে কদমফুল, পিপুলপাতা, নাকে বেসর, কোমরে গোট ও পায়ে মল, গুজরী পঞ্চম। জুল্‌পি তখন আর থাকিত না। কপালে সিঁথিপাটী থাকিলেও, সন্তান না হওয়া পর্যন্ত থরকাটা রাখা হইত।" ৪৪

সেকালের এক বালিকা বধূর অলংকার পরিধানের অভিজ্ঞতার সামান্য বর্ণনা দিয়ে এই প্রসঙ্গ শেষ করা যাক। তিনি লিখেছিলেন— "উৎসবের সময় আমাদিগকে নানা রকমের গহনা পরিয়া সাজিতে হইত। এখনকার মত তখনকার দিনের গহনা অত হাল্কা ছিল না। বাড়ির যে নতুন বউ আসিত তাহাকে আরও বেশী রকম গহনার উৎপাত সহ্য করিতে হইত। আমি তখন নতুন বউ, কাজেই আমারও অবস্থা নিতান্ত মন্দ হয় নাই। গলায়—চিক্, ঝিলদানা, হাতে চুড়ী, বালা, বাজুবন্ধ, কানে—মুক্তার গোছা, বীরবৌলি, কানবালা, মাথায়— জড়োয়া সিঁথী, পায়ে— গোড়ে, পায়জোড় মল, ছানলা, চুটকী। এই ছয়-সাত সের ওজনের গহনা পরিয়া চলা-ফেরা করিতে হইত, না বলিবার উপায় ছিল না...ইহা ছাড়াও দশভরির গোট কোমরে পরিবার নিয়ম ছিল।" ৪৫

প্রসাধন

সেকালে মেয়েদের প্রসাধন ও রূপচর্চার প্রশস্ত অবসর ছিল। প্রতিদিনের জীবনে নিয়ম ছিল, সন্ধ্যার আগেই চুলবেঁধে, প্রসাধন সেরে নিতে হবে। তাই বেলা পড়ে এলেই অন্তঃপুরের দালানে মাদুর পেতে মেয়েরা যে যার সাজের বাক্স নিয়ে বসতেন। সেকালে মেয়েদের বিয়ের সময় চুল বাঁধা ও প্রসাধনের সরঞ্জামসহ বিশেষ এক ধরণের বাক্স দেওয়া হত। প্রতিমা দেবী তাঁর 'স্মৃতিচিত্রে' বর্ণনা দিয়েছেন— "মুখ সাজের এক-একটি বাক্স নিয়ে মাদুরের উপর বসতেন বৌদিরা বেণী রচনায়। সেই পেঁটরার মধ্যে প্রসাধনের বিচিত্র সরঞ্জাম সাজানো থাকত। এখনকার

চেয়ে যে তার কোথাও কিছু কমতি ছিল, তা বলতে পারি না। পমেটম্, রুজ, থেকে আরম্ভ করে গোলা খয়ের আর কাঁচপোকার টিপ, আলতা, সিঁদুর, সুরমা, কাজল, কিছুই বাদ যেত না। মাথা-ঘষার মিষ্টি গন্ধ বাক্স খোলার সঙ্গে সঙ্গেই ভুরভুরিয়ে উঠত।”[৪৬]

সেকালে নাপতিনীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে নখ কেটে, ঝামা দিয়ে ঘসে পা ধুইয়ে, বাড়ির মেয়ে-বউদের আলতা পরিয়ে দিত। অনেকে আবার মেহেন্দী পাতার রস দিয়ে নখ রাঙাতেন। একালের মেয়েরা কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত নানাবিধ প্রসাধন দ্রব্য— সাবান, তেল, শ্যাম্পু, স্নো, ক্রীম, পাউডার, লিপস্টিক ইত্যাদি ব্যবহার করে। কিন্তু সেকালের মেয়েরা রূপচর্চার জন্য সহজপ্রাপ্য নানা বস্তু দিয়ে নিজেরাই অঙ্গরাগ প্রস্তুত করে নিতেন। যেমন সর-ময়দা বা ব্যসন মেখে গা পরিষ্কার রাখতেন। চুলে পরিপাটি করে তেল মাখার রেওয়াজ ছিল। মাথায় মাখা খাঁটি নারকেলের তেলে ‘মাথা-ঘষা’ নামে মশলার ব্যবহার ছিল। তাতে চুলের গোড়া শক্ত হত, আবার চুলের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পেতো এবং মৃদু মধুর একটি গন্ধও পাওয়া যেত। নানা ধরণের আতর ও গোলাপজলের ব্যবহার ছিল। বিবাহিতা নারীর কাছে সংস্কার ও প্রসাধন হিসাবে সিঁদুরের ব্যবহার ছিল অপরিহার্য। শোনা যায় অস্ট্রিক জাতির কাছে থেকে বাঙালি সমাজে এই সিঁদুরের প্রচলন হয়েছে। বিবাহের মুহূর্তে বর, লজ্জারুণ নববধূর সীমন্তে, ভালোবাসার রঙের মতোই লাল সিঁদুরের রেখা এঁকে দেন সযত্নে। এই শুভ চিহ্ন চিরতরে মুছে যায়, যখন কোনো নারীর জীবনে অশুভের আবির্ভাব ঘটে। তখন তিনি নিরাভরণা ও শুভ্র বসনা হয়ে রিক্তরূপে দেখা দেন। সাজসজ্জার একটা বড়ো রকমের পরিবর্তন ঘটে। সেকালে তাঁদের পক্ষে তাম্বুল রাগও ছিল নিষিদ্ধ। এইভাবে উনিশ শতকের বঙ্গনারীদের নিজস্ব রীতির প্রসাধন ও সাজসজ্জার প্রথা প্রচলিত ছিল। একালে তার মধ্যে কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটলেও, মূল আদর্শটি বজায় আছে।

নির্দেশিকা

১। উদ্বোধন পত্রিকা। ৫৬ তম বর্ষ। ষষ্ঠ সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩৬১, পৃ. ৩২৯
২। ‘Some Reflaetions of the Ideals of Indian Womanhood' by D.C. Ganguly in *The Cultural Heritage of India,* Vol. II, 2nd Edn. p. 608
৩। শঙ্কর নাথ রায়, ‘ভারতের সাধিকা’, প্রথম খণ্ড। পৃ. ২০৩-২০।
৪। তদেব, পৃ. ২০৩-২২৪
৫। ভাইজী প্রণীত, ‘মাতৃদর্শন’, ৩য় সংস্করণ। পৃ. ১৬১
৬। ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ‘বাঙ্গালার ইতিহাস’, ২য় সংস্করণ, ১৩৮৩, পৃ. ১৮২-৮৪
৭। বিনয় ঘোষ, ‘পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি’, ১ম সংস্করণ, পৃ. ৩৬০
৮। যোগেশচন্দ্র বাগল, ‘জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গনারী’, (বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ), পৃ. ৮

৯। ড. উষা চক্রবর্তী, 'নারী প্রগতি' (প্রবন্ধ), নরেন্দ্র চক্রবর্তী, 'ঊনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল', পৃ. ৪৩৬

১০। যোগেশচন্দ্র বাগল, 'জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গনারী', পৃ. ১০

১১। কমলা দাশগুপ্তা, 'স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী', ১ম সংস্করণ, ১৩৭০

১২। অরুণকুমার চক্রবর্তী, 'চিকিৎসাবিজ্ঞানে বাঙালী', পরিবেশক সিগনেট বুকশপ। প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৩৮২ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৭৬

১৩। সরলাদেবী চৌধুরানী, 'জীবনের ঝরাপাতা', পৃ. ২২০

১৪। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বঙ্গীয় নাট্যশালা' (বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ), ১৩৫১ বঙ্গাব্দের সংস্করণ, পৃ. ৯-১০

১৫। বিনোদিনী দাসী রচিত 'আমার কথা ও অন্যান্য রচনা' গ্রন্থের 'ভূমিকা' অংশ দ্রষ্টব্য। (সুবর্ণরেখা - ১৩৭৬)

১৬। "ঊনবিংশ শতাব্দীর অভিনেতা-অভিনেত্রী" (প্রবন্ধ), নরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, 'ঊনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল'।

১৭। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস (এই গ্রন্থ থেকে অভিনয়-সম্পর্কিত অধিকাংশ তথ্য গৃহীত হয়েছে।)

১৮। অর্ধেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী (ও. সি. গাঙ্গুলী), 'ভারতের শিল্প ও আমার কথা', পৃ. ৪৪

১৯। সরলাদেবী চৌধুরানী, 'জীবনের ঝরাপাতা', (রূপা সংস্করণ), পৃ. ৭৯-৮০

২০। তদেব।

২১। প্রতিমা দেবী, 'স্মৃতিচিত্র', পৃ. ২৮

২২। চিত্রাদেব, ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল। ১ম সংস্করণ, পৃ. ৯৭

২৩। 'গীতবিতান বার্ষিকী', ১৩৫০, পৃ. ৫৪

২৪। সুভাষ চৌধুরী, 'বাল্মীকি প্রতিভার প্রতিভা (প্রবন্ধ)' 'দেশ' পত্রিকা, ১৮ জুলাই, ১৯৮১। পৃ. ৪৪

২৫। বারিদবরণ ঘোষ, "ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী"। (প্রবন্ধ) 'দেশ' পত্রিকা। ১২ জানুয়ারি, ১৯৭৪। পৃ. ৯৬৪

২৬। ইন্দিরা দেবী, 'রবীন্দ্রস্মৃতি', পৃ. ২৫

২৭। অর্ধেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী (ও. সি. গাঙ্গুলী), 'ভারতের শিল্প ও আমার কথা', পৃ. ১৭৩

২৮। Jaya Appasamy, *Abanindranath Tagore and The Art of His Times*-- p. 1.

২৯। হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়; ঠাকুরবাড়ির কথা', পৃ. ২২০

৩০। অর্ধেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী, 'ভারতের শিল্প ও আমার কথা', পৃ. ১৪২-৪৩

৩১। "গিরীন্দ্রমোহিনী দেবী'- সাহিত্য সাধক চরিতমালা, পৃ. ১৫

৩২। প্রতিমা দেবী, 'স্মৃতিচিত্র', পৃ. ৩৪

৩৩। তদেব, পৃ. ৩৭

৩৪। Jaya Appasamy, *Abanindranath Tagore and The Art of His Times*- p. 66.

৩৫। প্রসন্নময়ী দেবী, 'পূর্বকথা', পৃ. ৭৮

৩৬। অনুরূপা দেবী, 'সাহিত্যে নারী : স্রষ্ট্রী ও সৃষ্টি', পৃ. ১৫০, ১৪৯, ১৫২

৩৭। দীনেশচন্দ্র সেন, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' (অষ্টম সংস্করণ), পৃ. ৬১

৩৮। 'বাঙ্গালির চরিতাভিধান', সাহিত্য সংসদ, পৃ. ২১৮

৩৯। 'কথামৃত' (৫ম ভাগ, ৩য় খণ্ড। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ নভেম্বর)

৪০। ক্রীড়াবিদ বাঙ্গালী মহিলাদের সম্পর্কে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে নিম্নলিখিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধগুলি থেকে—

ক) অবনী কৃষ্ণ বসু, 'বাঙ্গালীর সার্কাস' (১৩৪৫);

খ) বাঁধন দাশগুপ্ত, "রাজবালা ও তাঁর ফিমেল থিয়েটার" (প্রবন্ধ) 'বারমাস' পত্রিকা (১৯৮২ - এপ্রিল-মে সংখ্যা);

গ) রাধাপ্রসাদ গুপ্ত, 'সার্কাস ও সার্কাসে বাঙ্গালী' (প্রবন্ধ), 'শারদীয়া মহানগর' ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ;

ঘ) "সেকালে বাঙ্গালীর সার্কাস" (প্রবন্ধ) আনন্দবাজার পত্রিকা (১৯৮০, ১০ ফেব্রুয়ারি);

ঙ) সুবোধ নারায়ণ চৌধুরী, "জাতীয় জাগরণে শরীর চর্চা ও খেলাধুলা" (প্রবন্ধ), 'উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল'।

৪১। সৌদামিনী দেবী, "পিতৃস্মৃতি", 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত, পৃ. ১৫৮; অপিচ দ্র. প্রশান্তকুমার পাল, 'রবিজীবনী', প্রথম খণ্ড, পৃ. ৫৬

৪২। রবীন্দ্র-রচনাবলী। দশম খণ্ড। (জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ), পৃ. ১৫১

৪৩। ঘরোয়া-অবনীন্দ্র গ্রন্থাবলী। ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৪

৪৪। প্রসন্নময়ী দেবী, 'পূর্বকথা', পৃ. ২২-২৩

৪৫। প্রফুল্লময়ী দেবী, "আমাদের কথা" 'বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ', পৃ. ২৭

৪৬। প্রতিমা দেবী, 'স্মৃতিচিত্র', পৃ. ১৪



উপসংহার

সকল-কালেই জনজীবনের ধারাটি ঠিক একই খাতে, একইভাবে প্রবাহিত হয় না। কখনো তা চলে ধীর মন্থরগতিতে, কখনো-বা দ্রুতগতিতে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এ দেশে যে নবজাগরণ এসেছিল, নারীমুক্তি আন্দোলন তার অন্যতম প্রধান ঘটনা। তারই একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা অঙ্কনের চেষ্টা করেছি আমি এই নিবন্ধে।

এ দেশের নারীজাগরণের সঙ্গে পাশ্চাত্য জগতের নারীজাগৃতির একটি মৌলিক পার্থক্য আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সেটি হল পাশ্চাত্যের রক্ষণশীল পুরুষরা কোনোক্রমেই নারীর সামাজিক মর্যাদা, ভোটাধিকার ও রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের দাবিকে মেনে নিতে চান নি। তার ফলে পাশ্চাত্যদেশীয় মহিলারা মরণপণ করে পুরুষের সঙ্গে সমকক্ষতা অর্জনের জন্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। অধিকাংশ পুরুষ তাঁদের প্রতি অশালীন আচরণ ও অকরুণ মনোভাব প্রদর্শন করেছিলেন। আন্দোলনের নেত্রীদের তাঁরা নানাভাবে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও ভর্ৎসনা করেছিলেন। মুষ্টিমেয় কয়েকজনমাত্র পুরুষ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাঁদের সমবেদনা ও সহানুভূতি জানিয়েছিলেন। যেমন নাম করা যেতে পারে জন স্টুয়ার্ট মিল-এর। তিনি ছিলেন নারীমুক্তি আন্দোলনের একজন প্রধান সমর্থক। বিখ্যাত নাট্যকার ইব্‌সেন তাঁর 'Doll's House' নাটকের নায়িকা নোরার মুখ দিয়ে বলেছিলেন : 'I believe that before all else I am a resonable human being, just as you are.'

ইংলন্ডের মেয়েরা বিংশশতাব্দীর প্রথম দশক থেকে যে ভোটাধিকার আন্দোলন (Suffagette) শুরু করেন, তার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এমেলাইন প্যাংকহার্স্ট ও তাঁর কন্যা ক্রিস্টাবেল প্যাংকহার্স্ট। তাঁদের শারীরিক নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল এবং তাঁরা কারাবরণও করেছিলেন। আমেরিকাতেও নারীরা সংগ্রাম করে তবে ভোটাধিকার লাভ করেছিলেন। (১৯২০)। পাশ্চাত্যের নারীকুল দীর্ঘকাল ধরে পুরুষের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিযোগিতা করে অবশেষে সাফল্য অর্জন করেছেন।[১]

আমাদের দেশে স্ত্রী-স্বাধীনতার সূত্রপাত ঘটেছে কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন রীতিতে। ঊনবিংশ শতকে জনাকয়েক মানবদরদী মনীষী সব প্রথম এগিয়ে এসেছিলেন স্ত্রীজাতিকে অবহেলা, অবমাননা ও নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য। তাঁরাই সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করে তুলতে চাইলেন এবং নারীজাতিকে জাগাতে চেষ্টা করলেন। অনেকদিন ধরে

---

১ "By 1975 women were allowed to vote in national election on an equal basis with men in 129 countries." —*Britannica Junior Encyclopeadia*, vol. 15, p. 135, 1980.

চলেছিল এই নারীকল্যাণমূলক সংগ্রাম। রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, ডিরোজিও ও তাঁর শিষ্যবর্গ, কেশবচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ প্রমুখ অনেকেই এই কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁদের প্রাণপণ চেষ্টাতেই অবশেষে বঙ্গীয় নারীসমাজ সাহস সঞ্চয় করে নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন ও সজাগ হয়ে উঠেছেন। স্বাধীনভারতে যে সংবিধান রচিত হয়েছে সেখানে সহজভাবেই মেনে নেওয়া হয়েছে পুরুষ ও নারীর সমানাধিকার। ভোটাধিকার পাবার জন্য স্বতন্ত্রভাবে কোনো সংগ্রাম করতে হয়নি এ দেশের মেয়েদের।

বিংশ শতাব্দীর শেষে ও একবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পৌঁছে দেখা যাচ্ছে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে খুব দ্রুতগতিতে বিস্ময়কর রূপান্তর ঘটে গেছে বঙ্গীয় নারী সমাজের। সেকালিনীরা ছিলেন একান্তভাবে অন্তঃপুরচারিণী স্বশিক্ষিত, রক্ষণশীল ও কিছু পরিমাণে কুসংস্কারাচ্ছন্ন হলেও ছিলেন আদর্শবাদী। একালের নারীদের তাঁদের সঙ্গে তুলনা করে প্রগতিশীল বলে মনে হলেও, সকল ক্ষেত্রে কিন্তু তাঁদের অতিক্রম করতে সক্ষম হন নি। কারণ এ যুগে বাহ্যাড়ম্বর ও চাতুর্যের বাহুল্য থাকলেও অন্তরের দৈন্যকে আবৃত করা যায় নি। সেকালের মানুষের অন্তরের যে ঐশ্বর্য ছিল, তা আমরা আজ হারিয়ে ফেলে নিঃস্ব হয়ে গিয়েছি। পুরোনো মূল্যবোধকে জোর করে অস্বীকার করলেও বিবেকের দংশন অস্বীকার করা যায় না। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে আজ নারীর আধিপত্য বৃদ্ধি পেয়েছে এ কথা সত্য। কিংবা আইনসংগতভাবে নানা অধিকারলাভে তাঁরা সমর্থ হয়েছে, সে কথাও ঠিক, তবুও কোথায় যেন একধরণের বিচ্ছিন্নতাবোধ ও হতাশা, অসামঞ্জস্য অনুভব করা যায় মর্মে মর্মে। একালের মানুষ ক্রমাগত যেন আত্মস্বার্থপরায়ণ অসংযমী হয়ে উঠছে। বাহ্যাড়ম্বরের ঘূর্ণাবর্তে পড়ে সমগ্র বাঙ্গালি জাতির প্রাণশক্তি যেন নিঃশেষ হয়ে যেতে বসেছে। সেইসঙ্গে ম্লান হয়ে পড়ছে জাতীয়তাবোধ ও মানবতাবোধ। নতুন প্রজন্মের বাঙালির মধ্যে প্রাণপণে আন্তর্জাতিক হয়ে ওঠার তীব্র প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। মাঝেমধ্যে কিছু উগ্র নারীবাদীর শূন্যগর্ভ আস্ফালনও শোনা যায়। তখন মনে হয় আমরা কি ভারতের চিরন্তন ও মহান আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ছি ? কবির ভাষায় সে আদর্শ হল—

"হে ভারত, তব শিক্ষা দিয়েছে যে ধন,
বাহিরে তাহার অতি অল্প আয়োজন,
দেখিতে দীনের মতো, অন্তরে বিস্তার
তাহার ঐশ্বর্য যত।"

— 'নৈবেদ্য' ৯৫

মনে করা যেতে পারে মধ্যযুগে নবদ্বীপের বিখ্যাত পণ্ডিত 'বুনো রামনাথ'-এর কথা। সীমাহীন দারিদ্রের মধ্যেই তাঁর দিন অতিবাহিত হত। বাড়ির তেঁতুল গাছের পাতার ঝোল দিয়ে পরিতৃপ্তি সহকারে ভাত খেতেন। তাঁর মনে কোনো বিকার ছিল না। দুরূহ জ্ঞানের চর্চায় বিভোর

হয়ে থাকতেন। তাঁর সহধর্মিণী শাঁখা ও লাল চুড়ির অভাবে হাতে লাল সুতো বেঁধে রাখতেন কিন্তু স্বামী-সৌভাগ্যে ছিলেন গরবিণী।

অতীত ও বর্তমানের জীবনযাত্রায় ঠিক কী ধরণের কতখানি পার্থক্য দেখা যায় এক নজরে তার সহজ একটি হিসাব তুলে ধরা যেতে পারে।

নারীমুক্তিকে এ দেশে ত্বরান্বিত করেছে বেশ-কয়েকটি আইনের প্রবর্তন। সেগুলির উল্লেখ করা যেতে পারে—

প্রাক-স্বাধীনতা যুগের আইনগুলি বলবৎ কবার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন নারী-দরদী মনীষীরা। যেমন সতীদাহ নিবারণ আইন (১৮২৯); বিধবা বিবাহ আইন (১৮৫৬); সহবাস সম্মতি আইন (১৮৯১); বাল্যবিবাহ নিবারণ আইন বা সর্দা আইন (১৯২৯) ইত্যাদি।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরেও এ দেশের অসহায় নারীদের জীবনে শান্তি ও স্বস্তি দেবার চেষ্টা করা হয়েছে আইনের সাহায্যে। সেগুলি হল— হিন্দু বিবাহ আইন (১৯৫৫), বিশেষ বিবাহ আইন (১৯৫৬); পণ বা যৌতুক বিরোধী আইন (১৯৬১)। এই আইনের সংস্কারসাধনও করা হয়েছে একাধিকবার (১৯৮৪/১৯৮৬)।

উনিশ শতকের নারীরা ছিলেন অন্তঃপুরচারিণী। বহির্বিশ্বের সঙ্গে তাঁদের কোনো যোগাযোগ ছিল না। বাল্য থেকে কৈশোরে উত্তীর্ণ হতে-না-হতেই বিবাহের পর যেতে হত শ্বশুরালয়ে। জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হত সেখানেই। তখন প্রচলিত ছিল যৌথ বা একান্নবর্তী পরিবার প্রথা। নদীমাতৃক বঙ্গভূমিতে কৃষিভিত্তিক জীবনে এই রীতি দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছিল। তখনও গ্রামেই বসবাস করত অধিকাংশ লোক। পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রভাবে ধীরে ধীরে ব্যাবসাবাণিজ্যের প্রয়োজনে গড়ে উঠতে লাগল কলকারখানা, অফিস-আদালত, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, নানাবিধ দোকানপাট ইত্যাদি। রুজিরোজগারের আশায় অনেক মানুষ তখন শহরমুখী হয়ে উঠলেও, যৌথ পরিবার প্রথাই ছিল। একান্নবর্তী পরিবারের অন্দরমহলে গৃহিণীর ভূমিকাই ছিল মুখ্য। সুগৃহিণীরা নিপুণহস্তে সমগ্র পরিবারকে নিয়ন্ত্রণ করতেন। নানা সমস্যা ও অভাব অভিযোগ থাকলেও সুশৃঙ্খলভাবে চলত প্রতিদিনের কর্মযজ্ঞ। সুসন্তান গড়ে তোলার দায়িত্বটিও ন্যস্ত ছিল প্রধানত মাতৃজাতির হাতে। একদিকে শিষ্টাচার ও সৌজন্যবোধ অন্যদিকে কর্তব্যবোধ ও মনুষ্যত্ব অর্জনের দীক্ষা পেত সন্তানসন্ততিরা। অধিকাংশ নারীই ছিলেন ধর্মভীরু। সুতরাং সততার আদর্শটিকে সামনে রেখে জীবনের পথে চলার আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। অতিথি অভ্যাগতদের যথেষ্ট সমাদর ছিল। কারণ অতিথি নারায়ণসম। ত্যাগ, তিতিক্ষা, সংযম ও সেবার আদর্শই ছিল তাঁদের কাছে প্রধান। এজন্য যৌথ পরিবারে আশ্রয় পেত অনাথ শিশু, বিকলাঙ্গ ও রোগগ্রস্ত, সহায়সম্বলহীন মানুষজন বৃদ্ধবৃদ্ধারা। শান্তি সর্বত্র না থাকলেও ছিল নিরাপত্তা, সহযোগিতা ও সহনশীলতার আদর্শ।

কালের বিবর্তনের ফলে এ দেশে এখন গড়ে উঠেছে 'ছোট পরিবার, সুখী পরিবার'। প্রকৃত সুখ সেখানে বিরাজ করুক আর নাই করুক— সেই আকাঙ্খা নিয়েই কর্তা-গিন্নী ও তাঁদের একটি বা দুটি সন্তানকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে 'অণুপরিবার'গুলি (nuclear family)। আগেকার সেই প্রশস্ত উঠোন, খোলা ছাদ, বড়ো বড়ো ঘরের পরিবর্তে এখনকার পরিবারের আশ্রয়স্থল বহুলতল বাড়ির ছোটো ছোটো খোপগুলিতে (flat)।

বেঁচে থাকতে হলে রান্না-খাওয়া জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ। সেই রান্নাঘরের পরিবেশেও ঘটে গেছে মস্ত বড়ো বিপ্লব। মা-ঠাকুমাদের আমলের উঠোনের প্রান্তে যে বিশাল আমিষ-নিরামিষ হেঁশেল বা রন্ধনশালা শোভা পেত, তা আজ অন্তর্হিত হয়েছে। সেকালে দিনের অধিকাংশ সময় দাউ-দাউ করে জ্বলত কাঠ-ঘুঁটে-কয়লার উনুন। তার কোনো প্রয়োজন হয় না এখন। প্রদীপ, মোমবাতি, লম্ফ হারিকেন কিংবা পেট্রোমাক্সের আলো নয়—জ্বলজ্বলে বৈদ্যুতিক আলো এসেছে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে একলাঘরের গিন্নীকে রান্নার কাজটুকু সম্পন্ন করতে হয় গ্যাস-স্টোভ অথবা কুকিং রেঞ্জে। আজকাল রান্নার কাজে সৌরশক্তিকে কাজে লাগানোর চেষ্টা চলেছে। এ ছাড়া আছে মাইক্রো-ওভেন, রেফ্রিজারেটার, মিক্সার ইত্যাদি। সময় ও শ্রম বাঁচানোর চেষ্টায় আরও আছে কাপড়কাচা ও বাসন মাজার জন্য ওয়াশিং মেশিন এবং ডিস্-ওয়াশার। ভোজনবিলাসী বাঙালির জন্য একালে পঞ্চাশ ব্যঞ্জনের আয়োজন না থাকলেও, খাদ্যাভ্যাসে বাঙালীয়ানার সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে নানা প্রাদেশিক ও আন্তর্জাতিক পদ— দক্ষিণ ভারতীয়, উত্তর ভারতীয় পাঞ্জাবী অথবা নানা ধরণে চীনা, ইতালীয়, ফরাসি অথবা ইংরেজী রান্না।

সেকালের নরনারীর কাছে বিবাহ ছিল স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে জন্মজন্মান্তরের সম্পর্ক। ভালো হোক বা মন্দ হোক—একবার বিবাহ হলে তাকে 'ভাগ্যের লিখন' বলে মেনে নিতে হত। অল্প বয়সে অভিভাবকদের মধ্যস্থতায় বিবাহ সংঘটিত হত। অনেক সময় পাত্র-পাত্রীর বয়সের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকত না। কারণ কৌলীন্য প্রথার প্রচলন ছিল। পরিবার প্রতিপালনের ক্ষমতা আছে কি নেই তার বিচার না করেই একাধিক বিবাহ করতেন অনেক পুরুষ। তার ফলে অনেক নারীকে আজীবন 'সতীনজ্বালা' সইতে হত। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'কবিতাবলী'তে 'কুলীনমহিলা বিলাপ' কবিতায় তাদের জীবনের বাস্তবচিত্র তুলে ধরেছেন—

"কী ষোড়শীবালা কিংবা প্রবীণারমণী
প্রতিদিন কাঁদিছে মা দিন দণ্ড গণি।
কেহ কাঁদে অন্নাভাবে আপনার তরে,
কারো চোক্ষে বারিধারা শিশু কোলে করে।"

বহুবিবাহ ছাড়াও সেকালের অনেক বিত্তশালী ব্যক্তি আভিজাত্যের পরিচায়ক হিসাবে 'রক্ষিতা' রাখতেন।

একালে অভিভাবক-নির্দিষ্ট বিবাহ অপেক্ষা, স্বেচ্ছাবিবাহ রীতিই প্রাধান্য পেয়েছে। ১৯৫৫ সালে যে 'বিশেষ বিবাহ আইনে'র প্রবর্তন হল, সেখানে পাত্র বা পাত্রীর এক বিবাহ থাকলে, অন্য বিবাহ সিদ্ধ নয়। অসবর্ণ বিবাহও এখন আইনসম্মত। এ ছাড়া বিবাহের বয়স উর্ধ্বমুখী হয়েছে। মেয়েরা ১৮ এবং ছেলেরা ২০ বছর বয়স না হলে, বিবাহ করতে পারবে না।

এখন 'অবাঞ্ছিতবিবাহে'র ক্ষেত্রে আইনের সাহায্য নিয়ে 'বিবাহ বিচ্ছেদ' ঘটানো যায়। সেকালে কিন্তু এই জাতীয় দুঃখের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যেত না, আজীবন দুঃখভোগ করতে হত। যদিও একালে অনেক অসহিষ্ণু ও অসংযমী নরনারীর ক্ষেত্রে 'বিবাহ বিচ্ছেদ' আইনের অপব্যবহার ঘটতে দেখা যায়।

এই বিবাহ বিচ্ছেদ প্রসঙ্গে উনিশ শতকের এক বঙ্গনারীর কথা উল্লেখ করলে হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বিখ্যাত বাঙালি স্যার তারকনাথ পালিতের কন্যা ছিলেন লিলিযান বাসন্তীললনা পালিত। লিলিয়ানের দাদা ছিলেন লোকেন পালিত। লিলিয়ানের জন্ম হয় ইংলন্ডে ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দে। সাতবছর বয়স পর্যন্ত তিনি সেখানেই লেখাপড়া শেখেন এবং পাশ্চাত্য আদবকায়দায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন। দেশে ফিরে তিনি রীতিমতো উচ্চশিক্ষিত হয়ে ওঠেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালযের 'ঈশান স্কলার' রূপে সম্মান লাভ করেন। তেইশ বছর বযসে তাঁর বিবাহ হয় (১৯০২) কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিস্টার শিশিরকুমার মল্লিকের সঙ্গে। তিনি দশ বছর স্বামীর সঙ্গে ঘরসংসার করেন এবং এক পুত্রসন্তানের জননী হন। কিন্তু কোন্ অজ্ঞাত কারণে তিনি মনে শান্তি পেলেন না। পাঁচবছরের শিশুপুত্র ও স্বামীকে পরিত্যাগ করে ইংলন্ডে চলে যান। সেখানকার অধিবাসী এবং তাঁর বাল্যকালের বন্ধু দীপনারায়ণকে বিবাহ করেন। এজন্য তাঁর স্বামী কলিকাতা হাইকোর্টে বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা (১৯১৩) করেছিলেন। সেকালের এই ঘটনাটি খুবই অভিনব এবং জনসমাজে দারুণ আলোড়ন তুলেছিল। (—দ্রষ্টব্য মায়া বসু, "অনেকের মধ্যে একজন", 'প্রথমা', চারুএভিনিউ সমিতির মুখপত্র। ১৩৯০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৫-১৮।)

এখন এদেশের মানুষের মনে নৈতিক ধ্যানধারণার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। পাশ্চাত্যদেশের মতো অনেক নরনারী, বিবাহ-বন্ধনে বাঁধা না পড়েও একত্রে বসবাস (Living together) করেন। আগের তুলনায় পারিবারিক সম্পর্ক শিথিল হয়ে পড়ছে, তাই সামাজিক শৃঙ্খলাবোধ আর আগের মতো নেই।

সেকালে নারীজীবনের চরম সার্থক

.০তা ছিল মাতৃত্ব লাভে। একালের মেয়েদের জীবনের আশা-আকাঙ্খা ও ধ্যানধারণার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। তারা নিজেদের শুধু 'মেয়ে' বলে ভাবে না—'মানুষ' বলেই ভাবে। এ ছাড়া জীবনকে নানাভাবে সার্থক করে তোলার নানা পথ উন্মুক্ত হয়েছে।

তখনকার দিনে পিতার সম্পত্তিতে বিবাহিত কন্যার কোনো অধিকার ছিল না। কিন্তু একালের অবিবাহিত, বিবাহিত সকল মেয়েদেরই সমান অধিকার স্বীকৃত হয়েছে পুত্রদের পাশাপাশি।

আগেরকার দিনের সধবা নারীরা 'হরিচরণব্রত' সাঙ্গ করে মনের কামনা জানাতেন— 'হবে পুত্তুর মরবে না/ পৃথিবীতে ধরবে না।' একালের মেয়েদের জীবনে তার উপায়ও নেই, সে প্রবৃত্তিও নেই। এমন-কি অবাঞ্ছিত মাতৃত্বের দায় থেকে রেহাই পেতে, আইনমাফিক ব্যবস্থাও আছে। তবুও একালে দেখা যায় সন্তান সংখ্যা সীমিত রাখতে গিয়ে অনেকে স্বেচ্ছায় 'কন্যা-ভ্রূণ' নষ্ট করেন। কারণ তাঁদের কাছে পুত্র সন্তানই কাম্য। এর বিষময় পরিণতির কথা হয়তো তাঁরা চিন্তাও করেন না। স্বাধীনতা লাভের পর ভারতের প্রথম যে জনগণনা হয় ১৯৫১ সালে তখন প্রতি হাজার পুরুষে, মহিলার সংখ্যা ছিল ৯৪৬— অর্থাৎ প্রায় সমান মাপের। কিন্তু ১৯৯১ সালের জনগনণায় দেখা যায় পুরুষ ও নারীর আনুপাতিক সংখ্যায়, দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে নারীব সংখ্যা। হাজার পুরুষের পাশে নারীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে মাত্র ৯২৯। এর ফলে অদূর ভ' ,ত নতুন ধরণেব বিপর্যয় দেখা দেবে জনজীবনে তার আশঙ্কা রয়েছে।

এবারের 'বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসে'র (১১।৭।২০০০) ঘোষণায় ভারতের জনস্ফীতির ভয়াবহ রূপের কথা শোনা গেল। বর্তমান ভারতের জনসংখ্যা একশত কোটিতে উত্তীর্ণ হয়েছে এবং প্রতিদিন চল্লিশহাজার করে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। অথচ জনসংখ্যার তুলনায় খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় নি। এ ছাড়া বাসস্থান, শিক্ষা, কর্মসংস্থান ইত্যাদির ব্যবস্থা সংকটজনক।

সেকাল ও একালের নারীদের সাজ-পোশাকের কথাও উল্লেখ করা যায়। দীর্ঘকাল ধরে বাঙালি মেয়েদের পোশাক বলতে বুঝতে হত একমাত্র শাড়িকেই। তার সঙ্গে ব্যবহৃত হত শেমিজ, শায়া, ব্লাউজ ইত্যাদি। কিন্তু হালআমলে গতির যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটেছে। ব্যস্ততার যুগে কাজের উপযোগী পোশাকের মর্যাদা পেয়েছে সালোয়ার-কামিজ, শার্ট-প্যান্ট-গেঞ্জি, স্কার্ট-ব্লাউজ ইত্যাদি। এ ছাড়াও আছে হরেক রকমের নতুন ধরণের পোশাক— কুর্তা-লুঙ্গি, ম্যাক্সি, কাফতান প্রভৃতি।

রূপচর্চার ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে প্রভূত পরিবর্তন। সেকালের মেয়েদের প্রসাধনরীতিতে কৃত্রিমতা তেমন ছিল না। ভেষজ রূপটান ইত্যাদির ব্যবহার ছিল, যাতে ভগবানদত্ত রূপটিকে কিছুটা আকর্ষণীয় করে তোলা যায়। দীর্ঘ কালো কেশের যথেষ্ট কদর ছিল। নানাছন্দে কেশ বিন্যাস করে, নানা অলংকার পরিধান করতে ভালোবাসতেন সেকালের নারী। বিবাহিত নারীর কাছে আলতা, সিঁদুর, লোহা, শাঁখার বিশেষ মর্যাদা ছিল। একালের মেয়েরা বিবিধ রীতিতে চুল ছেঁটে, নানাধরণের কৃত্রিম প্রসাধনীর ব্যবহার করে নিজেকে মনোহারিণী করে তুলতে পছন্দ করেন। রূপের জৌলুষ বাড়িয়ে দেবার জন্য গড়ে উঠেছে শহরে ও গ্রামেগঞ্জে 'বিউটি পার্লার'। অনেক মেয়ে সেখানে 'বিউটিসিয়ান' হিসাবে নতুন রুজি-রোজগারের পন্থা বেছে নিয়েছেন। বিয়ের কনেকে সাজানোর দায়িত্ব এখন তাঁদের হাতে।

আর্থিক স্বনির্ভরতার কথা ভাবতে গেলে, সেকালের মেয়েরা যে কত অসহায় ছিলেন এ বিষয়ে ভাবতে আতঙ্ক হয়— যাকে এক কথায় বলা যায় 'শোচনীয় অবস্থা' ছিল তাঁদের। ভদ্রঘরের

মেয়েদের দারিদ্র্যের জ্বালা থেকে রেহাই পাবার কোনো উপায়ই ছিল না প্রায়। যথাস্থানে বিদ্যাসাগরের পরিবারের মেয়েদের আর্থিক অনটনের কথা বলা হয়েছে। এ ছাড়া শোনা যায় শ্রী সারদামায়ের (শ্রীরামকৃষ্ণপত্নী) জননী শ্যামাসুন্দরী আর্থিক অভাবের তাগিদে, সংসারের যাবতীয় কাজ সারা হলে, ক্ষেত থেকে তুলো এনে পৈতা (উপবীত) তৈরি করতেন এবং দু-এক পয়সায় তা বিক্রি করতেন। কোনো কোনো সময় কারও বাড়িতে গিয়ে ঢেঁকিতে ধান কুটে দিয়ে দু-চার পয়সা সংগ্রহ করতেন।

কিন্তু এখন বাঙালি মেয়েরা শিক্ষার অধিকার লাভ করে ও বৃত্তিমূলক নানা বিদ্যা আয়ত্ত করে যথার্থ স্বনির্ভর হতে পেরেছে। আজ যে- কোনো ক্ষেত্রেই ভারতীয় নারীদের অবাধ গতি! ইন্দিরা গান্ধী ভারতের প্রধানমন্ত্রী রূপে যেমন যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে গেছেন, তেমনি রাষ্ট্রদূত, রাজ্যপাল, মন্ত্রী, উপমন্ত্রী ইত্যাদি দেশের শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে অনেক নারীই প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন এপর্যন্ত। সেইসঙ্গে এখন বঙ্গের নারীরাও আছেন নানা পেশায়— ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আই.এ.এস., বিমান চালিকা, প্রযুক্তিবিদ্, বৈজ্ঞানিক, আইনজীবী, পুলিশ কমিশনার, ব্যবসায়ী, উপাচার্য, অধ্যক্ষা, অধ্যাপিকা, সেবাব্রতী, ক্রীড়াবিদ্, অভিনেত্রী, চিত্রশিল্পী, ভাস্কর, লেখিকা, সংগীতজ্ঞা, নৃত্যশিল্পী, সাংবাদিক, গ্রন্থাগারিক ইত্যাদি আরও নানা ধরণের বৃত্তি অনায়াসে গ্রহণ করে চলেছেন। তার সঙ্গে মধ্যমশিক্ষিতা বা অল্পশিক্ষিতারাও জীবিকার তাগিদে গ্রহণ করছেন যে ধরণের পেশা, আগে সেখানে দেখা যেত শুধু মাত্র পুরুষদের । উদাহরণ হিসাবে বলা যায় ডাকপিয়ন, ট্যাক্সিচালিকা, হোটেলকর্মী, পুলিশ, মডেল, টাইপিস্ট, দোকানের কর্মী ইত্যাদি হরেক বকমের জীবিকা। আর্থিক স্বয়ম্ভরতা লাভ করে আজকের মেয়েরা সমাজে ও সংসারে মর্যাদার আসন পেয়েছেন, নানান্ অসহায় অবস্থায় হাত থেকে পরিত্রাণ লাভের উপায় খুঁজে পেয়েছেন। তবুও কিন্তু দেখা যাচ্ছে আজও নারী নিগ্রহ ও নির্যাতনের নিরসন ঘটেনি। প্রতিদিনের জীবনে তার অনেক নিদর্শন আমরা দেখতে পাই।

সেকালে ও একালের মেয়েদের অবসর বিনোদনের রীতিনীতির মধ্যেও অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। সেকালের মেয়েরা সমবয়সীদের সঙ্গে সই পাতিয়ে মনের কথা বলে, কাঁথা সেলাই করে, পুতুলের বিয়ে দিয়ে সময় কাটাতেন। অনেকে পাখি পুষতেন। খাঁচায় বন্দী পাখির দিকে তাকিয়ে হয়তো নিজেদেব বন্দিনী জীবনের প্রতিফলন দেখতে পেতেন এবং সান্ত্বনা পেতেন মনে। এ যুগের মেয়েদের অবসর যাপনের নানা সুযোগ রয়েছে। নাচ, গান, বাজনা, আবৃত্তি, ছবি আঁকা, খেলাধুলা, জাপানী প্রথায় ফুলসজ্জা (ইকাবেনা), পুতুল তৈরি ইত্যাদি হরেক নেশা নিয়ে মেতে থাকতে পারেন। অনেকে আবার সিনেমা, থিয়েটার দেখে কিংবা গল্পের বইয়ের মধ্যে মগ্ন থাকতে ভালোবাসেন। এ ছাড়া রয়েছে দূরদর্শন দেখা বা রেডিও শোনার অভ্যাস। কিছু না হোক দল মিলিয়ে দেশভ্রমণ বা 'পিক্‌নিকে' যেতে কোনো বাধা নেই ।

একেলে মেয়েদের চলাফেরার অবাধ অধিকার থাকলেও তাদের মনের প্রসার যে তেমন ঘটেনি-এ কথা বলা চলে। নিজেকে নিয়ে এবং নিজের সংসার নিয়ে ব্যস্ত থাকতেই ভালোবাসেন অধিকাংশ নারী। দেশের দশের কাজে আত্মনিয়োগ করার মনোভাব লোপ পেতে বসেছে।

সামাজিক দায়বদ্ধতা স্বীকার করে নিতে চান না সহজে। অথচ আগেকার দিনের মেয়েরা সীমিত জীবনেও আশেপাশে যে-সব দীন দরিদ্র, অনাথ আতুর থাকত তাদের জন্যে নানাভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেন। যেমন ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী বলেছিলেন নিজের কালের মহিলাদের সম্পর্কে— ''প্রথমবয়সে শিক্ষা, মধ্যবয়সে সংসারও শেষবয়সে লোকহিত— এই ত্রিধারায় জীবন চালাতে পারলে সেকালের চতুরাশ্রম ও একালের যুগধর্ম দুদিকই রক্ষা করা হয়...। সেকালের ধীরাস্থিরাব সঙ্গে একালের বীরা হতে হবে; অথবা সেকালের শ্রী ও হ্রীর সঙ্গে একালের ধী মেলাতে হবে— বঙ্কিমবাবু হলে যাকে বলতেন প্রখরে-মধুরে মেশা। এই সামঞ্জস্যই নারীজীবনে মূলমন্ত্র।''—'বঙ্গনারী' প্রবন্ধ, 'নারীর উক্তি', বিশ্বভারতী, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৮৫।

এদেশের মেয়েদের জীবনের পটভূমি এখন পূর্ণ মানবিকতা বিকাশের উপযোগী হয়ে উঠলেও, যান্ত্রিকতার প্রভাবে পড়ে তাঁরা আত্মসুখী ও ভোগলিপ্সাপ্রবণ হয়ে পড়ছেন। বর্তমান সাংস্কৃতিক-সংকটের মধ্যে পড়ে অনেকে অতিপ্রগতির প্রলোভনে দিশেহারা হয়ে পড়ছেন। অথচ বঙ্গললনাদের শ্যামলকোমলরূপলাবণ্যের অন্তরালে যে চিরন্তন মমতাময়ী, সেবাপরায়ণা, কল্যাণী মূর্তিটি ছিল, তার বিলোপসাধন হোক—এটা মেনে নিতে পাববেন না বিবেকযুক্ত ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ। সকলেই চাইবেন নতুন আধারে সেই চিরকালের চেনা চিরন্তনীকে।



নির্ঘন্ট

অ

অথর্ববেদ ২, ২৭, ৩১, ৩২
অতুলচন্দ্র গুপ্ত ৩
অরুন্ধতী ২১, ১৪৫
অর্জুন ৩৩
অষ্টাধ্যায়ী ৩৫, ১৪৫
অজ ৩৬
অনসূয়া ৩৬, ১৪৫
অজিত নাথ ৪২
অণ্ডভূক জাতক ৪৩
অবদান কল্পলতা ৪৪
অর্ধকাশী ৪৫
অনুলা ৪৫
অভিধম্মপিটক ৪৭, ৪৮
অগ্গিমিত্তা ৪৭
অশ্ব ঘোষ ৪৯
অপালা ৫০, ৫৩
অগস্ত্য সহোদরা ৫০
অদিতি ৫০, ৫৩
অম্ভৃণ ৫০
অশ্বিনীকুমাব ৫১, ১৬৯
অঙ্গিরা ৫১
অসঙ্গ ৫১
অগস্ত্য ৫২
অত্রিমুনি ৫৩, ১৪৫
আনোপমা ৫৮
অণুলচ্ছীত্র ৬৪
অবন্তিসুন্দরী ৬৪
অজনেশ্বরী ৬৬
অণ্ডাল ৬৮
অবৈয়ার ৭০
অনঙ্গপাল ৭১
অহল্যাবাঈ ৭৪
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৭৫, ৭৯, ১৯৪, ৩০৬
অর্থশাস্ত্র ৮৯

অন্নদামঙ্গল ৯১, ৯৩, ১০৭, ১৪৩, ১৭৬
অদ্বৈতাচার্য ৯২, ১০৭
অনঙ্গকদম্বাবলী ৯৩
অজিত সিংহ ৯৬
অযোধ্যাবাম ১০২
অনাথকৃষ্ণ দেব ১৩০
অক্ষয়াবায়তিনী ১৩১
অর্চিদেবী ১৪১
অত্রিসংহিতা ১৪১
অঙ্গীরা ১৪১
অনল আয়তি ১৫৮
অহল্যা ১৬৯
অনিরুদ্ধ ১৭০
অবলাবান্ধব ১৭০
অমৃতলাল বসু ১৮১, ১৮৭, ১৯৫
অনুদেয়ী ১৮৪
অশ্রুমতী ১৯৪
অন্নদাচরণ খাস্তগীব ১৯৪
অববোধবাসিনী ১৯৬, ২৭৯
অযোধ্যানাথ পাকডাশি ২০৭
অন্তঃপুব স্ত্রীশিক্ষা ২১৯
অবলাবান্ধব ২২০, ২২৩. ২৩১, ২৩৭, ৩০৮
অন্তঃপুর ২২০
অনুরূপাদেবী ২৩৬, ২৮০-২৮১, ২৮৫, ৩০৫
অবলাবিলাপ ২৩৭
অক্ষয়কুমার বড়াল ২৩৯
অম্বুজাসুন্দবী দাশগুপ্তা ২৬২
অন্নপূর্ণার মন্দিব ২৮১
অনুরাগ ২৮১
অভিশপ্তা ২৮১, ২৮৩
অলখঝোরা ২৮৩
অবাক ২৮৩
অভিশপ্ত সাধনা ২৮৩
অনিন্দিতা দেবী (বঙ্গনারী) ৩০০
অনিন্দিতা দেবীব রচনা সংকলন ৩০১
অমিয় চক্রবর্তী ৩০১
অম্বা ৩০৫
অমলাদেবী ৩০৬

অনাথ ৩০৭
অনাথিনী পত্রিকা ৩০৯
অন্তঃপুর পত্রিকা ৩১০
অমরেন্দ্রনাথ মজুমদাব ৩২১
অবলা বসু ৩৩৬
অভিজ্ঞা দেবী ৩৫১
অমলা দাশ ৩৫৪
অপর্না দেবী ৩৫৪
অন্নপূর্ণা দত্ত ৩৬২

আ

আপিশলা ৩৫
আত্রেয়ী ৩৬
আর্যা ৪১
আম্রপল্লী ৪৩, ৪৫
আনন্দ ৪৮
আত্রেয়ী ৫৪
আড়বাব ৬৬ ৬৮
আলাউদ্দীন খিলজী ৭১
আকবর বাদশাহ ৭২, ৭৩, ৭৬, ১৪৮
আব্দুর রহিম খান্-ই-খানান ৭২
আবদুল মজিদ আসফখান ৭৩
আনন্দ রাও সিন্ধিয়া ৭৪
আকবর ৮০, ৯৫
আকিল খাঁ ৮০
আলেকজাণ্ডার ৮৭
আনন্দময়ী ৯৪, ১০২
আনন্দলাল উপাধ্যায় ৯৫
আনন্দ লতিকা ৯৯
আশুতোষ ভট্টাচার্য ১১৫, ১৬৬
আত্মারাম চৌধুরী ৯৭
অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি ১২৮, ১৪৩
আবুল ফজল ১৪৮
আইন-ই-আকবরী ১৪৮
আত্মীয়-সভা ১৬১, ১৭৪
আলালের ঘরের দুলাল ১৭৬
আত্মচরিত ১৯৩, ১৯৫
আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস ১৯৪

আমাব জীবন ২০৭
আত্মকথা ২০৭, ২৯৪
অ্যানকুক্ ২০৯
অ্যাকাডেমিক এসোসিযেশন ২১১
আর্যনাবী সমাজ ২২০
আনন্দমোহন বসু ২২০
আলো ও ছাযা ২৩৪
আদর্শ বিপাবলিক ২৩৯
আ-মো-বসু ২৪১
আঁধাবে আলো ২৮১
আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ ২৯০
আমাদেব কথা ২৯৬
আমাব কথা ও অন্যান্য বচনা ২৯৮
আশাচন্দ্র ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন ৩০১
আজব দেশ ৩০৭
আরোগল্প ৩০৭
আলিভুলিব দেশে ৩০৭
আনন্দমযী মা ৩১৮

ই

ইন্দুমতী ৩৩, ৩৬
ইসিদাসী ৪৪, ৪৭
ইন্দ্রানী ৫০ ৫২
ইন্দ্রমাতা ৫০
ইল্বল ৫২
ইন্দ্র ৫৩, ১৬৯, ১৬৯
ইন্দ্রসেনা ৫৪
ইন্দুলেখা ৫৬
ইলতুৎমিস ৭২
ইলতুনিয়া ৭২
ইযং বেঙ্গলস ১৫১, ২১১
ইডেন স্কুল ২২৬
ইন্দিবা দেবী চৌধুবাণী ২৩৬, ৩৫১-৩৫৩
ইন্দিবা দেবী ২৭৯, ২৮৫
ইমানদাব ২৮৩
ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা ২৯৮
ইলবার্ট বিল ৩২৪

ঈ

ঈশ্ববী পাটনী ৯১
ঈশ্ববগুপ্ত ১২৭, ১৬৪, ১৬৫, ১৭৯, ২২৮, ২৩৭
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগব ১৪০, ১৫৯, ১৬৪, ১৬৯, ১৭৪, ১৯৯, ২০৮, ২১২, ২১৪, ২২০, ৩০৬
ঈশ্বরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ২৯৫

উ

উদ্দালক ১৫, ১৮৪
উত্তবামচবিত ৩৫
উত্তরা ৩৬
উভয ভাবতী ৩৭
উদযন ৩৭
উত্তবপুবাণ ৪২
উৎপলবর্ণা ৪৩, ৪৭
উচ্ছঙ্গজাতক ৪৪
উপালি ৪৭
উপনিষদ ৫০
উমেশচন্দ্র মিত্র ১৬৬
উপেন্দ্রনাথ দাস ১৯৫
উমাপতি সিদ্ধান্ত ১৯৯
উইলিযাম কেবী ২০৯
উত্তরপাড়া হিতকবী সভা ২১৮
উমেশচন্দ্র দত্ত ২১৯, ২৩৭, ৩০৯
উপেন্দ্র কিশোব রায চৌধুবী ২২০, ৩০৬
উপেন্দ্রমোহিনী ২৪১
উত্তবায়ণ ২৮০
উচ্ছৃঙ্খল ২৮১
উদ্যানলতা ২৮৩

ঊ

ঊর্বশী ৫০, ৫৪, ৩০২
ঊষালতা ২২০
ঊষা ৩০০
ঊর্মিলা দেবী ৩২৮
ঊষা গুহ ৩৩৩

ঋ

ঋগ্বেদ ২৭, ৩১, ৩২, ৫১, ৫২, ৫৩
ঋষভদেব ৪২

এ

একাদশী ১৬৮
এডুকেশন গেজেট ২৮০, ৩০৯, ৩১০
এপাব গঙ্গা ওপার গঙ্গা ২৮৪
এলোকেশী ৩৪০

ঐ

ঐতবেয় ব্রাহ্মণ ২৭, ৮৭

ঔ

ঔরঙ্গজেব ৭৮, ৭৯

ক

কুড়ানোমানিক ২৮১
করুণাদেবীর আশ্রম ২৮২
ক্ষণিকের অতিথি ২৮৪
কাঞ্চনমালা দেবী ২৮৬
কিকি কুসংস্কার তিবোহিত হইলে এদেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পাবে ২৯০
কৈলাসবাসিনী মিত্র ২৯৫
কীর্ত্তিবিলাস ৩০২
কুমারিল ভট্ট ৩০৬
কথাসপ্তক ৩০৮
কামিনীশীল ৩১০
কৃষ্ণরঞ্জিনী বসু ৩১০
কুমুদিনী মিত্র ৩১০, ৩২৫
কৃষ্ণনাথ নন্দী ৩২৩
ক্ষীরোদাসুন্দরী চৌধুরী ৩২৮
কিরণবালা ৩৩০
কুসুমকুমারী ৩৪২
কৃষ্ণভামিনী ৩৪৫
কিরণ লেখা রায় ৩৬৭
কুমুদিনী ৩৭০
কন্যাদায় ১৮৬
কাদম্বরী দেবী ১৯৩
ক্যালকাটা রিভিউ ২০৭
কৃষ্ণসখা ঘোষ ২০৯
কাশীনাথ ঘোষাল ২০৯
কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ২১১
কালীকৃষ্ণ মিত্র ২১১

কিশোরীচাঁদ মিত্র ২১১, ২৯৪
কুন্দমালা ২১৭
কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় ২১৮, ২২০-২২১, ৩২৫, ৩২৬, ৩৩৩-৩৩৪
কৃষ্ণকুমার মিত্র ২২০
কেশ্ববানন্দ মমগায়েন ২২১
কুমুদিনী খাস্তগীব ২২৬
কাশীপ্রসাদ ঘোষ ২২৬
কামিনীসুন্দরী দেবী ২২৭, ৩০২
কালীপ্রসন্ন ঘোষ ২২৮
কৈলাসবাসিনী দেবী ২২৯
কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায ২৩২
কর্মদেবী ২৩৬
কামিনী দেবী ২৪১
ক্ষীবোদা মিত্র ২৪১
ক্ষেত্রমণি দেবী ২৪১
কৃষ্ণকামিনী দাসী ২৪২-২৪৫
কবিতামালা ২৪৭
কবিতাহার ২৫০
কুসুমকুমাবী দাশ ২৭১
কামিনীকলঙ্ক ২৭৫
কিবণমালা ২৭৫
কুসুমকুমারী রায় চৌধুবী ২৭৬-২৭৭
কাহাকে ২৭৮
কূর্মবৃত্তি ৮৯
কৌলীন্যপ্রথা ৯১
কর্নানন্দ ৯২
কবিকঙ্কণ চণ্ডী ৯৩
কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ (লালাবাবু) ৯৬
কৃষ্ণনাথ সার্বভৌম ৯৮
কেনারাম পালা ১০১
কাজীর বিচার ১০১
কাত্যায়নী ১০২
কহ্নন ১০৪
কমলা ১০৪
কাহ্নপাদ ১০৪, ১৮৫
কৃত্তিবাস ১১০
কেষ্টমুচি ১২৯
ক'বেল কামিনী ১৩০, ১৩১

কুলুই চন্দ্র সেন ১৩২
কৃষ্ণকমল গোস্বামী ১৩২
কৈলাসবাসিনী ১৩৩
কেশবচন্দ্র সেন ১৩৯, ১৭৯, ১৯৫, ২০৮, ২১৬, ২১৯, ২২০, ২৯৫, ৩০৮, ৩০৯, ৩১৫
কৃষ্ণচন্দ্র (মহারাজ) ১৪৪, ১৬১
কন্বাব মেয়ব ১৪৮
কালীনাথ চৌধুরী ১৪৮
কুঞ্জবিহারী রায় ১৪৮
কালীকৃষ্ণদেব ১৪৯
ক্যালকাটা লিটারারি গেজেট ১৫৪
কালীমতী ১৬৩
কালীপ্রসন্ন সিংহ ১৬৫
ক্ষেমানন্দ ১৬৫
কামিনী রায় ১৬৬, ২২৮, ২৩৪, ২৬১, ৩০৪, ৩০৭, ৩২৪
কুলীন ১৭০
ক্যাম্বেল ১৭৫
কুলীনকুল সর্বস্ব নাটক ১৯৭, ৩০২
কালীচন্দ্র চৌধুরী ২৮১
ক্ষিতিমোহন সেন, ১, ১৫, ১৯৮
করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ২
কালিদাস ৭, ১২, ১৬, ৩৬, ৩৭, ৪৯
কাত্যায়নী ১৪
কুমার সম্ভবম্ ২৯
কাশকৃৎস্নী ৩৫
কামন্দকী ৩৫
কৌশল্যা ৩৬, ১৪০
কুন্তীদেবী ৩৭, ১৪০, ১৬৮
কুমারদেবী ৩৮
কহ্লন ৩৯
ক্ষেমা ৪৩, ৪৭, ৬৬
কুণাল জাতক ৪৪
ক্ষেমেন্দ্র ৪৪
কথা ও কাহিনী ৪৫
কালি ৪৭
কক্ষীবান ৫১
কৃষ্ণদাস ৫৫
কুটলা ৫৬
কেরলী ৫৬

কর্পূর মঞ্জরী ৬২
কবীর ৬৬
করমেতিবাঈ ৬৬, ৬৮
কানহুপাত্রা ৬৬
কৃষ্ণ ৬৬, ৭৮, ১৪০
কাবাইক্কাল আম্মেযার ৬৮
কনকবতীয়ার ৬৮
কবিনাবাঈ ৬৯
কৃষ্ণদেব ৭০
কর্ণদেবী ৭১
কুবাণ ৭৯
কামসূত্র ৮৯, ৯১
কৌটিল্য ৮৯

খ

খনা ৩৭, ১১৯, ২৩০
খুদ্দনিকায ৫৭
খণ্ডেরাও হোলকার ৭৪
খুল্লনা ৯৩
খণ্ডমেঘ ২৮২
খোকা এল বেড়িযে ৩০৭
খৃষ্টীয় মহিলা পত্রিকা ৩১০

গ

গীতা ১০, ১৭
গোভিল ৩৪
গৃহ্যসূত্র ৩৪
গান্ধারী ৩৬
গুণভদ্র ৪২
গৌতমী ৪৮, ৪৯, ৫৭
গোধা ৫০, ৫৪
গার্গী ৫৪, ২৩০
গন্ধদীপিকা ৫৬
গৌরী ৫৬
গাথাসপ্তশতী ৬২
গৌরাঙ্গী ৬৬
গবরীবাঈ ৭০
গ্রহবর্মা ৭১
গঙ্গাধর রাও ৭৪

গুলবদন বেগম ৭৫
গঙ্গারীড ৮৭
গোপাল ৮৮
গৌরী বৈষ্ণবী ৯৩
গঙ্গামণি ৯৪, ১০২
গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ৯৬
গৌড়ীরীতি ৯৮
গাঙ্গ ১০৪
গোঁজলা গুঁই ১২৯
গোলোকমণি ১২৯
গোবিন্দ তাঁতি ১৩১
গোবিন্দ অধিকাবী ১৩২
গোপাল উড়ে ১৩৩
গোপাল ন্যায়ালঙ্কাব ১৪৩
গোপীমোহন দেব ১৪৯
গোকুলনাথ মল্লিক ১৪৯
গৌরীশঙ্কব ভট্টাচায; (গুড়গুড়ে) ১৬৩
গিবীন্দ্রমোহিনী দত্ত ১৬৭, ২৩৬, ২৫৮-২৬১, ৩০৫, ৩০৭, ৩২৪
গৌতমমুনি ১৬৯
গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুব ১৭৭
গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৮৭
গিরিশচন্দ্র ঘোষ ১৮৭, ৩০২
গোবিন্দ দাস ১৮৮
গজদানন্দ ও যুববাজ ১৯৫
গ্রেট ন্যাশনাল থিযেটার ১৯৫
গোলকমণি ২০৮
গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ ২০৮
গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার ২০৯, ২১১, ২২৯
গিরীন্দ্রচন্দ্র মজুমদার ২১৯
গীতিগাথা ২৭৯
গরীবের মেয়ে ২৮১
গিরিবালা দেবী ২৮২
গৌরহরি দাস ২৯৫
গোরাচাঁদ ঘোষ ২৯৫
গতযুগেব জনৈকা গৃহবধূর ডায়েবী ২৯৫
গৌরী মা ৩১৭
গোলকনাথ দাশ ৩৩৮
গঙ্গামণি ৩৪২
গহরজান ৩৪৪

ঘ

ঘোষা ৫০
ঘনশ্যাম শর্মা ১৪৮
ঘর থাক্তে বাবুই ভেজে ১৮৬
ঘরোয়া ১৯৪

চ

চৈতন্যাবদান ৭
চাণক্য ১৪
চন্দ্রাপীড় ৩৫
চূড়ালা ৩৭
চিত্রলেখা ৩৭
চন্দ্রগুপ্ত ৩৮, ৩৯
চিত্রাঙ্গদা ৪০
চন্দনবালা ৪২
চৈতন্য ৪৬, ৫৫, ৬৬, ৯২, ১৩২
চূলনাগা ৪৭
চূল সুমনা ৪৭
চুল্লক বগ্‌গ ৪৮
চণ্ডী ৫০
চৈতন্যচরিতামৃত ৫৫, ১০৭
চন্দ্রকান্তা ভিক্ষুণী ৫৬
চণ্ডালবিদ্যা ৫৬
চিন্ন শ্মা ৫৬
চাঁদ সুলতানা ৭২
চেঙ্গিস খান ৮১
চন্দ্র বর্মা ৮৮
চন্দ্রবতী ৯৩, ৯৯, ১০০, ১২৫
চণ্ডীচরণ তর্কলঙ্কার ৯৪
চুনিলাল খান ৯৬
চণ্ডীদাস ৯৯, ১০১
চণ্ডীদাস সমস্যা ৯৯
চন্দ্রকুমার দে ১০০
চণ্ডীমঙ্গল কাব্য ১০৭, ১১০, ১৪৩, ১৯৯
চার্লস মেটকাফ ১৪৮
চন্দ্র ১৭০
চপলাচিত্ত চাপল্য ১৮৬
চৈতন্যভাগবত ২৯৪

চার্চ মিশনারী সোসাইটি ২০৯
চণ্ডীচবণ সেন ২২১
চন্দ্রমুখী বসু ২২১-২২৩, ২২৮, ৩৩৩
চিত্তবিলাসিনী কাব্য ২৩৮
চক্র ২৮০
চক্রবাল ২৮৪
চণ্ডীচবণ দে ২৯৩
চাকশীলা দেবী ৩৩০, ৩৩৮
চাকপ্রভা সেনগুপ্ত ৩৩২

ছ

ছন্না ৪৭
ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি ১৮৬
ছিন্নমুকুল ২৭৮
ছাযাপথ ২৮৪
ছেলেবেলাব দিনগুলি ৩০৭
ছোট ছোট গল্প ৩০৭
ছন্দে পুবাতনী ৩০৭

জ

জনকরাজা ১৩, ৩৩, ৫৪
জনা ৩৬
জটিলা গৌতমী ৩৬, ১৬৯
জিন সেন ৪২
জুহূ ৫০, ৫৩
জঘন চপলা ৫৭
জহবব্রত ৬৫, ৭৪, ১৪৫
জনাবাঈ ৬৬, ৬৯
জয়পাল ৭০
জিজাবাঈ ৭৩
জাহানারা ৭৫, ৭৭, ৭৮
জবুন্নিসা ৭৫, ৭৮, ৭৯
জাহাঙ্গীব ৭৬, ৭৭, ৭৮, ১৪৬
জেবুন্মনশাত ৭৯
জহান্‌জেববানু (জানী বেগম) ৮০
জাহ্নবীদেবী ৯২
জঙ্গলী ৯২
জনার্দন উপাধ্যায় ৯৫
জয়ানন্দ ১০০

জয়নারায়ণ ১০১
জয় দেব ১০৪
জ্যোতিরীশ্বর ১০৭
জোব চার্নক ১৪৩
জগন্মোহন রায় ১৪৯
জোয়ান অব আর্ক ১৫০
জ্যোতির্ময়ী দেবী ১১৫৯, ১৬৮, ২৮৪, ২৮৬
জীমূতবাহন ১৬৯, ১৯৭
জ্ঞানান্বেষণ ১৭৩
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৭৭, ১৯৪, ২০৬, ২৯৪, ৩০৯
জামাইব্যারিক ১৭৭
জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ১৯৩, ১৯৪, ২২০, ২৩১, ৩০০, ৩০৭, ৩০৮, ৩১০, ৩৬২
জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় ১৯৪
জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ২০৯
জন এলিয়ট ড্রিঙ্ক ওয়াটার বীটন ২০৯, ২১৩, ২১৬-২১৭, ২২০
জেশুয়া মার্শম্যান ২১০
জ্ঞানান্বেষণ ২১২
জগদীশচন্দ্র বসু ২২০
জয়কালী গুপ্ত ২৪২
জগন্মোহিনী দেবী ২৫৪, ২৫৬
জ্যোতিস্মতী দেবী ২৭৩
জোয়ার ভাঁটা ২৭৯
জীবন দোলা ২৮৩
জন্ম অপরাধী ২৮৩
জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনা সংকলন ২৮৪
জয়নারায়ণ সর্বাধিকারী ২৯৮
জ্যোতিরিঙ্গণ ৩০৮
জগন্নাথ গর্গ ৩২০
জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী ৩৩০
জয়দুর্গা ৩৩৮

ঝ

ঝড়ের পথিক ২৮১

ট

টলেমি ৮৭
টাক্ ডুমাডুমডুম্ ৩০৭

ঠ

ঠাকুরদাস সিংহ ১২৯

ঠাকুর দাস ১৯৯
ঠাকুরানী দাসী ২৪২
ঠাকুরমার ঝুলি ৩০৬

ড

ডিওডোরাস সিকিউসাস ১৪১
ডিরোজিও ১৪৮, ১৫৩, ১৬১, ২১২
ডাবলিউ. বি. বেলি ১৪৮
ডি. এল. রিচার্ডসন ১৫৪
ডেভিড হেয়ার ২১২

ঢ

ঢাকা প্রকাশ ১৭৪

ত

তাবা ৩৭, ১৭০
ত্রিভুবণ মহাদেবী ৩৯
ত্রিভুবণ সরস্বতী ৫৭
তিরুপ্পাবৈ ৬৮
তৈত্তিরীয় উপনিষদ ১১, ২৭
তন্ত্রশাস্ত্র ২৫
তীর্থঙ্কর ৪১
ত্রিশলা ৪২
ত্রিপিটক ৪৮, ৫৭
তুলসীদাস ৬৬
তিলক বতীযার ৬৮
তাজ ৬৯
তারাবাঈ ৭৩
তাজবিবি ৭৫
তান সেন ৮১
তারাসুন্দরী ৯৭
তারক কাঁড়াল ১৩১
তারাচাঁদ ১৩১
ত্রৈলোক্যতারিণীর দল ১৩৩, ১৩৪
তারিণীচরণ বাড়ুয্যে ১৪৩
তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ১৯০
তারাশঙ্কর তর্করত্ন ২০৯, ২৩০
তারাচাঁদ চক্রবর্তী ২১২
তরু দত্ত ২৩৬, ২৫৮-২৬১

তরঙ্গিণী দাসী ২৭৩
তারাবতী ২৭৬
তারাচরিত ২৭৬
ত্রিবেণী ২৮০
তৃণগুচ্ছ ২৮২
তিব্বতে তিন বৎসর ৩০০
তারাচরণ শিকদার ৩০২
তারাসুন্দবী ৩৪২
তিনকড়ি ৩৪২

থ

থেরীগাথা ৪৪, ৪৬, ৪৭
থাকমণি দেবী ৩০৯

দ

দক্ষসাহিত্য ১৭, ১৪১
দময়ন্তী ২১ ৩৩, ৪০
দ্রৌপদী ৩৩, ৩৬, ৩৭, ১৬৯
দেবযানী ৩৩
দিবাকর সেন ৩৯
দিদ্দা ৩৯
দিগম্বর ৪১
দধিবাহন ৪২
দক্ষিণা ৫০, ৫৪
দেবীসূক্ত ৫০
দেবাহূতি ৫৪
দাদূ ৬৬
দয়াবাঈ ৬৬, ৬৯
দিবালীবাঈ ৬৯
দেবগুপ্ত ৭০
দুর্গাবতী ৭৩, ৭৪
দিল্‌রাসবানু বেগম ৭৯
দিওয়ান্‌-এ-মখ্‌ফী ৭৯
দারাশিকো ৮০
দয়ারাম ৯৩, ৯৭
দ্রবময়ী ৯৪
দেবী সিং ৯৬
দেবী চৌধুরাণী ৯৬
দ্বিজ বংশীদাস ৯৯

দুখিনী ১০১
দয়ামণি ১২৯
দাশরথি রায় ১৩১, ১৬৫, ১৬৬
দশরথ ১৪০
দেবকী ১৪১
দুর্গাদাস ১৫৬
দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ১৬২, ২০৯, ২১২, ২১৬
দেবেন্দ্রনাথ সেন ১৬৭, ১৭৭, ২৩৮
দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ২১৯, ২২০, ২২১, ২২৩, ২৩৫, ৩০৮
দীনবন্ধু মিত্র ১৭৭, ২০৮, ৩০২
দীনেশচন্দ্র সেন ১৭৮
দুর্গাচরণ রায় ১৮৬
দেনাপাওনা ১৮৬
দুর্গামোহন দাস ১৯৪
দুর্গাদেবী ১৯৮
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২১৮, ২১৯, ২৯৬, ৩০০, ৩১৫
দুর্গামোহন দাস ২১৯, ২২১
দিদি ২৮১
দিশেহারা ২৮১
দান প্রতিদান ২৮২
দুহিতা ২৮৩
দুর্গাচরণ গুপ্ত ২৯০
দেবেন্দ্রনাথ দাস ২৯৮
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ৩০২
দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ৩০৫
দুপাতা ৩০৭
দুইভাই ৩৬০৭
দিগ্‌দর্শন ৩০৮
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৩০৯
দুকড়িবালা দেবী ৩৩১
দ্রবময়ী দাসী ৩৬৯

ধ

ধর্ম ৮, ১৭০
ধৃতরাষ্ট্র ৩৬
ধনাবহ ৪২
ধম্মপদখকথা ৪৪
ধনঞ্জয় ৪৪

ধন্না ৪৭
ধর্ম্মপাল ৫৭
ধাত্রীপান্না ৭১
ধীমান ১০৪
ধর্মমঙ্গল ১০৬, ১১০, ১৪২
ধর্মসভা ১৪৯
ধবেন্দ্রবালা সিংহ ২৭১
ধরাসুন্দরী দেবী ২৮০

ন

নীহাররঞ্জন রায় ৩, ১৮৫
নৈষধচরিত ৩৩
নলরাজা ৩৩
নীলকণ্ঠ ৩৩
নন্দুওরা ৪৭
নলিনাক্ষ দত্ত ৪৮, ৫৭
নিষৎ ৫০
নদী ৫০
নানক ৬৬
নানীবাঈ ৬৬
নাভাজী ৬৮
নিজামশাহ ৭৩
নূরজাহান ৭৫, ৭৬, ৭৭
নুরউন্নিসা ৮০
নাদিরশাহ ৮১
নন্দিনী ৯২
নারায়ণ দাস ৯৪
নয়ান চাঁদ ১০০
নকুল ঠাকুর ১০১
নীলুঠাকুর ১২৯
নিতাই বৈরাগী ১২৯
নেড়ীকবি ১২৯
নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় ১৩২
নবীন বসু ১৩২
নবীন মাস্টারের দল ১৩৩
নীলমণি কুণ্ডু ১৩৩
নকুল ১৪০, ১৭০
নীলমণি দেব ১৪৮
নিমাই চাঁদ শিরোমণি ১৪৮

নচিকেতা ভরদ্বাজ ১৫৩
নন্দলাল বসু ১৫৯
নারায়ণ চন্দ্র ১৬৭
নবীনচন্দ্র সেন ১৬৭
নিস্তারিণী দেবী ১৭২, ২৯৬
নবনাটক ১৭৭, ৩০২
নয় শো রূপেয়া ১৮৬
নীলমণি দাস ২০৯
নবীনকৃষ্ণ মিত্র ২১১
নলিনী দাশ ২১৮
নববিধান সভা ২২০
নীলরতন সরকার ২২০
নিবেদিতা (ভগিনী) ২২৫
নিত্য ধর্মানুরঞ্জিকা ২২৬
নন্দকুমার কবিরত্ন ২২৬
নারীজাতি বিষয়ক প্রস্তাব ২২৮
নির্মাল্য ২৩৪
নিরুপমা দেবী ২৩৬, ২৪০, ২৭৩, ২৮১, ২৮৫
নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ২৪১
নবীনকালী দেবী ২৫০-২৫৪, ২৭৫-২৭৬
নীরদমোহিনী বসু ২৬২
নীলনলিনী বসু ২৬৬
নগেন্দ্রবালা মুস্তাফী ২৬৮
নলিনীবালা বসু (ঘোষ) ২৭১
নবকাহিনী ২৭৮
নিশীথবাদল ২৮১
নূরন্নেছা খাতুন ২৮২
নিয়তি ২৮২
নারীচরিত ২৯১
নরনারায়ণ চৌধুরী ২৯৩
নেপালে বঙ্গনারী ২৯৯
নারীর উক্তি ৩০০
নীলদর্পন ৩০২
নাট্য চতুষ্টয় ৩০৫
নীতিকথা ৩০৫
নতুন ছড়া ৩০৭
নানাগল্প ৩০৭
নারী শিক্ষা পত্রিকা ৩০৮

নীলরতন সরকার ৩২৩
নির্মলা সরকার ৩২২
নেলী সেনগুপ্তা ৩২৮
ননীবালা দেবী ৩২৮
ন্যাশানাল থিয়েটার ৩৩৯
নরীসুন্দরী ৩৪১
নীরদা সুন্দরী ৩৪৪-৩৪৫
নবগোপাল মিত্র ৩৬৯

প

পরাশর ৩৩
পাণিনি ৩৫, ৮৮
পত্রলেখা ৩৫
প্রভাবতী ৩৯
পার্শ্বনাথ ৪২
পটচারা ৪৭, ৬০
প্রয়োগ ৫২
পুরূরবা ৫৪
পাঞ্চালরীতি ৫৫
প্রভুদেবী ৫৬
পরমথদীপনী ৫৭
প্রহ্তা ৬৪
পদ্মাবতী ৬৬, ১০৪
পরশুরাম ৬৮
প্রবীণাবাঈ ৬৮
প্রতাপকুমারী বাঈ ৬৯
প্রমীলা রাজ্য ৭০
প্রভাকর বর্ধন ৭০
পদ্ম সিংহ ৭০
পৃথিরাজ ৭০, ৭২
পদ্মিণী ৭২, ১৪৫
প্রেমকুমারী (হোসেনী ব্রাহ্মণী) ৮১
পেরিপ্লাস ৮৬
পরমেশ্বর মোদক ৯২
প্রিয়ম্বদা দেবী ৯৪, ৯৮, ২৩৬, ২৪১, ২৬৩-২৬৪
প্রাকৃত পৈঙ্গল ১০৫
পূর্ববঙ্গ গীতিকা ১২১
পাঁচু দত্ত ১৩১

পুরাণ ১৩২
পবমানন্দ ১৩২
প্রহ্লাদ চরিত্র ১৩৪
পাণ্ডুরাজা ১৪০, ১৬৯
পৃথু ১৪১
পরাশর সংহিতা ১৪১
পরিশেষ ১৪৬
প্রমীলা ১৫৫
পশুপতি ১৫৬
প্রিয়প্রসঙ্গ ১৬৭
পল্লীসমাজ ১৬৮,
পবন ১৭০
পথের পাঁচালী ১৭৩
প্যারীচাঁদ মিত্র ১৭৬, ২১২, ২৩৭
পলাতকা ১৭৭
পাশ করা ছেলে ১৮৭
পাশ করা জামাই ১৮৭
প্রতিমা দেবী ১৯০, ৩০০
পুরাতনী ১৯৩, ৩০৯
প্রসন্নকুমার ঠাকুর ১৭৯, ১৯২
প্রিন্স অব ওয়েল্‌স্‌ ১৯৪
প্রসন্নময়ী দেবী ২০৭, ২৩৬, ২৫৮, ২৬৬
পূর্বকথা ২০৭
প্যাবীচরণ সরকার ২১২
প্রফুল্লচন্দ্র বায় ২২০
প্রতুলকুমারী দাসী ২২৭
প্রভাকর পত্রিকা ২৩৬
প্রমথ চৌধুরী (বীববল) ২৩৭, ২৩৮
পদ্মিনী উপাখ্যান ২৩৮
প্লেটো ২৪০
প্রমীলা নাগ (বসু) ২৬৪
পঙ্কজিনী বসু ২৭২
প্রফুল্লময়ী দেবী ২৭৩
প্রণয় প্রতিমা ২৭৬
প্রেমলতা ২৭৬
স্নেহলতা বা পালিতা ২৭৮
পরাজিত ২৭৯
প্রত্যাবর্তন ২৭৯

পদ্মরাগ ২৭৯
পথহারা ২৮০
পথের সাথী ২৮০
পূর্ণশশীদেবী ২৮১
প্রেমের বায়না ২৮১
পথে বিপথে ২৮১
পথিক বন্ধু ২৮৪
প্রভাবতী দেবী সরস্বতী ২৮৪, ২৮৬
পথের শেষে ২৮৫
পদ্মলোচন রায় ২৯৪
প্যারীচরণ সেন ২৯৫
প্রফুল্লময়ী দেবী ২৯৬
প্রবাসী পত্রিকা ২৯৬-২৯৭
প্রতিমাঠাকুর ২৩০১, ৩৭৬
পুরোন দিনের কথা ৩০১
পূর্ণিমাদেবী ৩০১
পিন্‌কুর ডায়েরী ৩০৭
প্রিয়ম্বদা দেবী ৩০৭
পুণ্যলতা চক্রবর্তী ৩০৭
প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ৩০৮, ৩১০
প্রমদাচরণ সেন ৩০৮
পরিচারিকা পত্রিকা ৩০৮, ৩০৯
প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী ২৪৯, ৩১০, ৩৬৬
পুণ্যপত্রিকা ৩১০
পার্বতীচরণ চট্টোপাধ্যায় ৩১৭
প্রাণকৃষ্ণ আচার্য ৩২৩
প্রফুল্লমুখী বসু ৩৩২
পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গ নাট্যালয় ৩৩৯
প্রতিভা চৌধুরী ৩৪৯-৩৫১
প্রিয়নাথ বসু ৩৬৯

ফ

কৃষ্ণহস্তিনী ৫৭
ফুল্লরা ১১০
ফিরিঙ্গীকালী ১৪৩
ফুলমণি ১৮১
ফরিদপুর সুহৃদ সংঘ ২১৮, ২২০
ফৈজুন্নিসা চৌধুরী ২৫০-২৫১

ফুলকুমারী গুপ্তা ২৬২
ফুলের মালা ২৭৮
ফুলের তোড়া ২৭৯
ফল্গুধারা ২৮১

ব

বেদ ৫, ৪১, ৫০
বৃহদারণ্যক উপনিষদ ৫, ৬, ৩৫
বশিষ্ঠ ১৩, ১৪
বাৎস্যায়ণ ৩০, ৮৮
বৃহস্পতি ৩২, ৫৩, ১৭০
ব্রহ্মবাদিনী ৩৪
বাল্মীকি ৩৫, ৪৯, ১৪০
বাণভট্ট ৩৫, ৪৯
ব্রহ্মসূত্র ৩৫
বিদুলা ৩৬
বাকর্ষী ৩৬
বিক্রোমবর্শী ৩৭
বিক্রমাদিত্য ৩৯
ব্রাহ্মী ৪২, ১৭০
বুদ্ধদেব ৪৩, ৪৫, ৪৬, ৪৮, ৫৭
বিশাখা ৪৩, ৪৪, ৪৫
বাক্কঢাজ্জাতক ৪৩
বিমলাচরণ লাহা ৪৬
বিনয়গ্রন্থ ৪৭, ৪৮
বিম্বিসার ৪৭, ৬১
ব্যাসদেব ৪৯
বৃহদ্দেবতা ৫০
ব্রহ্মজায়া ৫০
বাক্ ৫০
বাতাপী ৫২
বিশ্ববারা ৫৩
বসুক্র ৫৩
বাচক্লবী ৫৪
বধ্রিমতী ৫৪
বৃহদারণ্যক ৫৪
বচক্লু ৫৪
বিজ্জলা ৫৫

বিকট নিতম্বা ৫৬
বিজয়াঙ্কা ৫৬
বিদ্যাবতী ৫৭
বিজয়রত্ন মজুমদার ৫৮
বদ্ধাবহী ৬৩
বাবাজান ৬৬
বাউরী সাধিকা ৬৬
বীর কুঁয়ারী ৬৬
বিক্রমজিৎ ৬৭
বিষ্ণু চিত্ত ৬৮
বকাবতী ৬৯
বিষ্ণুপ্রসাদ কুমারী ৬৯
বিদ্যাপতি ৬৯
বৃন্দাদাসী ৬৯
বিশ্বাসদেবী ৭০
বিক্রমজিৎ ৭১
বীরনারায়ণ ৭৩
বাবর ৭৫, ৭৬
বয়রাম খাঁ ৭৬
বয়েৎ ৭৬
বদরউন্নিসা ৮০
বজবাহাদুর ৮১
বৌধায়ন ধর্মসূত্র ৮৬
বক্তিয়ার খিলজী ৮৮
বল্লাল সেন ৯১, ১৪৪, ১৭০
বলরাম দাস ৯২
বিদ্যাসুন্দর ৯৩, ১৩২, ১৩৩
বিদ্যা ৯৩
বৈজয়ন্তী দেবী ৯৪, ৯৭
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৯৬, ১৫৬, ২৩৭
বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ ১০১
বীতপাল ১০৩
বিদ্যুতপ্রভা ১০৩
বৌদ্ধগান ও দোঁহা ১০৩, ১৮৫
বড়ুচণ্ডীদাস ১০৪, ১১০
বেহুলা ১০৫
বর্ণরত্নাকর ১০৭
বিজনবিহারী ভট্টাচার্য ১১৫

ব্রজমোহন রায় ১৩৩
বৌ-কুণ্ডুর দল ১৩৩
বউ-মাস্টারের দল ১৩৩
ব্রজলীলা পালা ১৩৪
বীরাঙ্গনা ১৪০
বসুদেব ১৪০
বিষ্ণুসংহিতা ১৪০
ব্যাস সংহিতা ১৪০
বৈকুণ্ঠনাথ চৌধুরী ১৪৮
বেঙ্গল হরকরা ১৫৪
বাসন্তী ১৫৫
বেণু ও বীণা ১৫৮
বেঙ্গল সেপক্টেটর ১৬১, ১৭৪
বসন্তকুমারী (রাণী) ১৬৩
বিদ্যোৎসাহিনী সভা ১৬৪
বিধবাবিবাহ নাটক ১৬৪
বালি ১৭০
ব্রহ্মা ১৭০
বিভীষণ ১৭০
বিজয় সেন ১৭০
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭৩
বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব ১৭৪
বিয়ে পাগলা বুড়ো ১৭৭
বৃহৎবঙ্গ ১৭৮
বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা ১৭৯
বাল্যবিবাহ নিবারণী সভা ১৭৯
বেহ্‌রামজী মেরবানজী মালাবারী ১৮০
বাল্যোদ্বিবাহ নাটক ১৮১
বেলাশেষের গান ১৮২
বোকাকড়ি চোকা মাল ১৮৬
বিবাহ বিভ্রাট ১৮৬
বলিদান ১৮৬
বাজীমাৎ ১৯৫
বেগম রোকেয়া সাকোয়াৎ হোসেন ১৯৬, ২৭৯-২৮০
বিজ্ঞানেশ্বর ১৯৭
বৈদ্যনাথ রায় ২০৯, ২১০, ২১১
বেঙ্গল সেপক্টেটর ২১১
ব্রজকিশোর বসু ২১৮, ২২১, ৩৩৩

ব্রাহ্মবন্ধু সভা ২১৮
বামাবোধিনী সভা ২১৮, ২৩৭
বরিশাল মহিলা উন্নয়ন সমিতি ২১৮
বিক্রমপুর সম্মিলনী ২১৮, ২২০
বামাবোধিনী পত্রিকা ২১৯, ২৩১, ২৩৭, ৩০৮
বরাহনগর বিধবাশ্রম ২২০
বনলতা ২২১
বিপিনচন্দ্র পাল ২২১
বিধুমুখী বসু ২২৩, ৩৩৪
ব্রাহ্মবালিকা বিদ্যালয় ২২৫
বালাবোধ ২২৮
বালাবোধিকা ২২৮
বালিকাবোধ ২২৮
বিদ্যাদর্শন ২২৯
বামারচনাবলী ২৩১
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৩৬
বঙ্গের মহিলা কবি ২৩৬
বঙ্গবন্ধু ২৩৭
বীরাঙ্গনা ২৩৮
বিহারীলাল চক্রবর্তী ২৩৮
বঙ্গসুন্দরী ২৩৮
বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ২৪১
বিন্ধ্যবাসিনী দেবী ২৪১
বিদ্যাদলনী কাব্য ২৪৫
বিরাজমোহিনী দাসী ২৫১
বিনয়কুমারী ধর ২৬৫
বনলতা দেবী -
বিদ্রোহ ২৭৮
বাগদত্তা ২৮০
বিধিলিপি ২৮১, ২৮২
বামাসুন্দরী ২৮৮-২৯০, ২৯৬
বিশ্বশোভা ২৯০
বসন্তকুমার দেবী ২৯৩
ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ২৯৬
বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৯৬
বিনোদিনী দাসী ২৯৭, ৩৪১
বিধবা বিবাহ ১৬১
বিপিনবিহারী সরকার ২৯৯

বাংলার স্ত্রীআচার ৩০০
বঙ্গমহিলার জাপানযাত্রা ৩০১
বালাবোধিকা ৩০২
বিদ্যারত্ন ৩০৭
বিদেশীছড়া ৩০৭
বালক ৩০৮, ৩১০
বালকবন্ধু ৩০৮
বালারঞ্জিকা ৩০৮
বঙ্গমহিলা ৩০৮, ৩০৯
বঙ্গবাসিনী পত্রিকা ৩১০
বিরহিনী পত্রিকা ৩১০
বনলতা দেবী ৩১০
বিরাজমোহিনী রায় ৩১০
বিবেকানন্দ ৩১৫, ৩২৫
বিপিনবিহারী ভট্টাচার্য ৩২০
বিজ্ঞানসভা ৩২২
বিন্ধ্যবাসিনী চৌধুরাণী ৩২২
বীরাষ্টমী ব্রত ৩২৬
বাসন্তী দেবী ৩৩০
বেথুন বিদ্যালয় ৩৩৩
ব্রাহ্মিকা সমাজ ৩৩৫
বামাহিতৈষিণী সভা ৩৩৫
বেঙ্গলী থিয়েটার ৩৩৮
বিদ্যাসুন্দর ৩৩৮
বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ ৩৩৯
বেলগাছিয়া নাট্যশালা ৩৪০
বনবিহারিণী ৩৪২
বেগমজান ৩৪৫

ভ

ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্তসাহিত্য ৪
ভবভূতি ৩৫, ৩৯
ভিক্ষুণী ৪১
ভদ্দাকুণ্ডল কেসা ৪৭
ভাস ৪৯
ভারবি ৪৯
ভাবয়ব্য ৫৩
ভাবদেবী ৫৭

ভোজরাজ ৬৭
ভক্তমাল ৬৮
ভীমসিংহ ৭১
ভারতচন্দ্র রায় ৯৩, ১০৭, ১২৮
ভোলা ময়রা ১২৯, ১৩০
ভবশঙ্করী ৯৫
ভবানী পাঠক ৯৬
ভবাণী বণিক ১২৯
ভদ্রা ১৪১
ভবাণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪৮
ভবাণীচরণ মিত্র ১৪৮
ভগবতী দেবী ১৬১
ভিক্টোরিয়া (মহারাণী) ১৭৫
ভারত সংস্কার সভা ১৭৯
ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় ১৮৬
ভুবনমালা ২১৭
ভারত আশ্রম ২১৮
ভুবনমোহন দাশ ২১৮
ভার্জিনিয়া মিত্র ২২১
ভুবনমোহন বসু ২২৩
ভিক্টোরিয়া ইন্‌স্টিটিউসন ২২৪
ভারতবর্ষীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষা ২৩০
ভারতী পত্রিকা ২৩১, ৩০৯, ৩১০, ৩২৬
ভুবনমোহিনী দেবী ২৪২
ভাগ্য চক্র ২৮২
ভারত মুক্তিসাধক রামানন্দ ও অর্ধশতাব্দীর বাংলা ২৮৩
ভারতবর্ষ পত্রিকা ২৯৬
ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল ২৯৯
ভারতবর্ষের ইতিহাস ৩০০
ভদ্রার্জুন ৩০২
ভিখারিনী ৩০৬
ভুবনমোহন রায় ৩০৮
ভূদেব মুখোপাধ্যায় ৩০৯
ভৈরবী ঠাকুরাণী ৩১৬
ভৈরব রঞ্জিনী মাহাত্ম্য ৩২১
ভারতসভা ৩২৪
ভার্জিনিয়া মেরী মিত্র ৩৩৪

ম

মনু ৬, ১২, ১৩, ১৪, ১৭, ২২, ২৩, ২৭, ৩০, ৪০, ১৪৫, ১৯৭
মালবিকাগ্নি মিত্র ৭
মৈত্রেয়ী ১৪, ৫৪
মনুসংহিতা ২৩, ১৪১, ১৬৯
মৈত্রায়ণী সংহিতা ২৭
মহাভারত ২৭, ৩৩, ৩৬, ১২৫, ১৪৫, ১৮৪
মহিলাকাব্য ২৮, ২৩৮
মহানির্বাণতন্ত্র ৩০
মালতীমাধব ৩৫
মন্দোদরী ৩৭, ১৭০
মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৩৭
মদালসা ৩৭
মহাশ্বেতা ৩৭
মালবিকাগ্নি মিত্র ৩৭
মহাপুরাণ ৪২
মহাবীর ৪২
মিগার ৪৪
মহাবংশ ৪৪, ৪৫
মজ্ঝিম নিকায় ৪৭
মহাতিস্সা ৪৭
মহাসুমনা ৪৭
মায়াদেবী ৪৮, ৫৭
মাঘ ৪৯
মেধা ৫০
মদালসা ৫৫, ৫৭
মারুলা ৫৫
মৌরিকা ৫৫
মাগম্মা ৫৭
মধুরবর্ণী ৫৭
মার ৬০, ৬২
মাহবী ৬৮
মীরাবাঈ ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৮০
মাতাবাঈ ৬৬
মাহেশ্বরী দেবী ৬৬
মাজাইয়াক্কাবা ৬৮
মুক্তাবাঈ ৬৯
মধুরবাণী ৬৯

মোহনাঙ্গিনী ৬৯
মল্লী ৭০
মুহম্মদ ঘুরী ৭০
মকদুম জানান ৭২
মুরাদ ৭২
মুজাফর শাহ্ ৭২
মলহর রাও ৭৩
মালেরাও ৭৩
মোরোপন্ত তাম্বে ৭৪
মনুবাঈ ৭৪
মুখ্ফী ৭৬, ৭৯
মীর্জা ঘিয়াস ৭৬
মেহেরুন্নিসা ৭৬
মমজাত মহল ৭৭, ৭৮
মৈনুদ্দীন চিশ্‌তী ৭৮
মুনিস্-উল-আরওলা ৭৮
মিয়াবাঈ ৭৯
মরিয়ম ৭৯
মুশাবা ৭৯
মৃগনয়নী ৮০, ৮১
মান ৮০
মামুদ ৮১
মাৎস্যন্যায় ৮৮
মুরভট্ট ৯৮
মনসামঙ্গল ৯৯, ১০৬, ১৪২, ১৬৬
মলুয়া ১০০
মল্লরাজা ১০০
মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ১০৭, ১৯৯
মাধবেন্দ্র পুরী ১০৭
মানিক গাঙ্গুলী ১১০
মৈমনসিংহ গীতিকা ১২৫
মোহিনী দাসী ১৩০
মথুর সরকার ১৩১
মাধবীলতা ১৩১
মদনমাস্টার ১৩৩
মতিলাল রায় ১৩৩
মতিলাল শীল ১৩৩, ২০৯

মুক্তামণি ১৩৪
মধুসূদন দত্ত ১৪০, ১৫৫
মাদ্রী দেবী ১৪০, ১৭০
মদিরা ১৪১
ময়নামতীর গান ১৪২
মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ১৪৮
মদনমোহন চক্রবর্তী ১৪৮
মেঘনাদবধ কাব্য ১৫৫, ২৩৮
মেঘনাদ ১৫৫
মৃণালিনী ১৫৬
মনোরমা ১৫৬, ১৫৮
মহামায়া ১৫৮
মানকুমারী বসু ১৬৭
মানসী ১৮১
মনোমোহন ঘোষ ১৯৩
মিতাক্ষরা ১৯৭
মিস্ গোমিস্ ২০৭
মদনমোহন তর্কালঙ্কাব ২০৯, ২১৮, ২৩০
মেরি কার্পেন্টার ২১৪, ২১৬, ২১৭
মিস্ এক্রয়েড ২১৬
মদনমোহন ঘোষ ২১৭, ২১৮
মনোবমা মজুমদাব ২১৭
মৈমনসিং সম্মিলনী ২২০
মহারাণী পাঠশালা ২২৪
মাতাজী মহাবাণী তপস্বিনী ২২৫
মনোমোহনী ব্যানার্জী ২২৫
মধুমতী মুখোপাধ্যায় ২৩১
মানকুমারী বসু ২৩৬, ২৪০, ২৫৮-২৬১, ৩০৭, ৩২৪
মধুমতী গঙ্গোপাধ্যায় ২৪১
মন্দোদরীর রণসজ্জা ২৪৯
মোক্ষদাদায়িনী মুখোপাধ্যায় ২৫৪, ৩০৯
মৃণালিনী সেন ২৭০
মনোরমা ২৭৬
মালতী ২৭৮
মিবাররাজ ২৭৮
মিলন রাত্রি ২৭৮
মালতী ও গল্পগুচ্ছ ২৭৮
মতিচুর ২৭৯

মন্ত্রশক্তি ২৮০
মহানিশা ২৮০
মা ২৮০
মেয়ের বাপ ২৮১
মহিলা মজলিস ২৮১
মুকুটমণি ২৮২
মঙ্গল ঘট ২৮৩
মনের অগোচরে ২৮৪
মাতৃঋণ ২৮৪
মহীয়সী নারী ২৮৫
মাধুরীলতা দেবী ২৮৫
মার্থা সৌদামিনী সিংহ ২৯১
মহিলা পত্রিকা ২৯৫
মাসিক বসুমতী ২৯৫
মিবার গৌরবকথা ৩০০
মীরাদেবী (ঠাকুর) ৩০১
মধুসূদন দত্ত ৩০২
মোহের প্রায়শ্চিত্ত ৩০৫
মাসিমা ৩০৭
মাসিক পত্রিকা ৩০৮
মোহিনী দেবী ৩০৯
মথুরানাথ ৩১৬
মোক্ষদা সুন্দরী দেবী ৩২০
মানগোবিন্দ মল্লার ৩২১
মণিবেগম ৩২১
মীরজাফর ৩২১
মহেন্দ্রলাল সরকার ৩২২
মাতঙ্গিনী হাজরা ৩২৬-৩২৮
মোহিনী দেবী ৩২৮
মোহিনী সেন ৩২৮
মিস্‌ফ্যানি পার্কস ৩৪৬
মালকা জান ৩৪৬
মৃণ্ময়ী ৩৭০

য

যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি ৩
যাজ্ঞবল্ক্য ১৪, ৫৪, ১৪১
যজু ৩১

যম ৩৪, ৫৪
যোগবাশিষ্ট ৩৭
যশোদা ৪২
যশোধরা ৪৩
যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ৬২, ২৩৬, ২৪১
যদুনাথ সরকার ৭৪
যদুনন্দন দাস ৯১
যজ্ঞেশ্বরী ১২৯
যতীন্দ্রনাথ ঘোষ ১৩৪
যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১৮৬
যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় ১৮৬
যোগেশ চন্দ্র বাগল ২১৮
যোগমায়া দেবী ২৪২
যোষিদ্বিজ্ঞান ২৯৩
যোগেশচন্দ্র ঘোষ ২৯৫
যোগেন্দ্র চন্দ্র গুপ্ত ৩০২
যশোদা মাঈ ৩২০
যামিনী সেন ৩৩৩
যাদুমণি ৩৪৬, ৩৪৭, ৩৪৮

র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২-৪, ৭, ১০-১১, ১৬, ২৬-২৭, ৪০,৪৫, ৯০, ১১৫, ১৪০, ১৪৬, ১৫৮, ১৭৭, ১৮১, ১৮৩, ১৯২-১৯৩, ২১২, ২৩৪, ৩০২, ৩০৫
রঘুবংশম্ ১২, ৩৩, ৩৬
রামপ্রসাদ ২২, ৯৩
রামায়ণ ৩৩, ১০৭, ১৩২, ১৪৫
রামচন্দ্র ১৪, ৩৩, ১৪০, ১৮৪
রুক্মিণী ৩৩
রমাচৌধুরী ৩৬
রত্নাবলী ৩৭
রুদ্র সেন ৩৯
রাজতরঙ্গিণী ৩৯
রেবতী ৪৭
রোমশা ৫০, ৫৩
রাত্রি ৫০
রাজ্ঞী ৫৪
রাজশেখর ৫৫, ৫৬, ৬৪
রাজকন্যা ৫৭
রসবতী প্রিয়ম্বদা ৫৭

রোহা ৬৪
রেবা ৬৪
রুইদাস ৬৬
রামানন্দ ৬৬
রত্ন সিংহ ৬৬
রণছোড়জী ৬৭
রামানুজ ৬৭
রত্নকুমারী ৬৯
রঘুনাথভূপাল ৬৯
রামরয়ালু ৬৯
রাজশ্রী ৭০
রাজ্যবর্ধন ৮০
রুদ্রদেবী ৮০
রাণাসঙ্গ ৮১
রাজারাম ৭৩
রঘুনাথ রাও ৭৪
রূপমতী ৮১
রামতনু ৮১
রেনেশাঁ ৯০
রাণীভবাণী ৯৩
রূপমঞ্জরী ৯৪
রাজা রুদ্রনারায়ণ ৯৫
রাণী শিরোমণি ৯৬
রাণী চৌধুরী ৯৬
রমেশচন্দ্র মজুমদার ৯৬
রাণী কাত্যায়নী সিংহ ৯৬
রাণী ভবাণী ৯৭
রাজা রামজীবন রায় ৯৭
রামকান্ত রায় ৯৭
রামকৃষ্ণ রায় ৯৭
রঘুনাথ মিশ্র ৯৮
রামী ৯৯, ১০০, ১০১
রামগতি ন্যায়রত্ন ১০১
রাজা রাজবল্লভ ১০১, ১৬১
রাজতরঙ্গিনী ১০৩
রাজা লক্ষ্মণ সেন ১০৩
রূপরাম ১০৫
রামেশ্বর ভট্টাচার্য ১১৩

রঘুনাথ দাস ১২৯
রামজীদাস ১২৯
রাসু-নৃসিংহ ১২৯
রামপ্রসাদ ঠাকুর ১২৯
রাম বসু ১২৯
রত্নমণি ১২৯
রামনিধিগুপ্ত (নিধুবাবু) ১২৯, ১৩২
রূপচাঁদ পক্ষী ১২৯
রূপে পাঠ ১৩১
রামচাঁদ মুখোপাধ্যায় ১৩২
রাধামণি ১৩৩
রাজকুমারী ১৩৩
রাধারাণী যাত্রা সম্প্রদায় ১৩৩, ১৩৪
রত্নমণি কুণ্ডু ১৩৪
রজনী কুণ্ডু ১৩৪
রামেশ্বর ১৩৫
রাজা রামমোহন রায় ১৪০, ১৪৬, ১৪৮, ১৪৯, ১৫০, ১৭৪, ১৭৮, ২১৭, ৩১৫
রুক্মিনী ১৪১
রোহিনী ১৪১
রঘুনন্দন ১৪৪
রাজকৃষ্ণ মিত্র ১৪৮
রামনারায়ণ মিত্র ১৪৮
রাধাকান্ত দেব ১৪৯, ২০৮, ২০৯, ২১০
রাজীব ১৫৮
রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ১৬১
রাজনারায়ণ বসু ১৬২, ১৯৩, ১৯৪, ২০৮, ২১৬
রাবণ ১৭০
রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় ১৭৪
রামনারায়ণ তর্করত্ন ১৭৫
রাধাবিনোদ হালদার ১৮৭
রজনীনাথ রায় ১৯৫
রামজয় তর্কভূষণ ১৯৯
রাসসুন্দরী দেবী ২০৮
রামগোপাল ঘোষ ২০৯, ২১১, ২১৪
রাধানাথ শিকদার ২১১
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ২২০, ৩০৮
রাধারাণী লাহিড়ী ২২৮, ২৪২
রামসুন্দর রায় ২৩০
রমাসুন্দরী ঘোষ ২৩১, ২৪২

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ২৩৯
রঘুমণি দেবী ২৪২
রাখালমণি গুপ্ত ২৪৭-২৫০
রূপজালাল ২৫০
রোকেয়া রচনাবলী ২৭৯
রামগড় ২৮০
রূপহীনা ২৮১, ২৮২
রাতের ফুল ২৮১
রায়বাড়ী ২৮২
রাজা ও রাণীর যুগ ২৮৪
রজনীগন্ধা ২৮৪
রাঙা বৌ ২৮৫
রামসুন্দরী দাসী ২৯৬
রামকমল সেন ২৯৭
রমাদেবী ২৯৮
রবীন্দ্র স্মৃতি ৩০০
রবীন্দ্র সংগীতের ত্রিবেণী সংগম ৩০০
রামনারায়ণ তর্করত্ন ৩০২
রামের বনবাস নাটক ৩০৩
রেভারেণ্ড এস. সি. ঘোষ ৩০৮
রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৩১৮
রমণীমোহন চক্রবর্তী ৩১৮
রাণী ইন্দ্রানী ৩২০
রাণী শিরোমণি ৩২১
রাণী কিশোরমণি ৩২০-৩২১
রেজা খাঁ ৩২১
রাণী স্বর্ণময়ী ৩২২
রাজেন্দ্র চন্দ্র চন্দ্র ৩৩৪
রমাবাঈ (পণ্ডিতা) ৩৩৭
রাধামণি ৩৩৮
রাজু ৩৩৮
রাজবালা ৩৭০

ল

লবকুশ ৩৫
লীলাবতী ৩৭, ৯৩, ৯৯, ২৩০
লোপামুদ্রা ৫০, ৫২, ৫৩
লাজ্জা ৫০
লক্ষ্মী ৫৭

লছিমা দেবী ৬৯
লক্ষ্মীবাঈ ৭৪, ২২৭
লহনা ৯৩
লালা রামপ্রসাদ বায় ১০২
লামা তারানাথ ১০৩
লক্ষ্মীধী ১০৭
লালু নন্দলাল ১২৯
লর্ডওয়েলেসলি ১৪৮
লর্ড বেন্টিক ১৪৮, ১৪৯
লোভেন্দ্র গবেন্দ্র ১৮৬
লর্ড লরেন্স ১৯৪
লর্ড নর্থব্রুক ১৯৬
লেডিস সোসাইটি ফব নেটিভ ফিমেল এডুকেশন ২০৯, ২১১
লণ্ডন মিশনারী সোসাইটি ২০৯
লোরেটো হাউস ২২৪
লক্ষ্মীমণি ২৪০
লজ্জাবতী বসু ২৬৫-২৬৬
লীলাদেবী ২৭৩
লুৎফন্নেসা ২৭৫
লীলাবতী মিত্র ৩১০, ৩২৩
লালমোহন ঘোষ ৩২৪
লাবণ্যপ্রভা দত্ত ৩২৮

শ

শ্রীরামকৃষ্ণ দেব ১, ৪, ৫, ৭, ৩১৫, ৩১৬, ৩১৭
শেষের কবিতা ২
শশিভূষণ দাশগুপ্ত ৪, ২৩
শ্রীশ্রীচণ্ডী ৫
শ্বেতকেতু ১৫, ১৮৪
শঙ্করাচার্য ১৮, ৫০
শ্রীহর্ষ ৩৩
শবরী ৩৩
শ্বেতাম্বর ৪১
শতানীক ৪২
শালবতী ৪৫
শৌনক ৫০
শ্রী ৫০
শ্রদ্ধা ৫০, ৫৪
শচী ৫২

শশীয়সী ৫৪
শীলা ভট্টারিকা ৫৫
শার্ঙ্গধর পদ্ধতি ৫৫
শুদ্ধোধন ৫৭
শ্রীরঙ্গনাথ ৬৮
শৈবনয়না ৬৮
শিব সিংহ ৬৯
শশাঙ্ক ৭০
শালিবাহন ৭২
শিবাজী ৭৩
শের আফগান ৭৬
শাহজাহান ৭৭, ৭৮, ১৪৮
শিবানন্দ সেন ৯২
শ্রীনিবাস আচার্য ৯২
শিবচন্দ্র রায় ৯৩
শ্যামাসুন্দরী দেবী ৯৪, ২৩১
শিবরাম সার্বভৌম ৯৮
শ্যামারহস্য ৯৮
শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ ১০৪
শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ১০৪, ১০৬, ১১০
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ১০৬
শ্রীরঙ্গপুরী ১০৬
শচীদেবী ১০৬
শিবায়ন ১১০
শশিমুখী ১৩১
শ্রীমতী ১৩১, ১৩২
শিশুরাম ১৩২
শ্রীদাম-সুবল ১৩২
শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৫৯
শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি ১৬১
শ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য ১৬২
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৬৬
শ্যামাচরণ শ্রীমাণি ১৮১
শিশির কুমার ঘোষ ১৮৭
শিবনাথ শাস্ত্রী ২০৮, ২১৪, ২২০-২২৪, ৩০৮
শিবকৃষ্ণ (রাজা) ২০৯
শিবচন্দ্র দেব ২১১, ২৩৭
শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ২২০

শ্রীহট্ট সম্মিলনী ২২১
শরৎচন্দ্র ধর ২৩১
শৈলজাকুমারী দেবী ২৩১
শৈলবালা ঘোষ জায়া ২৩৬, ২৮৩-২৮৬, ৩০৬
শূর সুন্দরী ২৩৮
শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ২৪১, ২৭৫, ২৮০, ২৮৩
শ্মশান ভ্রমণ ২৫০
শতগান ২৬৪
শিবসুন্দরী দেবী ২৭৫-২৭৬
শান্তিলতা ২৭৬
শরৎকুমারী চৌধুরাণী ২৭৮
শুভবিবাহ ২৭৮-২৭৯
শরৎকুমারী চৌধুরাণীর রচনাবলী ২৭৯, ৩০৯
শ্যামলী ২৮১
শান্তা দেবী ২৮২-২৮৩, ২৮৬, ৩০৭, ৩৬০-৩৬১
শান্তি ২৮৩
শ্রীনাথ দাস ২৯৮
শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবনজবিত ৩০০
শ্যামাঙ্গিনী দে ৩১০
শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩১০

স

সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ৩
সাংখ্যদর্শন ৫
সুকুমার সেন ৭, ২৬, ১০৪
সীতা ১৪, ২১, ৪০, ৫৭, ১৪০, ১৪৪, ১৪৬, ১৫৯, ১৮৪
সতী ২১, ৪০, ১৪৪, ১৪৫
সাবিত্রী ২১, ৩৩, ৪০, ১৪৪
স্বামী বিবেকানন্দ ২২, ২৬, ২২৭
স্যর মনিয়ার উইলিয়ামস্ ২৬
সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ২৮, ২৩৮
সাম ৩১
সুভদ্রা ৩৩, ৩৬
সুলভা ৩৩, ৫৫
স্বয়ংপ্রভা ৩৬
সরমা ৩৬
সাগরিকা ৩৭
সুসজ্জা ৩৭
সমুদ্রগুপ্ত ৩৮

সাধ্বী ৪১
সুন্দরী ৪২
সম্বুলা ৪৩
সম্বুলজাতক ৪৩
সিরিমা ৪৫
সুলসা ৪৫
সিবলী ৪৬, ৪৭
সুক্কা ৪৭
সংঘমিত্রা ৪৭
সুত্তপিটক ৪৭, ৪৮, ৫৭
সখুক ৪৭
সারিপুত্ত ৪৭
সোনা ৪৭
সরমা ৫০
সার্পরাজ্ঞী ৫০, ৫৪
সূর্যা ৫০, ৫১
সূক্তি মুক্তাবলী ৫৬
সরস্বতী ৫৭
সুমনা ৫৯
সোমা ৫৩
সসিপহা ৬৪
সহজোবাঈ ৬৬, ৬৯
সখুবাঈ ৬৬
সংগ্রাম সিংহ ৬৭
সেখ ৬৯
সুন্দরী কুমারী ৬৯
সোয়েরাবাঈ ৬৯
সপ্তকাহোপাত্রা ৬৯
সংযুক্তা দেবী ৬৯
সুলতানা রাজিয়া ৭১
সলমা সুলতান বেগম ৭৬
সেলিম ৭৬
সতীউন্নিসা ৭৮
সেখ নিজামুদ্দিন আউলিয়া ৭৮
সরস্বতী ৮১
সুলতান কুতুবুদ্দিন ৮৭
সীতাদেবী ৯৩, ১০২, ১০৭, ১৪৫
সীতাচরিত্র ৯২

সীতাগুণকদম্ব ৯২
সুভদ্রা দেবী ৯২
স্বর্ণকুমারী দেবী ৯৩, ২১৯, ২৩৬, ২৪০, ২৫৪-২৫৬, ২৭৮, ২৮৫, ২৯৭, ৩০৫, ৩০৭, ৩০৯, ৩২৪-৩২৫
সেকেলে কথা ৯৩
সুখময় রায় ৯৩, ২১২
সারদামঙ্গল ৯৩
সিরাজদ্দৌলা ৯৭
সুলোচনা ৯৮
সীতার বারমাসী ৯৯
সেক-শুভোদয়া ১০৩
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ১০৫, ১৫৮, ১৮২, ১৮৮
সার্বভৌম ভট্টাচার্য ১০৭
সদুক্তিকর্ণামৃত ১১০
সর্বানন্দ কবিয়াল ১৩০
সহচরী ১৩১
সমাচার দর্পণ ১৩৩, ১৭৩
সহদেব ১৪০, ১৭০
সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের সংবাদ ১৪৮
সূর্যশঙ্কর ঘোষাল ১৪৮
সহমরণ ১৫৮
সুশীল রায় ১৫৮
সতীর চিতায় আহোরণ ১৫৯
সংবাদ প্রভাকর ১৬৩, ১৭৯
সুগ্রীব ১৭০
সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভা ১৭৪, ১৮৬
সিপাহী বিদ্রোহ ১৭৪
সর্বশুভকারী ১৭৯
সর্দা আইন ১৮১
সহবাস সম্মতি আইন ১৮১
সম্মতি সঙ্কট ১৮১
সোম প্রকাশ ১৮৬, ১৯৪, ২৯০
স্নেহলতা মুখোপাধ্যায় ১৮৭
স্বর্ণলতা ১৯০
স্মৃতিচিত্র ১৯০, ১৯৩
সুধীররঞ্জন দাশ ১৯০
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৩, ১৯৪, ৩০০
স্ত্রীধন ১৯৭, ২০০

সারদাসুন্দরী দেবী ২০৮
সম্বাদ ভাস্কর ২০৮
স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক ২১১, ২২৯
সেন্ট্রাল স্কুল ২১২
সমাজোন্নতি বিধায়িনী সভা ২১২, ২১৩
সারজন হান্টার লিটলার ২১৬
সৌদামিনী দেবী ২১৭
সর্বশুভকরী সভা ২১৮
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২১৮, ২১৯
সুন্দরীমোহন দাশ ২২১
স্বর্ণময়ী দেবী (মহারাণী) ২২৬
সারদা মা ২২৬
সরলাদেবী চৌধুরাণী ২২৭
সমাচার চন্দ্রিকা ২২৭
স্কুলবুক সোসাইটি ২২৮
সর্বশুভকরী পত্রিকা ২২৯
সুলভ পত্রিকা ২৩০
স্ত্রী শিক্ষা বিধান ২৩০
স্ত্রীধর্ম বিধায়ক ২৩০
সরোজিনী নাইডু ২৩৬, ২৭০-২৭১, ৩২৬
সরোজকুমারী দেবী ২৪১
সংবাদ প্রভাকর ২৪২
স্বর্ণপ্রভা বসু ২৪২
স্বপ্নদর্শনে অভিজ্ঞান ২৪২
সুনীতি দেবী ২৬১-২৬২
সুরবালা ঘোষ ২৬২
সুশীলা সুন্দরী সেন ২৬২
সরলাবালা দাসী ২৬৪
সরলাদেবী চৌধুরাণী ২৬৪-২৬৫, ২৮৫, ৩০৯, ৩২৫, ৩৫৩-৩৫৪
সুরমাসুন্দরী ঘোষ ২৬৫
সুচারুদেবী ২৬৬
সরলাবালা সরকার ২৬৭, ৩০৭
সরোজকুমারী দেবী ২৬৭
সরযূবালা সেন ২৭২
সুরঙ্গিণী ২৭৬
স্নেহলতা বা পালিতা ২৭৮
স্বপ্নবাণী ২৭৮
স্রোতের গতি ২৭৯

স্নেহময়ী ২৮১
সাদা কালো ২৮১
স্বপ্ন দ্রষ্টা ২৮২
সেখ আব্দু ২৮৩
সোনা নয় রূপা নয় ২৮৪
সীতাদেবী ২৮৪, ২৮৬, ৩০৭
সোনার খাঁচা ২৮৪
সীতানাথ সরকার ২৯০
সারদাসুন্দরী দেবী ২৯৫
সেকেলে কথা ২৯৬
সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৯৬
সাধ্বীজ্ঞান দেবী ৩০১
স্মৃতির খেয়া ৩০১
সাহানা দেবী ৩০১
স্মৃতিকথা ৩০১
স্মৃতিচিত্র ৩০১
সুকুমারী দত্ত ৩০২, ৩০৪-৩০৫
সন্ন্যাসিনী বা মীরাবাঈ ৩০৫
সিতিমা ৩০৫
সাতভাই চম্পা ৩০৭
সাতরাজার ধন ৩০৭
সুখলতা রাও ৩০৭, ৩৬০
সোনার ময়ূর ৩০৭
সুরুচিবালা সেন ৩০৭
সখা ৩০৬
সাথী ৩০৬
সমাচার দর্পণ ৩০৬
সুচারু দেবী ৩০৮
সোহাগিনী পত্রিকা ৩১০
সুশীলাবালা দেবী ৩১০
সুখতারা দত্ত ৩১০
সারদামণি দেবী ৩১৭
সুবালা আচার্য ৩২৩
সুন্দরীমোহন দাস ৩২৩
সরমাগুপ্তা ৩২৮
সুরমা মুখোপাধ্যায় ৩২৮
স্নেহশীলা চৌধুরী ৩২৮
[illegible]গুপ্তা ৩২৮

সরযূবালা সেন ৩২৯
সখিসমিতি ৩৩৫
সুকুমারী দত্ত (গোলাপবালা) ৩৪০
সুর্পনান ৩৪৬
সুরমা ৩৪৬
সুনয়নী দেবী ৩৫৭-৩৫৯
সুশীলা সুন্দরী ৩৬৯
সুলতান বালা ৩৭০
সুচিন্তা ও সুকুমারী ৩৭০

হ

হারীত ৩৫
হেমা ৪৭
হাল ৬৩
হরি ৬৬
হর্ষবর্ধন ৭০
হুমায়ুন ৭১, ৭৫
হাম্বীব রাও ৭৩
হুমায়ুননামা ৭৫
হাফেজ ৭৯
হরিদাস ৮০
হেমলতা ঠাকুরাণী ৯২
হরসুন্দরী ৯৩
হটী বিদ্যালঙ্কার ৯৪
হরিলীলা ১০১
হরেকৃষ্ণ দীঘাঙ্গী ১২৯
হারাণ ঠাকুর ১৩১
হরমোহন ১৩১
হরিহর দত্ত ১৪৮
হরনাথ তর্কভূষণ ১৪৯
হেমচন্দ্র ১৫৬, ১৫৮
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৬৭, ১৯৫, ২২১
হিন্দু হিতৈষী ১৭৩
হিন্দু বিবাহ আইন ১৭৪
হরিমোহন মাইতি ১৮১
হরবিলাস সর্দা ১৮১
হরিশচন্দ্র মিত্র ১৮৬
হীরালাল ঘোষ ১৮৬
হরানন্দ ২০৮

হেয়ার প্রাইজ ফণ্ড ২১২, ২৩৭
হেমেন্দ্রচন্দ্র দত্ত ২২০
হরিনারায়ণ সেন ২২০
হেরম্বচন্দ্র মৈত্র ২২০
হিন্দু ইন্টালিজেন্স ২২৮
হিন্দুমহিলাগণের হীনাবস্থা ২৩১, ২৯০
হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাসও তাহার সমুন্নতি ২৩১, ২৯০
হবকুমারী দেবী ২৪৭
হিরন্ময়ী দেবী ২৬৩, ৩০৯, ৩২৪
হেমলতা ঠাকুর ২৬৬-২৬৭, ৩০৭
হ্যানা ক্যাথারিন মুলেন্স ২৭৪-২৭৫
হেমাঙ্গিনী ২৭৬
হুগলীর ইমামবাড়া ২৭৮
হাবানো খাতা ২৭৯
হিন্দুর মেয়ে ২৮২
হেমেন্দ্র মোহন বসু ২৮৬
হরচবণ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৯৬
হেমলতা সরকাব ২৯৯
হবিপ্রভা তাকেদা ৩০১
হেমন্তবালা দেবী ৩০১
হবচন্দ্র ঘোষ ৩০২
হিন্দুস্থানী উপকথা ৩০৭
হুকাকুয়া ৩০৭
হেমলতা পত্রিকা ৩০৮
হিন্দুলল·. ৩০৯
হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুব ৩১০
হেমন্তকুমারী চৌধুরী ৩১০
হেমাঙ্গিনী দাস ৩২৩
হেমপ্রভা মজুমদার ৩৩১
হিন্দু থিয়েটার ৩৩৮
হিন্দু পাইয়োনিয়াব ৩৩৮
হিজুল ৩৪৬
হীরাবুলবুল ৩৪৬

